অখণ্ড মণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

১৩৩৯ বাংলা সালের চৈত্র মাস। শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব মৌনী। এই অবস্থায় তিনি পূর্ব্ববঙ্গের কুমিল্লা শহরে সাধু-সজ্জন-ভক্ত ক্ষীরোদ বিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের গৃহে আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসুরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছেন। শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিত ভাবে জবাব দিতেছেন। ক্ষীরোদ বাবুরই যত্নে লিখিত উত্তর সমূহের কিছু সুরক্ষিত ছিল। তাহাই মুদ্রিত করিয়া ক্ষুদ্র-কলেবর একখানা পুস্তিকা বাহির করা হয়,—"গুরু"। আজ ক্ষীরোদ বাবু ইহধামে নাই, কিন্তু এই গ্রন্থের সহিত তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত।

বাংলা ১৩৫৩ সালের ফাল্গুনে "অখণ্ড-সংহিতা" প্রথম খণ্ড হইতে নবম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ হইতে গুরুবাদ সম্পর্কিত নিবন্ধ-গুলি সঙ্কলন ও সংযোজন করিয়া "গুরু" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাইবার প্রায় আট বৎসর পরে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে।

ইতিমধ্যে "অখণ্ড-সংহিতার" প্রথম হইতে অষ্টম খণ্ড পর্য্যন্ত দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। তাহার সহিত মিল রাখিয়া "গুরু" গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ সংশোধিত হইল। ইহাতে বর্ত্তমান গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। "অখণ্ড-সংহিতা" প্রথম সংস্করণের সবগুলি খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ হইলে এবং অপ্রকাশিত খণ্ডগুলি মুদ্রিত হইলে ভবিষ্যতে "গুরু" গ্রন্থের আরও আয়তন-বৃদ্ধি ঘটিবে।

এবার কলেবর-বৃদ্ধির আরও এক কারণ ঘটিল। তাহা এই যে, দ্বিতীয়াংশে "শান্তির বারতা" হইতে এবং শেষাংশে 'ধৃতং প্রেম্না" ১ম—৮ম খণ্ড হইতে কিছু কিছু সঙ্কলিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানা জনসাধারণের মনের অচলায়তনে প্রবলভাবে নাড়া দিয়াছে, ইহা পাঠকদের শত শত সপ্রশংস পত্রের মাধ্যমে আমরা অবগত হইয়াছি। গুরুবাদ, গুরুতত্ত্ব, গুরু ও শিষ্য সম্পর্কে বর্ত্তমান

আমার মনে কোনও উদ্বেগ বা উল্লাস সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু একটা জিনিষ এই এসে দাঁড়াল যে, আমার বৈদিক সন্ধ্যার মন্ত্র-তন্ত্র, বাংলায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার মহাবাক্য, সবই একসঙ্গে চলে গেল, রইল শুধু এই মহামন্ত্র প্রণব, যাঁকে ছেড়ে দিলে আমার অস্তিত্বই থাকে না। এখন বল ত' সেই স্কুলের মাষ্টার মশাই আমার গুরু কিনা? বয়স বেড়ে চলেছে, সাধু-পন্থে নেমে গেছি, কিন্তু মনের ভিতরে এক অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা আমাকে পীড়া দিচ্ছে। এই রকম নিঃসঙ্গতা-বোধ এলেই মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা কত্তে চায়। অবশ্য দীক্ষার প্রয়োজন আমি অনুভব করিনি। কিন্তু এই সময়ে এক গৃহী সাধক এসে নিজে সেধে আমার সঙ্গে আলাপ জমালেন। মিষ্টি কথা-বার্ত্তায় প্রাণ নরম হ'ল। তাঁকে প্রেমপূর্ণ পত্রাদি লিখ্‌তে আরম্ভ কল্লাম। কিছুদিন পরে তাঁর সঙ্গে হাওড়াতে বলদেও-পাড়াতে মিলন হ'ল। তিনি আমাকে মন্ত্রাদি দেবার আগেই দেখলাম তাঁর শিষ্যদের কাছে আমাকে তাঁর শিষ্য ব'লে পরিচয় দিলেন। মনটা একটু সন্দিগ্ধ হ'ল। কিন্তু পরদিন ভোর সময়ে স্নান সেরে আসতেই তিনি বল্‌লেন,—“বস ত' সামনে।” বস্‌লাম। বল্লেন,—“চোখ বোজ ত।” বুজলাম, তাঁর উদ্দেশ্য কিছুই ধারণা কত্তে পারি নি। তিনি আমার কাণে এক মন্ত্র দিয়ে বল্লেন,—‘‘তোমার দীক্ষা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে মনটা হ'ল বিদ্রোহী। দীক্ষা ত' আমি চাই নি, দীক্ষার ত' আমার দরকার

যুগের মানুষের মনের সহস্র প্রশ্ন এই গ্রন্থে নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে। অপক্ষপাত মতামতের জন্য আচার্য্য স্বরূপানন্দ সুখ্যাত।

নিজেদের ধর্ম্মসংঘকে পরিপুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে অযাচক আশ্রম হইতে একখানা গ্রন্থও অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। জনসাধারণের মনে স্বাধীন বিচার-বুদ্ধিকে উদ্রিক্ত করিয়া স্বকীয় সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির আলোকে সাধককে নির্ভয়ে পথ চলিবার উৎসাহ প্রদানই আমাদের উদ্দেশ্য। ইতি— বৈশাখ, ১৩৭১

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-১

বিনীত নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

পঞ্চম সংস্করণের নিবেদন

"গুরু" বহির চতুর্থ সংস্করণ বর্দ্ধিত-আয়তনে প্রকাশিত হইয়াছিল বৈশাখ ১৩৭৬ বাংলা সনে। চতুর্থ সংস্করণে আয়তন বৃদ্ধির কারণ "অখণ্ড-সংহিতা" দশম খণ্ড হইতে ত্রয়োদশ খণ্ড ও "ধৃতং-প্রেম্না" নবম খণ্ড হইতে পঞ্চবিংশতিতম খণ্ড পর্য্যন্ত গুরুবাদ সম্পর্কে যেখানে যে উপদেশ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

পঞ্চম সংস্করণে কলেবর বৃদ্ধি ঘটে নাই। চতুর্থ সংস্করণে মুদ্রিত "গুরু" বহির ইহা হুবহু পুনর্মুদ্রণ মাত্র। দীর্ঘ ১৩ বৎসর পর পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া পাঠকদের আগ্রহাতিসয্যে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করার জন্য আমরা নূতন বিষয় সংযোজন করার সময় পাই নাই। ইতি— পৌষ, ১৩৮৯

অযাচক আশ্রম
বারাণসী-১০

বিনীত নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

দূরের কথা, আমার কয়জন সঙ্গীই আমাকে বুঝ্‌তে পেরেছে? কিন্তু একথা জেনো, অখণ্ড-মন্ত্রের প্রতি আমার যে কুণ্ঠাহীন আনুগত্য, তাই আমার নিকটে নিখিল জগৎকে টেনে আন্‌বে। অন্য কোনও কৌশলের প্রয়োজন হবে না!

(২৩শে পৌষ, ১৩৪৮)

নামের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখ

মঙ্গলময় নামের অনির্ব্বাণ প্রদীপ সকল সময় ভ্রূমধ্যে প্রজ্জ্বলিত রাখ্‌বে। একটী নিমেষের জন্যও নামের প্রদীপকে নিভে যেতে দেবে না। জগতের যত সংশয়, যত সন্দেহ সব এই নামের পবিত্র জ্যোতিতে ছিন্ন হ'য়ে যাবে। জীবনের এমন কোনও রহস্য নেই, নামের তীরবৎ তীক্ষ্ণ জ্যোতি যাকে ভেদ না কত্তে পারে। নামে লগ্ন হ'য়ে থাক, সকল অজ্ঞান তোমার দূর হবে, নিয়ত ব্রাহ্মী প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে নিত্যসত্যময় অক্ষয় শান্তিতে তুমি বিরাজমান হবে।

আমি কিন্তু আসিব

আজ থেকে নাম-সাধনের ব্রত নিলে. তাতে কিন্তু দিনে রাত্রে আমি চার চার বার তোমাদের কাছে ছুটে আস্‌ব, প্রাণভরা এই ব্যাকুল কামনা নিয়ে যে, তোমরা ঠিক্‌ ঠিক্‌ তোমাদের নাম-সাধনার যজ্ঞবেদীতে বিনম্র হ'য়ে বসেছ। তোমরা যদি সেই সময়ে আমাকে মধুময় অখণ্ডনাম প্রেমভরে

গুরু

বা

গুরুবাদ ও গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে

বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত

উপদেশ-সমূহের

সঙ্কলন

মধ্য দিয়া সেই সাধনা করিয়া লও, তবে ত' বাবা দীক্ষা নিবে !

আমি তোমাদিগকে নিরুৎসাহ করিতে চাহি না। কিন্তু তোমাদের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দেওয়াও আমার কর্ত্তব্য।

(২৬শে পৌষ, ১৩৬৮)

(৫৭)

তোমার পত্র পাইয়া হাসিলাম। জনৈক মহাপুরুষ নিজ অলৌকিক শক্তির প্রচার করিয়া কয়েকদিনে তোমাদের ওখানে দুই হাজার শিষ্য করিয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমি বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন হই নাই। আগরতলাতে আমি কি একমাত্র একদিনে চারি হাজার পঁচিশ জনকে দীক্ষা দেই নাই ? আমার রেকর্ড ইনি ব্রেক্ করিতে পারেন নাই। অথচ আমার কোনও অলৌকিক শক্তি নাই, আমার অলৌকিকতাকে প্রচার করিবার কোনও অধিকার তোমাদের দেই নাই। তবে কেন অত ঘাবড়াইয়া যাইতেছ ?

আমার শরীর মরিয়া যাইবার অনেক পরেও আমি বাঁচিয়া থাকিব। এ বাঁচা আদর্শের বাঁচা। আমার একটা আদর্শ আছে, যাহার সম্পর্কে আমারই রচিত ইংরাজি কবিতায় আমি একদা বলিয়াছি,—

Ages shall proclaim the name
For long and worthy years.

ওঁ

গুরু

ভ্রূ-মধ্যে গুরুদর্শন

যিনি অন্ধকার দূর করেন, সংশয় দূর করেন, তিনিই গুরু। ভ্রূ-মধ্যে যাঁকে দেখলে সর্ব্ব-সংশয় দূরে যায়, তাঁকে দর্শনেরই নাম গুরুদর্শন। এই গুরু যে কেমন, তা বর্ণনাতীত। কেউ কখনও বলতে পারে নি। কিন্তু যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল সংশয় থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

ভ্রূ-মধ্যে গুরুদর্শনের উপায়

মনটাকে দিনরাত ভ্রূ-মধ্যে ফেলে রেখে দাও। অন্যদিকে মন যেতে চাইলেও মনকে টেনে ভ্রূ-মধ্যে বসাবে আর অবিরাম ইষ্টনাম জপ কত্তে থাকবে। ইষ্টনামের উজ্জ্বল মূর্ত্তি কল্পনানেত্রে ভ্রূ-মধ্যে দর্শন কর্ত্তে চেষ্টা করবে। ক্রমশঃ দেখতে পাবে, যা তুমি কল্পনা কচ্ছ না, এমন অনির্ব্বচনীয় রূপেরও প্রকাশ আপনি হচ্ছে। ভ্রূ-মধ্যে মনে মনে নাম-ব্রহ্মকে অঙ্কন কর এবং শক্ত ক'রে তাকে ধ'রে রাখ। নাম-ব্রহ্মের রূপ যত ছুটে পালাতে চাইবে, তত তুমি জোর ক'রে ধ'রে রাখ। ভ্রূ-মধ্য থেকে নামের বিগ্রহ যত মুছে যেতে চাইবে, বারংবার কল্পনার তুলিকায় তত তাকে অঙ্কন কর। জিদ ছেড়ো না, মনের বল হারিয়ো

না, হতোৎসাহ হয়ো না। সবাই শক্তের ভক্ত। তোমার মনও শক্ত অভ্যাসের হাতে পড়্‌লে আপনি বশীকৃত হবে। তখন ভ্রূ-মধ্যে দেদীপ্যমান ব্রহ্মজ্যোতির বিকাশ ঘটবে, সদ্‌গুরু প্রকাশমান হবেন, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের পার্থক্য ঘুচে যাবে, জ্ঞান-কল্পতরুর অমৃতময় সবগুলি ফল তোমার নিকট করামলকবৎ হবে। (৩রা বৈশাখ, ১৩৩৪)

অল্প বয়সে গুরুসঙ্গের সুফল

পশ্চিমা সাধুদের অধিকাংশই সাত আট বৎসর বয়সেই গুরুর সঙ্গ পান। তাঁদের বাপ-মা স্বেচ্ছায় নিজ নিজ ছেলেদিগকে সদ্‌গুরুর হাতে তুলে দেন। আর বাঙ্গালী বাপ-মায়ের অবস্থা কি? দিয়ে দেওয়া দূরে থাকু, কোনো ছেলে সদুপদেশ পাবার জন্য সাধু-সঙ্গ খুঁজলে তাকে রাঙ্গা টুকটুকে একটী বউ এনে হাতে পায়ে শিকল বাঁধার আয়োজন হয়। বাঙ্গালী বাপ-মায়ের আতঙ্কের অবধি নেই, গেরুয়া কাপড় দেখ্‌লেই বুক দুরু দুরু ক'রে ওঠে,— ভাবে, আমার ছেলেটাকেই বুঝি চুরি ক'রে নিতে এসেছে। বাল্যাবধি কুসঙ্গে প'ড়ে ছেলেরা গোল্লায় যাকু, গুপ্ত অসংযমে সে জাহান্নামে ডুবুক, মদ খেয়ে মাত্‌লামী করুক, বেশ্যাবাড়ী যাকু, তাও স্বীকার, কিন্তু ছেলে যেন সাধু না হয়! পশ্চিমা সাধুরা গুরু-সঙ্গে থেকে ব্রহ্মচর্য্য পুরোপুরি পালন ক'রে তারপরে সন্ন্যাস নেন; বাঙ্গালীর ছেলের সে

কপাল-জোর নেই, তাঁরা ব্রহ্মচর্য্য সাধনের কোনও সুযোগ না পেয়ে শুধু প্রাণের টানে সন্ন্যাসী হন। (৭ই বৈশাখ, ১৩৩৪)

স্বপ্নে দীক্ষা

স্বপ্নে দীক্ষা পেলে গুরু-কর্ত্তৃক পুনরায় তা' সংশোধিত ক'রে নিতে হয় কিন্তু যেখানে স্বপ্নের উপদেশগুলি সুস্পষ্ট স্মরণে আছে এবং গুরুর সূক্ষ্ম শক্তিতেই পূর্ণ বিশ্বাস রয়ে গেছে, সেখানে পুনরায় লৌকিক সংস্কার না নিলেও চলে। আর, যেখানে স্বপ্ন-প্রাপ্ত দীক্ষার স্মৃতি এলোমেলো, উপদেশ অস্পষ্ট, প্রভাব আড়ষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী এবং তাতে আস্থা অদৃঢ়, সেখানে লৌকিক পুনঃ-সংস্কার একান্তই প্রয়োজন।

স্বপ্নে দীক্ষা-লাভের প্রকার ভেদ

স্বপ্নে দীক্ষা পাওয়া ব্যাপারটা অনেক রকম। স্বপ্ন বস্তুটা আগে বুঝে নাও, তা' হ'লেই সব বুঝবে। নিদ্রার অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান ও মানস-জ্ঞান নিবিড় তমসায় অভিভূত হয়ে থাকে, সামান্য পরিমাণে অস্ফুট একটা জড় অনুভূতি মাত্র থাকে। কিন্তু স্বপ্নের অবস্থায় মানস-ভাব সকল প্রস্ফুটিত হ'তে থাকে, যদিও বাহ্যজ্ঞান রুদ্ধই থেকে যায়। এই যে মানস ভাব, এটা তোমার নিজের মনেরও হ'তে পারে, কিম্বা অন্য শক্তিশালী মনের প্রেরণাও হ'তে পারে। তোমার হয়ত অন্তরের ভিতরে প্রকৃতই আকাঙ্ক্ষা জেগেছে কোনো মহাত্মার কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার, কিন্তু মনের ভিতরে সঙ্গে সঙ্গে

আরও এতগুলি কামনা-বাসনা গিজ্-গিজ্ কচ্ছে যে, দীক্ষা লাভের এই আকাঙ্ক্ষা সকলকে ঠেলেঠুলে মাথা জাগিয়ে উঠ্তে পাচ্ছে না। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় সমগ্র দিন যে সব কামনা-বাসনা তোমার উপরে যথেষ্ট দৌরাত্ম্য করেছে এবং যাদের অনুরোধ, উপরোধ, আদেশ ও আব্দার যথেষ্ট পরিমাণে পালন কত্তে চেষ্টা করেছ, স্বপ্নকালে প্রায়ই তারা বড় একটা অধীর হয় না। যারা অনাদৃত উপেক্ষিত ছিল, এই সময়ে তারাই আত্মপ্রকাশ করে এবং তোমাকে মুগ্ধ করার জন্য কল্পনার ভুবনমোহন বেশ পরিধান করে। অনেক স্থলে স্বপ্নে দীক্ষা-লাভ ব্যাপারটা এই রকম, তুমি যে দীক্ষা লাভের কামনা মনে মনে কচ্ছ, তারই দ্যোতক মাত্র। এ সব স্থলে প্রায়ই দীক্ষার কথাটা মনে থাকে কিন্তু দীক্ষা-লাভের কথাটা স্পষ্ট মনে থাকে না। আবার, এমনও হয় যে, তোমার একজন বন্ধু তোমাকে কারো কাছ থেকে দীক্ষা নেবার জন্যে হয়ত পীড়াপীড়ি কখনো করেছিলেন, তারই প্রভাবটা সঙ্গোপনে মনের মধ্যে রয়ে গেছে, ফলে স্বপ্নে দেখ্লে, তুমি যেন কারো কাছ থেকে দীক্ষা নিচ্ছ। এসব স্থলে মন্ত্র বা সাধন-প্রণালীর কথা প্রায়ই মনে থাকে না। এমনও হয় যে, তোমার এক বা একাধিক বন্ধু মুখ ফুটে কিছু বলছেন না, কিন্তু মনে মনে তীব্র-ভাবে আকাঙ্ক্ষা কচ্ছেন যে, তুমি তাঁদের গুরুদেবের শরণাপন্ন হও, তার ফলে, তুমি যখন নিদ্রিত হ'লে এবং সঙ্গে সঙ্গে

তোমার বাহ্যজ্ঞান ও তোমার মানস জ্ঞান উভয়ই তমোঽভিভূত হ'য়ে এল, তখন আস্তে আস্তে তাঁদের মানস ভাবই মনোহারিণী-মূর্ত্তি পরিগ্রহণ ক'রে তোমার সুপ্ত মনের মধ্যে এসে উদিত হ'ল এবং বহু খোশ্‌মেজাজি অতিথিকে যেমন গৃহস্থ দু'চার মিনিট যেতেই একান্তই নিজের বাড়ীর মানুষ ব'লে মনে করে, তুমিও তেমনি বহিরাগত এই মানস ভাবগুলিকে তোমার নিজের মনের ভাব ব'লে মনে কত্তে আরম্ভ কর্ল্লে। এভাবেও অনেকে স্বপ্নে দীক্ষা-প্রাপ্ত হয়। এসব দীক্ষা পাওয়ার পরেই পুনরায় লৌকিক দীক্ষা-সংস্কার গ্রহণ করা আবশ্যক।

যথার্থ স্বপ্ন-দীক্ষার লক্ষণ

কিন্তু যথার্থ স্বপ্ন-দীক্ষা ব্যাপারটা এসব থেকে একেবারে আলাদা। যার চেহারা দেখ নাই, এমন কি ছবিখানা পর্য্যন্ত চোখে পড়ে নাই, এমন ব্যক্তিও এসে যখন দীক্ষা দিয়ে যান, তখন বুঝ্‌তে হবে, এই দীক্ষার মধ্যে পূর্ব্ব-সংস্কারের কারিকুরি কিছুই নাই। যথার্থ স্বপ্ন-দীক্ষায় হয় গুরু দূরদূরান্তর থেকে শিষ্যের কাছে সূক্ষ্ম দেহে আসেন, নতুবা শিষ্য তার মনোময় সূক্ষ্ম তনুতে গুরু-সন্নিধানে গমন করে এবং একজনের শক্তি অপরের মধ্যে অবতরণ করে। এসব স্থলে পুনরায় লৌকিক দীক্ষার সংস্কার গ্রহণ করা নিষ্প্রয়োজন। তবু যদি কেউ তা' গ্রহণ করে, তবে জান্‌বে,—অধিকন্তু ন দোষায়।

কোন্‌টা যে যথার্থ স্বপ্ন-দীক্ষা, আর কোন্‌টা নয়, তা' বুঝবার উপায় নিশ্চয়ই আছে। তামা, পিতল পরীক্ষার উপায় না জানা থাকুলে ক্ষতি নেই, কিন্তু সোণা চিন্‌বার উপায় জানা থাকা যে খুবই দরকার রে! যথার্থ স্বপ্ন-দীক্ষায় জাগরণের পরও স্বপ্ন ব'লে বিশ্বাস কত্তে প্রবৃত্তি হয় না এবং গুরুদত্ত উপদেশের একটি কণাও বিস্মৃত হয় না। গুরু-কৃপারই এমন একটা আশ্চর্য্য প্রভাব যে, স্বপ্নাভিভূত মনের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য জাগরণ, একটা অপূর্ব্ব স্মৃতিশক্তি উন্মেষিত হ'য়ে যায়। যথার্থ স্বপ্ন-দীক্ষার পর-মুহূর্ত্ত থেকে শিষ্য নব-জীবনের অমৃত-রসায়ন আস্বাদন কত্তে থাকেন, অতীতের পাপ-তাপ, মলিনতা যেন নিমেষে দূর হ'য়ে গেছে ব'লে মনে হয়, নিমেষের মধ্যে নিজের উপরে, নিজের ভবিষ্যতের উপরে যেন একটা সুগভীর আস্থা জ'ন্মে যায়। যথার্থ স্বপ্ন-দীক্ষার লক্ষণ এই যে, এই দীক্ষালাভের পরে আর তন্দ্রাঘোর থাকে না, অথচ কোন্ সময়ে যে তন্দ্রা কেটে গেল, তাও অনুভব করা যায় না। (৮ই বৈশাখ, ১৩৩৪)

গুরুতে বিশ্বাস ও উচ্ছ্বাস

তুমি যখন আমাকে গুরু ব'লে জেনেছ, তখন এই কথাও তোমার জানা প্রয়োজন যে, তোমার হাতের ছোঁয়া কাগজখানা দুটী মাত্র অক্ষর নিয়ে গেলেও আমি তা' থেকে তোমার প্রয়োজন অপ্রয়োজন বুঝতে পারি। ভক্ত যখন দেবতার

পায়ে তুলসী-বিল্বপত্র অর্পণ করে, তখন সেই তুলসী-পাতায় বা বেলপাতায় সে নিজের অন্তরের আকিঞ্চন লিখে দেয় না। প্রাণের সকল আবেদন বহন ক'রে কিন্তু সেই একটী দুইটী গাছের পাতা ভগবানের কাছে পৌছে যায়। গুরুর কাছে পত্র দিতেও শিষ্যের তেমনি বিশ্বাস থাকা চাই। তা হ'লেই উচ্ছ্বাস কমে যাবে।

উচ্ছ্বাসের দোষ

উচ্ছ্বাসের অনেক দোষ। তোমার মনে যে ভাবটা যতটুকু প্রকটিত, তাকে তার চেয়ে বেশী ক'রে দেখানই হচ্ছে উচ্ছ্বাসের স্বভাবধর্ম্ম। মিশ্রি মিষ্টি লেগেছে, এ কথা বল্লেই মিশ্রি সম্পর্কে সকল কথা এক রকম বলা হল। কিন্তু যদি বল্‌তে সুরু কর, কি আশ্চর্য্য মিষ্টি, কি নিদারুণ মিষ্টি, কি সাংঘাতিক মিষ্টি, কি মারাত্মক মিষ্টি, কি ভয়ঙ্কর মিষ্টি, তা' হ'লে সত্য সত্যই কতকগুলি শব্দের অতি সাংঘাতিক অপপ্রয়োগ হ'য়ে গেল। পরিচ্ছন্ন কয়েকটী শব্দের মধ্য দিয়ে মনের ভাবকে প্রকাশ কত্তে কপটতার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তাকে সাহিত্যিক-ধর্ম্মবিশিষ্ট করার জন্য দুনিয়ার যত উপমা ও তুলনার সমাবেশ ক'রে, নানাবিধ অলঙ্কারিকতার জঞ্জালে তাকে ভারাক্রান্ত ক'রে যখন কথা বল্‌তে বা লিখ্‌তে সুরু কর্ল্লে, তখনই তোমার আসল ভাব বস্তাপচা শব্দরাশির তলায় প'ড়ে ম'রে পচতে আরম্ভ করে। "ভগবান্, তোমাকে

ভালবাসি",—এই কথাতেই ভগবানের সঙ্গে চরম মধুর সম্পর্ক স্থাপন হয়ে গেল কিন্তু যখন বল্‌তে সুরু করবে,—"হে ভগবান্, তোমাকে ভালবাসি গ্রীষ্মকালের কাঁচা আমের চাটনীর চেয়ে বেশী, শীতকালের লেপের চাইতে বেশী, ক্ষুধার সময়ের ইলিশ-মাছ-ভাজার চাইতে বেশী", তখন তা' ভালবাসাকে করবে কবরস্থ এবং সেই কবরের তলা থেকে কেবল পচা মরার গন্ধই আস্‌তে থাকবে। ভগবান্ মহাকবি, তিনি কবিতা ভালবাসেন, কিন্তু সেই কবিত্ব হবে স্বতোনিঃসারিত, কষ্ট-কল্পনা ক'রে নয়।

(১৮ই বৈশাখ, ১৩৩৪)

গুরুবাদ ও ব্রহ্মচর্য্য

ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে গুরুবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ব্রহ্মচর্য্য বীর্য্যের সাধনা, পৌরুষের সাধনা, স্বয়ম্প্রতিষ্ঠার সাধনা। এ বীর্য্য, এ পৌরুষ, এ স্বয়ম্প্রতিষ্ঠা তোমাকে যেখানে নিয়ে পৌঁছাবার পৌঁছাক্, তুমি স্বাধীন মনে, স্বাধীন জ্ঞানে নিজের কল্যাণ, নিজের পূর্ণতা আহরণ কর। এর মাঝে গুরুবাদের বস্‌বার জায়গা নেই। সম্প্রদায়-প্রসার কখনো ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের উদ্দেশ্য হতে পারে না। (৩০শে বৈশাখ, ১৩৩৪)

গুরু কে ?

শিষ্য এসে গুরুকে জিজ্ঞেস কল্লেন,—আমার গুরু কে মশাই ? গুরু বল্লেন,—তুমিই তোমার গুরু। শিষ্য বল্লেন,—

কিন্তু আমি যে আমার উপরে সব সময় নির্ভর কত্তে পারি না, দুর্ব্বলতা যে এসে যায়! গুরু বল্লেন,—তখন আমি তোমার গুরু! শিষ্য বল্লেন,—কি করে তা' হবে? একবার আমি আমার গুরু, আর একবার আপনি আমার গুরু, এটা কি রকম? গুরু বল্লেন,—তুমি আর আমি যে অভেদ। শিষ্য বল্লেন,—কিন্তু যখন অভেদ ব'লে বোধ না হবে—আর আপনাকেও বিশ্বাস কত্তে ইচ্ছা না হবে? গুরু বল্লেন,—ভগবানের নামই তোমার গুরু। শিষ্য বল্লেন,—ভগবানের কোন্ নাম? যে নাম আপনি দিয়েছেন? গুরু বল্লেন,—তার কোন মানে নেই। আমিই দিই, আর তুমিই আবিষ্কার ক'রে নাও, কিম্বা অন্য কারো কাছেই পাও, তাতে কিছু যায় আসে না। যে নাম পরিত্যাগ করার সামর্থ্য তোমার নেই, সেই নামের কথাই আমি বল্‌ছি। যে নাম পরিহার করার সামর্থ্য তোমার হবে, সে নাম তোমার গুরু নয়। যে নাম যতবারই বর্জ্জন কর না কেন, বাধ্য হ'য়ে পুনরায় তোমাকে নিতে হবে, সেই নামই তোমার গুরু। যে নাম অপরিহার্য্য, অপরিবর্জ্জ্য, সেই নামই তোমার গুরু,—সে নাম কোথা থেকে পাচ্ছ, কি ভাবে পাচ্ছ, তার কোনও সর্ত্ত-চুক্তি নেই। শিষ্য জিজ্ঞাসা কর্লেন,—কি ক'রে বুঝ্‌ব, কোন্ নাম অপরিহার্য্য? গুরু বল্লেন,—বর্জ্জন ক'রে পরীক্ষা কর, যিনি পরীক্ষায় টিকবেন, তিনিই তোমার গুরু।

সদ্গুরু ও যোগ্য শিষ্যের দুর্ল্লভতা

সদ্গুরু ও যোগ্য-শিষ্য উভয়ই সমান দুর্ল্লভ। কত গুরু কেঁদে ম'চ্ছেন,—"যোগ্য-শিষ্য পাচ্ছি না।" কিন্তু একদিন যখন যোগ্য-শিষ্য জুট্‌ল, তখন শিষ্যের খাপ-খোলা তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণধার চরিত্র-বলের কাছে ম্লান দীপ্তিহীন হ'য়ে গুরুদেব প্রাণ নিয়ে পালালেন জঙ্গলে। আবার কত শিষ্য কেঁদে ম'চ্ছেন,—"যোগ্য গুরু পাচ্ছি না", কিন্তু যেদিন গুরু মিল্‌ল, তখন নিজেকে প্রতি পদে তাঁর অযোগ্য জেনে, তাঁর আদেশ-পালনে অক্ষম বুঝে, শিষ্য সু-কৌশলে স'রে পড়্‌লেন। শুধু স'রেই পড়্‌লেন তা' নয়, যাবার সময়ে শহরময় ঢেঢ্‌ড়া পিটিয়ে যাবেন যে, গুরুদেব দারুণ ক্রোধী, অবিবেচক, শিষ্যদের কষ্ট বুঝেন না, কাজের পরে কাজ চাপিয়ে শিষ্যের প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তোলেন, গুরুদেব নিষ্ঠুরতার সাক্ষাৎ বিগ্রহ, নির্দ্দয়তার সিদ্ধ-তাপস। কথায় বলে,—গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা না মিলে এক। কেউ বলেন,—চেলা মিলে লাখ লাখ, গুরু না মিলে এক। দুটো কথাই সমান সত্য জান্‌বে। (৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪)

ত্যাগী শিষ্যের বিষয়ী গুরু

সংসার নিয়ে যিনি ব্যস্ত, ত্যাগ-বুদ্ধি ব্যক্তি যদি তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, তবে তার বড় বিপদ। বিপদ হচ্ছে সংশয়ের। গুরুবাক্যে নিঃসংশয়িত বুদ্ধি না থাকলে সাধারণ

লোকের পক্ষে সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া বড় কঠিন। বিষয়ী গুরুর জীবনে নানা অসামঞ্জস্য দেখে ত্যাগেচ্ছু শিষ্য বিষম সংশয়ে প'ড়ে যায়, তাতে তার অনেক সময়ে ভয়ানক ক্ষতিও হ'য়ে থাকে। তবে যাঁরা একান্ত সাধন-বিশ্বাসী, তাঁদের পক্ষে পৃথক্ কথা, তাঁরা গুরুর কাছে সাধন পেয়ে ঐ সাধনকেই গুরু ব'লে মনে করেন এবং একান্ত চিত্তে সাধনই কত্তে থাকেন, গুরুর পানে আর ফিরেও তাকান না। এঁদের সঙ্গে আর গুরুর সঙ্গে সাধন পাবার পরে বড় একটা সম্পর্কই থাকে না। সাধন-দাতার চাইতে এঁরা সাধনকেই বড় মনে করেন এবং সাধন-দাতার জীবনে কোথায় কোন্ অসম্পূর্ণতা ফুটে উঠ্‌ছে, তা অগ্রাহ্য করেন। তাঁদের কাছে সাধনই প্রকৃত গুরু, সাধনই ব্রহ্ম; সাধন কল্লে'ই ব্রহ্মসেবা, এই এঁদের ধারণা। দীক্ষাদাতা মাতালই হোন, আর লম্পটই হোন, এ সব ভাগ্যবানদের তাতে বড় যায় আসে না। কিন্তু যাঁরা এতটা শক্ত নন, তাঁদের পক্ষে যার-তার শিষ্যত্ব স্বীকার করা এক অতি ভয়ঙ্কর কথা।

গুরু-ত্যাগ

এই বিপদ অতিক্রম করার উপায় হচ্ছে, ভগবানে শরণাপন্ন হওয়া এবং তিনি যদি কাউকে প্রাণের জন ব'লে চিনিয়ে দেন, তবে তাঁর সহায়তা নেওয়া। এতে গুরু-ত্যাগের অপরাধ হয় না। ব্রহ্মই গুরু, মানুষ ত' আর গুরু নন্!

সেই পরম-গুরুকে লাভ করার জন্যই মানুষকে গুরু ব'লে মান্‌তে যাওয়া। যাঁকে গুরু ব'লে মান্‌লে পরম-গুরুকে পাওয়ার পথ হয়, তাঁকেই শুধু গুরু ব'লে মান্‌ব, তাঁর কাছেই শুধু মাথা নত কর্ব্ব। যাকে গুরু ব'লে মান্‌লে পরম-গুরুকে পাওয়া যায় না, তাকে মান্‌ব না, তার কাছে মাথা নত করব না। পরম-গুরুকে পাব না বুঝেও যদি কেউ মানুষ-গুরুর সেবা করে, তবেই সে প্রকৃত পক্ষে গুরু-ত্যাগী। আর, পরম-গুরুকে পাব জেনে যদি কেউ মানুষ-গুরুকে ত্যাগ করে, তাকে গুরু-ত্যাগী বলে না, তাকেই বল্‌তে হয় প্রকৃত গুরুনিষ্ঠ। পরম-গুরুর সাথে যখন মানুষ-গুরুর লড়াই হবে, তখন পরম-গুরুই গুরু, মানুষ-গুরু কিছু নন্‌।

বিষয়ী গুরুর ত্যাগী শিষ্য

বিষয়ী গুরুর ত্যাগী শিষ্য থাকাটা, শিষ্যের পক্ষে অসুবিধা-জনক হ'লেও গুরুর পক্ষে লাভজনক ; শিষ্যের ত্যাগোন্মুখ জীবনের প্রভাব গুরুকে নির্বিষয় হবার প্রেরণা দেয়। গুরুর কাছ থেকে যেমন শিষ্যের লভ্য আছে, শিষ্যের কাছ থেকেও গুরুর তেমন লভ্য আছে। সেই দিক থেকে বিষয়ী গুরুর ত্যাগী শিষ্য থাকা গুরুর পক্ষে অধ্যাত্ম-সম্পদ-বর্দ্ধক। যেখানে গুরুগিরি একটা ব্যবসায়, আর্থিক আয়ের পন্থা, সেখানকার কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু যেখানে পথনির্দ্দেশহীন পথিকের হিতার্থেই দীক্ষাদান ও সাধন-কৌশলাদি শিক্ষা-প্রদান গুরুর

লক্ষ্য, সেখানে বিষয়ী গুরু ত্যাগবুদ্ধি সুপাত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে নিজেও ক্রমশঃ ত্যাগ-বুদ্ধির প্রতি প্রাণের অনুরাগ উপলব্ধি করেন। অবস্থার ফেরে বাহ্য ত্যাগ তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌লেও আভ্যন্তর ত্যাগের অনুকূলতা সৃষ্টি হ'তে থাকে। এটা বিষয়ী গুরুর মস্ত লাভ।

প্রচলিত গুরু-বাদের ফরমুলা

দেশ-প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান গুরু-বাদের মূল ফরমূলা হচ্ছে,—গুরুই ব্রহ্ম, গুরুই ইষ্ট, গুরুই মহামন্ত্রের অভেদ-বিগ্রহ। এই 'ফরমূলার' ফল হ'য়েছে এই যে, ব্রহ্মাভিমানী বিষয়ী গুরু ত্যাগী-শিষ্যের ভিতরে অনেক সময়ে মানব-গুরুতে ব্রহ্মভাবার্পণ জাগ্রত কর্ত্তে পাচ্ছেন না।

প্রচলিত ফরমুলার পরিবর্ত্তনে বিপ্লব

কিন্তু বহু-প্রচলিত এই "ফরমূলার" পরিবর্ত্তন হওয়া মাত্র, রঙ্গমঞ্চের পট-পরিবর্ত্তন ঘ'টে যাবে, ভারতের ধর্ম্ম-জীবনে একটা স্বাস্থ্যপ্রদ মহাবিপ্লব এসে যাবে। দীক্ষাদাতাই গুরু নন, দীক্ষা-দাতা সমপথের অগ্রসর পথিক মাত্র, এই ধারণা প্রত্যেকের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে। ফলে মহামন্ত্রে দীক্ষা পেয়ে শিষ্য নিজেকে একান্তভাবে নামেরই শরণাগত কর্ব্বার জন্য চেষ্টা কর্ব্বে এবং দীক্ষাদাতার ব্যক্তি-গত দোষ-ত্রুটীর বিবেচনা তার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হবে।

সেই সময়ে শত শত বিষয়ী আচার্য্য নিঃসঙ্কোচে ত্যাগবুদ্ধি পথনির্দ্দেশহীন পথিককে মহামন্ত্র দান ক'রে সুস্পষ্ট ভাষায় ব'লে দিতে পারবেন,—'এই রইলেন তোমার সমক্ষে জলদগ্নিসমপ্রভ স্বতেজোদীপ্যমান পরম-পবিত্র মহামন্ত্র তোমার এক অদ্বিতীয় গুরুরূপে—আর কাউকে গুরু ব'লে মানবার বা ভাববার তোমার প্রয়োজন নেই।'

ত্যাগী গুরুর বিষয়ী শিষ্য

ত্যাগী গুরুর বিষয়ী শিষ্য থাকাও এক কম আপদ নয়। যে যার সঙ্গ করে, সে তার দোষগুণ পায়। বিষয়ী শিষ্য ত্যাগী গুরুর সঙ্গ পেয়ে ত্যাগের দিকে আকৃষ্ট হন, আবার ত্যাগী গুরু বিষয়ী শিষ্যের সঙ্গগুণে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই জন্যই দেখা যায়, অনেক ত্যাগীরা গৃহীদের পাত্তাই দেন না। তবে যাঁর ত্যাগ একেবারে পাকা, কারো সঙ্গেই তাঁর বিকার বা পরিবর্ত্তন আসে না। কিন্তু উন্নতির ত' অন্ত নেই। যিনিই যত অগ্রসর হোন, আরো সম্মুখে যেতে হবে। যিনিই যত উচ্চ উপলব্ধির অধিকারী হোন, আরও উপলব্ধির প্রয়োজন রয়েছে। অমৃতত্বের ভাণ্ডার অক্ষয়, একটী জিভ দিয়ে চেটে চেটে কে তার ক্ষয়-বিধান কর্ব্বে? সুতরাং কোন ত্যাগীরই নিজেকে পূর্ণ ত্যাগী ব'লে মনে করা উচিত হয় না। সুতরাং জীবের হিতকল্পে কাউকে দীক্ষা দিলেও সর্ব্বত্যাগীরও নিজের উপরে "গুরু"-অভিমান রাখা চ'লবে না। শিষ্যের পাপ-তাপ গুরুকে

পায়। নিজের ভিতর গুরু-অভিমান না থাকলে সব পাপ-তাপ জগদ্‌গুরু পরব্রহ্মে গিয়ে লয় পায়, দীক্ষা-দাতাকে ছোঁয়ও না।

(৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪)

এক চেলার দুই গুরু

একই ব্যক্তি দুই গুরুর কাছে মন্ত্র নিলে তার কর্ত্তব্য দুই মন্ত্রেরই সাধন সমভাবে করিয়া যাওয়া। তারপরে সাধন করিতে করিতে পরবর্ত্তী কর্ত্তব্যের পথ আপনা হইতে খুলিয়া যাইবে। সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস প্রভৃতি নানা উদ্বেগজনক অবস্থার মধ্য দিয়া ক্রমে সাধক নিজের সাধনের বলেই প্রকৃত সত্যে গিয়া উপনীত হইবে। (২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪)

গুরু

১। যার-তার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করা কাজের কথা নয়। নিজ-জীবনে যিনি তাকে আস্বাদন ক'রেছেন, তিনিই গুরু হ'তে পারেন। যত দিন প্রকৃত গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নিজেদের মনোমত সাধনই অকপট-চিত্তে ক'রে যান। কারো কথায় টল্‌বেন না, কারো পরামর্শে পিছ-পা হবেন না। সদ্‌গুরুকে চেনা শক্ত, তিনি নিজে যদি ধরা দেন, তবেই তাঁকে চেনা যায়। আপনি শুধু অপেক্ষা করুন, আর, ভগবানের একটী নাম নিজেই মনোনীত ক'রে নিয়ে তাই জপ ক'রে যান। আপনার যদি গুরুর প্রয়োজন থাকে, তবে তিনি সময়মত আস্‌বেনই,

এসে আপনাকে যা' যা' জানাবার, জানিয়ে যাবেনই। প্রকৃতই যখন তাঁর সাহায্যের আপনার দরকার হবে, তখন আর তিনি দূরেই বা থাকবেন কি ক'রে, লুকিয়েই বা রইবেন কি ক'রে? আসতে তাঁকে হবেই। জনমেজয় রাজার সর্প-যজ্ঞে যেমন ইন্দ্রকেও রথসহ ছুটে আসতে হয়েছিল, সদ্‌গুরুকেও জগতের কল্যাণের প্রয়োজনে তেমনি প্রাণের দায়ে ছুটে আসতে হবেই। তিনি আপনাকে দুঃখ-সমুদ্রের পরপারে নিয়ে যেতে চাইবেন, কিন্তু পারের কড়ি চাইবেন না। তিনি মন্ত্র হয় ত' দেবেন, কিন্তু শুধু কাণেই কি দেবেন? প্রাণেও দেবেন।

২। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ গুরুর আশীর্ব্বাদ কখনো ব্যর্থ যায় না। তাই তত্ত্বজ্ঞ গুরুর জন্যই উন্মুখ হ'য়ে থাকবেন। যারা তত্ত্বজ্ঞ নয়, ব্রহ্ম-রসাস্বাদনকারী নয়, এমন কত শত গুরুপদাভিলাষী ব্যক্তি হয় ত' আপনার কাছে এসে ঘনিষ্ঠ হ'তে চাইবে, আপনি তাদের অবমাননা না ক'রে তাদের প্রতি উদাসীন থাকবেন। আসল গুরু কে? যিনি আপনার পরমোপাস্য, তিনিই আপনার গুরু অর্থাৎ পরব্রহ্মই গুরু। "গুরুগীতা" প'ড়ে দেখবেন, গুরুর যে সব লক্ষণ ও নাম-নিরুক্তি করা হ'য়েছে, সব আপনার বেদান্তের ব্রহ্মেরই কথা। সেই পরমগুরুকে জানবার জন্যে ব্রহ্মকৃপালব্ধ তত্ত্বদর্শী পুরুষকে পথ-প্রদর্শক ব'লে জানতে হয়। কিন্তু ভগবানকে যখন জানা যায়, তখন কোথায় বা আপনার

লৌকিক-জগতের গুরু আর কোথায় বা আপনার লৌকিক-জগতের শিষ্য! কে যে কোথায় থাকেন, তার খোঁজ কে নেবে? রাজর্ষি জনক যখন শুকদেবকে ব্রহ্মবিদ্যা দান কর্বেন, তখন বল্লেন,—শিষ্য, গুরু-দক্ষিণাটা দিয়ে নাও। শুকদেব বল্লেন,—সে কি! দীক্ষার আগেই দক্ষিণা? তাতে জনক বলেছিলেন, "সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।" ব্রহ্মবিদ্যা যে লাভ করে, সে শুধু ব্রহ্মকেই গুরু ব'লে জানে।

৩। গুরু আপনার পথ-প্রদর্শক। কিন্তু পথটা দেখে নিতে হবে আপনার নিজের চোখের দৃষ্টি দিয়ে। যার স্বাধীন বিচার-শক্তি নেই, তেমন শিষ্য ঠিক্ ঠিক্ গুরুবাক্য পালন কত্তে পারে না।

৪। নিঃস্বার্থচেতা গুরু যদি কোনও শিষ্যকে জগৎ-কল্যাণের সঙ্কল্প দেন, তবে ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক্, তাকে জগৎ-কল্যাণ কত্তেই হবে। শত প্রলোভনও তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না। গুরুবাক্য বিস্মৃত হ'য়ে যদি সে পাপের পঙ্কেও ডুব্‌তে থাকে, তবু একটা অব্যক্ত অন্তর্দ্দাহে অস্থির হ'য়ে তা'কে একদিন না একদিন জগতের কাজে ছুটে আসতে হবে। এর অন্যথা হ'তে পারে না, এর অন্যথা কখনও হয় নি। সদ্‌গুরু কি শিষ্যকে মন্ত্র দিয়েই খালাস? তিনি জানেন, একই পরমগুরু একজনের মধ্যে বাস ক'রে শিষ্যকে উপদেশ দেওয়াচ্ছেন, আবার তিনিই আর একজনের মধ্যে

অবস্থান ক'রে সে-সব পালন কচ্ছেন। তাই তিনি শিষ্যকেও ব্রহ্মবোধে পূজা করেন। লোকশিক্ষার জন্য বাইরে শিষ্যের পূজা নেন, আর, প্রাণের তৃপ্তির জন্য শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞানে অর্চ্চনা করেন। এমন যে গুরু, ব্রহ্ম-দৃষ্টিই যাঁর দৃষ্টি, তাঁর অভিপ্রায় কখনো ব্যর্থ হ'তে পারে না।

৫। দেশ-প্রচলিত গুরুবাদের সাথে লড়াই দিয়ে শক্তি-ক্ষয়ের প্রয়োজন কি? যুগধর্ম্মের দাবীতে যেখানে যার যোগ্য স্থান হওয়া উচিত, সেখানেই তার স্থান হ'য়ে যাবে। এজন্য আপনার বা আমার চেষ্টার প্রয়োজন নেই। হৃদয়কে সত্যের জন্য অবারিত করুন, উন্মুক্ত করুন। কঠোর হোক্, অপ্রিয় হোক্, সত্য সর্ব্বাবস্থাতেই সত্য, সত্য সর্ব্বাবস্থাতেই পূজ্য। জীবনকে সত্যের পূজার জন্য প্রস্তুত করুন। এর ফলে আপনার পূর্ব্ব-সংস্কার বুঝে প্রচলিত গুরুবাদ দরকার মত রূপান্তর নেবে। মতামতের পরিবর্ত্তন অহরহ হয়, সত্যের পরিবর্ত্তন কখনো হয় না। একটী সত্যকে ধ'রে বহু পরস্পর-বিরোধী মতামত গঠিত হ'তে দেখা যায়। সত্যকে ধর্‌তে চেষ্টা করুন, মতামতের কোলাহলে পথচ্যুতির ভয় থাক্‌বে না। (২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪)

গুরু, শিষ্য ও দীক্ষা

এক চাষার বিশাল ইক্ষু-ক্ষেত্র ছিল। একদিন তাঁর দুই ভাগ্নে বেড়াতে এলেন মামার বাড়ী। মাতুল ম'শায় ভাগ্নে দুটীকে নিয়ে আখের ক্ষেতে প্রবেশ ক'রে তাদের বল্লেন,—

'দেখ ভাগ্নেরা, এই যে বিরাট আখের ক্ষেত, এর সবগুলো আখই তোমাদের জান্‌বে, যেটা ইচ্ছা, সেটাই তোমরা খেয়ো, যতগুলি ইচ্ছা ততগুলিই খেয়ো। বড় ভাগ্নে ত' এই না শুনে বড় বড় দেখে এক একটা আখের কাছে যায়, আর, মিষ্টি কিনা পরীক্ষা কর্ব্বার জন্যে একটা ক'রে কামড় দেয়; কিন্তু এক কামড়ে' ত' আর আখের রস বেরোয় না, সুতরাং ভাল ক'রে দেখে শুনে আর একটা আখে গিয়ে কামড়ায়। ছোট ভাগ্নে কিন্তু দাদার পথে গেল না। সে তার মামাকে বল্লে,—' মামু, তুমি নিজের হাতে একখানা আখ কেটে দাও। মামা বল্লে,— 'তুমি নিজেই পছন্দমত আখ বেছে নাও।' ছোট ভাগ্নে বল্লে,—'না, মামা, তোমার নিজ হাতে দেওয়া একটা আখ আমার চাই-ই।' মামা তখন ছোট ভাগ্নের বিনয় ও আগ্রহে খুশী হ'য়ে নিজের হাতে একখানা আখ কেটে দিলেন। আখ কাট্‌বার সময়ে তিনি বেশ ক'রে বিবেচনা ক'রে নিলেন, আখটা কেমন হবে, আর ছোট ভাগ্নের দাঁতের শক্তি কতটুকু। ছোট ভাগ্নে ত' মামার দেওয়া আখখানা নিয়ে প্রথমেই দিয়ে নিলে দু'তিন চিবুনি, কিন্তু রস বেরুল না। তখন সে তার বড় দাদার মত নিজের পছন্দমত যে আখটাকে বড় ব'লে মনে হয়, সেটাকেই দেয় এক কামড়। কিন্তু এক কামড়ে কোনটাতেই রস বেরুল না। তখন সে আবার মামার দেওয়া আখটাতেই আর এক চিবুনি দেয়। তখনো আখের রস বেরোয় না দেখে

সে পুনরায় কিছুকাল তার দাদার মত কত্তে লাগ্‌ল। কিন্তু মামার দেওয়া আখখানা তার হাতেই ছিল, মাঝে মাঝে ওটাকে দু'এক চিবুনি সে অনিয়মিতভাবে দিচ্ছে। হঠাৎ একটা কামড়ের পর সে মামার দেওয়া আখখানার ভিতর থেকে কিঞ্চিৎ রসের আস্বাদ পেল। তখন সে কর্ল্লে কি, না, ক্ষেত-জোড়া অন্যান্য আখের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে হাতের আখ-খানাকেই চিবুতে আরম্ভ কর্ল্লে। চিবুতে চিবুতে রসের উৎস খুলে গেল, সে সেই রসের আস্বাদনেই তন্ময় হ'য়ে রইল। এদিকে তার বড় ভাই হতাশ মনে ঘুরতে ঘুরতে ছোট ভায়ার কাছে এসে হাজির। সে এসে দেখে অবাক্ কাণ্ড। ছোট ভাই প্রাণভ'রে আখের রস পান কচ্ছে, তার দুই গাল বেয়ে রসের ঝর্‌ণা ব'য়ে যাচ্ছে, তার বুক ভিজে যাচ্ছে, মাটি পর্য্যন্ত ভিজে কাদা হয় আর কি! বড় ভাই ব'ল্লে,—'ওরে থেমো, আখের রস তুই কি ক'রে পেলি? আমি ত' এতক্ষণ পণ্ডশ্রম ক'রেই মর্ল্লাম।' ছোট ভাই কোনো জবাব দিল না, আঙ্গুল দিয়ে মামাকে দেখিয়ে দিল। বড় ভাগ্নে তখন গিয়ে মামাকে ধর্ল্লে। মামা বল্লেন,—'হাজার আখে কামড়াতে গেলি কেন; একটা নিয়ে থাকলেই ত' এতক্ষণে কত রস আস্বাদন কত্তে পাত্তিস্।' বড় ভাগ্নে আর দেরী কর্ল্লে না, মামাকেও আর কথাটী বল্লে না, হাতের কাছে যে আখখানা পেল, সেই-খানাই ভেঙ্গে নিয়ে সে চিবুতে আরম্ভ কর্ল্ল। কিছুক্ষণ পরে

সেও রসের আস্বাদন পেল, সেও ডুবল। গুরু, শিষ্য এবং দীক্ষার ব্যাপার এই প্রকার। সদ্‌গুরু হ'লেন চাষার মতন, তিনি কোন ভাগ্যেকে নিজ হাতে একখানা আখ কেটে দেন, কাউকে বা শুধু ব'লে দেন যে, যেখানাই খাও, একটা নিয়ে লেগে থাকতে হবে। আরো মজা হচ্ছে এই যে, দীক্ষা দিয়ে প্রকৃত গুরু কখনো শিষ্যের স্বাধীনতা হরণ করেন না। সদ্‌-গুরুর শিষ্যও অনেক হন কিন্তু গুরুদত্ত জিনিষের উপর পূর্ণ আস্থা আসে না ব'লে বার বার শত পথ ঘুরে ধীরে ধীরে গুরু-দত্ত পথে একনিষ্ঠ হ'য়ে ব্রহ্মরস প্রাপ্ত হন। এঁরা সব ছোট ভাগ্যের মত। আবার কোনো সাধক আছেন, দীক্ষা তাঁরা নেন না, নিজেরাই একটার পর একটা ক'রে সাধন-পন্থা পরীক্ষা ক'রে ক'রে শেষটায় হতাশ হ'য়ে যান কিন্তু কোনও আকস্মিক কারণ-বশতঃ পুনরায় তাঁদের উৎসাহ জেগে উঠে এবং বিনা দীক্ষাতেই যে-কোনও একটী মনোভিমতানুযায়ী সাধনে একনিষ্ঠ প্রযত্নে লেগে থেকে তাঁরা ব্রহ্মরস আস্বাদন করেন। এঁরা সব বড় ভাগ্যের মত। ওঙ্কারনাথ পাহাড়ে যে মৌনী বাবা ছিলেন, তিনি এই বড় ভাগ্যের দলের সাধক।

(২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪)

গুরু ও গুরুবাদ

'গুরু' অমর, তাঁর মৃত্যু নেই। কিন্তু 'গুরুবাদে'র মরবার দিন এসেছে। 'গুরু' থাকবেনই কিন্তু 'বাদ'টুকুকে বাদ দিয়ে।

গুরু শাশ্বত সনাতন কিন্তু 'বাদ'টুকুকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে। (১২ই আষাঢ়, ১৩৩৪)

অভয়দাতা গুরু

যখন গুরু তাঁর শিষ্যকে ভবিষ্যতের প্রতি আস্থাবান্ রাখ্‌তে অক্ষম হন, তখন তিনি নিজ গুরুত্ব থেকে ভ্রষ্ট হন। অভয় বিতরণই গুরুর কাজ, শুধু বিতরণ নয়, heart-এর (হৃৎপিণ্ডের) মধ্যে অভয় একেবারে inject ক'রে (ঢুকিয়ে) দিতে হবে, যেন প্রত্যেকটা রক্তস্পন্দনের মাঝে অভয়ের নাচন চ'ল্‌তে থাকে। হতাশকে তিনি আশা দিতে জানেন, অবসাদ-গ্রস্তকে তিনি উৎসাহ দিতে পারেন, অক্ষমকে তিনি বলদান কত্তে পারেন,—তাই তিনি গুরু। শুধু মন্ত্র দিলেই গুরু হয়? শিষ্যের প্রাণের ভিতরে নূতন সজীবতা তিনি এনে দেবেন, তবে ত' মানি গুরু! শিষ্যকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ ক'রে দেখিয়ে দেবেন,—"ঐ দেখ্ তোর ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল, কত মহান্",—তবে ত' তিনি গুরু! (১৬ই আষাঢ়, ১৩৩৪)

সকলের গুরুই এক

আমার গুরু, তোমার গুরু
রামের গুরু, শ্যামের গুরু,
সবার গুরু, একই গুরু,
এই বোধেতেই সাধন সুরু।

(১৭ই আষাঢ়, ১৩৩৪)

দীক্ষা ও নামজপ

দীক্ষা না নিলে কি নাম-জপ করা যায় না? খুব যায়। একনিষ্ঠ-ভাবে যদি কত্তে পার, তবে কেন তাতে ফলের পার্থক্য হবে? একই নাম একই উদ্যমে, একই ভাবে, অবিরত সাধন কত্তে হবে, এইটীই হ'ল মুখ্য প্রয়োজন। দীক্ষা ছাড়াও যদি এভাবে জপ কত্তে পার, তবেই হ'ল। তবে গুরুর প্রয়োজন আছে। লোক-দেখান একটা দীক্ষা নেবার জন্যে নয়, দীক্ষা-গ্রহণের উপলক্ষ্যে গুরুকে কতকগুলি দ্রব্যসম্ভার ও বার্ষিক দেবার জন্যে নয়, "আমি অমুক দশহাজারী স্বামীজীর শিষ্য, অমুক বিশহাজারী দণ্ডীর শিষ্য, অমুক পঞ্চাশ-হাজারী পরমহংসের শিষ্য"—প্রভৃতি ব'লে লোক-সমাজে নিজের আধ্যাত্মিক কৌলীন্য জাহির করার জন্যে নয়, পরন্তু সাধন-পথে প্রকৃত সহায়তা পাবার জন্যে গুরুরও আবশ্যকতা আছে। খুব শক্ত রকমের ছেলে ছাড়া প্রায় সকলের গুরুকরণ দরকার হ'য়ে পড়ে। তার একটী কারণ এই হচ্ছে যে, করিৎ-কর্ম্মা ব্যক্তির সহায়তা না পেলে অনেক সময় সাধক নিজের বলে সাধন সম্পর্কিত সংশয়-সমূহ ছেদন কত্তে পারে না কিম্বা জপ-তপের প্রকৃষ্টতম প্রণালীগুলিও সহজে আবিষ্কার ক'রে নিতে পারে না।

দীক্ষা-প্রাপ্ত নামে আর স্বয়ং-নির্ব্বাচিত নামে ফলের পার্থক্য নেই, একথা ঠিক্। কিন্তু দীক্ষাপ্রাপ্ত নামে আর স্বয়ং-

নির্ব্বাচিত নামে, তোমার মনের গঠন অনুসারে, অভিনিবেশের পার্থক্য হ'তে পারে। অভিনিবেশের ঐকান্তিকতাই আসল কথা, মন্ত্র কোথায় পেয়েছ, সেটা বিচার্য্য নয়। ঐকান্তিক অভিনিবেশের ফলে দীক্ষাহীন সাধকও ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন, অভিনিবেশের অভাবে দীক্ষিত সাধকও ব্রহ্মপদলাভে চিরবঞ্চিত থাকেন।

গুরু করিবার আবশ্যকতা

তথাপি স্থল-বিশেষে গুরু করবার আবশ্যকতা আছে। শক্তিমান্ গুরুর মুখোচ্চারিত মন্ত্রে শিষ্যের অভিনিবেশ হয় স্বাভাবিক, আর স্বয়ং-নির্ব্বাচিত মন্ত্রে অভিনিবেশ হয় চেষ্টা-প্রসূত। স্বভাবের পথে সাধনই নিশ্চিত সাধন, সিদ্ধি তাতে সহজে করতলগত হয়।

গুরুর লক্ষণ

কিন্তু গুরু চিন্‌বে কি ক'রে? গুরু কেউ চিন্‌তে পারে না, তিনি নিজে চেনা দেন। তাঁর মুখোচ্চারিত নাম যেন বজ্রের শক্তি নিয়ে আসে, সে-শক্তিকে কেউ অগ্রাহ্য কত্তে পারে না। এতেই গুরু চেনা যায়। শক্তিমান্ গুরুর নিরভিমান প্রতিনিধিরূপে যদি কোনো সাধক-পুরুষ দীক্ষা দেন, তবে তাতেও এ ফলই হয়।

গুরুহীন সাধকের জপফল

কিন্তু সদ্‌গুরু যে সুদুর্ল্লভ! যার তার কাছে মাথা নত

না ক'রে, প্রত্যেক সাধকের উচিত, প্রাণের আবেগ বুঝে তদনুযায়ী ভগবানের নাম জপ করা। গুরুহীন জাপকের জপে ফল হয় না ব'লে যে কথাটা সর্ব্বত্র শুন্‌তে পাও, তার যাথার্থ্য এইটুকু যে, অদীক্ষিতের পক্ষে একটা নামে লেগে থাকার দৃষ্টান্ত খুব কম দেখা যায়। নতুবা তুমি গুরুহীনই হও আর গুরুবন্তই হও, জপ করলেই ফল আছে। একবার জপ কর ত' একবারেরই ফল পাবে, দশবার জপ কর ত' দশবারের ফল পাবে। কাজ কর্‌লে তার ফল হবেই,—এ থেকে তোমাকে বঞ্চিত কত্তে পারে, এমন সাধ্য শাস্ত্রেরও নেই, শাস্ত্রকারেরও নেই। তবে যে দীক্ষা নেবার সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা সব রয়েছে, তার কারণ, দীক্ষিতের পক্ষে একটা নামে একনিষ্ঠ ভাবে লেগে থাকা সহজ হয়।

গুরু ও নাম

যতক্ষণ চিনির খোঁজ না পাও, ততক্ষণ চিনির ব্যাপারীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা, আলাপ-আলোচনা। কিন্তু যাই চিনির বস্তা পেয়ে গেলে, যদি বুদ্ধিমান্ হও, তবে চুপ মেরে খালি চিনিই খাও, ব্যাপারীর সঙ্গে আর তোমার দরকার কি? চিনির বস্তা খোলা পেয়েও যে ব্যাপারীর সঙ্গে কথায় কাল কাটায়, তার মত আর মূর্খ দুনিয়ায় কে আছে? তবে যখন চিনির চিনিত্বে সন্দেহ আস্‌বে, চিনির সঙ্গে তুষ, লবণ বা বালি মিশ্রিত ব'লে সন্দেহ হবে, তখন ব্যাপারীকে জিজ্ঞেস ক'রে

আসল কথা জেনে নিতে হবে। (২৪শে আষাঢ়, ১৩৩৪)

গুরু ও শিষ্য

যে শিষ্য একদিন সখা, আর একদিন সে সন্তানবৎ হইবে, তৃতীয়দিন সে উদাসীনবৎ, চতুর্থদিন সে বিদ্রোহী, পঞ্চম-দিন শান্ত, ষষ্ঠদিন সে ভাবময় ভক্ত,– গুরু-শিষ্যের মধ্যে এইরূপ নানা ভাব স্বভাবতঃ আসিবে! গুরুর কর্ত্তব্য ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা। কারণ, এই সকল বিভিন্ন ভাবের মধ্য দিয়া গুরু ও শিষ্য উভয়েরই জীবন কল্যাণে পুষ্ট হয়।

গুরু সর্ব্বাভীষ্ট-প্রপূরক মহাভাব

গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ এক অতি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ। যারা ঐহিক জগতের দিকটাকে বাদ দিয়ে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধকে দর্শন করে, তারা এর মাঝে জগতের সকল সম্পর্কগুলিকে খুঁজে পায়। গুরু শিষ্যের মধ্যে আর শিষ্য গুরুর মধ্যে মা পায়, বাপ পায়, ভাই পায়, বন্ধু পায়, প্রেমিক পায়, প্রেমার্থী পায়। ভগবানকে নিয়ে বৈষ্ণবের যেমন পঞ্চরস, গুরুকে নিয়ে শিষ্যের তেমন পঞ্চরস। কিন্তু শুধু আকর্ষণের সম্পর্কগুলিই কি তাঁদের মধ্যে? বিকর্ষণের কি এখানে স্থান নেই? রামের প্রতি রাবণ, কৃষ্ণের প্রতি শিশুপাল, এসব ভাবেরও কি স্থান এখানে নেই? খুব আছে। যে গুরু শিষ্যের ভক্তিটুকুই চান, বশ্যতাটুকুই চান, বিদ্রোহটুকু সইতে পারেন না, তিনি গুরুই নন। যে গুরু

ভালবাসাই চান, প্রীতিই চান, বিদ্বেষের জ্বালা সইতে পারেন না, তিনি গুরুই নন। কারণ, গুরু ত' একটা মানুষ নয়, গুরু একটা ভাব। যে ভাবটার অপরিসীম উচ্চতার কাছে স্তব্ধ হ'য়ে শিষ্যের ভাল-মন্দ, শুভাশুভ সকল ভাব নত হয়, গুরু সেই সর্ব্বাভীষ্টের প্রপূরক মহান্ ভাব। মানুষটার কাছে নিজেকে নত করার নাম শিষ্যত্ব স্বীকার নয়, শিষ্যত্ব হচ্ছে সর্ব্বভাবের অবিরোধী, সর্ব্বভাবের সাফল্য-দাতা, সর্ব্বভাবের অনুপূরক মহাভাবের নিকটে মাথা নত করা।

গুরুবাদের বনিয়াদ

এই ছিল ভারতের গুরুবাদের মূল বনিয়াদ। শিষ্যের জন্যই যাঁর সর্ব্বস্ব, নিজের জন্য যাঁর কিছুই নয়, সেই গুরুর একান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠা শিষ্যের দৃষ্টিতে তাঁকে ব্রহ্মপদাভিষিক্ত ক'রেছিল। জান ত', ভারতবর্ষ অবতারবাদের দেশ। অন্যান্য দেশের লোকের ভিতরেও মহামানবকে ঈশ্বরাবতার ব'লে পূজা করার প্রবৃত্তি প্রচুর দেখা যায়, একথা সত্য। কিন্তু এক ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র একজন মহাপুরুষ এত সহজে ভগবানের সঙ্গে অভেদ ব'লে প্রতিষ্ঠা পান নি। ত্রিজগতে হজরৎ মহম্মদের তুল্য পুরুষ আর কেউ মুসলমানের দৃষ্টিতে নেই, তবু তিনি আল্লার সঙ্গে অভেদ নন, তিনি আল্লার রসুল, আল্লা নন। দেখ, আরবের মাটীতে তাঁকে অবতার ব'লে গ্রহণ করা হ'ল না। হজরৎ আলির শিষ্যেরা এক প্রকারের অবতারবাদ

যেন অনুশীলন কত্তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কেউ তার পাত্তাই দিলে না। যীশুখৃষ্ট খৃষ্টানগণের চ'খে ঈশ্বরাবতার, কিন্তু পিতৃরূপী ঈশ্বর, পুত্ররূপী যীশু এবং পবিত্রাত্মারূপী ভগবান্, এই তিনের মধ্যে ঐক্য কতখানি আর অনৈক্য কতখানি, তার দার্শনিক তর্কাতর্কি খৃষ্টানদের বিভিন্ন ব্যূহে কয়েক শ' বছর ধ'রে চল্ল। কিন্তু ভারতের মাটীতে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি",—যে ব্রহ্মকে জানে, সে ব্রহ্ম হ'য়ে যায়। ফলে প্রথম প্রথম হ'ল, "যত মত, তত অবতার", তারপরে দাঁড়াল, "যত শিষ্য, তত অবতার"। প্রথমে হ'ল,—একজন সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা মহামানব সেই সম্প্রদায়ের সকল লোকের কাছে অবতার, সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মোপদেষ্টারা গুরু, কিন্তু অবতার নন, উপাস্যও নন। কিন্তু পরে দাঁড়াল,—একই সম্প্রদায়ের মতামত শত সহস্র গুরু প্রচার কচ্ছেন, একই সম্প্রদায়ের সাধন-ধর্ম্মে শত শত গুরু দীক্ষাদান কচ্ছেন এবং দীক্ষিতের নিকটে তিনি এবং পরমেশ্বর এক ও অভেদ ব'লে গৃহীত হচ্ছেন। কোনটা ভাল ছিল বা কোনটা মন্দ হ'ল, সে বিচারে যেয়ে কাজ নেই। কিন্তু ঘটনাটী দাঁড়াল এই। একটী মাত্র ব্যক্তির কাছে সম্যক্ আত্মসমর্পণ ক'রে শিষ্য সেই ব্যক্তিটীর সাধনোৎকর্ষের সবটুকু সহজে আয়ত্ত কর্ল্লেন, এইটুকুই হ'ল তাঁর প্রাপ্তি। কিন্তু যেই ব্যক্তিটীর ভিতরে সাধুত্বের ভাণ ছাড়া আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ কিছুই নেই বা শিষ্যকে একটী মন্ত্র দেওয়া ছাড়া আর কোনও আধ্যাত্মিক

যোগ্যতা নেই, তার কাছে নিজেকে নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়ে শিষ্যের লাভ হ'ল কি এবং কতখানি,—প্রথার দাস অন্ধ-সমাজ কি তার কখনো হিসাব ক'রেছে ?

গুরুবাদের রূপান্তর

সেই হিসাব করে নি ব'লেই, আজকের যুগে এই হিসাবটা নিয়েই সব চেয়ে বেশী বুঝা-পড়া হচ্ছে। প্রশ্ন উঠ্‌ছে গুরুবাদ-বর্জ্জিত ধর্ম্ম-সমাজ কি স্থাপিত হ'তে পারে না ? দীক্ষাদাতা দীক্ষা দেবেন, দীক্ষার্থী দীক্ষা নেবেন, এর দ্বারা একজন আর একজনের পূজনীয় এবং অপর জন আশীর্ভাজন হলেন। বাস্, এই পর্য্যন্তই। কিন্তু নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুরু, তিনি কি দীক্ষাদাতা ও দীক্ষাগ্রহীতা উভয়ের গুরু ব'লে মনে, জ্ঞানে ও ব্যবহারে গৃহীত হ'তে পারেন না ? চিরপ্রচলিত গুরুবাদ এবং অভ্যুন্নত গুরুবাদ, এই উভয়ের মাঝখানে আমি হচ্ছি transition (রূপান্তর)এর সেতু। আমার পরে দেখবে যে, কোনো ব্যক্তি আর মানুষের গুরু নয়, পরমাত্মাই সবার গুরু, পরমাত্মার সাক্ষাৎ-বিগ্রহস্বরূপ নামই সবার গুরু। (৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৪)

সদ্‌গুরু নিজেই একটা বিশ্ববিদ্যালয়

ত্যাগ-পবিত্র জীবন-যাপনের আন্দোলন কি সফলতা লাভ কর্ব্বে চেঁচামেচি আর লাফালাফিতে ? না, তা নয়। এ

আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর কর্বে, সদ্‌গুরুর আবির্ভাবের উপরে। কোনও একজন নির্দ্দিষ্ট জগদ্‌গুরু বা বিশ্বত্রাতার আবির্ভাবের উপর নয়, পরন্তু দেশের সর্ব্বত্র, সমাজের সর্ব্বস্তরে শত শত তপঃসিদ্ধ নিষ্কাম-চেতা সদ্‌গুরুর আবির্ভাবের উপরে। কারণ, সদ্‌গুরু নিজেই একটা বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁর মুখের বাণীতেই ব্রহ্মাণ্ডের সকল জ্ঞান প্রবিষ্ট হ'য়ে রয়েছে, আর সত্যিকার সদ্-গুরু যদি তিনি হ'য়ে থাকেন, তবে যা তাঁর মুখের বাণীতে আছে, তার কোটিগুণ আছে তাঁর প্রলোভনজয়ী নিষ্কাম প্রাণের নিভৃত সদিচ্ছার মাঝে। তাঁর সদ্‌গুরুত্ব তাঁর মন্ত্রদান-শক্তির প্রাচুর্য্যের উপরে নির্ভর কর্বে না, কর্বে সকলের সঙ্গে সর্ব্বসম্বন্ধবর্জ্জিত থেকেও সকলের ভিতরে জ্ঞান ও ত্যাগ-নিষ্ঠার উন্মেষের শক্তির উপরে। (১৩ই শ্রাবণ, ১৩৩৪)

সত্য ও গুরু

এ জগতে সত্যের মতন গুরু নাই, গুরুর মতন সত্য নাই। কিন্তু সত্যই বা কাকে বলে, গুরুই বা কাকে কহে? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, যাহা গুরু, কোন কিছুর তুলনাতেই যা' লঘু নয়, নীচু নয়, ছোট নয়, তাই সত্য; আর যা সত্য, মিথ্যার যাতে লেশমাত্র নেই, স্পর্শমাত্র নেই, তাই হচ্ছেন গুরু। সত্যে আর গুরুতে যদি বিরোধ ঘটে, তবে বুঝতে হবে, হয় সত্যটা সত্য নয়, অথবা গুরুই গুরু নন। অ-গুরু গুরুকে সত্যের জন্য ত্যাগ করা

যায়, অ-সত্য সত্যকে গুরুর জন্য বর্জ্জন করা যায়। অ-গুরু গুরু বর্জ্জনে সত্যকে লাভ করা যায়, অ-সত্য সত্য বর্জ্জনে গুরুকে লাভ করা যায়। সত্যকে যে পেয়েছে, গুরুকেও সে পেয়েছে, গুরুকে যে পেয়েছে, সত্যকেও সে পেয়েছে। গুরু আর সত্য অভেদ, অ-গুরু অ-সত্য অভেদ।

দীক্ষা ও দীক্ষাদাতা

সংসঙ্কল্পে দৃঢ়া স্থিতি দানই দীক্ষাদান আর সংসঙ্কল্পে দৃঢ়া নিষ্ঠা গ্রহণই দীক্ষাগ্রহণ। যাঁর যে বিষয়ে সঙ্কল্পের দৃঢ় নিশ্চয় নেই, তিনি সে বিষয়ে দীক্ষা দিতে পারেন না। যাঁর যে বিষয়ে ঐকান্তিকী আকাঙ্ক্ষা নেই, তিনি সে বিষয়ে দীক্ষা নিতে পারেন না। নিজে যিনি ব্রহ্মচর্য্যে অটুট নিষ্ঠাবান্ নন্, তিনি ব্রহ্মচর্য্যের দীক্ষা দিতে পারেন না। যিনি নিজে ভগবদ্দর্শনের জন্য কৃতসঙ্কল্প নন, তিনি আধ্যাত্মিক দীক্ষা দিতে পারেন না। নিজে যিনি স্বদেশ সাধনায় দৃঢ়ব্রত নন, তিনি স্বদেশ-ব্রতে দীক্ষা দিতে পারেন না।

দীক্ষিত ও দীক্ষাদাতা

দীক্ষিতের উপরে দীক্ষা-দাতার প্রভাব অপরিসীম। এ প্রভাব ভালর দিকেও বটে, মন্দর দিকেও বটে। দীক্ষাদাতার জীবনে যদি কাপট্য থাকে, দীক্ষিতের জীবনেও তার ছায়া এসে পড়ে; দীক্ষা-দাতার জীবনে যদি লাম্পট্য থাকে, দীক্ষিতের জীবনেও তার স্পর্শ আসতে চায়। দীক্ষা-দাতার

জীবনে যদি ফাঁকিবাজি থাকে, চালাকী থাকে, ছলচাতুরী থাকে, দীক্ষিতও ফাঁকিবাজ, চালিয়াৎ ও ছলনাকারী হয়। আর দীক্ষাদাতার জীবনে যদি থাকে নিষ্কাম বৈরাগ্য, প্রেমময় সমদর্শিতা আর একনিষ্ঠ সাধন-পরায়ণতা, তা হ'লে শিষ্যের জীবনে ঐসব দুর্ল্লভ সদ্‌গুণ ও কৃতিত্বনিচয় ফুটে উঠে। সকল আধারেই সমপরিমাণে ফোটে, তা' নয়, কিন্তু ফোটে যে, তা' অবধারিত। কি ধর্ম্ম-সাধনা, কি স্বদেশ-সাধনা, সকল সাধনার জগতেই এই একই নিয়ম। পুত্র যেমন পিতার দোষগুণ পায়, দীক্ষিত তেমন দীক্ষা-দাতার দোষগুণ পায়, সবটা না পাকু, অল্প হ'লেও কিছু না কিছু পায়।

ধর্ম্মসাধনের জগতে শিষ্যের উপরে গুরুর এই অপরিসীম প্রভাব সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্ব থেকেই ভারতের সর্ব্বত্র স্বীকৃত রয়েছে। সেও আবার যেমন-তেমন ভাবে স্বীকৃত নয়, বলতে গেলে একেবারে অবিসংবাদিতরূপেই স্বীকৃত রয়েছে। (১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৪)

গুরু ও ব্রহ্ম

দাতার মধ্যে জ্ঞান-দাতা শ্রেষ্ঠ, তাই গুরু-পূজ্য। কিন্তু যিনি অনন্ত জ্ঞানের খনি, সেই ব্রহ্মই তোমার উপাস্য। গুরুতে এবং ব্রহ্মতে স্বাভাবিকভাবে যদি কখনো অভেদবুদ্ধি আসে, আসুক, ক্ষতি দেখি না। কিন্তু যাকে মানুষ ব'লে স্পষ্ট বোধ হচ্ছে, যার

জীবনের সসীমত্ব প্রত্যক্ষ বুঝতে পাচ্ছ, তাকে ব্রহ্ম ব'লে ধারণা কর্ব্বার মিথ্যা চেষ্টা ক'রো না। তাতে কারো মুক্তি হয় না,—'মুক্তির্ন জায়তে দেবি, মানুষে গুরু-ভাবনাৎ।" দীক্ষা পেয়েছিস্, তাই ব'লে কি একেবারে ব্রহ্ম হ'য়ে গেলাম? যিনি ছাড়া জগতে আর কেউ নেই, তিনিই ব্রহ্ম। যখন যাঁকে অদ্বিতীয় ব'লে জানবে, তখন তাঁকেই ব্রহ্ম ব'লো। কিন্তু যার দ্বিতীয় আছে, তাকে কখনো ব্রহ্ম ব'লো না। বল্লে ঠকবে। তোমার গুরু কে? না, যাঁর কাছে তুমি স্বভাবতঃ লঘু, যাঁর সৎসঙ্গ তোমার আত্মাভিমান দূর করে, যাঁর পাদস্পর্শ তোমার পক্ষে সহজজ্ঞানদায়ী। গুরু মিলে ক'জনার? গুরু চেনে কয়জনে? উপলব্ধি কর্‌বার ক্ষমতার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের নাম নেই, শুধু "গুরু"—"গুরু" ব'লে কোলাহল। "গুরুই ব্রহ্ম"—ব'লে শুধু চেঁচালে কি হবে? আগে নিজেকে সত্যনিষ্ঠ হ'তে হবে, মনে মুখে এক হ'তে হবে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড না যতক্ষণ গুরুময় হচ্ছে, ততক্ষণ আবার মানুষ-গুরু কিসের ব্রহ্ম? সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, ত্রাসে ত্রাণে, সঙ্কটে উদ্ধারে সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় যতক্ষণ না হৃদয়ের মধ্যে গুরু-কৃপার স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় স্পর্শ অনুভব হচ্ছে, ততক্ষণ প্রাণ গেলেও স্বীকার ক'রো না যে, গুরুই ব্রহ্ম।

গুরুর মধ্যেও কি ব্রহ্ম-সত্তা নেই? আছে। কিন্তু তোমার

মধ্যেও কি ব্রহ্ম-সত্তা নেই ? গুরুর মধ্যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব রয়েছে ব'লে তিনি ব্রহ্ম, কিন্তু তোমার মধ্যেও ত' ব্রহ্মের অস্তিত্ব রয়েছে, তুমিও কি ব্রহ্ম নও ? ব্রহ্ম সবাই, গুরুও ব্রহ্ম, শিষ্যও ব্রহ্ম। তবে যথার্থ গুরুর ভিতরে ব্রহ্মের প্রকাশটা খুব নির্ম্মল, খুব উজ্জ্বল, কারণ আধারটা তাঁর স্বচ্ছ ও তপঃশুদ্ধ। তুমিও সাধন কর, তোমারও আধার স্বচ্ছ হবে, দেহ মন ব্রহ্মজ্যোতি বিকিরণের যোগ্য হবে। (২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩৪)

গুরু ও অভয়

যার কাছে যেতে ভয় আসে, তিনি আবার গুরু কিসের ? গুরু হবেন অভয়দাতা, গুরু হবেন সন্তাপহারী, গুরু হবেন প্রাণের প্রাণ আপনার জন। গুরু কি বাঘ না গণ্ডার, যে, তাঁকে ভয় কত্তে হবে ? গুরু তাঁর মুখের একটী সামান্য কথায় শিষ্যের প্রাণের সমস্ত তাপ প্রশমন করেন। কি ক'রে করেন, জানিস ? তাঁর অভয়-দানের শক্তি দিয়ে। (২৫শে শ্রাবণ, ১৩৩৪)

শিষ্যের প্রতি সদ্‌গুরু

শিষ্যকে মনে রাখা অতি ছোট কথা, প্রকৃত গুরু শিষ্যকে ধ্যান করেন। শিষ্যের জীবনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতার মধ্যেই গুরুর ইহপর-জীবনের সকল সার্থকতা লুকাইয়া থাকে। শিষ্যের জীবনের প্রভাব শতাব্দীর পরে বিশ্বমানবের উপরে যে প্রবলতা ও দীপ্তি লইয়া নিপতিত হইবে, তাহাই প্রকৃত গুরু নিজ জীবনের দীপ্তি বলিয়া জানেন। গুরু যে অমর, তাহা শিষ্যের

দ্বারা প্রমাণিত হইবে, গুরুর দ্বারা নহে। শিষ্যের অমানুষ অলৌকিক জীবনের দিব্য প্রতিভাই প্রত্যক্ষ পরিচয় দিবে যে, গুরু মানব-জাতির কতখানি সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। গুরু জগতের জন্য তাঁহার হৃৎপিণ্ডের কতখানি রক্ত ঢালিয়া দিতে প্রস্তুত, তাহা শিষ্যের মনুষ্যত্বের অভ্রভেদী ঐশ্বর্য্য দিয়া জগতের গোচরীভূত হইবে। এই জন্যই শিষ্য গুরুর নয়নের মণি, এই জন্যই গুরু শিষ্যকে প্রাণের অধিক বলিয়া গণনা করেন। (৩রা ভাদ্র, ১৩৩৪)

গুরু-তত্ত্ব

আমাদের গুরুবাদ প্রচলিত গুরুবাদের সঙ্গে এক নয়। গুরুর দেহই কি গুরু? গুরুর নাক, কাণ, চোখ, মুখ. এসব কি গুরু? যিনি নিত্য-চৈতন্যস্বরূপ, তিনিই গুরু। যিনি অন্ধকার দূর করেন, তিনিই গুরু। অন্ধকার দূর করে কে? আলো না, আলোর বাহক? আলোই গুরু, লণ্ঠনটা গুরু নয়। লণ্ঠনটার ভিতর দিয়ে তুমি আলোর প্রকাশ দেখতে পাচ্ছ. তাই লণ্ঠনটার অত আদর, অত যত্ন। আলোহীন লণ্ঠনকে যত্ন কর কি? নিত্যানন্দময় পরব্রহ্মই শ্রীগুরু, তিনিই ইষ্ট, তিনিই মন্ত্র তিনিই বিশ্বরূপে প্রকাশিত, তিনিই জ্ঞেয়রূপে অপ্রকাশিত। তিনিই মনুষ্যদেহ হ'য়েছেন, কিন্তু মনুষ্য-দেহটাই তাঁর সবটুকু নয়। মনুষ্যদেহ সসীম, তিনি অসীম। মনুষ্যদেহ ক্ষুদ্র, তিনি ভূমা। সসীম দেহে অসীমের স্পর্শ আছে, তাই এ দেহের

মান। এই ক্ষুদ্র দেহে ভূমার লীলা হচ্ছে, তাই এ দেহের গৌরব। মানব-গুরু উপলক্ষ্য, পরমগুরু লক্ষ্য ; মানবগুরু পন্থা-প্রদর্শক, পরম-গুরু পথ, লক্ষ্য ও প্রদর্শক সবই একাধারে।

এ কঠিন গুরুবাদ একদিনে বোধগম্য হবে কেন ? সাধন কত্তে কত্তে হবে। পথ না পাওয়া পর্য্যন্ত দীক্ষাদাতাই তোমার গুরু, সাধন পাওয়ার পরে নামই তোমার গুরু, পুর্ণজ্ঞানাবস্থায় পরমাত্মা তোমার গুরু। তুমি যতটা বড়, তোমার গুরুও সেই অনুপাতেই বড়। তুমি যখন সাধন-জগতের দুগ্ধপোষ্য শিশু, তখন মানব-গুরু তোমার চরম। তুমি যখন নিজ পায়ে ভর দিতে পাচ্ছ, তখন নাম-গুরু তোমার চরম। তুমি যখন আত্মাকে চিনেছ, তখন ব্রহ্ম-গুরু তোমার সর্ব্বস্বধন। (৬ই ভাদ্র, ১৩৩৪)

গুরু ও শিষ্য

গুরু কে জান ? ব্রহ্মই গুরু। তবে মানুষটাকে গুরু ব'লে মান কেন ? না, পথ দিয়ে তুমি যাচ্ছ, হঠাৎ গর্ত্তে প'ড়ে গেলে। যাকেই দেখ্‌তে পাচ্ছ, তাকেই বল্‌ছ, তোমাকে টেনে তুলে নিতে। কেউ নিচ্ছে না। একজন এসে বল্ল,—আমি তোমাকে তুল্‌ব, কিন্তু আমাকে বাপ্‌ ডাকতে হবে। তুমি বল্লে,—সে কি, বাপ্‌ যে আমার একজন রয়েছে, যে পথে

চল্‌তে চল্‌তে প'ড়ে গেলাম, সেই পথেরই শেষ সীমানায় তাঁর বাস, তিনি থাক্‌তে তোমাকে আবার বাপ্‌ ডাক্‌ব কেন? সে বল্লে,—ওসব শুন্‌ছি না, আগে বাপ্‌ ডাকো, তারপরে তুল্‌ব। অগত্যা তুমি বাপ্‌ ডাকলে। তখন সে তোমাকে টেনে তুল্লে এবং পিতৃসম্বোধনে স্নেহমুগ্ধ হ'য়ে তোমার হাতে একগাছা লাঠি দিয়ে বল্লে,—অন্ধকারে চল্‌তে এই লাঠিখানা দিয়ে পথ ঠিক্‌ ক'রে নিও, তাহ'লে আর গর্ত্তে পড়্‌বে না। তারপর তুমি এগিয়ে গেলে। গুরু-শিষ্যও এইরূপ। পথে না উঠা পর্য্যন্তই গুরু-শিষ্যে সম্বন্ধ, পথ পেলে যত সম্বন্ধ সব ঐ পরমগুরুর সঙ্গে।

গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতা

কৃতজ্ঞতা কি নেই? আছে। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ-বিতরণই সদ্‌গুরুর কাজ, অনন্ত মুক্তির দিকে প্রেরণা দেওয়াই সদ্‌গুরুর স্বভাব, চালকলার যোগাড়ে তাঁর মন নেই বা পূজাপ্রাপ্তিতে তাঁর রুচি নেই, তোমার উন্নতিতেই তাঁর আনন্দ, তোমার কল্যাণেই তিনি খুশী। সুতরাং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে, প্রাণপণে আত্মগঠন আর প্রাণপণে অগ্র-গমন। তুমি যদি পথ এগিয়ে না যাও, তবে তাঁর মহৎ প্রাণের মহৎ উদ্দেশ্যটী সফল হ'ল না, তিনি ব্যর্থকাম হ'লেন, এতে অকৃতজ্ঞতাই হ'ল। ফুলফল দিয়ে গুরুর পাদপদ্ম পূজা কল্লেই কৃতজ্ঞতা হ'ল না, তাঁকে অবতার ব'লে প্রচার কল্লে'ও না,

কিম্বা তাঁর নামে গান বেঁধে খোল-করতাল বাজিয়ে নগর-সঙ্কীর্ত্তন ক'রে বেড়ালেও না। (১১ই ভাদ্র, ১৩৩৪)

গুরু সর্ব্বময়

কেবল সাধন ক'রে যাও বাবা, সাধন ক'রে যাও। সাধন কর্ত্তে কর্ত্তে একদিন সত্যিকারের উপলব্ধিতে জেগে উঠবে যে, গুরু সর্ব্বময়. গুরু চিন্ময়, মৃন্ময়, মনোময়, গুরু চিদতীত, মৃদতীত, মানসাতীত। লণ্ঠনও গুরু, আলোও গুরু, তৈলও গুরু, সলিতাও গুরু, মানুষও গুরু, ব্রহ্মও গুরু, শিষ্যও গুরু, সাধকও গুরু। গুরুর সেই সর্ব্বময় সত্তাকে নিজ উপলব্ধি দ্বারা জেনে নিয়ে তারপরে তুমি মানুষ-গুরুকে কর না সর্ব্ব অন্তর দিয়ে পূজা, সর্ব্বস্ব দিয়ে অর্চ্চনা, তাতে কোনো ভুল হবে না। (১১ই ভাদ্র, ১১৩৪)

গুরুগিরি ও স্বাধীনতা

মানুষের স্বাধীনতাকে যারা সম্মান করে না, তাদের পায়ে মাথা লুটান বিড়ম্বনা, তা'দিগকে আচার্য্য ব'লে গ্রহণ করা এক বিষম অশান্তি। মানুষ সর্ব্বাগ্রে স্বাধীন মানুষ, তারপরে সে গুরুর শিষ্য। তোমার স্বাধীন রুচির সম্মান রেখে যিনি পরমার্থের পথ দেখাতে পার্ব্বেন না, তাঁকে দূর থেকে নমস্কার ক'রেই বিদায় হবে, তাঁর শাসনকে জীবনের উপরে চাপ্‌তে দিও না। সকল রোগীর জন্যই যারা টিঞ্চার আইওডিন্ ব্যবস্থা করে,

জেনো, তারা কখনো সুচিকিৎক নয়। মানুষগুলি বরং বিনা চিকিৎসায় মরুক, তবু হাতুড়ে বৈদ্যের ঔষধ সেবন কিছু নয়। চেয়ে দেখ্ দেখি বাবা ধর্ম্মজগৎটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? ধর্ম্ম-প্রচারকেরা আর উপদেষ্টারা চাচ্ছে, দুনিয়ার সব লোককে অন্ধ রেখে নিজেদের খেয়ালমত চালিয়ে নিতে। কেউ তার শিষ্যকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সবাই চাচ্ছে একপাল অন্ধের মোড়লী কত্তে!

(১৩ই ভাদ্র, ১৩৩৪)

প্রচলিত গুরুবাদ

এখন যা গুরুবাদ্ চল্‌ছে, ওটা ত' একটা জুচ্চুরির দুর্গ। আনুগত্যের নাম ক'রে গুরুরা শিষ্যের চ'খে ঠুলি বেঁধে দিচ্ছেন। কোনো গুরু শিষ্যদের নিজ নিজ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর দাঁড়াতে দিচ্ছেন না, সবাই বল্‌ছেন,—"এটা মানো, ওটা মানো, যেহেতু আমি বল্‌ছি!" শিষ্যের নিজের বিচার-বুদ্ধিকে, স্বাধীন অনুধাবনার ক্ষমতাকে কেউ জাগ্রত কচ্ছেন না, সবাই বল্‌ছেন,—"মামেকং শরণং ব্রজ, আমায় পূজা কর, আমার স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন কর।" কারো কারো গুরু-গৌরব একেও অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে, যা বক্তব্য নয়, তাই তাঁরা বল্‌ছেন, যা কর্ত্তব্য নয়, তাই তাঁরা কচ্ছেন, যা ভাবা উচিত নয়, তাই তাঁরা ভাব্‌ছেন, যা ভাবানো উচিত নয়, তাই তাঁরা ভাবাচ্ছেন। বিদেশীর পরাধীনতা যেমন অপ্রার্থনীয়, এই

সকল গুরুদেবের অধীনতাও তেমন অপ্রার্থনীয়। বৈদেশিক পরাধীনতা যেমন মনুষ্যত্বের অপচায়ক, এই শ্রেণীর গুরুদেবের পরাধীনতাও তেমনি মনুষ্যত্বের অপচায়ক।

প্রকৃত গুরু

আমার মতে তিনিই প্রকৃত গুরু, যিনি বুক ঠুকে বলতে পারেন,—সত্যের জন্য আমাকে অগ্রাহ্য কর, এমন কি অবাধে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পর্য্যন্ত কর, কেন না এ জগতে সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু, তার তুলনায় ব্রহ্মাণ্ডের আর সকল-কিছুই লঘু, যোগৈশ্বর্য্যও লঘু, ইন্দ্রপদও লঘু, তেত্রিশকোটি দেবতার প্রসাদও লঘু। তিনিই প্রকৃত গুরু, যিনি বলতে পার্ব্বেন, যদি প্রত্যক্ষ সত্য আমার কাছে কিছু পাও, তবেই আমাকে মেন, নইলে ছেঁড়া কাঁথার মত আমাকে বর্জ্জন ক'রো, উচ্ছিষ্ট খাদ্যের মত আমাকে বর্জ্জন ক'রো, রজঃস্বলা স্ত্রীলোকের অশুচি বস্ত্রখণ্ডের মত আমাকে বর্জ্জন ক'রো। যথার্থ গুরু বল্‌বেন,—অনুমানে আমাকে মানতে যেও না, মানতে হয় ত' প্রত্যক্ষে নির্ভর ক'রে মানো। যথার্থ গুরু বল্‌বেন,—আমার কথায়, আমার চিন্তায় আমার কার্য্যে যদি অসত্য দেখ্‌তে পাও, ওটা আমার একটা লীলা ব'লে মনকে ফাঁকী দিও না, অসত্যের প্রতিবাদ কর্ত্তে নির্ভীক চিত্তে দণ্ডায়মান হ'য়ো, মিথ্যা অমান্য করো। (১৪ই ভাদ্র, ১৩৩৪)

গুরু ও ভগবান্

ভগবানকে নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করা যায়। কে দেখিয়ে দেবে? যিনি দেখ্‌বেন, তিনিই দেখিয়ে দেবেন এবং যাঁকে দেখ্‌বেন, তিনিও দেখিয়ে দেবেন। ভগবানকে চাও কি? তবে শুধু ভগবানের কথাই ভাবো। পথ-প্রদর্শকের কথা ভেবে ভগবানকে ভোল কেন? ভগবানেরই জন্য পাগল হও, তোমার আর ভগবানের মধ্যে আবার আর একজনকে এনে ব্যবধান জুটাও কেন? ভগবানের সঙ্গে তোমার অন্তরঙ্গ যোগ হোক্। ভগবানের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে যখন তুমি আকুল অধীর হবে, তখন যদি মধ্যপথে সহায়ক কেউ জোটেন, জুটুন। না জুট্‌লেই বা বৃথা চিন্তা কেন? ধ্রুবের গুরুর দরকার হয়েছিল। কিন্তু ধ্রুব 'গুরু' 'গুরু' ব'লে কাঁদেন নি, 'হরি' 'হরি' ব'লেই কেঁদেছিলেন। 'হরি' নামে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তেই তাঁর গুরুলাভ হ'ল। দীক্ষা লাভের পরেও ধ্রুব 'গুরু' 'গুরু' ক'রে জীবন কাটান নি, গুরুকে ভুলে গিয়ে গুরুদত্ত নাম নিয়ে শ্রীহরিকেই ডেকেছিলেন। হরিই ছিলেন ধ্রুবের লক্ষ্য, নানা উপলক্ষ্যের মধ্যে গুরু ছিলেন একজন। লক্ষ্যের জন্য উপলক্ষ্যকে ত্যাগ করা যায়, বিস্মৃত হওয়া যায়।

গুরুকে ভগবান্ বলিয়া কি ধ্যান করা যায়?

সৃষ্টি আর স্রষ্টার তফাৎ নেই। ভগবানই পিতা হ'য়ে, মাতা হ'য়ে, পুত্র হ'য়ে, গুরু হ'য়ে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

সুতরাং যে-কাউকে ভগবান্ ব'লে ভাবা, ধ্যান করা কেন চল্‌বে না? গুরুতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রেম এসে যায় ব'লে তাঁতেই ভগবদ্‌ভাব আসে গভীরতর হ'য়ে এবং অতি সহজে,—ভারত-বর্ষের ধর্ম্ম-সাধনার জগতে এটী একটী চিরন্তন মনস্তত্ত্ব। কেউ যদি এই মনস্তত্ত্বের অনুগত হ'য়ে গুরুতেই ভগবদ্ভাব অর্পণ ক'রে সাধন ক'রে যায়, তাহ'লে তার দিক দিয়ে ভুল কিছুই হবে না, কিন্তু গুরুদেবেরা যদি শিষ্যদের ডেকে ডেকে কেবলই বল্‌তে থাকেন,—"জানিস্? আমিই ভগবান্। আমাকে পুজা করাই ভগবানকে পুজা করা। আমাকে পুজা করার জন্য তুই ভগবান্‌কেও পারলে ভুলে যা",—তবে তা' হবে এক মহাবিপত্তির কথা। (১৫ই ভাদ্র, ১৩৩৪)

গুরুর যোগ্যতা

কাণে একটা মন্ত্র দিলেই গুরু হওয়া যায় না, গুরু হওয়া বড় শক্ত কথা। আজকাল এই যে অত সহজে একজন আর একজনের গুরু হচ্ছে, তার ফল কি জানো? যত্ন ক'রে, কষ্ট ক'রে গুরুপদবী লাভ কত্তে হ'ল না বলে গুরু তার মনুষ্যত্বে খাটো হন। আর, মনুষ্যত্বে খাটো হন ব'লেই বিদ্রোহী শিষ্যকে ক্ষমা কত্তে পারেন না, আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌তে পারেন না,—'সত্যের জন্য আমাকে বর্জ্জন কর, আমার প্রতি মোহাকৃষ্ট হ'য়ে সত্যকে অবমাননা ক'রো না।' বর্ত্তমানের প্রচলিত এই

গুরুবাদরূপ ভণ্ডামির বিরুদ্ধে চারিদিকে তীব্র বিদ্রোহ দেখেও বুঝ্‌তে পাচ্ছ না যে, বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম exploitation (পরের মাথায় হাত বুলান) সহ্য কর্ব্বে না। যুগধর্ম্ম চায় না, দুটো সংস্কৃত শ্লোক আউড়েই কেউ গুরু হ'য়ে যাক্, হঠযোগের দুটো প্রক্রিয়া দেখিয়েই কেউ তোমার জীবন-তরণীর কর্ণধার হোক্। পরন্তু, নিজের জীবনের জ্বলন্ত মনুষ্যত্ব দেখিয়েই বর্ত্তমানের গুরুকে শিষ্যের মনুষ্যত্ব-প্রয়াসী চিত্তকে আকৃষ্ট কত্তে হবে। তাতে গুরুরও লাভ, শিষ্যেরও লাভ। (১৫ই ভাদ্র, ১৩৩৪)

গুরু-দক্ষিণা

এক গুরু তাঁর শিষ্যদের ডেকে এনে বল্লেন,—"গুরু-দক্ষিণা দাও।" সব শিষ্য নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল, শুধু দুইজন শিষ্য গুরুর অভিমুখী হ'লেন। প্রথম শিষ্য বল্লেন,—"এই নিন্ গুরুদেব, আমি আমার সকল ধন-সম্পদ আপনার পায়ে সঁপে দিচ্ছি।" দ্বিতীয় শিষ্য বল্লেন,—"ধন-সম্পদ দিয়ে আর কি হবে গুরুদেব, আপনি চাচ্ছেন আমার জীবনের উন্নতি,—আজ থেকে আমি প্রতিজ্ঞা কল্ল'ম যে, আত্মগঠন কর্ব্ব, মনুষ্যত্ব লাভ কর্ব্ব, গুরুর মান রাখ্‌ব, যে মহান্ আদর্শের প্রচারের জন্য আপনি এত যত্ন পাচ্ছেন, সেই আদর্শের পায়ে আমি আমার জীবন উৎসর্গ কর্ব্ব, জন্মে জন্মে আমি ঐ একই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ভয়ে মৃত্যুবরণ কর্ব্ব।"

গুরুদক্ষিণা প্রকৃতই অদেয়। অর্থাৎ সর্ব্বস্ব দিয়েও

যোগ্যভাবে দেওয়া হ'য়ে উঠে না। এইজন্য গুরুকে না দিতে পার্লে দিতে হয় জগৎকে। জগৎ-সেবাই গুরু-সেবা। এই কথাটা মনে রেখে চল্‌তে হয়। কিন্তু বড় বড় কথার আড়ালে নিজেদের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের অনিচ্ছাকে ঢেকে রাখবারও একটা ছোঁয়াছে রোগ আছে। সেই রোগ সম্পর্কে সাবধান।

(১৭ই ভাদ্র, ১৩৩৪)

সিদ্ধপুরুষ ও দীক্ষা

দীক্ষা দেওয়া না-দেওয়ার উপরে কারো সিদ্ধত্ব নির্ভর করে না। নির্ভর করে মানবজাতির অজ্ঞাতসারে তার উপকার করার শক্তিতে। যাঁর সংস্পর্শে এলে তুমি তোমার অজ্ঞাতসারে সত্যের প্রতি, পবিত্রতার প্রতি, মঙ্গলের প্রতি আকৃষ্ট হবে, তিনি সিদ্ধপুরুষ। যাঁর প্রাণের শুভ ইচ্ছা তোমাকে নবজীবন দান কর্ব্বে, তিনি সিদ্ধ-পুরুষ। দীক্ষাদান একটা অতি বাহ্য ব্যাপার। যাঁর কৃপা অন্তর্ভেদ করে, তিনিই সিদ্ধ-পুরুষ। কারো কৃপা দীক্ষার ভিতর দিয়েই অন্তর্ভেদ করে, কারো বা দীক্ষা ব্যতীতই অন্তর্ভেদ করে।

শিষ্যের গুরু-ত্যাগ

অনেক সময় দেখা যায়, কোনও ব্যক্তি কোনও সাধুপুরুষের চরিত্রে মুগ্ধ হ'য়ে তার শিষ্যত্ব স্বীকার কর্লে; কিন্তু পরে গুরুর জীবনে নানা অসঙ্গতি দেখে গুরুর প্রতি আস্থা তার নাশ হ'য়ে গেল। এ অবস্থায় গুরুসঙ্গ এবং গুরু-সংশ্রব ত্যাগই তার

কর্ত্তব্য। লোকতঃ ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু হ'তে পারে কিন্তু যাকে দর্শন কর্লে মন উচ্চভাবে পূর্ণ হ'য়ে যায় না, তাঁর সঙ্গ কখনই কর্ত্তব্য নয়।

কিন্তু সাধন সম্বন্ধে সে কি কর্বে? উৎকৃষ্টতর সাধন না পাওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বপ্রাপ্ত সাধন নিয়েই চলা উচিত এবং ভগবানকে একমাত্র গুরু ব'লে মানা উচিত।

গুরু যদি চেষ্টা করেন, শিষ্য পূর্ব্বের ন্যায় বাধ্য হোক্, বিনয়ী হোক্? গুরু যদি নানা প্রকারের স্নেহ প্রদর্শন ক'রে শিষ্যের মনকে আকৃষ্ট কত্তে চেষ্টা করেন? তা'হলেও সেই স্নেহে আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। সন্দিগ্ধ-চরিত্র স্ত্রীর সাথেও বরং ঘর করা চলে, সসর্পেও বরং গৃহবাস চলে, কিন্তু যার উপরে আস্থাহীনতা এসেছে, তাঁকে গুরু ব'লে মেনে চলা যেতে পারে না। এমতাবস্থায় গুরু যদি স্নেহাদি প্রদর্শন ক'রে শিষ্যের মন ভিজাতে চেষ্টা করেন, তাহ'লে শিষ্যের উচিত এই স্নেহকে মায়ামোহের জাল মনে ক'রে উপেক্ষা করা।

গুরু যদি শিষ্যের জন্য কেঁদে আকুল হন? মা-বাপ কেঁদে আকুল হ'লেও যেমন সন্ন্যাসী ছেলে সন্ন্যাসব্রত ত্যাগ করে না, ঠিক তেমনি অযোগ্য গুরু শিষ্যের জন্য কেঁদে বুক ফাটালেও শিষ্যের উচিত নয় সেই অনুচিত আকর্ষণে মুগ্ধ হওয়া। বাপ হওয়া সহজ, মা হওয়া সহজ, কিন্তু গুরু হওয়া সহজ নয়।

কিন্তু যদি গুরুর উপর শিষ্যের আস্থা কখনো ফিরে আসে?

তাহ'লে ত' মিটেই গেল। আস্থা এলেই আত্মসমর্পণ। যতক্ষণ আস্থা না আস্‌বে, ততক্ষণ উপেক্ষা। যদি কখনই আস্থা না আসে, তবে চির-উপেক্ষা। (১৯শে ভাদ্র, ১৩৩৪)

গুরুত্যাগ

স্বয়ং শ্রীভগবানই গুরু। কিন্তু তিনি মনোবুদ্ধির অগম্যলোকে নিজ স্বরূপ লুকিয়ে রেখেছেন। তাই তাঁর কাছে পৌছুবার জন্য তাঁকে অবলম্বন ক'রে যে মহাভাব মনোবুদ্ধির জানিত ভাষায় অন্তরে উদিত হয়, সেই মহাভাবই গুরু। কিন্তু এই মহাভাবকে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর মহানামের আবশ্যকতা পড়ে। সুতরাং তাঁর নামই তোমার গুরু। এই নামকে সুদৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাণে ধ'রে রাখবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ অনেকের পক্ষেই প্রয়োজন। সুতরাং দীক্ষা-দাতা মহাপুরুষ তোমার গুরু। দীক্ষা নিয়ে তুমি নামের অনুগত হচ্ছ, ভগবন্মুখী মহাভাবের অনুগত হচ্ছ, তাই দীক্ষা-দাতা তোমার গুরু। দীক্ষা নেবার পরে যদি তাঁর সঙ্গে সংশ্রব-রক্ষার ফলে তোমার অন্তরের উদ্দীপনা ও উচ্চ-ভাবকে স্বহস্তে নিধন কত্তে হয়, তা হ'লে যে আত্ম-হত্যার পাপ হবে বাছা! সুতরাং নামকে একান্ত ভাবে আশ্রয় করবার জন্যই তখন তোমাকে মনুষ্যদেহী গুরুর কাছ থেকে দূরে যেতে হবে, এতে গুরুত্যাগ হয় না।

কুলগুরুর সম্মান

সদ্‌গুরু যদি পেয়ে যাও আর সাধন কর্ব্বার জন্য অন্তরে যদি

প্রবল আগ্রহ এসে থাকে, তাহ'লে "কুল-গুরুর কাছে দীক্ষা না নিলে নরক হবে," এসব সেকেলে শাসন-বাক্য অগ্রাহ্য কত্তে ভয় পেয়ো না। তবে কুলগুরু-বংশ বিয়ে, পৈতে, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে কিছু কিছু ধন-প্রাপ্তির প্রত্যাশা রাখেন। সুতরাং তা থেকে তাঁদের বঞ্চিত ক'রো না। দীক্ষা তাঁদের কাছ থেকে নাও নি ব'লে তাঁদের যোগ্য সম্মান কত্তে কখনো কুণ্ঠিত হ'য়ো না।

গুরু ও শিষ্যবর্দ্ধন

জগতে অনেক গুরু সত্য সত্যই বাধ্য হ'য়ে শিষ্য-সংখ্যা বর্দ্ধন করেন। কেউ করেন নিজ নিজ গুরুদেবদের আদেশে। কেউ করেন জীব-উদ্ধারের প্রবল প্রেরণায়। কেউ করেন সংখ্যা-বৃদ্ধি-জনিত নানা সুযোগ-সুবিধার লোভে। কেউ করেন নানা বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে নিতান্তই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। কেউ করেন শিষ্যদের আগ্রহের দরুণ বাধ্য হ'য়ে। কেউ করেন নিজ প্রেমময় স্বভাবের স্বাভাবিক ঝোঁকে। কারো কার্য্যেই আগে থেকে অভিসন্ধি আরোপ ক'রে তাঁকে হেয় জ্ঞান করা ঠিক নয়। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জগতের প্রায় সকল গুরু-পদাধিকারীরাই কিছু না কিছু জগদ্ধিত সাধন কচ্ছেন। এই-জন্য যেখানেই যাঁর গুরুকে দেখ্‌তে পাও, নিজের গুরু মনে ক'রে মনে মনে শ্রদ্ধা দেবে। (১৯শে ভাদ্র, ১৩৩৪)

উপদেষ্টার অসংযমে

যাই শিষ্য দেখ্‌বে, গুরুর জীবনে সংযম নেই, ব্রহ্মচর্য্য

নেই, তখনি সে তাকে বর্জ্জন কর্ব্বে। শিষ্য যদি হয় খাপখোলা তলোয়ার, তবেই গুরু তাঁর প্রকৃত পদবীতে আরোহণ কত্তে পারেন। নতুবা একপাল গরু-ছাগলের গুরু হ'তে গিয়ে উন্নতমনা মহান্ গুরুকেও নীচে নেমে আস্‌তে হয়, নিজের পায়ে নিজে কুঠার হানতে হয়।

মহাপুরুষ ও শিষ্য-সংগ্রহ

প্রকৃত মহাপুরুষেরা কখনো শিষ্য-সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হন না. জীবের মঙ্গলের জন্যই তাঁরা ব্যাকুল। কিন্তু মঙ্গল কত্তে হ'লেই যে মন্ত্র দিয়ে শিষ্য কত্তে হবে, তার কোনো মানে নেই। যেখানে মঙ্গল কর্ব্বার ক্ষমতা এবং ইচ্ছা শুধু মন্ত্রদানের মধ্যেই নিবদ্ধ হ'য়ে পড়ে, সেখানে মহাপুরুষ তাঁর মহত্ত্ব থেকে ভ্রষ্ট হন। অনেক সময় মন্ত্রদীক্ষা না দিয়েই জীবের বেশী উপকার করা যায়। সে ক্ষেত্রে প্রকৃত মহাপুরুষ মন্ত্রদীক্ষা-দান বর্জ্জন করেন। মন্ত্রলাভের জন্য যার আগ্রহ জাগে নাই, মন্ত্রলাভের মহিমায় যার আস্থা আসে নাই, তাকে মন্ত্রদান ত' দীক্ষার অপব্যবহার। অবশ্য অনিচ্ছুক, তথাকথিত অপাত্রেও অনেক শিষ্য-সংগ্রহে অরুচিমান্ মহাপুরুষকে জোর ক'রে দীক্ষা দিতে দেখা গিয়েছে কিন্তু সেগুলি তাঁদের অসীম কৃপারই নিদর্শন, শিষ্য-সংগ্রহের আগ্রহ নয়।

দীক্ষার শক্তি

দীক্ষা কি একটা দেশ-প্রচলিত চিরাচরিত লোকপ্রথা মাত্র,

না, দীক্ষার কোনও শক্তি আছে? সাধারণ দৃষ্টিতে দীক্ষাদান ও গ্রহণকে লোকপ্রথা ছাড়া আর কি বলবে? বালবধূকে শ্বাশুড়ী দীক্ষা নেওয়াচ্ছেন কেবল হাতের জল শুদ্ধ করার জন্য, অন্য কোনও উদ্দেশ্যই তাঁর এতে নেই। বৃদ্ধবৃদ্ধারা দীক্ষা নিচ্ছেন কেবল এই ভেবে যে, কি জানি হঠাৎ কখন ম'রে যান, ফলে অদীক্ষিত অবস্থায় মরলে ত' যমরাজা অনেক বেশী কষ্ট দেবেন। কেউ দীক্ষা নিচ্ছেন এই ভেবে যে, অদীক্ষিত রয়েছেন শুন্‌লে সমাজের লোকেরা একটু অনাদরের চোখে দেখবেন, দীক্ষিত হয়েছেন জান্‌লে কেউ কেউ একটু সমীহ ক'রে চল্‌বেন। কেউ কেউ অনেক বেছে খুব নামজাদা গুরুর কাছে দীক্ষা নেন মাত্র এই উদ্দেশ্যে যে, তাহ'লে অমুক জজের গুরুভাই, অমুক ম্যাজিষ্ট্রেটের গুরুভাই, অমুক রাজা বাহাদুরের বা প্রফেসারের গুরুভাই ব'লে নিজেকে জাহির করা যাবে। এসব ক্ষেত্রে দীক্ষা নেওয়া প্রথার দাসত্ব করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু দীক্ষার প্রতাপে জগতে অনেক মাতাল মদ ছেড়েছে, অনেক অসতী সতীধর্ম্মে ফিরে এসেছে, অনেক প্রবঞ্চক ও প্রতারক সৎ, সাধু, সজ্জনে পরিণত হয়েছে। দীক্ষা অনেক দোদুল্যমান-চিত্ত নর-নারীকে একনিষ্ঠ, একলক্ষ্য, একমুখ, একাগ্র ও অধ্যবসায়ী করেছে। দীক্ষা অনেক দুর্ব্বলকে বল দিয়েছে, অনেক পাপীর পাপ হরণ করেছে, অনেক দুঃশাসন দুর্ম্মতিকে সুসংযত ও সুন্দর করেছে। দীক্ষা একটা প্রথা হ'লেও সুপ্রথা। জীবের কুশলকে লক্ষ্য রেখেই এই প্রথার আবির্ভাব। (২০শে ভাদ্র, ১৩৩৪)

গুরুমূর্ত্তি ধ্যান

নাম জপ কত্তে কত্তে যদি কখনো গুরু-মূর্ত্তি জাগে? জাগুক, তাঁকেও অনাদর কর্ব্বার দরকার নেই। কিন্তু মনে রাখ্‌তে হবে,—ন-ইতি, এখানেই শেষ নয়। ভগবানের নাম জপ করলে বিনা চেষ্টায় যে-কোন রূপ তোমার চক্ষের সমক্ষে এসে দাঁড়াবে, জান্‌বে এটা ভগবানেরই রূপ। তাঁর নাম কত্তে ব'সে যদি মৈথুনাদি কদাচারে রত পশুপক্ষি-সরীসৃপের মূর্ত্তিও জাগে, তবে জান্‌বে এটাও ভগবানেরই রূপ। যত রূপ যেখানে আছে, সবই ভগবানেরই রূপ। কালীমূর্ত্তিও ভগবানেরই রূপ, কৃষ্ণমূর্ত্তিও ভগবানেরই রূপ, জনকমূর্ত্তিও ভগবানেরই রূপ, দরিদ্র-মূর্ত্তিও ভগবানেরই রূপ। ভগবান্‌ রূপের মহাসমুদ্র। কালী, কৃষ্ণ, জনক, জননী, গুরু, গুর্ব্বী, দীন, দরিদ্র, অনাথ, আতুর, অন্ধ, খঞ্জ, পুত্র, শিষ্য, স্ত্রী, কন্যা, বন্ধু, বান্ধব, শত্রু, মিত্র, রাজা, প্রজা, নদী, পর্ব্বত, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সবই সেই অনন্ত রূপ-সমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ মাত্র। নাম জপ কত্তে কত্তে এঁদের যাঁকেই যখন দেখ না কেন, জেনো, ভগবদ্‌-দর্শনই হচ্ছে। কিন্তু পূর্ণ ভগবানকে দেখ্‌ছ না, তাই এইটুকু দর্শনেই তুষ্ট থাকলে চল্‌বে না, আরো দেখ্‌তে হবে এবং তারই জন্যে কষে নাম-সাধনা কত্তে থাকবে।

(২৪শে ভাদ্র, ১৩৩৪)

মিথ্যা গুরু

গুরু-শিষ্যে সম্বন্ধটা এমন একটা সম্বন্ধই নয়, যা জোর ক'রে

কৌশল ক'রে, ছলনা-কপটতার সাহায্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা উচিত। একজন লোকের আর একজন লোককে দেখে বেশ ভাল লাগ্‌ল, আর সেই সাময়িক দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে অপর ব্যক্তি তার কাণে একটা মন্ত্র ফুকে দিয়ে বল্লেন,—"এই আমি গুরু হ'লাম",– গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ এ ভাবে সৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। এভাবে এ সম্বন্ধ সৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে ফুস্‌লে নিয়ে বা বলাৎকার ক'রে নারীকে নিজের পত্নী ক'রে নেওয়ার সঙ্গে বেশ একটা ব্যবহারিক সাদৃশ্য আছে। ফুসলান বা বলাৎকৃতা স্ত্রী যেমন স্বল্পকাল পরেই তথাকথিত স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা, এমন কি নিষ্ঠাও হারায়, এই ভাবে শিষ্য কত্তে গেলে এই সব গুরুদেবদের শিষ্যরা অনেক সময়ে গুরুর প্রতি তেমনি অতি অল্পকাল মধ্যেই শ্রদ্ধা-ভক্তি হারায়। রেজেষ্টারী অফিসে দলিল রেজেষ্টারী কত্তে গিয়ে অনেক সময়ে দলিলে নিজের পরিচয়টা কি ভাবে দিবে, স্থির কত্তে না পেরে অনেক শিষ্য হয়ত ঐ ব্যক্তির নামটাকেই গুরুরূপে লিখিয়ে দেয়, কিন্তু তাতে তার অন্তরের সায় থাকে না, ফলে রেজেষ্টারী করা বিবাহ যেমন অনেক সময়ে মিথ্যা হ'য়ে যায়, তেমনি রেজেষ্টারী দলিলের নাম-পরিচয়ও মিথ্যা হ'য়ে যায়। গুরুর কর্ত্তব্য শিষ্যকে বৎসরের পর বৎসর ধ'রে দেখে-শুনে নিজেকে তার উত্তরণের যোগ্য ব'লে ধারণা হ'লে তবে তার গুরুরূপে আত্ম-প্রকাশ করা। কোনও প্রকারে একটা মন্ত্রদান ক'রে ফেলে

একটা লোককে চিরজীবনের মত আটক ক'রে রাখার মত কুবুদ্ধি আর জগতে কিছু নেই। নবযৌবনবতী কুলীন-কন্যা যেমন মুমূর্ষু বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহিত হওয়ার দুই দিন পরেই বিধবা হয় এবং জোর ক'রে বেঁধে তাকে সহমরণে পাঠালেও সে সুযোগ পেলেই পলায়ন করে, এই সব স্থলেও তেম্‌নি দুই চারি দিন গুরু-শিষ্যের প্রেমাভিনয় চল্‌বার পরে হঠাৎ গ্রন্থি-বন্ধন ছিঁড়ে যায়, শিষ্য গুরুকে পরিহার ক'রে নিজ পথে চ'লে যায়। শিষ্য তার প্রথম মোহে এই গুরুর প্রতি যতই বিনম্র বিনীত ভাব প্রদর্শন করুন না, জোর ক'রে এসব ক্ষেত্রে শিষ্যকে চিরকাল শিষ্য ব'লে বেঁধে রাখা জগতে কারো পক্ষে সম্ভব নয়। শিষ্য তার চরিত্রের স্বভাব-গত বিনয় বশতঃ হয়ত বাহ্য ব্যবহারে ভবিষ্যতেও কোনও দুর্ব্বিনীত ব্যবহার করে না কিম্বা নিজের স্বভাবগত কোনও দুর্ব্বলতা বা ভ্রান্তিবশতঃ এই গুরুর কাছে দুই একবার মাথা খুঁড়তেও যায়, তবুও জান্‌তে হবে যে, এ সম্বন্ধ সত্য নয়। মিথ্যা এখানে গুরুদেবের গুরুত্বের অভিনয়, মিথ্যা এখানে শিষ্যের আনুগত্যের অভিনয়।

শিষ্যের অকৃতজ্ঞতা

কিন্তু কোনও শিষ্য যদি গুরুদেবের শিষ্যরূপে নিজেকে পরিচিত করার সুযোগ নিয়ে লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ক'রে থাকে আর তারপরে ব'লে বসে যে উনি তার গুরু নন, -তাহ'লে তাকে অকৃতজ্ঞ ব'লে জান্‌তে হবে। যাকে ধ'রে যে

প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ক'রেছে, তাকেই সে অস্বীকার কর্ব্বে? অকৃজ্ঞতা ক্ষমার যোগ্য অপরাধ নয়।

লঘুত্ব-প্রাপ্ত গুরু

যেখানে তথাকথিত শিষ্যের স্বোপার্জ্জিত প্রভাব-প্রতিপত্তির দিকে অঙ্গুলী-সঙ্কেত ক'রে তথাকথিত গুরু জন-সমাজে নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়াবার চেষ্টা করেন, সেখানে তিনি যে ব্যবসায়-বুদ্ধি-সম্পন্ন সুচতুর গুরু, তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু তিনি এই শিষ্যের হৃত্তাপহারী গুরু হবার অধিকার থেকে চিরবঞ্চিত থাকেন। শিষ্যের নাম-যশকে, শিষ্যের দীপ্ত কীর্ত্তিকে, শিষ্যের দিগ্‌দেশব্যাপী প্রভাব-প্রতিপত্তিকে যিনি নিজের গুরুগিরির পরিবর্দ্ধনের জন্য প্রয়োগ করেন, তিনি গুরু নামের যোগ্যই নন। এ ক্ষেত্রে তিনি লঘু হ'য়ে যান। যে শিষ্য নিজ অনুভূতির রাস্তা ধ'রে সত্যের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হ'য়ে যাচ্ছে এবং তারই ফলে ভিতরে বাহিরে অগণিত নরনারীর শ্রদ্ধা ও আত্মপ্রসাদের জনক হচ্ছে, সুকৌশলে তাকে নিজের শিষ্যদের মুখে মুখে জন-সমাজে স্বকীয় শিষ্য ব'লে পরিচিত করিয়ে করিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি বাড়াবার চেষ্টা লঘুত্ব-প্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ। গুরুত্ব-প্রাপ্ত ব্যক্তির পরিচয় এতে মোটেই নেই। এসব ক্ষেত্রে শিষ্যকে নিজের সাময়িক অভ্যস্ত দুর্ব্বলতা ও মোহ পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র পরমেশ্বরকেই গুরু জেনে তাঁরই চরণে পূর্ণ আনুগত্য রেখে অগ্রসর হ'তে হয়

এবং কে কোথা থেকে পিছন-টান দিয়ে পথ-বিঘ্ন উৎপাদনের চেষ্টা কচ্ছে, তার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন হ'তে হয়।

(২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৩৪)

দীক্ষা ও ফ্যাসান

দেখ, দীক্ষা লওয়াটা আজকাল একটা ফ্যাসান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সাধন-ভজন করা নেই, শুধু গেয়ে বেড়ান,—"আমি অমুকের শিষ্য।" এরই জন্য আজকাল দীক্ষার সম্মান কমে গেছে, মূল্য হ্রাস পেয়েছে। ভগবানের জন্য প্রাণ আকুল হ'ল না, তাঁর জন্য চিত্ত অধীর হ'ল না, তবু একটা লোক-দেখান দীক্ষা নিতেই হবে, আর লোক-দেখান সাধুগিরি ফলিয়ে বেড়াতে হবে। এতেই দেশের সর্ব্বনাশ হয়েছে।

অযোগ্যের দীক্ষা

দীক্ষার ফলেও অনেকের প্রাণে ভগবানের জন্য আকুলতা জন্মে, একথা সত্য। কিন্তু দীক্ষার জন্যও আত্মগঠন প্রয়োজন। বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা ব্যতীত কেউ দীক্ষা লাভের যোগ্য হয় না। একজন সাধু দেখ্‌লে, আর অম্‌নি বল্লে, দীক্ষা দাও, এর মত বোকামী আর নেই। আগে আত্মপরীক্ষা ক'রে দেখ, দীক্ষার জন্য প্রকৃত আগ্রহ এসেছে কি না, দীক্ষার পর ক্রিয়া কর্‌বে কি না, না, দুদিন পরেই হাত-পা গুটিয়ে বস্‌বে? তারপরে পরীক্ষা কর, যাঁর কাছে দীক্ষা চাচ্ছ, তাঁর মধ্যে দীক্ষাদানের যোগ্যতা আছে কি না, তিনি তোমার প্রাণের পিপাসা মিটাতে পার্ব্বেন কি না।

গুরু-পরীক্ষা

গুরু-পরীক্ষা না ক'রে দীক্ষা কেন নেবে? পরীক্ষা কর, তিনি ত্যাগী কিনা, জ্ঞানী কি না, ভগবদ্-প্রেমিক কিনা। পরীক্ষা কর, তিনি ভয়ের সময়ে অভয় দিতে পারেন কিনা, দুর্ব্বলতার সময়ে হৃদয়ে বলসঞ্চার কত্তে পারেন কি না। পরীক্ষা কর, তাঁর ভিতরে প্রকৃতই ব্রহ্মবীর্য্য আছে কি না, তাঁর বাক্য অনুভূতির ফল কি না, তাঁর অনুভূতি তীব্র সাধনার ফল কি না? পরীক্ষা কর, তিনি যে তোমাকে ধর্ম্মজগতে সাহায্য কত্তে চান, তার কারণ লাভ, পূজা বা প্রতিষ্ঠার লোভ কি না, না, তিনি নিষ্কাম প্রেমেরই প্রেরণায় তোমাকে বুকে তুলে নিচ্ছেন।

গুরুর পরিচয়

গুরুর পরিচয় তোমাকে নিতে হবে। গুরুর পরিচয় কোথায় পাবে? পাবে তোমার ইন্দ্রিয়দমনের ক্ষমতার ভিতর। গুরুর সঙ্গ তোমাকে নারীজাতির প্রতি মাতৃবুদ্ধি আরোপ কত্তে সামর্থ্য দেবে, নারীর প্রতি ভোগবুদ্ধি বর্জ্জন ক'রে পূজাবুদ্ধি আরোপ কর্ব্বার শক্তি দেবে। তাঁর সঙ্গ তোমাকে নিয়ত মনে করিয়ে দেবে যে, জগতের সকল সৃজনী শক্তিই হচ্ছে তোমার মা, গর্ভধারিণী তোমার মা, জন্মভূমি তোমার মা, ভাষা তোমার মা, অন্নদাত্রী তোমার মা, অভয়দাত্রী তোমার মা, পালয়িত্রী তোমার মা, নিঃসম্পর্কীয়াও তোমার মা। গুরুর সঙ্গ তোমাকে শেখাবে, বালিকা তোমার মা,

কিশোরী তোমার মা, যুবতী তোমার মা, প্রৌঢ়া তোমার মা, বৃদ্ধা তোমার মা, নারীর মৃত দেহটাও তোমার মা, নারীর ছবিটা পর্য্যন্ত তোমার মা। গুরুর পরিচয় কোথায়? তার পরিচয় হচ্ছে বিশ্বজনীন মাতৃবোধকে জাগ্রত করার শক্তিতে। প্রত্যেক নারীকে যখন মনে কর্‌বে এক-একটা সিদ্ধ পীঠস্থান, এক-একটা অন্নপূর্ণার মন্দির, এক-একটা ব্রহ্মবিদ্যার বেদী, এক-একটা সরস্বতীর বীণা, এক-একটা শ্মশানকালীর খড়্গ, তখন জান্‌বে, গুরুর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

(৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৩৪)

বর্ত্তমান গুরুবাদ

গুরু কাহাকে বলে? শাস্ত্র বলিয়াছেন,—'গু' মানে 'অন্ধকার', 'রু' মানে 'অন্ধকার-নিবারক'। সুতরাং তিনিই গুরু, যিনি অন্ধকার দূর করেন। তাহা হইলে যিনি অন্ধকার দূর করেন না, তিনি কি করিয়া গুরু হইবেন? যিনি অন্ধকার দূর করিতে পারেন না, তিনি কি করিয়া গুরুর গুরুতর পদবী দাবী করিবেন?—যাঁহারা বর্ত্তমান দেশ-প্রচলিত গুরুবাদ সমর্থন করেন, তাঁহাদিগকে আগে এই প্রশ্নের জবাব পাইয়া লইতে হইবে।

অনেক শাস্ত্র যাঁহার অধ্যয়ন করা আছে, কথায় কথায় যিনি ঝুড়ি ঝুড়ি সংস্কৃত শ্লোক উদ্গার করিতে পারেন কিন্তু শাস্ত্রার্থের প্রত্যক্ষ অনুভূতি যাঁর নিজ জীবনের মধ্যে এক

কণিকাও নাই, তিনিই কি গুরু ?—বর্ত্তমান গুরুবাদকে এই প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হইবে।

যে সকল গুরু বলেন,—গুরুত্যাগে মহাপাপ, তাঁহারা কসাই। তাঁহারা বলেন,—অযোগ্য গুরু ত্যাগ করিয়া আমাকে বরণ কর, তাঁহারাও কসাই। শিষ্যকে পরমার্থের লোভ দেখাইয়া উভয়েই জানিয়া শুনিয়া শিষ্যের গলায় ছুরী চালাইয়া থাকেন। এই দ্বিবিধ গুরু হইতেছেন বর্ত্তমান গুরুবাদের প্রধানতম স্তম্ভ। শিষ্যের জীবনে সত্যলাভের বিদ্যুন্ময়ী প্রেরণা জাগিয়া বজ্রের সৃষ্টি না করিলে এই স্তম্ভ-দ্বয়ের ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞান শিষ্যের অন্ধ অনুরক্তিই ইঁহাদের প্রতিষ্ঠাকে অক্ষয় অমর করিয়া রাখিতেছে।

আমি কখনই মনে করি না, শিষ্যের পুরুষকারকে পায়ের তলায় চাপিয়া রাখিয়া নিজের গুরুত্বকে স্পর্দ্ধিতশির হইতে দিবার অধিকার কোনও গুরুর আছে। বর্ত্তমান গুরুবাদ যেখানে যেখানে শিষ্যকে পুরুষকার-বিমুখ ও দৈব-নির্ভর করিয়াছে, সাধনে পরাঙ্মুখ, কৃপার লোলুপ এবং অলস করিয়াছে, সেখানে সেখানেই সে তাহার স্বকীয় শেষ সমাধি নির্ম্মাণ করিয়াছে।

ভারতীয় গুরু, পাশ্চাত্য পাদ্রী এবং আইন

নির্দ্দিষ্ট সরকারী পরীক্ষায় পাশ না করিতে পারিলে কেহ

গুরু হইতে পারিবেন না,—এইরূপ আইন-প্রণয়নের চেষ্টাকে আমি একান্তই হাস্যকর মনে করি। কারণ, গুরু আর পুরোহিত এক বস্তু নহেন। দেশের রীতিই এই যে, যজন-যাজন করাইতে পারিলেই যে-কেহ পুরোহিত হইতে পারেন,—অবশ্য যদি তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মেন। কিন্তু এই জাতি-ভেদ-শাসিত দেশেও অব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারেন, হইয়াছেন এবং হইতেছেন, যদি কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ঘটিয়া যায়। কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বপণ্ডিত অথবা কোন্ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ইহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন ? কেননা, একমাত্র শিষ্যই গুরুর শক্তিকে অনুভব করেন, অপরে করিতে পারেন না।

পাশ্চাত্যের পাদ্রীরা যে হিসাবে রাজার আইন মানিয়া থাকেন, ভারতের গুরু কখনও তাহা মানিবেন না। পাশ্চাত্য পাদ্রী কতকটা আমাদের দেশের পুরোহিতদেরই মতন যজ-মানের ধর্ম্মের বহিরঙ্গ আচার-ব্যবহারগুলি লইয়া গলদ্‌ধর্ম্ম হন। পরন্তু ভারতের গুরু,—যথার্থ গুরু,—শিষ্যের প্রাণের সুপ্ত শক্তিকে নিজের জাগ্রত শক্তির অদৃশ্য স্পর্শ দিয়া নিদ্রোত্থিত করেন। এখানেই ভারতীয় গুরুর কৃতিত্ব এবং এখানেই তাঁহার অমরত্ব। মোট কথা, বর্ত্তমান গুরুবাদ স্বার্থসিদ্ধিমূলক গুরুবাদ, বংশানুক্রমিক কৌলীন্যের মত বংশানুক্রমিক গুরুবাদ কখনও কোনও সত্যান্বেষীর সমর্থন

পাইবে না। কিন্তু পরমার্থ-পথের জন্য যাহারা ব্যাকুল হইয়াছে, তাহারা তত্ত্বদর্শী গুরুর সাক্ষাৎ চিরকালই কামনা করিবে। আইন করিয়া বা আন্দোলন চালাইয়া এই সত্যকে ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। (৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪)

সার্থক-দীক্ষা নবজন্মদানেরই নামান্তর

দীক্ষা হচ্ছে নবজন্ম-লাভ। দীক্ষার ফলে অতীতের সংস্কার মুছে যায়, নূতন জীবন-যাত্রার পথ উন্মুক্ত হয়। দীক্ষাদান আর জন্মদান এক কথা। যে যাকে দীক্ষা দেয়, সে তাকে নিজের জাতিও দেয়। দীক্ষা দিয়ে সকল পতিতকে মহাপুরুষেরা যুগে যুগে উপরে টেনে তুলেছেন। আর, যেখানে এইটীই হয়েছে দীক্ষার ফল, সেখানেই দীক্ষা হয়েছে সার্থক। সার্থক-দীক্ষা নবজন্মদানেরই নামান্তর, নবজন্মলাভেরই রূপান্তর।

দীক্ষার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার

এসব ক্ষেত্রে দীক্ষা দীক্ষিতের মুক্তিদাত্রী, স্বাধীনতাদাত্রী নিরঙ্কুশ ঊর্দ্ধ্বগমনের শক্তিবিধাত্রী। কিন্তু যেখানে দীক্ষা দিয়ে গুরু তাঁর শিষ্যকে স্বাধীনতার সামর্থ্য না যুগিয়ে কেবল বন্ধনের প্যাঁচ কষেন, সেখানে দীক্ষা ব্যর্থ। এ কথা যেমন মিথ্যা নয় যে, দীক্ষা দিয়ে দলে দলে স্বচ্ছন্দচারী উচ্ছৃঙ্খল লোককে সামাজিক-চরিত্র-বিশিষ্ট সুসংযত জীবন-যাপনকারী ব্যক্তিতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে, একথাও তেমন মিথ্যা নয় যে,

দলে দলে লোকের মনের স্বাধীনতা হরণ ক'রে আধ্যাত্মিক ক্রীতদাসে পরিণত ক'রে একটা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর সেবার জন্য তা'দিগকে কেনা-গোলামে রূপান্তরিত ক'রে রাখার চেষ্টাও এই দীক্ষার মাধ্যমেই দীর্ঘকাল ধ'রে করা হ'য়ে এসেছে। দীক্ষা এক অতি শক্তিমৎ অস্ত্র, যার সদ্ব্যবহার মানুষকে করেছে দেবতায় উন্নীত, যার অসদ্ব্যবহার মানুষকে করেছে ক্রীড়নকের দলে পরিণত।

রাজনীতিক নেতাদের সহিত দীক্ষাদাতা গুরুদের সাদৃশ্য

রাজনীতিক নেতারা যেমন ক'রে অনেক সময়ে জনসাধারণকে মিথ্যা স্তোকবাক্যে প্রলুব্ধ ক'রে তাদের কাছ থেকে নিজের অনুকূলে ভোট আদায় ক'রে তারপরে রাজ্যশাসকের গদিতে ব'সে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনের জন্য সকলের স্বার্থকে পদবিদলিত করে, দীক্ষাদানের মধ্য দিয়ে তেমনি একদল লোক সহস্র সহস্র নরনারীর উপরে সম্মোহনাস্ত্র প্রয়োগ ক'রে তাদের স্বাধীন জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধির সর্ব্বশক্তি লোপ ক'রে দিয়ে স্বর্গ-নরকাদির প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে তাদের বল-বিত্ত অপহরণ ক'রে ক'রে নিজেদের ব্যক্তিগত সুখের অনুশীলন এবং নিজেদের নিতান্ত সান্ত ইন্দ্রিয়সমূহের পরিতর্পণ ক'রে থাকে। এরা সকলেই সমাজের শত্রু। এই কথাটী সুস্পষ্ট রূপে জেনে রেখে প্রত্যেককে হুজুগ-বর্জ্জিত মন নিয়ে

ভোটদানের কেন্দ্রে বা দীক্ষার গৃহে ঢুকতে হবে। কেন দীক্ষা নিচ্ছি, তা' না জেনে দীক্ষা নেওয়া উচিত নয়।

সৎসাহস চাই

সর্ব্বাবস্থাতেই তোমার সৎসাহস চাই। ইহজীবনই বল আর পরজীবনই বল, জীবন নিয়ে কোনও অবস্থাতেই জুয়াখেলা চালানো উচিত নয়। "তোমাকে ভোট আমি দিব না"—এই কথা বলার সাহস যেমন প্রত্যেক নাগরিকের থাকা উচিত, "তোমার কাছে দীক্ষা আমি নিব না"—এই কথা বলার সাহসও তেমন প্রত্যেক সাধন-পথ--গমনেচ্ছু ব্যক্তির থাকা উচিত। এ সৎসাহস যাদের না থাকে, তারা বস্তাপোরা-বেড়ালের মত কেবল আছাড় খায় আর আঘাতই পায়।

(৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪)

সদ্‌গুরু ও অসদ্‌গুরু

সকলেরই একটা লক্ষণ আছে, যা' দিয়ে তাকে চেনা যায়। যেমন, না ব'লে যে পরের জিনিষ নেয় বা রাত্রিতে পরের ঘরে সিঁদ দেয়, তাকে বলে চোর। যেমন, লাঠি-সোটা, অস্ত্র শস্ত্র, নিয়ে গায়ের জোরে যে পরস্ব অপহরণ করে, সে হল ডাকাত। ঠিক তেমনি যিনি বুক ঠুকে শিষ্যকে বল্‌তে পারেন,—"যেদিন দেখ্‌বি, আমি তোর কল্যাণের বিঘ্ন হচ্ছি, ধর্ম্মলাভের অন্তরায় হচ্ছি, ভগবানকে পাবার বাধা হচ্ছি, সেদিন আমাকে ত্যাগ ক'রে যাবি",—তিনিই হ'লেন সদ্‌গুরু। যিনি বল্‌তে

পারবেন,—“যেদিন দেখ্‌বি, আমাকে ত্যাগ কল্লে তোর সাধন-জীবনের গতি দ্রুত হবে, তুই সহজে পূর্ণতা লাভ কত্তে পারবি, সেদিন আমার প্রতি ভালবাসা আছে ব'লে যেন পিছন তাকিয়ে চলিস্‌ না,”—তিনিই সদ্‌গুরু। আর যিনি বলেন,—“আমায় ছাড়লে তোর অধোগতি হবে, আমাকে ত্যাগ কল্লে তোর নির্ব্বংশ হবে, সর্ব্বনাশ হবে, তিনি হচ্ছেন অসদ্‌-গুরু।”

ত্রিবিধ গুরু

এক শ্রেণীর গুরু আছেন, তাঁরা নিজেরা নিজেদিগকে ব্রহ্ম ব'লে কখনো উপলব্ধি করেন নি কিন্তু অজ্ঞ মূর্খ অশিক্ষিত শিষ্যের কাছে বারবার শুধু এই কথাই ব'লে বেড়ান যে,—“গুরুতে মানুষ-বুদ্ধি কত্তে নেই, গুরু স্বয়ং ব্রহ্ম—ইত্যাদি” এবং এইভাবে চাল-কলার বরাদ্দটা বাড়িয়ে নেন। এঁরা অধম গুরু। আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন, যাঁরা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করেছেন এবং নিজেকে ব্রহ্ম ব'লে বুঝেন এবং শিষ্যের নিকট নিঃসঙ্কোচে ব'লে বেড়ান,—“আমিই ব্রহ্ম, আমিই পরাৎপর পরমাত্মা, আমিই উপাস্যের উপাস্য, ঈশ্বরের ঈশ্বর।” এঁরা মধ্যম গুরু। আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন, যাঁরা নিজেদিগকে ব্রহ্মের সাথে অভেদ ব'লে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি লাভ করেছেন কিন্তু মুখে কখনো বলেন না,—“আমি ব্রহ্ম”, বরঞ্চ সকল শিষ্যকে বার বার ক'রে মনে করিয়ে দেন যে, মানব-

গুরুকে নিয়ে তুষ্ট থাকলে চলবে না, পৌঁছুতে হবে পরম-ব্রহ্মে। এঁরা উত্তম গুরু।

ত্রিবিধ শিষ্য

এক প্রকারের শিষ্য আছেন, যাঁদের মতলব হচ্ছে ফাঁকি দেওয়া, গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হ'লে তাঁরা মনে মনে বিচার করেন,—"গুরুর দেহটা ত' আর গুরু নয়! সুতরাং গুরুর দেহের পরিচর্য্যা ক'রে আর কি হবে?" এঁরা অধম শিষ্য। আর এক প্রকারের শিষ্য আছেন, গুরুর আত্মার সম্বন্ধে কোনও বিচার তাঁরা করেন না, তাই ঐ দেহটারই প্রাণপণে সেবা ক'রে যান। আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যান। এঁরা মধ্যম শিষ্য। আর এক প্রকারের শিষ্য আছেন, তাঁরা গুরুদেবের দেহের যথাশক্তি পরিচর্য্যা করেন কিন্তু দেহটাকে গুরু মনে করেন না, দেহের অভ্যন্তরস্থ আত্মাকেই গুরু ব'লে মনে করেন, এঁরা উত্তম শিষ্য। (১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪)

দুই গুরু হইলে কি কর্ত্তব্য

গুরু যখন দুই হবেন, তখন গুরুর গুরু পরমেশ্বরকে গুরু ক'রে পথ চল। নইলে মিথ্যা দ্বন্দ্বে, বৃথা সংশয়ে, অলীক আশঙ্কায় দিন কাটাতে কাটাতে জীবন মাটি হ'য়ে যাবে।

(২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪)

গুরু

গুরুর চেয়ে আপন নাই। কিন্তু গুরু কে? ব্রহ্মই গুরু।

কিন্তু ব্রহ্মই যে গুরু, তা' যিনি বুঝতে পারেন না, তাঁর উপায় ? তাঁর পক্ষে গুরু-নির্ণয়ের পথ অভয়। যাঁর দর্শনে ভয় দূরে যায়, যাঁর স্পর্শনে ভয় দূরে যায়, যাঁর স্মরণে ভয় দূরে যায়, তিনিই সদ্‌গুরু। যাঁর মুখের কথাটী শুনলে ভয় পালায়, প্রাণ নির্ভয় নিঃশঙ্ক হয়, তিনিই সদ্‌গুরু। যিনি তা' নন, তিনি অসদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু শিষ্যকে ডেকে বলেন,—ওরে দেখ্, ব্রহ্মপূজাই আমার পূজা, জগৎ-কল্যাণে আত্মসমর্পণই আমার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন; আমার পূজার জন্য যে ব্রহ্মপূজায় হেলা করে, আমার সম্মানের জন্য জগৎ-কল্যাণে শৈথিল্য করে, সে আমার কেউ নয়। সদ্‌গুরু শিষ্যকে ডেকে বলেন,—দেখ্, সত্যের জন্য যেদিন আমাকে ছেড়ে যেতে তোর কষ্ট হবে না, সেই দিনই তুই প্রকৃত শিষ্য। সদ্‌গুরু শিষ্যকে ডেকে বলেন,—আমার চেয়ে যাঁরা বড়, তাঁদের চেয়ে আমাকে বড় ভাবিস না, তাঁদের উপরে আমাকে স্থান দিস না। সদ্‌গুরু শিষ্যের চাল-কলার বাধ্য নন, তার প্রকৃত উন্নতিরই বাধ্য।

—সদ্‌গুরু বল্লেন, হে শিষ্য, তুমি নাকি আমার পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথে চলেছ ? শিষ্য বল্লেন,—এ কথা সত্য, কারণ, আপনার পথ আমার ভাল লাগল না। সদ্‌গুরু বল্লেন,—বেশ করেছ, খুশি হ'য়েছি, তোমার স্বাধীনতা দিয়েই তোমার সাথে আমার সম্বন্ধ, পরাধীনতা দিয়ে নয়। অসদ্‌গুরু বল্লে,—হে শিষ্য, তুমি নাকি আমায় ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ ধরেছ ?

শিষ্য বল্লে,—আজ্ঞে হাঁ। অসদ্গুরু বল্লে,—তোমার নির্ব্বংশ হোক, তুমি জাহান্নমে যাও, তোমার চৌদ্দপুরুষ নরকে ডুবুক্। সদ্গুরু শিষ্যকে বল্লেন,—বাবা! শিষ্য বল্লেন,—আমাকে পুত্রভাবে সম্বোধন কর্ব্বেন না, আমি আপনার পুত্র নই। সদ্-গুরু বল্লেন,—বন্ধো! শিষ্য বল্লেন,—আমি আপনার বন্ধুও নই। মুখ সাম্‌লে কথা বলুন। সদ্গুরু বল্লেন,—ভাই! শিষ্য বল্লেন,—আমি আপনার ভাইও নই, বেশী আত্মীয়তা কর্ব্বেন না। সদ্গুরু বল্লেন,—আচ্ছা সবই মানলুম, হে নিঃসম্পর্কীয়, হে সম্বন্ধাতীত! শিষ্য চুপ ক'রে রইলেন। সদ্-গুরু বল্‌লেন,—নিঃসম্পর্কের মধ্য দিয়েই তোমার আমার সম্বন্ধ, এ সম্পর্কের আর ছেদ-ভেদ নেই, এ সম্বন্ধের আর ছাড়াছাড়ি নেই। (১৬ই পৌষ, ১৩৩৪)

সদগুরু প্রসঙ্গ

সদ্গুরু বল্লেন,—'হে শিষ্য, আমার চেয়ে যদি কখনো, কোন মহত্তর লোক পাও, তখন কি কর্ব্বে?' শিষ্য বল্লেন,—'আজ্ঞে, আমিও ক'দিন ধ'রে ঠিক্ সেই কথাটাই ভাবছি' সদ্গুরু বল্লেন,—'তোমাকে আর ভাবতে হবে না বাছা, আমি নিজেই সব ঠিক্ ক'রে দিচ্ছি। আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ যখনই পাবে, তখনি আমাকে ছেঁড়া চটিজুতোর মত ত্যাগ কর্ব্বে। আমার দেওয়া পথের চাইতে উৎকৃষ্টতর পথ যখনি পাবে, তখনি সেইটী গ্রহণ কর্ব্বে। শিষ্য বল্লেন,—'কিন্তু আমার

মন যদি আপনাকে ত্যাগ কত্তে না চায় ?' সদ্‌গুরু বল্লেন,—'সত্যকে যদি গ্রহণ কর, জেনো, তাহ'লেই আমাকে গ্রহণ করা হবে ; সত্যকে যদি অস্বীকার কর, তা'হলে আমাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকলেও ত্যাগ করাই হবে। সত্যই গুরু, সত্যকে যে ত্যাগ করে, সে-ই গুরু-ত্যাগী।'

(২)

এক শিষ্য গুরুকে অসত্যাশ্রয়ী মনে ক'রে গুরুর সংশ্রব ত্যাগ ক'রে নিজের স্বাধীন পথে, স্বাধীন মতে পরকল্যাণ কত্তে আরম্ভ কল্লে'ন ; অসদ্‌গুরু তখন তাঁর শিষ্যদের ডেকে এনে একত্রিত ক'রে বল্লেন,—'ওকে তোরা এক-ঘ'রে ক'রে রাখ,, ওর ধোপা-নাপিত বন্ধ কর্।' সদ্‌গুরু বল্লেন,—'সে কি ? তোতে আর আমাতে সম্পর্ক ত' সত্য নিয়ে, বশ্যতা বা অধীনতা নিয়ে ত' নয়।' তখন তিনি প্রিয় শিষ্যদের ডেকে বল্লেন,—'ওরে দেখ, তোরা সব ওকে গিয়ে সহায়তা কর, যে বশ্যতা, যে সেবা, যে আজ্ঞানুবর্ত্তিতা তোরা দিচ্ছিলি আমাকে, আজ থেকে তা' ঐ সত্যানুরাগী ছেলেটাকে গিয়ে দে। কেননা সত্যকে প্রার্থনা ক'রেই ও আমাকে সত্য ক'রে পেয়েছে।

(৩)

শিষ্য এসে বল্লেন,—'গুরুদেব, তোমার সব শিষ্য তোমার বিদ্রোহী হয়েছে।' সদ্‌গুরু জিজ্ঞেস্ কল্লে'ন,—'কেন রে ?'

শিষ্য বল্লেন,—'তুমি আর নূতন ভাব, নূতন চিন্তা, নূতন প্রেরণা দিতে পাচ্ছ না। তাই সকলে নূতনের খোঁজে বের হ'তে চাচ্ছে।' সদ্‌গুরু বল্লেন,—'এতদিন ধ'রে যা দিয়ে আস্‌ছি, এটা তারই অমৃতময় ফল ; তুই ওদের সবাইকে বল্‌গে যা, এই বিদ্রোহের ধ্বজা ধ'রে আগে আগে আমি চল্‌ব, আমি বুড়ো ব'লে পিছনে পড়ে থাকব না!'

(৪)

শিষ্য বল্লে,—'হে গুরো, তুমি বড় সুন্দর।' সদ্‌গুরু বল্লেন,—'মনে রেখো, তুমি তোমাকেই দেখছ, তুমি তোমারই প্রশংসা কচ্ছ।' শিষ্য বল্‌লেন,—'হে গুরো, তোমার চরিত্রে দোষ আছে, ত্রুটী আছে, অসম্পূর্ণতা আছে।' সদ্‌গুরু বল্লেন,—'ঠিকই বলেছ, তোমার কথা সত্য ; আমার গুরু আজ শিষ্য সেজে আমাকে সংশোধিত কচ্ছেন,—'তুমি আমার প্রণতি গ্রহণ কর।' শিষ্য বল্লেন,—'হে গুরো, তোমাকে আমি ব্যথা দিতে এসেছি।'– সদ্‌গুরু বল্লেন,—বেশ ক'রেছ, ভাল ক'রেছ, ব্যথার জন্য রাজিই আছি কিন্তু বাছা তুমি আবার ব্যথা পেয়ে না ব'স, এইটুকুই আমার প্রার্থনা।' শিষ্য বল্লেন,—'হে গুরো, তুমি আমাকে ভুল পথে চালিয়েছ, ঠকিয়েছ।' সদ্‌গুরু বল্‌লেন,—'প্রবঞ্চনা যে ধর্‌তে পেরেছ, তা' কখনও ভুলো না বাপধন, সতর্ক হ'য়ে পথ চল, আর কখনও ঠকুবে না।' (২২শে পৌষ, ১৩৩৪)

গুরু এবং শিষ্য

এক গুরু ছিলেন। তাঁর তিনটী অতিপ্রিয় শিষ্য ছিল। দীর্ঘকাল গুরুসেবার পরে একদিন প্রথম শিষ্য ভাবলে—এ লোকটা গুরু হবার যোগ্য নয়, সুতরাং একে ত্যাগ করাই উচিত। শিষ্য আশ্রম ছেড়ে রওনা হচ্ছে দেখে গুরু বল্লেন,—'কোথা যাচ্ছিস রে?' শিষ্য বল্লে,—'যেদিকে দু'চ'খ যায়।' গুরু বল্লেন,—'কেন রে?' শিষ্য বল্লে,—'আপনাকে পূর্ণ মানুষ ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি আপনি অপূর্ণ মানব, আপনার জীবনে অনেক ত্রুটী।' গুরু বল্লেন,—'তারই জন্য চলে যাবি? কেন রে, আমি কি আত্মসংশোধন কত্তে পারি না?' শিষ্য বল্লে,— 'তা' ইচ্ছা হয় করুন গে, কিন্তু আমি আর থাকুব না, পূর্ণ মানুষের খোঁজে আমি চল্লাম।' গুরু বল্লেন,—'যাস্‌নে রে তুই যাস্‌নে, আমি যে তোর গুরু, আমাকে ত্যাগ কল্লে যে তুই অপরাধী হ'বি।' শিষ্য বল্লে,—'আপনাকে আর গুরু ব'লে মানিই না, আপনাকে ত্যাগ কর্লে কোনো দোষ নেই।' গুরু বল্লেন,—'না রে না, ও কথা বল্‌তে নেই, ওতে মহাপাপ হয়, গুরু চিরকালই গুরু, চোর হ'লেও গুরু, ডাকাত হ'লেও গুরু, মাতাল হ'লেও গুরু, লম্পট হ'লেও গুরু। কিন্তু শিষ্য শুন্‌লে না, সে চলে গেল। গুরু প্রিয় শিষ্যের শোকে অনেক দিন ব'সে ব'সে কাঁদ্‌লেন, কালক্রমে শোক অপনোদিতও হ'ল। হৃদয়ের যে স্থানটা প্রথম শিষ্য দখল

ক'রে ব'সেছিল, ধীরে ধীরে দ্বিতীয় শিষ্য এসে সেই স্থানটা অধিকার কল্লে। কিন্তু দ্বিতীয় শিষ্যের ছিল চরিত্র-দোষ। গুরু একদিন দেখ্‌লেন, প্রিয়-শিষ্য ত' সর্ব্বনাশের পথে চলেছে। তিনি শিষ্যকে ডেকে বল্লেন,—'বাবা, এখনো এ পথ থেকে ফিরে আয়, নইলে বিষম বিপদ ঘট্‌বে, তুই যে ডুবলি হত-ভাগা। শিষ্য গুরুর কথায় কর্ণপাতও কল্লে না। তখন গুরু নিরুপায় দেখে ভাব্‌লেন,—বন্ধুত্বের শক্তি অপরিসীম, হয়ত ওর বন্ধুরা ওকে কু-পথ থেকে ফিরাতে পার্ব্বে। তাই তিনি শিষ্যের বন্ধুদের নিকট গিয়ে বল্লেন,—'দেখ্‌ তোদের অমুক বন্ধু চরিত্র-ভ্রষ্ট হয়েছে, পারিস যদি, তোরা সব তাকে রক্ষা কর্।' কিন্তু বন্ধুরা কেউ কিছু কত্তে পাল্লে না, বরং দ্বিতীয় শিষ্য যে গোল্লায় যাচ্ছে, মাঝ থেকে এই কথাটা শুধু শুধু সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জানাজানি হ'য়ে গেল। শিষ্য এতে ব্যথিত হ'য়ে আশ্রম ত্যাগ ক'রে রওনা হল। গুরু বল্লেন,—'ওরে তুই যাচ্ছিস্ কোথা?' শিষ্য বল্লে,—'অধঃপথে যাচ্ছি, তুমি আমাকে পেছন থেকে ডে'ক না ব'লে দিচ্ছি!' গুরু বল্লেন,—'কেন রে, কি দোষ আমি করেছি?' শিষ্য বল্লে,—'ন্যাকা সেজো না, আমার নিন্দা ত্রিভুবনময় ছড়িয়ে দিয়ে এখন ভালবাসা দেখান হচ্ছে।' গুরু বল্লেন,—'তোর ভাল'র জন্যই ত' করেছিলাম রে, তোর মন্দ ত' আমি চাই নি!' শিষ্য বল্লে,—'ভালো মন্দ বুঝি না মশাই, তুমি আমার গুপ্ত কথা

ব্যক্ত করেছ, তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই।' গুরু বল্লেন,—'হাজার আমি দোষ করি, হাজার আমি ক্রুটী করি, আমি যে তোর গুরু রে! শেষটায় আমাকে ত্যাগ কৰ্বি?' শিষ্য বল্লে,—'তোমার মতন গুরু ত্যাগ করাই উচিত; শিষ্যের ছিদ্র যে লুকিয়ে রাখ্‌তে পারে না, সে গুরু হবার যোগ্যই নয়।' শিষ্য চলে গেল, গুরু কতদিন ধরে তার জন্যে কাঁদলেন। ক্রমে শোক অপনোদিত হ'লে তৃতীয় শিষ্যই তাঁর হৃদয়ের সকল স্নেহের আধার হ'ল। কিছুদিন যায়, একদিন তৃতীয় শিষ্যও পড়ল কঠিন ব্যাধিতে, জীবনের আর কোনও আশা নেই। শিষ্য রোগশয্যায় পড়ে পড়ে চিন্তা আরম্ভ কর্ল্ল,—রোগ হবার কারণ কি? আমি ত' আহারের সুনিয়ম, সদাচার, সংযম—এসব থেকে কখনো পরিভ্রষ্ট হই নি। শেষে ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঠিক কর্ল্লে যে, গুরুর কাছে যে মন্ত্র সে নিয়েছে, তারই ফলে এই মারাত্মক ব্যাধি তাকে ধরেছে, এ সাধন না কর্‌লে ত' তার আর ব্যাধি হ'ত না। তাই সে ঠিক কর্‌ল, মন্ত্র ভুলে যাবে। কিন্তু ভুল্‌বার জন্য যত চেষ্টা করে, ততই ইষ্টমন্ত্র তার বেশী বেশী মনে আসে। শিষ্য দেখ্‌ল বিষম বিপদ। তখন সে স্থির কর্‌লে, গুরুকেই ত্যাগ কত্তে হবে, নইলে আর মন্ত্র ত্যাগ করা যায় না। তখন সে রুগ্ন শরীরেই ভাল ক'রে কাঁথাকম্বল জড়িয়ে রওনা হ'ল। গুরু বল্‌লেন,—'যাস্ কোথা?' শিষ্য বল্‌লে,—'তোমাকে ছেড়ে

যাচ্ছি, কারণ তোমার দেওয়া সাধনের ফলেই আমার এ প্রাণান্তকর ব্যাধি হ'য়েছে।' গুরু বল্‌লেন,—কিন্তু এ যে ভয়ঙ্কর শীতকাল, পথে বেরুলে যে মারা পড়বি? শিষ্য বল্‌লে,—'মরি না হয় পথে-পগারেই মর্ব্ব, তবু তোমার ওখানে থাকব না, তোমার জন্যই না আমার এমন ব্যাধি হ'ল, তোমারই জন্যে না আমি এমন ভয়ঙ্কর কষ্ট পাচ্ছি।' গুরু বল্‌লেন,—'আমি শতবার ঘাট মান্‌ছি রে, তবু আমায় ছেড়ে যাস্‌নে, আমি যে তোর গুরু।' শিষ্য বল্‌লে,—'মুখে বল্‌লেই গুরু হয় না, গুরুর মত কাজ কত্তে হয়, শিষ্যকে উপদেশ দেবার বেলা হিসাব ক'রে উপদেশ দিতে হয়, যেন তাতে আবার শিষ্যের অনিষ্ট না হয়।' শিষ্য চ'লে গেল, গুরু কেঁদে আকুল। একে একে তাঁর সব গেল। যাকে ভেবেছিলেন প্রাণের প্রাণ, সেও গেল; যাকে ভেবেছিলেন পরমবুদ্ধিমান্‌, সেও গেল। সর্ব্বশেষে যাকে ভেবেছিলেন সকলের চেয়ে ধীর স্থির, যেতে যেতে সেও গেল। আজ যে আশ্রমের মন্দিরে বাতি দেবার লোকটীও নেই! গুরু তখন ভগবানের পায়ে আত্মসমর্পণ ক'রে বলতে লাগলেন,—'ঠাকুর, বৃথাই শিষ্য খুঁজে বেড়াই আর ভালবাসতে গিয়ে প্রাণভরা জ্বালা আর হৃদয়-ভরা বেদনা পাই। না ঠাকুর, কারো সঙ্গে আমি আর কোনো সম্বন্ধ রাখ্‌ব না, এখন থেকে সকল সম্বন্ধ শুধু তোমাতে আর আমাতে।' এই না ব'লে গুরু বস্‌লেন

সাধনাতে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এভাবে কেটে গেল। একদিন সহসা তিনি এক দৈববাণী শুন্‌তে পেলেন, কে যেন বল্‌ছে,—'তুই কারো গুরু ন'স, তুই সকলের লঘু, তুই কারো প্রভু ন'স, তুই সকলের দাস।' দৈববাণী শুনেই গুরু তখন মন্দিরের বাহিরে এসে উন্মুক্ত মাঠের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়াতেই দেখেন, যে-দিকেই মুখ ফিরান, সেই দিকেই একজন লোক হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি চ'খ তাকাতেই অম্‌নি বলে,—'গুরো, পথ দেখিয়ে দাও, প্রভো, চরণাশ্রয় দাও।' গুরু বল্‌লেন,—'ওরে তোরা আমাকে গুরু বলিস্ নে, আমাকে প্রভু ডাকিস্ নে, আমি যে তোদের সেবক মাত্র, তোদের যখন যে অভাবটুকু পড়্‌বে, আমি সেই অভাবটুকুর পূরক মাত্র। যার প্রাণে যেইখানে আছে বেদনা, সেইখানে হাত বুলিয়ে শুশ্রূষা কর্ব্ব ; যার যেখানে ক্ষত, সেখানে নিজের জিভ্ দিয়ে পূয সাফ্ কর্ব্ব ; যার পায়ে কাঁটা ফুটবে, দুই হাতে তার পদতলের পরিচর্য্যা কর্ব্ব। আমি তোদের পায়ের ধূলো, আমি তোদের পায়ের জুতো. আমি তোদের সেবক, তোদের দাস, আমাকে 'গুরু' ব'লে, 'প্রভু' ব'লে গাল্ দিস্ নে।' হঠাৎ গুরু দেখ্‌লেন তিনজন লোক চ'খে মুখে কাপড় গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছে। গুরু তাদের বুকের কাছে টেনে নিতেই তারা মাটিতে প'ড়ে অশ্রুজলে পদতল সিক্ত কর্ত্তে লাগ্‌ল। বার

বার তারা বল্‌তে লাগ্‌ল,—'গুরো, পিতা, আমরা তোমার বিদ্রোহী সন্তান, আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা কর।' গুরু বল্‌লেন,—'সে কি রে, পরমপিতাই একমাত্র পিতা, পরমগুরুই একমাত্র গুরু,—আমি যে তোদের দাদা, তোদের গুরুভাই!' শিষ্যেরা বল্‌লে,—'আপনি কি আমাদিগকে চিনতে পাচ্ছেন না?' গুরু বল্‌লেন,—'পাচ্ছি রে পাচ্ছি, তাই-না আজ ভাই ব'লে কোল দিচ্ছি; তোরা আমার সেই তিনটী হারানো নিধি, তোদের কথা কি কখনো ভুল হ'তে পারে?' শিষ্যেরা বল্‌লে,—গুরো, আমরা গুরুত্যাগ ক'রে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু আজ স্পষ্ট বুঝলাম, গুরুকে কখনো ত্যাগ করা যায় না, চেষ্টা ক'রেও না।' গুরু বল্‌লেন,—'আমিও চেয়েছিলাম তোদের উপর গুরুগিরি ফলাতে, কিন্তু আজ স্পষ্ট জান্‌লাম, মানুষে-মানুষে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধই নিত্য সম্বন্ধ, এ সম্বন্ধের আর লয়-ক্ষয় নেই।' (২৭শে পৌষ, ১৩৩৪)

গুরু

(১)

পুলিশ, সিপাহী, জেলখানা, অন্তরীণ, ফাঁসী-কাষ্ঠ, আন্দামান বা ধলন্দা হাউসের বলে গুরু শিষ্যকে শাসন করেন না। কামান, বন্দুক, ঢাল, তলোয়ার, বর্শা, বেয়নেট, বোমা, রিভলবার দিয়াও গুরু শিষ্যকে শাসন করেন না। কর্ত্তব্যজ্ঞান কৃতজ্ঞতা, উপকারবুদ্ধি প্রভৃতির সহায়তায়ও গুরু শিষ্যকে

শাসন করেন না। গুরু শাসন করেন তাঁর শিষ্যকে প্রেমের দ্বারা, যে প্রেমের উৎপত্তি কোনও হেতু-বিশেষকে আশ্রয় করিয়া নহে, যে প্রেমের মূল কোনও কার্য্যে নহে, নিয়ত একত্র অবস্থান নহে. পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ে নহে, যাহার আশ্রয় শুধু গুরুর প্রেমময় স্বভাব।

(২)

শিষ্যত্বের ধর্ম্ম ভক্তি ও শ্রদ্ধা। ভক্তি-শ্রদ্ধার ধর্ম্ম এই যে, মানুষের যুক্তি-বিচার যতটুকু ঊর্দ্ধে চলিতে পারে, ভক্তি-শ্রদ্ধা ততটুকু পথ যুক্তি-বিচারের সাহচর্য্য করে, কিন্তু যেখানে যুক্তি-বিচার প্রত্যক্ষের অনেক দূরে, যেখানে যুক্তি-বিচার নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অনুমান মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, সেখানে শিষ্যের ভক্তি-শ্রদ্ধা, প্রেমময়-স্বভাব শুদ্ধ-চরিত গুরুর আদেশ, উপদেশ, দৃষ্টান্ত ও ইঙ্গিত-সমূহকে বিনা বিচারেই যুক্তি-সঙ্গত এবং বিনা যুক্তিতেই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করে।—ইহা শিষ্যের নীচতা বা দাসত্ব নহে। বুদ্ধি যেখানে সত্যকে ধরিতে পারে না, বুদ্ধি যেখানে সত্যের অস্তিত্বে সংশয় উৎপাদিত করে, বুদ্ধি যেখানে দিশাহারা পথিকের ন্যায় নানাপথে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং বাচালের ন্যায় মুহুর্মুহু বিরুদ্ধ কথার সমর্থন করে ও অর্থ-হীন হট্টগোলের সৃষ্টি করে, ভক্তি-শ্রদ্ধা তখন হয় সন্দিগ্ধের একমাত্র উপায়, অবিশ্বাসীর একমাত্র বল ; চঞ্চল-চেতার চিত্ত-স্থৈর্য্যের একমাত্র পথ।

(৩)

মানুষ নিজেই নিজের গুরু। কতটুকুর গুরু ? যতটুকু সে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছে। তাহার প্রত্যক্ষের জগতে অপর কাহারও গুরুত্ব নাই, প্রভুত্ব নাই, অনুশাসন নাই। এই প্রত্যক্ষটুকু সে লাভ করিয়াছে, নিজ ভুজ-বিক্রমে। কিন্তু কোন্ পথে এই বাহুবলকে পরিচালিত করিবে, তার নির্দ্দেশ সে কাহারও নিকট পাইয়াছিল। যাঁহার নিকটে পাইয়াছিল, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বাভাবিক, কিন্তু তিনি শুধু পথেরই গুরু। পথের গুরুকেই সাধারণ কথায় গুরু বলা হইয়া থাকে। যাহার যে বিষয়ে প্রত্যক্ষ নাই এবং যার যুক্তি-বিচার যে-পথে শুধু ধোঁয়াটে অন্ধকারে ঘুরিয়া মরে, তাহাকে সেই বিষয়ে এই গুরু মানিতে হয়, গুরুবাক্যানুসারে চলিতে হয়, প্রত্যক্ষ লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নির্ব্বিচারে তাঁহার অনুশাসন মান্য করিতে হয়। মানুষ নিজেই নিজের গুরু, এ কথা যুগাচার্য্যেরা অকুণ্ঠিত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। মানুষেরই অভ্যন্তরে গুরু বাস করেন, গুরু খুঁজিবার জন্য দেশ-বিদেশ পর্য্যটনের প্রয়োজন নাই, গুরুর আজ্ঞা সাধনের ফলে ভ্রূমধ্যস্থ দ্বিদল-পদ্ম প্রকাশিত হয়, একথা সাধন-শাস্ত্রনিচয় বহুবার বলিয়াছেন। যোগীর সাধনা মানুষের নিজ-স্বরূপকেই গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গুরুতে, মন্ত্রে, আরাধ্যে এবং নিজেতে অভেদ উপলব্ধির চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছেন ; নিজেকে গুরু বলিয়া জানিবার

পথ প্রত্যেকের পক্ষেই মুক্ত রহিয়াছে, শুধু প্রয়োজন একটী জিনিষের—তাহা হইতেছে, সাধন। মানুষ নিজেই নিজের গুরু, কিন্তু সাধন করিয়া, সিদ্ধ হইয়া, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তারপরে। যতটুকু যে নিজেকে চিনিয়াছে, ততটুকুর সে গুরু, যতটুকু চেনে নাই, ততটুকুর শিষ্য। কে যে কাহার শিষ্য, তাহা তাহার অন্তরের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা-ভক্তিই জানে, তাহার মুখের বচন-বিন্যাস জানে না। আজ যে শিষ্য, কাল সে গুরু। প্রত্যক্ষের এই পারে যতদিন, ততদিন সে শিষ্য ; প্রত্যক্ষের ঐ পারে যখন, তখনই সে গুরু।

(৪)

যতদিন শিষ্য উন্নত সংস্কারের অধিকারী না হইবে, ততদিন তাহাকে উন্নত তত্ত্ব দান করা গুরুর সাধ্যাতীত। এই জন্য নীচবুদ্ধি শিষ্যসমাজে মহামনা গুরুর আবির্ভাব হয় না। যতদিন গুরু না হইবেন সম্যক্ প্রকারে নিঃস্বার্থ-চেতা, ততক্ষণ পর্য্যন্ত হীনসংস্কারাচ্ছন্ন শিষ্যের মনে উন্নত সংস্কারের জাগরণও অসম্ভব।

(৫)

গুরু দেখিবেন, শিষ্যের সর্ব্ববিষয়িণী পূর্ণতা হইতেছে কিনা। পরস্বাপহারী দস্যুবৃত্তিধারী নররাক্ষস সৃষ্টিও যেমন তাঁহার লক্ষ্য হইবে না, তেমনি আবার কম্বলকৌপীনধারী বৃথাতীর্থচারী বৈরাগীর দল গড়াও তাঁহার লক্ষ্য হইতে পারে না। মাথাটা যেখানে বড় হইবে, হৃদয়টাও সেখানে উদার হওয়া

চাই। একদেশদর্শিতা গুরুত্ব-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ শক্তি। সর্ব্বদর্শিত্ব, সমদর্শিত্ব এবং সম্যগ দর্শিত্বই সদ্‌গুরুর লক্ষণ।

(৬)

শক্তি অর্জ্জন শিষ্যকেই করিতে হয়, গুরু খাইলে শিষ্যের পেট ভরে না। গুরু যে সুখাদ্য খাইয়াছেন, তাহার প্রতি শিষ্যের মনকে তিনি আকৃষ্ট করিতে পারেন, এমন কি তাহা শিষ্যের মুখে পর্য্যন্ত তুলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু চিবাইবার ভার, গলাধঃকরণ করিবার ভার শিষ্যের। শক্তি-অর্জ্জনের পথ অজ্ঞাত-পদ্ধতি শিষ্যকে বলিবার অধিকার গুরুর এবং অর্জ্জিত শক্তি তামসিকতার প্রভাব বশতঃ আসুরিকী প্রকৃতি ধারণ করিয়া পরের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া আত্মেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির লালসার আগুনে ইন্ধন না যোগাইয়া যাহাতে ত্যাগের মধ্য দিয়া, সর্ব্বভূতের কল্যাণার্থে আত্মবিসর্জ্জনের মধ্য দিয়া নিজ সার্থকতা সম্পাদন করে, তাহার প্রেরণা যোগাইবার সামর্থ্যও গুরুর। শিষ্যের সাধারণ যুক্তিতে যে কল্যাণ-পথ ধরা পড়িবে না, নিজ অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির বলে তাহা দর্শন করিয়া তদনুসারে শিষ্যকে পরিচালনের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব গুরুর। সাধারণ চক্ষে বা সাধারণ যুক্তি-বিচারে কিছু ধরিতে পারে না বলিয়াই যে সে বস্তুটী নাই—এমত প্রমাণ হয় না। যেখানে বস্তু আছে কিন্তু দেখিতে পাও না, সত্য আছে কিন্তু ধরিতে পার না, গুরুর কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র, দায়িত্বের ক্ষেত্র, পরিশ্রমের ক্ষেত্র, সেবার ক্ষেত্র সেইখানে।

(৭)

গুরুর কাছ হইতে যে উৎসাহ, যে উদ্দীপনা ও যে প্রেরণা পাইয়াছ, তাহাকে বিশ্বজগতে ছড়াইয়া দিবার নাম গুরু-দক্ষিণা দান। যত স্বার্থত্যাগ তিনি তোমার জন্য করিয়াছেন, জগতের জন্য তোমাকে ততখানি স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। তোমাকে তিনি যতখানি ভালবাসিয়াছেন, জগৎকে ততখানি ভালবাসিতে হইবে। যতখানি তিনি তোমার জন্য কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন, জগতের জন্য তোমাকে ততখানি কাঁদিতে হইবে। তবেই গুরু-দক্ষিণা দেওয়া হইল। গুরু-দক্ষিণা দেওয়া সহজ কথা নয়, ঋষি-ঋণ অর্থ দিয়া পরিশোধ হয় না।

(৮)

গুরু কে ? স্বার্থ-সেবায় সাময়িক সুখ অপেক্ষা ধর্ম্মার্থে সর্ব্বস্ব ত্যাগের আনন্দকে যিনি অধিকতর কাম্য বলিয়া শিষ্যের মনের উপরে চিহ্ন আঁকিয়া দিতে পারেন। গুরু কে ? যাঁহার সংস্পর্শে আসিলে আত্ম-সুখের তৃষ্ণা লজ্জায় মাথা লুকায়, ভোগ-লিপ্সা পলাইয়া প্রাণ বাঁচায়। তিনিই গুরু, যিনি ছোটকে করেন বড়, আর, বড়কে করেন বৃহত্তর, যিনি শিষ্যকে প্রেমের শাসনের অধীন করেন এবং কামের বন্ধন, মোহের বন্ধন ও মিথ্যার বন্ধন হইতে মুক্ত করেন। তিনিই গুরু, যিনি পরাধীনতার লৌহ-শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া দেন। তিনিই গুরু, যিনি সমষ্টিগত সমাজের কল্যাণকে পরাহত না করিতে ব্যষ্টি-

মানবের জীবনের উন্নত মহিমাকে প্রস্ফুটিত করিতে পারেন এবং ব্যষ্টি-মানবের বিকাশের মহিমাকে খর্ব্ব না করিয়া সমষ্টির মঙ্গলকে দ্রুতগতিশীল করিতে পারেন। এক কথায় তিনি গুরু, যিনি একটি শিষ্যের সেবা করিয়াই সমগ্র জগতের সেবা করিতে পারেন।

(৯)

শিষ্যের মন প্রবৃত্তির পথে ধাইয়া চলিয়াছে, গুরু কি তাহাকে জোর করিয়া নিবৃত্তির পথে টানিয়া আনিবেন? সে চায় স্বেচ্ছাচার করিতে, চায় উচ্ছৃঙ্খল হইতে,—গুরু কি তখন যুক্তির জাল রচিয়া, নিষেধের দেয়াল গাঁথিয়া তাহাকে আটকাইবেন? নিশ্চয়ই না। কেন না, তাহা হইলে উপায়টা হইবে কৃত্রিম, সুতরাং ক্ষণ-ভঙ্গুর। স্বভাবেরই শক্তিতে যাহাতে শিষ্যের মন সংযমের পথে, সন্নীতির পথে, সদাচারের পথে ফিরিয়া আসে, আদেশ-নিষেধের মুখ চাহিয়া নয়, পরন্তু, নিজ স্বাধীন ইচ্ছায়, স্বাধীন রুচিতে, স্বাধীন বুদ্ধিতে যাহাতে তাহার মন মঙ্গলের দিকে আবর্ত্তিত হয়, শুধু সেই ব্যবস্থাটুকুই করিবেন গুরু। নিষেধ করিতে শিখিলেই গুরু হয় না, আদেশ করিতে পারিলেই গুরু হয় না, শিষ্যের জীবনকে সর্ব্ববিধ অস্বাভাবিকতার উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিয়া নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার মধ্য দিয়া তাহার প্রস্ফুটন সম্পাদনই গুরুর কাজ। এ কাজ সহজ নহে। এই জন্যই গুরু সবাই হইতে পারে না, অতি অল্পসংখ্যক লোকেই জগতে যথার্থ গুরুর জগৎপূজ্য স্থান অধিকার করেন।

(১০)

গুরু শিষ্যের অধীন। কি ভাবে অধীন? শিষ্যের ভক্তির অধীন, শ্রদ্ধার অধীন, প্রেমের অধীন। শিষ্যের কল্যাণের অধীন, পূর্ণতার অধীন, মুক্তির অধীন। কিন্তু, যদি তিনি হন শিষ্যের অর্থের অধীন, শিষ্যের প্রদত্ত অন্নবস্ত্রের অধীন বা তাহার শাসন বা রক্তচক্ষুর অধীন, তবে আর তাঁহাতে গুরুর ধর্ম্ম কিছুই থাকিতে পারে না। তখন তিনি নামেই গুরু, কিন্তু শিষ্যের জীবনকে মনুষ্যত্বের পথে পরিচালিত করিতে তিনি অক্ষম। কেন না, যে পরাধীন, সে না পারে নিজেকে কল্যাণবন্ত করিতে, না পারে অপরের কল্যাণ সাধন করিতে।

(১১)

জীবনের সীমাবদ্ধ আদর্শ লইয়া পথ চলিতে গিয়া যাহারা নিজদিগকে করিয়া ফেলে সসীম এবং নিজেদের চরণ-গতিকে করে শৃঙ্খলিত, তাহাদিগকে জীবনের অসীম আদর্শের প্রতি টানিয়া আনাই গুরুর কর্ত্তব্য। পরম্পরাগত জীবন-ধারাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টা তিনি অনেক সময়ই করেন না পরন্তু নির্জীব প্রাণের মধ্যেও এমন বিদ্যুতের তিনি সঞ্চার করিয়া দেন, যাহাতে জীর্ণ অট্টালিকার ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতেই অভ্রভেদী বিশ্বেশ্বর-মন্দির গড়িয়া উঠে। এই জন্যই সংযমেচ্ছুরও তিনি গুরু, ভোগী-বিলাসীরও তিনি গুরু, পতিব্রতারও তিনি গুরু, কুলত্যাগিনীরও তিনি গুরু, মানুষেরও

তিনি গুরু, অমানুষেরও তিনি গুরু, পরার্থকারীরও তিনি গুরু, আত্ম-সুখ-লুব্ধেরও তিনি গুরু। নিজ নিজ স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যেকেই তাঁহার নিকট হইতে পূর্ণতা লাভের পথ পায় বলিয়াই তিনি সকলের গুরু।

(১২)

ভোটের জোরে কাহারও 'গুরুত্ব' প্রতিষ্ঠিত হয় না, শুধু গুরু-ধর্ম্মের প্রভাবেই ইহা নির্দ্ধারিত হয়। গুরুর অধিকারের সীমা কোথায়, গুরুর কর্ম্মের রীতি কি হইবে, জনসাধারণের ইচ্ছায় তাহা নির্ণীত হইতে পারে না। যে বিশ্বজনীনতা সামান্য মানবকে গুরুর অসামান্য পদবী দান করিয়াছে, তাহারই নির্দ্দেশ গুরুর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। শিষ্যের তামসিকী প্রকৃতি যাহাতে রাজসিকতার রথে আরোহণ করিয়া উন্নীতা ও দ্রুতবিকাশ-ক্ষমা হইতে পারে, শিষ্যের রাজসিকী প্রকৃতি যাহাতে সাত্ত্বিকতার বিমানপোতে আরোহণ করিয়া অনন্ত-ঊর্দ্ধগামিনী ও স্বচ্ছন্দ-গতিশীলা হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াই তিনি মুক্ত। কে তাঁহাকে গুরু মানিল, আর কে মানিল না, তাহা খুঁজিয়া দেখিবার তাঁহার প্রয়োজন নাই। সেবা করিয়াই তিনি কৃতার্থ, মহিমা ত' তিনি চাহেন না। জগতের সকলেও যদি তাঁহার বিরুদ্ধে ভোট দেয়, তথাপি তিনি গুরুই থাকিবেন।

(১৩)

অনেক শিষ্য গুরুদ্রোহী হয়। কেন হয়? শিষ্যের বুদ্ধি

ও প্রতিভা গুরুসঙ্গের দ্বারা স্বাধীন স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না বলিয়া। শিষ্যের চিন্তা ও কর্ম্ম সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী কাটিতে আরম্ভ করিয়া গুরুর শক্তিকে নিজ বিরোধে প্রযুক্ত দেখিতে পায় বলিয়া। আরও এক কারণে শিষ্য গুরুত্যাগী হয়। গুরু যাহা বলিয়াছেন, না বুঝিয়া গলাধঃকরণ করিয়া শিষ্য পরিশেষে যখন দেখে যে, উহা জীর্ণ করা কঠিন, তখন সে হয় গুরুর বিরুদ্ধে শস্ত্রপাণি। কখনও শিষ্য গুরুদ্রোহী হয় এই কারণে যে, যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও উন্নত চরিত্রবলের কাছে শিষ্য একদিন মাথা নত করিয়াছিল, আনুগত্য ও বশ্যতার সুযোগ পাইয়া তাহা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া সত্যের পরিবর্ত্তে করে অসত্যের সেবা, ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে করে ভোগ-বিলাসের পাদ-সংবাহন। গুরুদ্রোহ দেখিতে ভয় লাগে। কিন্তু, পরিণামে ইহা গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই মঙ্গলজনক হইয়া থাকে।

(১৪)

গুরু কহিলেন,—"ওহে শিষ্য, তুমি স্বাধীন।" এই কথার প্রকৃত অর্থ এই যে,—"হে শিষ্য, তুমি যে স্বাধীন, তাহা ত' আমি স্বীকার করিলামই, পরন্তু, তোমাকেও সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, যত ব্যক্তি তোমার সংস্পর্শে আসিবে, কাহারও যুক্তি-বিচারের স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করিবার তোমার যেন মন্দ বুদ্ধি না হয়।" শিষ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া গুরু তাহাকে শুধু স্বাধীনতাই দিলেন, তাহা নহে; পরন্তু অপরের স্বাধীনতাকে সম্মান করিতে বাধ্য করিলেন।

(১৫)

গুরু যখন ক্ষমতামদে মত্ত হইয়া প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হন, লোক-কল্যাণের পবিত্র ব্রত পরিহার করিয়া তুচ্ছ ঐহিক সুখ-সাধনে বিব্রত রহেন, তখন শিষ্য কাহার ভরসা করিবে ? সে তখন নিজের বাহুতে আস্থা স্থাপন করিতে এবং 'জয় ভগবান' বলিয়া গুরু বর্জ্জন করিবে। কেননা, গুরুর উচ্চ অধিকার শিষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলে জীবন দান ব্যতীত সার্থকতার মহিমায় ধন্য হয় না।

(১৬)

বিদ্রোহী শিষ্যকে বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ আছে বুঝিয়া যিনি উৎসাহিত করিতে পারেন, তিনিই গুরুর কর্ত্তব্য করেন। শিষ্য যেখানে অকারণে বা তুচ্ছ কারণে বিদ্রোহী, সেখানে যিনি সহিষ্ণু ভাবে কালপ্রতীক্ষা করিতে পারেন, তিনিই গুরুর কর্ত্তব্য করেন। শিষ্য যেখানে গুরুর উপস্থিতিকে জীবনের উন্নতির পক্ষে বিঘ্ন মনে করে, সেখানে যিনি আত্মবিলোপ সাধন করিতে পারেন, তিনিই গুরুর কর্ত্তব্য করেন। গুরুকে গুরু বলিয়া মানিলে যেখানে শিষ্যের অবনতির সম্ভাবনা বা অভ্যুদয়ের অসম্ভাবনা, সেখানে যিনি নিজের গুরু-গৌরব চাপিয়া রাখিয়া অপরিচিতের মত চলিতে পারেন, তিনিই গুরুর কর্ত্তব্য করেন।

(১৭)

একটি দিয়াশলাই দিয়া প্রদীপ ধরাইলে। দিয়াশলাই গুরু, প্রদীপ শিষ্য। প্রদীপে সলিতা ও তৈল না থাকিলে শত

দিয়াশলাই পুড়িলেও জ্বলিত না। এই হিসাবে শিষ্যই প্রধান, গুরু অপ্রধান। আবার দিয়াশলাই না হইলে শত সলিতা বা তৈল থাকিলেও আলো হইত না। এই হিসাবে গুরু প্রধান, শিষ্য অপ্রধান। যে দিয়াশলাইতে মশলা নাই, তাহা প্রদীপ ধরাইতে পারে না। যে দিয়াশলাইতে মশলা আছে, কিন্তু কাঠিটী ভাঙ্গা বা ছোট, তাহাতেও আগুন ধরাইতে বড় অসুবিধা। আবার যে প্রদীপে তৈল আছে সলিতা নাই, তাহা জ্বলে না, যে প্রদীপে সলিতা আছে, তৈল নাই, তাহাও জ্বলে না। একই দিয়াশলাই দিয়া শত শত প্রদীপ জ্বালাইয়াছ, কিন্তু যে প্রদীপের তৈল ভাল, সলিতা ভাল, তৈল বেশী, সলিতা মোটা ও লম্বা, তাহাই ভাল জ্বলে, বেশী জ্বলে। পরন্তু, যে প্রদীপের তৈল খারাপ, সলিতা খারাপ, তৈল কম, সলিতা ছোট বা সরু, তাহা জ্বলে খারাপ এবং জ্বলে অল্পক্ষণ। কোনও প্রদীপে তৈল ভাল, সলিতা মন্দ বা তৈল মন্দ, সলিতা ভাল— সে সবও ভাল জ্বলে না। এই জন্যই এক গুরুর শত শিষ্য শত প্রকারের হয়। কোন প্রদীপ জ্বালাইতে পাঁচটা দিয়াশলাই লাগে, কোনটাতে বা একটাতেই হয়। এইরূপ বৈচিত্র্য জগৎ ভরিয়াই রহিয়াছে। প্রদীপ যখন সলিতা ও তৈলে পূর্ণ হয়, তখন সে দিয়াশলাই খুঁজিয়া বেড়ায়; আবার দিয়াশলাইয়ের কাঠিতে যখন মশলা সংযুক্ত হয়, তখন সে প্রদীপ খুঁজিতে বাহির হয়। চিরকাল জগতে গুরু শিষ্যকে এবং শিষ্য গুরুকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে।

(১৮)

গুরু কি ঘাড়ের বোঝা, না কাঁধের ভূত? গুরু কি বেয়নেটের খোঁচা, না বর্গী দস্যুর শাণিত কৃপাণ?

(১৯)

শ্রীগুরু-নির্ভরে শ্রীনাম উজ্জ্বল,
শ্রীনাম-নির্ভরে বুকভরা বল।

এখানে শ্রীগুরু মানে ব্রহ্ম, শ্রীগুরু মানে উপাস্য দেবতা।

(২০)

মঙ্গলময় ভগবান্‌কে গুরু জানিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও। প্রপন্নের তিনি সর্ব্ব-কুশল স্বহস্তে সম্পাদন করিবেন। তাঁহাকেই ইহপরজীবনের সার-সর্ব্বস্ব জানিয়া নিজের সব-কিছু ঐ চরণে সমর্পণ করতঃ তাঁহাকে তোমার সর্ব্বেশ্বর বলিয়া স্বীকার কর। দেহে, মনে, প্রাণে, আত্মায়, কর্ম্মে, বাক্যে, চিন্তায়, অনুধ্যানে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকেই তোমার একমাত্র অবলম্বন-তরু জ্ঞান করতঃ লতাবৎ নিজেকে অবিরাম তাঁহারই আশ্রয়ে অনন্ত ঊর্দ্ধাকাশ জুড়িয়া বিস্তারিত কর। জীবন ধন্য হউক, জন্ম সার্থক হউক।

(১১ই মাঘ, ১৩৩৪)*

---

* (১৩৩৪ সালের ৮ই মাঘ তারিখ হইতে ২৫শে মাঘ তারিখ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসজী মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন। সেই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র তাঁহাকে "গুরুবাদ"

গুরু কে ?

গুরু কে ? ব্রহ্মই গুরু। জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সেই গুরুর প্রকাশ বা বিভূতি। সর্ব্বভূতে তিনি বিরাজমান, সর্ব্বত্র তাঁর গতি ও স্থিতি। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে তিনিই আমাদের প্রাণ রক্ষা করেন, জলরূপে তৃষ্ণা নিবারণ করেন, আহার্য্যরূপে ক্ষুধাগ্নি নির্ব্বাপিত করেন। তিনি অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু দৃষ্টির দৈন্য-দোষে আমরা মানুষকে গুরু ব'লে গ্রহণ করি এবং ব্রহ্মের প্রাপ্য পূজা মানুষকে দান করি। যার ভক্তি হয়, সে মানুষকেই গুরু ব'লে মানুক, গুরু ব'লে পূজা করুক ; যদি অকপটতা থাকে, তবে তাতেই তার পরম মোক্ষের দ্বার খুলে যাবে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট একটী মানুষকে গায়ের জোরে ব্রহ্ম ব'লে ধারণা কত্তে চেষ্টা করা প্রকৃত ব্রহ্মবাদের বিরোধী। জগদ্‌গুরুর প্রকাশই সর্ব্ব-ভূতে ; সুতরাং মানুষও গুরু, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একমাত্র মানুষটীই গুরু নন, সর্ব্বভূত তোমার গুরু, সর্ব্বভূতাত্মা তোমার গুরু। হে নবভারতের নূতন শিষ্য, সেই পরম গুরুর সাক্ষাৎ কৃপা-লাভের জন্য আজ জাগ্রত হও, – বল,—"ওয়া গুরুজীকি ফতে", বল,—"জয় গুরু শ্রীগুরু"। আজ তোমরা সর্ব্বপ্রকার

সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমৎ আচার্য্যপ্রবর যে সকল উপদেশ লিখিত ভাবে প্রদান করেন, তাহা একটীর পর একটী সাজাইয়াই এই নিবন্ধ হইয়াছে। দুঃখের বিষয় ১১ই মাঘ তারিখ ব্যতীত অন্য দিনের উপদেশগুলি রক্ষিত হইতে পারে নাই।)

সাম্প্রদায়িকতার হীন পরিবন্ধন হ'তে মুক্ত হও, আজ তোমরা বজ্রকণ্ঠে বল্‌তে শিখ,—সত্যই তোমাদের গুরু। সত্যকে আশ্রয় কর, সত্যের জয়-জয়কার তোমাদের দ্বারা ঘোষিত হোক। মানুষ গুরুকে মান্‌বেই না তা' নয়। সত্যদ্রষ্টাকে মান্‌বে। যাঁর কাছে নতি স্বীকার কর্লে তোমার স্বাধীনতার শক্তি ক্ষুণ্ণ হয় না, যাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর্লে আত্মশক্তির জাগরণ ঘটে, তাঁকেই মান্‌বে। তোমার প্রাণ-মন মথিত ক'রে স্বাধীনতার বজ্র-ঝঙ্কার যিনি তুল্‌তে পারবেন, যাঁর গভীর অভয়-হুঙ্কারে লক্ষ যুগের লৌহ-শৃঙ্খল চূর্ণ হ'য়ে খ'সে পড়ে যাবে, তাঁকে মান্‌বে। মান্‌বে কাকে? যাঁকে মান্‌লে চিত্ত আত্মনিষ্ঠ হয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়, সত্যনিষ্ঠ হয়। (২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫)

গুরুবাদ ও নারী-ধর্ম্ম

গুরুতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ সর্ব্বশাস্ত্রের বিধান। আবার নিজের নারী-মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখা নারী-ধর্ম্মের বিধান। যদি এই দুই ব্রতের মধ্যে কখনও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তা হ'লে নারীর কর্ত্তব্য কি?

নারী সর্ব্বাগ্রে তার নারী-ধর্ম্মকে বজায় রাখ্‌বে। কেন না, সতীত্ব না থাকলে কাহারও শিষ্যত্ব সত্য হয় না। আরও একটী কথা মনে রাখ্‌তে হবে যে, গুরুতে সর্ব্বস্ব-সমর্পণের মানে এই নয় যে, গুরুর ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণের জন্য নিজেকে ব্যবহার কর্ত্তে হবে। গুরুতে সর্ব্বস্ব-সমর্পণের মানে গুরুপাদপদ্মে সকল স্বার্থ-

বুদ্ধি বিসর্জ্জন দেওয়া, গুরুকে অহেতুক কৃপা-সিন্ধু জেনে তাঁর আদেশ পালনের জন্য মরণ পণ করা, ভগবানকে লাভ করার জন্য তিনি যে সুপবিত্র পন্থা নির্দ্দেশ ক'রে দেবেন, তা দৃঢ়তা-সহকারে আঁকড়ে ধ'রে থাকা। গুরু যে সাধন দান করেছেন, তার উপরে পূর্ণ নির্ভরেরই নাম গুরুতে আত্ম-সমর্পণ।

ভক্তেরা কোথায় গোল বাঁধিয়েছেন, জানেন? অনেক ভক্তই মনে ক'রে থাকেন, গুরু একটা মাংসপিণ্ড, ক্ষুধা-তৃষ্ণাদির আধার ও প্রবৃত্তিনিচয়ের ক্রীড়নক একটা মানুষ। গুরুকে মানুষ ভাব্‌তে গিয়েই মানুষের যার যা প্রবৃত্তি, তার দিক থেকেই গুরু-সেবার চেষ্টা হয়েছে। কেউ গুরু-সেবা করেছেন অর্থ দিয়ে, কেউ আহার্য্য দিয়ে, কেউ বা দেহ দিয়ে। কিন্তু এতে গুরুর সেবা হয় নি আদবেই। গুরুর যে প্রকৃত সেবা, তা' হয় শুধু সাধনের একনিষ্ঠা দিয়ে। অন্য কোনও বস্তুই গুরুসেবার জন্য অপরিহার্য্য নয়।

আমি এ কথা বল্‌ছি না যে, কোনও শিষ্য গুরুকে অর্থ-দান, অন্ন-দান বা ভূমি-দান কর্লে অপরাধী হয়। আমার এত কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ দৈহিক বা মানসিক ভাবে স্থাপিত হ'লে উভয়ের গুরুত্ব ও শিষ্যত্ব গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, একের জন্য অপরের যে স্বাভাবিক কল্যাণ-কারিণী শক্তি, তা অচেতন হ'য়ে পড়ে।

(১৩ই আষাঢ়, ১৩৩৫)

গুরু-ভক্তির লক্ষণ

প্রত্যেক বস্তুই তার লক্ষণ দিয়ে চেনা যায়। যেমন স্বর্ণ তার ওজন আর ঔজ্জ্বল্য দিয়ে, হীরক তার স্বচ্ছতা ও কাচ কাটবার ক্ষমতা দিয়ে, আর চন্দন তার স্নিগ্ধকারকতা ও সুগন্ধ দিয়ে চেনা যায়। গুরু-ভক্তির এইরকম কতকগুলি লক্ষণ আছে। প্রাণ দিয়ে গুরুকে ভালবাসাই গুরু-ভক্তির প্রথম লক্ষণ. "জয়-গুরু—জয় গুরু" ব'লে তুমি গগন-বিদারী উচ্চ চীৎকার কর, কি না কর, তাতে ভক্তির কিছু আসে যায় না। গুরুকে শিবাবতার, কৃষ্ণাবতার বা রামাবতার ব'লে পথে পথে জয়ঢাক পিটিয়ে হয়ত তুমি যাচ্ছ, কিন্তু গুরুর একটি তুচ্ছ আদেশকেও নিজ জীবনে প্রস্ফুটিত ক'রে তুলতে পার নাই। কে বলে তুমি গুরুভক্ত?

গুরু-বাক্য-পালনে শিষ্যের অক্ষমতা

অবশ্য. কোন শিষ্যেরই এত শক্তি থাকে না যে, গুরুবাক্য যথার্থ ই পালন ক'রে উঠতে পারে। কিন্তু তার জন্য তুমি দোষ-ভাগী হবে না। তোমার চাই গুরুবাক্য পালনের অকপট ইচ্ছা। গুরুর আদেশ প্রতিপালনের জন্য যার চেষ্টা আছে, সে যদি কার্য্যতঃ সফল নাও হয়, তবু সে সফলতারই যোগ্য পুরস্কার আহরণ করে।

গুরুতে আনুগত্য ও কুল-কুণ্ডলিনী

গুরুর আদেশ পালনের মত অনুগত মনোভাব আসামাত্র সাধনে আপনা আপনি রুচি বেড়ে যায়; এ এক আশ্চর্য্য

রহস্য। সাধনে রুচি বাড়াবার পক্ষে এমন কৌশল আর কিছু নেই। তার সঙ্গে সঙ্গে যদি সাধনে উদ্যম প্রযুক্ত হয়, তবে ত সোণায় সোহাগা। কিছুদিন যেতে না যেতেই অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস-মুখ খুলে যায়। দেহে মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও প্রেমাবেশের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় এক এক আধারের বিশেষত্ব অনুযায়ী এক এক প্রকারের অনুভূতি বা উপলব্ধির আমেজ আসতে থাকে। একেই যোগীরা কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ব'লে থাকেন। কুল-কুণ্ডলিনী নিয়ে শত শত জনে নানা ধোঁয়াটে ব্যাখ্যা করেছেন, যা শেষ পর্য্যন্ত কতকগুলি শব্দেরই সমষ্টি থেকে যায়, অর্থের বাহক হয় না। সেই শব্দের জঙ্গলে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে অনেকে অসহায় পথিকের মতন উদ্বিগ্ন হয়। কিন্তু চারিদিকে বৃথা তাকিয়ে মনকে বৃথা কৌতূহলী না ক'রে অকপট আনুগত্য নিয়ে গুরুদত্ত সাধনে লেগেই যদি কেউ থাকে, তবে শাস্ত্রের গহন অরণ্য আর কুজ্‌ঝটিকা ভেদ করার চেষ্টা না ক'রেও সাধকের অন্তর্নিহিত শক্তি জেগে ওঠে। তখন রক্তমাংসের মানুষটা দেবতায় পরিণত হয়, প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেমে যায়, স্নিগ্ধ সন্তোষে প্রাণমন পূর্ণ হ'য়ে যায়। (১৯শে আষাঢ়, ১৩৩৫)

সদ্‌গুরুর সন্ধান

এ জগতে সে-ই ধন্য, যে সদ্‌গুরুর সন্ধানে নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে।

কিন্তু বাছা, একজনের পর এক জন করিয়া নব-নব দীক্ষা-দাতা গুরুর পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইবার নামই সদ্গুরুর অনুসন্ধান নহে। নিজের প্রকৃত পরিচয় ও সন্ধান লাভের নামই সদ্গুরুর সন্ধান। তুমি কে, ইহা চিনিবার নামই সদ্গুরুর সাক্ষাৎ লাভ করা।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকেরই এই এক বদ্ধমূল ধারণা যে, দীক্ষা না হইলে ভগবদ্দর্শন হয় না। বলা প্রয়োজন যে, এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমহীন নহে। দীক্ষা লওয়া বা না লওয়ার উপরে ভগবদ্দর্শন লাভ করা বা না-করা ততটা নির্ভর করে না, যতটা করে তোমার সাধনের নিষ্ঠা ও প্রাণের ভক্তির উপর। ভক্তিতেই ভগবান্ বিগ্রহ ধরিয়া তোমার নয়ন-সমক্ষে চারু-চঞ্চল চরণে আসিয়া আবির্ভূত হইবেন, প্রেমেরই টানে তিনি রসস্বরূপ হইয়া তোমার হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া জীবন জুড়াইবেন।

তুমি যে গুরুর পর গুরু পরিবর্ত্তিত করিয়াছ, আর প্রণালীর পর প্রণালী ধরিয়া সাধন-পথে শুধু ব্যর্থতাই চয়ন করিয়াছ, তাহার কারণ এই বদ্ধমূল দীক্ষাবাদ। কিন্তু পরীক্ষায় ত' প্রমাণিত হইল যে, দীক্ষা লইলেই ভগবানকে মিলে না, ভগবানকে পাইবার জন্য আরও কিছু চাই। প্রত্যক্ষ ত' দর্শন করিলে যে, মানুষের কাছে মাথা নত করা আর না-করার

পার্থক্য অতি অল্পই আছে, যদি না নিজের ভিতরের কুণ্ডলিনী-শক্তি হুহুঙ্কারে জাগ্রত হইয়া উঠে।

তাই আজ তোমার পক্ষে প্রয়োজন হইতেছে গুরুকরণের আবশ্যকতাকে অস্বীকার করা। তোমাকে আজ বজ্রকণ্ঠে বলিতে হইবে,—গুরুর কোনও আবশ্যকতা নাই, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে আর একজন তীর্থের পাণ্ডা বা কমিশনী দালালের দরকার নাই। তোমাকে আজ জানিতে হইবে, প্রত্যক্ষভাবে, সরাসরি-ভাবে, অবিচ্ছেদ্যভাবেই তোমার সাথে আর তোমার পরমোপাস্য পরমব্রহ্মের সাথে যোগ, এই যোগের সূত্র হইবার স্পর্দ্ধা করিবার ন্যায্য দাবী অপর কোনও মানব বা মানবী, দেবতা বা দেবীর নাই।—অর্থাৎ তোমাকে গুরুবাদের বিদ্রোহী হইতে হইবে।

সকলের পক্ষে গুরুবাদের বিদ্রোহ করিতে হইবে, তাহা বলি না। অনেকের পক্ষে গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে, অনেকের পক্ষে গুরুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিবার প্রবৃত্তিও সত্য-সঙ্গতই হইবে। কিন্তু ঘটনার আবর্ত্তন তোমাকে তাহাদের শ্রেণী হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। চক্ষের উপর তুমি দেখিয়াছ, কুল-গুরুর প্রদত্ত দীক্ষা তোমার জীবনে কার্য্যকরী হইল না। স্পষ্টরূপে তুমি অনুভব করিয়াছ, তোমার দ্বিতীয় গুরুর সাংসারিকতার দৃষ্টান্ত তোমার চিত্ত ও

মনকে উন্নয়নের পথে টানিয়া নিতে পারিল না। মর্ম্মে মর্ম্মে তুমি অনুভব করিয়াছ, প্রলোভন-প্রেরিত হইয়া যে পরমহংস-নামধেয় গুরুর শরণাপন্ন হইয়াছিলে, তাঁহার 'ভেল্‌কি ও বুজরুকী', তাঁহার 'শঠতা' তোমার জীবন-তরীকে ভব-সমুদ্রের একটি তরঙ্গাভিঘাত সহিবারও শক্তি দিতে পারিল না, তাঁহার উপদেশ তোমার জীবনে কার্য্যকর হইল না। তবে কেন আর নূতন করিয়া মানুষ-গুরুর কাছে মাথা নত করিতে চাহিতেছ ভাই? আমি বলি, তুমি একটু শক্ত হও এবং গুরুবাদের প্রতি তোমার অপরিসীম আনুগত্য এতদিন ধরিয়া শুধু পরিপুষ্ট পর-গাছার মত বাড়িয়াই চলিতেছিল, তাহাকে ডালে-মূলে উৎপাটন কর। প্রাণে এক নূতন বিশ্বাস জাগাইয়া তোল যে, নিজের বলেই মানুষ সদ্‌গুরুর সন্ধান করিতে পারে, স্বাধীন-ভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠভাবে কার্য্য করিবার শক্তি পরমাত্মাই তাঁহাকে দিয়া রাখিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন গুরু ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র ও সাধন দিয়া তোমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এখন তুমি একযোগে সকল মন্ত্র ও সকল সাধন পরিত্যাগ কর এবং একমাত্র 'সদ্‌গুরু' এই নাম-যোগে পরমাত্মার উপাসনা করিতে থাক। ইহাই তোমার পক্ষে পন্থা। এই পন্থাই তোমাকে সত্যে নিয়া পেঁৗছাইবে। * * * সদ্‌গুরুসেবা করিবার জন্য কোনও তীর্থে বা আশ্রমে যাইবার প্রয়োজন নাই। সদ্‌গুরু দীন, দুঃখী, আর্ত্ত ও ব্যথিতের মধ্যে আজ যে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ

করিয়াছেন, তাহার যদি পূজা করিতে পার, তবেই সদ্‌গুরুর পূজা হইবে। * (২০শে আষাঢ়, ১৩৩৫)

গুরুর অনুকরণ

অনেক শিষ্য গুরুর অনুকরণ ক'রে অসত্যাচরণ করে। চির কালের সংযমী গুরু একদিন হয়ত অসংযমী হ'য়ে পড়েছিলেন, সেই নজিরে নিজেও অসংযত হয়। চিরকালের ত্যাগী গুরু একদিন হয়ত ভোগসুখাসক্ত হ'য়েছিলেন, তারই দোহাই দিয়ে নিজের ভোগের পথ প্রশস্ত ক'রে নিতে চেষ্টা করে। এটা কিন্তু যথার্থ শিষ্যের লক্ষণ নয়। প্রকৃত শিষ্য গুরুর জীবনের অনিচ্ছাকৃত বা ভ্রম-প্রমাদ-প্রেরিত পদস্খলনগুলিকে নিজের পথ-প্রদর্শনের স্তম্ভ ব'লে মনে করেন না,—ঐগুলিকে তিনি বর্জ্জন করেন। শিষ্যকে হ'তে হবে গুরুর চাইতে অধিকতর

* পরবর্ত্তী কোনও সময়ে শ্রীশ্রীবাবামণি এই পত্রখানার অনুলিপি পাঠ করিতেছিলেন। পাঠান্তে বহুগুরুর শিষ্যের দুর্গতির কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। তাহা নিম্নে লিখিত হইল,—

(১) তোমার জলের প্রয়োজন, কূপ খুঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছ। চল্লিশ হাত খুঁড়িলে হয়ত জল পাইবে কিন্তু পনর হাত খুঁড়িবার পরই স্থানান্তরে অন্বেষণে গেলে। পুনরায় সেখানে বিশহাত খুঁড়িলে, জল মিলিল না, আবার গেলে আর এক স্থানে। গুরুর পর গুরু, সাধনের পর সাধন যাহারা পরিবর্ত্তন করে, এইভাবে তাহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয় অত্যধিক, কিন্তু জল পায় না তাহারা এক কণাও। কিন্তু আমাদের এই পুপুন্‌কীর কূয়ার মতন অনেক খুঁড়িয়াও যার জল মিলে

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, অধিকতর পবিত্রচেতা, অধিকতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তবেই না শিষ্য নাম ধরা সার্থক হ'ল। প্রত্যেক শিষ্যকে এই সঙ্কল্প কত্তে হবে যে, গুরুর জীবনের অনুকরণ করাই তার চরম কর্ত্তব্য নয়, গুরুর পবিত্র জীবনকে ভিত্তি ক'রে নিজের জীবনটাকে আরও উন্নত, আরও বিশাল ক'রে গড়ে তোলাই তার উদ্দেশ্য। শিষ্য গুরুর উপর কেন নির্ভর কর্ব্বে ? গুরুর

না, অন্যত্র কূপ খুঁড়িবার সহস্র উপদেশ-দাতার প্রাণ-পণ চেষ্টা সত্ত্বেও (এমন কি "গোঁয়ার-গোবিন্দ" আখ্যা পাইয়াও), যাহারা জিদ্ ছাড়ে না, কঠিনতম প্রস্তর ভেদ করিয়া হইলেও এইরকম সুস্বাদু জল তাহারা পায়।

(২) তুমি কৃষক, উৎকৃষ্টভাবে জমি তৈয়ারীর পর একজনের কাছ হইতে ঢেঁড়শের বীজ আনিয়া বপন করিলে। কিন্তু বীজ অঙ্কুরিত হইতে না-হইতেই পুনরায় আর একজনের নিকট হইতে বীজ আনিয়া ক্ষেত্রময় অড়হর বুনিয়া দিলে। কিন্তু তাহারও গাছ গজাইবার সবুর সহিল না,—পুনরায় আর একজনের নিকট হইতে বীজ-সংগ্রহ করিয়া এক ধার হইতে সোনামুগের বীজ ছড়াইয়া গেলে। এদিকে কৃষির ঋতু চলিয়া গেল, মেঘ-বর্ষণের অভাব ঘটিল, অনুকূল আবহাওয়া পরিবর্ত্তিত হইল।—এ ভাবে যাহারা আবাদ করে, সেই চাষাকে ভিক্ষা-পাত্র হস্তে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া মরিতে হয়।

(৩) সঙ্গীত শিখিতে আসিয়া পাঁচদিন বেহালা বাজাইয়াই ধরিলে সেতার, সাতদিন সেতার অভ্যাস করিয়াই ধরিলে স্বরদ, স্বরদে হাত বসিল না দেখিয়া দুই চারি দিন যাইতে না-যাইতেই ধরিলে সানাই, এক সপ্তাহকাল সানাই ফুঁকিয়া গলা ব্যথা হইল, অমনি ধরিলে জল-তরঙ্গ, দু'দিন পর উহাতেও অরুচি ঘটিল, ধরিলে কণ্ঠ-সঙ্গীত। এই-ভাবে যাহারা সঙ্গীত শিখে, জন্মেও তাহারা কিছু শিখিতে পারে না। নিত্যনূতন সাধন-পরিবর্ত্তনকারীর এইরূপ অবস্থা।

চাইতে মনুষ্যত্বে ও মহত্ত্বে ছোট থাকবার জন্যে কি? না, তা' নয়। গুরুর মহত্ত্বের সাহায্য নিয়ে তাকে মহত্তর হ'তে হবে, তাই তার গুরু-স্বীকৃতি, নতুবা গুরুকরণের কোনও যথার্থ উপযোগিতাই থাকতে পারে না। পুত্রকে হ'তে হবে পিতার চাইতে মহান্, তবেই না জন্ম-গ্রহণের সার্থকতা। পিতার অঙ্গে যদি শ্বেতী রোগের দাগ থাকে, পুত্রকে কি তা'হ'লে সেই কদর্য্য রোগটাকে নিজ দেহেও শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হ'তে দিতে হবে? নিশ্চয়ই পুত্রকে চেষ্টা কর্ত্তে হবে, যেন পিতার দোষ থেকে, পিতার ব্যাধি থেকে, পিতার গ্লানি থেকে পুত্র সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হ'তে পারে। এইখানেই পুত্রের পুত্রত্ব এবং যথার্থ পুরুষকার। (২১শে আষাঢ়, ১৩৩৫)

(৪) আম বাগানে ঢুকিয়াছ, আম খাইবে। একটা গাছে দু'হাত না উঠিয়াই ভাবিলে অপর গাছের আম খুব মিষ্টি। সেই গাছটায় আবার তিন হাত না-উঠিতেই ভাবিলে তৃতীয় গাছটার আম বেশী বড়। আমবাগানে ঢুকিয়া মুহুর্মুহু এইরূপ চিত্ত-পরিবর্ত্তন যাহার হয়, সে অমৃতরস আস্বাদনের অনেক পূর্ব্বেই ডাল ভাঙ্গিয়া মরে।

(৫) কলিকাতা হইতে পুপুন্‌কী আসিবার জন্য পুরুলিয়া প্যাসেঞ্জারে চাপিয়া খড়্গপুর আসিয়াই যে ভাবে যে, বি, এন্, আর এর গাড়ীগুলি নিতান্ত সেকেলে, অতএব ই, আই, আর এর গাড়ীতে যাইব, এবং এইরূপ মনে করিয়া ধানবাদ দিয়া আসিবার জন্য গয়া-প্যাসেঞ্জারে চাপে, তার মুহুর্মুহু মত-পরিবর্ত্তনের দরুণ আজ পাটনা, কাল ভাগলপুর, পরশু দ্বারভাঙ্গা যাওয়াই হয়, পুপুন্‌কী পৌঁছান যায় না।

দীক্ষা-প্রার্থীর প্রতি

দীক্ষা ত' বাবা দিলেই হইল না। দীক্ষা পাইবার জন্য সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা যার জাগ্রত হইয়াছে, দীক্ষা একমাত্র তারই হওয়া উচিত। কাল-প্রতীক্ষায় যার সহিষ্ণুতার প্রমাণ হয়, মানুষ তাহাকে দীক্ষা না দিলেও ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া তাহাকে দীক্ষা দিয়া যান। দীক্ষার জন্য জগদ্গুরু ভগবানের পায়ে ব্যাকুলতা জানাও, মানুষ-গুরু ত' বাবা তাঁর দাসানুদাস! (২৮শে আষাঢ়, ১৩৩৫)

গুরুর ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্ব ও শিবত্ব

গুরু-গীতায় আছে,—গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেব-মহেশ্বরঃ। মানুষ মাত্রেরই মধ্যে যে সকল সদ্গুণ থাকা আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়, তার মধ্যে যেগুলি শিষ্যের মধ্যে নেই, আচার্য্যকে সেগুলি নিজের শিক্ষার শক্তি দিয়ে সৃষ্টি ক'রে নিতে হবে। এখানে তিনি হচ্ছেন ব্রহ্মা। শিষ্যের ভিতরে যে সকল সদ্গুণ বিশেষভাবে স্ফুটনোন্মুখ, সেই সকল বিশিষ্ট গুণগুলিকে শিক্ষার শক্তিতে পরিপুষ্ট এবং পূর্ণ-বিকশিত কর্ত্তে হবে, এই সদ্গুণগুলি যাতে বিরুদ্ধ চিন্তার অপঘাত পেয়ে অকালমৃত্যুকে না বরণ করে, দিন দিন যাতে অনুকূল চিন্তা, চর্চ্চা ও চেষ্টার সংস্পর্শ পেয়ে ক্রম-বিবর্দ্ধমান হ'তে পারে, আচার্য্যকে তার জন্য নিজের শক্তি-সামর্থ্য সুকৌশলে প্রয়োগ কর্ত্তে হবে। এখানে তিনি হচ্ছেন বিষ্ণু। শিষ্যের মধ্যে যে

সকল অসদ্‌গুণ আছে, যেগুলির বিকাশ ঘট্‌লে শিষ্যের নিজেরও ক্ষতি, সমাজেরও ক্ষতি, যেগুলির অস্তিত্ব শিষ্যের পূর্ণতার বিঘ্ন, যেগুলি শিষ্যের মনুষ্যত্বের শত্রু, সেইগুলিকে ধ্বংসও কত্তে হবে আচার্য্যকে। এখানে তিনি হচ্ছেন ত্রিশূল-ডমরুধারী সদাশিব। যিনি একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ আচার্য্য। (২৯শে আষাঢ়, ১৩৩৫)

গুরু-পূজা

গুরু-পূজার কথা লিখিয়াছ। বাস্তবিকই গুরু-পূজা আত্মোন্নতির মূলস্বরূপ। কিন্তু গুরুদেবের প্রতিমূর্ত্তি পুষ্পাদির অঞ্জলি দ্বারা অর্চ্চনা বা ধূপ-ধুনা কর্পূরাদির দ্বারা আরতিই কি একমাত্র গুরু-পূজা? গুরুদেবের চরণ-বন্দনা, পাদসংবাহন, অন্ন-বস্ত্র-অর্থাদি দ্বারা তাঁহার পরিতোষণই কি একমাত্র গুরু-পূজা? আমি বলি, এই সব অধম শ্রেণীর গুরু-পূজা। গুরুদত্ত সাধন ও জীবনাদর্শকে নিয়ত বুকে ধরিয়া রাখিয়া পরমকল্যাণে জীবনোৎসর্গই শ্রেষ্ঠ গুরু-পূজা। গুরুদেবের ধ্যানের দ্বারা তাঁহার শুভ্র নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের স্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া থাকার অভ্যাসেও কল্যাণ আছে, কিন্তু গুরুদত্ত সাধনের শক্তিতে বুক বাঁধিয়া, নির্ভীক প্রাণে স্বদেশ-সেবা বা জগদ্ধিতে-জীবনোৎসর্গ করার মধ্যে বৃহত্তর কল্যাণ বাস করে।

শিষ্য যদি বলে যে, গুরুমূর্ত্তি পূজায় আমি আনন্দ পাই, সাধনে জোর পাই, অতএব মারো আর কাটো আমি মূর্ত্তি-পূজা

কর্ব্বই, বক আর ঝক আমি তোমার ফটো ফুল দিয়ে সাজাবোই, চন্দনে চর্চ্চিত কর্ব্বই, পঞ্চ-প্রদীপে আরতি কর্ব্বই, তাহ'লে কে ঠেকাতে যাচ্ছে বল ? প্রাণ যা চায়, ক'রে নাও বাবা, কোনো বাধা নেই ; কিন্তু গুরু-পূজায় যেখানে খুব সোর-গোল আরম্ভ হবে, জানবে, সেখানে তোমার ভিতরে ভণ্ডামি এসেছে। যা কত্তে হয় কর, নিভৃতে কর, শুধু প্রাণের টানের দিক চেয়ে কর, বাইরে জাহির করার জন্য কিছু করো না। ভালবাসা বড় ভয়ঙ্কর জিনিষ,—একটু গভীর হ'লেই ভালবাসার বস্তুটীকে নিয়ে একেবারে ভগবানের আসনে বসায়। এই ভাবে স্ত্রী স্বামীকে, কখনো কখনো বা স্বামী স্ত্রীকে, শিষ্য গুরুকে, কখনো বা গুরু শিষ্যকে, বন্ধু বন্ধুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার ব'লে মনে কচ্ছে। ভালবাসার উৎকর্ষ-পথের এটা একটা স্তর। অতএব একে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। ঊর্দ্ধস্তরে উঠ্‌বার পথে এটা নিম্নতর একটা স্তর। কিন্তু ভালবাসা যেখানে সত্য, সেখানে তার গতিপথ বড় প্রচ্ছন্ন, বাইরের উচ্ছ্বাস, বাইরের চাঞ্চল্য, বাইরের আড়ম্বরকে সে স্বভাবতঃই গোপন ক'রে চলে।

ভণ্ড-শিষ্য ও খাঁটী-শিষ্য

যেখানে দেখ্‌বে, শিষ্য নিজে সাধন-ভজনে অমনোযোগী, জীবন-কর্ম্মে গুরু-বাক্যকে প্রতিফলিত ক'রে তুল্‌তে অপ্রয়াসী, অথচ নূতন নূতন গুরু-ভ্রাতা সংগ্রহে উৎসাহের অভাব নেই,

সেইখানেই জান্‌বে গুরুদেব ভণ্ড শিষ্যের পাল্লায় পড়েছেন। আবার যখন দেখ্‌বে, শিষ্য তার গুরুকে প্রাণ দিয়ে ভাল বাসছে, তার চ'খে, মুখে, সেবায়, যত্নে সে ভালবাসা যেন উপ্‌ছে পড়ছে, কিন্তু মুখ ফুটে একবারটী বল্‌ছে না,—"আমার নাথই জগন্নাথ, আমার গুরুই জগদ্‌গুরু," যখন দেখ্‌বে দিবা-নিশি সাধনেই শিষ্য নিমগ্ন, কর্ত্তব্য কার্য্যের অবসরে একটী নিমেষকেও সে বৃথা যেতে দেয় না, আপ্রাণ গুরু-সেবা-রত হ'য়ে থেকেও সে সাধনের বিন্দুমাত্র সুযোগকে অব্যবহৃত রাখ্‌ছে না, নিজেকে বা নিজ গুরুকে বাইরে প্রচারের আদৌ আকাঙ্ক্ষা নেই অথচ জগৎ-কল্যাণ কর্ম্মের ব্যপদেশে যতটুকু প্রচার যখন হ'য়ে যাচ্ছে, তার কোনও বিরোধিতাও কচ্ছে না, তখন জান্‌বে, এই শিষ্যই খাঁটী শিষ্য, এই রকম শিষ্যদের দিয়েই গুরুর ধর্ম্ম, গুরুর আদর্শ, গুরুর জীবন জগদ্‌ব্যাপী হবে।

গুরু-শিষ্যের বিচিত্র সম্বন্ধ

সদ্‌গুরু আর সৎশিষ্যের পরস্পরের সম্বন্ধ বড় বিচিত্র। কখনো এঁরা মাতা-পুত্র, কখনো এঁরা ভ্রাতা-ভগ্নী, কখনো এঁরা সখা-সখী, কখনো এঁরা প্রভু-দাস; কখনও এঁরা প্রণয়ী-প্রণয়িনী কখনো অভেদ-সত্তা। ভালবাসার যতগুলি বিকাশ আছে, সবগুলি ক্রমে ক্রমে এঁদের জীবনে ফোটে। এই সম্বন্ধ-বৈচিত্র্য অত্যাশ্চর্য্য ও অফুরন্ত,—ব'লে শেষ করা যায় না। সৎশিষ্য পেয়ে সদ্‌গুরু ভাবেন, এমন শিষ্যের আমি যোগ্য নই, শুধু

ভাগ্যগুণে পেয়েছি। সদ্‌গুরু পেয়ে সৎ-শিষ্য ভাবেন, এমন গুরুর কৃপা-লাভের আমি মোটেই যোগ্য নই, শুধু পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে লাভ করেছি। সৎ-শিষ্য মনোময় উপচারে প্রাণের আবেগ দিয়ে নিয়ত গুরুপূজা করেন, সদ্‌গুরু শিষ্যকে ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি বোধে মনে মনে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করেন।

তোমারি কাজে হরি
পেয়েছি যারে,
তোমারি অবতার ভাবিয়া পায়ে তার
প্রণতি করিয়াছি বারে বারে!

সদ্‌গুরুর মনোভাব এই রকমের। (২৩শে শ্রাবণ, ১৩৩৫)

গুরু হইবার যোগ্যতা

শিষ্যকে যিনি উপদেশ দিয়ে অসৎ পথ হ'তে ফিরাতে পারেন, তিনি গুরু হবার যোগ্য। উপদেশ যেখানে নিষ্ফল, সেখানে যিনি আদেশের বলে তাকে সৎপথে আন্‌তে পারেন, তিনি গুরু হবার যোগ্য। আদেশও যেখানে ব্যর্থ, সেখানে যিনি ইচ্ছার বলে শিষ্যের উচ্ছৃঙ্খলতাকে দূর কর্ত্তে পারেন, তিনি গুরু হবার যোগ্য। ইচ্ছার শক্তি যেখানে নিষ্ফল, সেখানে যিনি প্রেম দিয়ে শিষ্যকে জয় কর্ত্তে পারেন, তিনি গুরু হবার যোগ্য। আর, প্রেমও যেখানে নিষ্ফল, সেখানে যিনি উপেক্ষা দিয়ে, ঔদাসীন্য দিয়ে শিষ্যকে সংশোধিত কর্ত্তে পারেন,

তিনি গুরু হবার যোগ্য। বিদ্রোহী শিষ্যের পদাঘাত যিনি ভৃগু-পদচিহ্নের মত সাদরে বুকে ধ'রে রাখতে পারেন, তিনি গুরু হবার যোগ্য। মাথায় লাঠি ভাঙ্গলেও যিনি অভিসম্পাত করেন না, তিনি গুরু হবার যোগ্য। এই যোগ্যতা যার নেই, তিনি দীক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু গুরু হ'তে পারেন না।

শিষ্য হইবার যোগ্যতা

গুরুর উপদেশকেই যিনি আদেশের মত মনে করেন, তিনি শিষ্য হবার যোগ্য। গুরুর আদেশ-পালনে মৃত্যুকেও যিনি গ্রাহ্য করেন না, তিনি শিষ্য হবার যোগ্য। গুরুর ইচ্ছাকে অলঙ্ঘনীয় জেনে যিনি তাঁর সাথে নিজ ইচ্ছার অভেদত্ব প্রতিষ্ঠিত কত্তে পারেন, তিনি শিষ্য হবার যোগ্য। গুরুর নিকট যিনি অকপট, গুরুর শক্তিতে যিনি বিশ্বাসী, সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় যিনি গুরুর মর্য্যাদা-রক্ষাকারী, তিনি শিষ্য হবার যোগ্য। গুরুর প্রেম, স্নেহ, আদর ও ভালবাসা যাকে অহঙ্কারে স্ফীত বা কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ করে না, গুরুর সহজ বিশ্বাসকে যিনি কপটতা বা অসততা দিয়ে কখনো আহত করেন না, গুরুদ্রোহি-তাকে যিনি মৃত্যু-যন্ত্রণার চাইতেও ভয়াবহ মনে করেন, তিনি শিষ্য হবার যোগ্য। গুরুর রুষ্টভাষণে বা ক্রুদ্ধ ব্যবহারে যিনি সর্পের ন্যায় দংশনোদ্যত হন না, গুরুর উপেক্ষাকে যিনি সহিষ্ণুতা-সহকারে বহন কত্তে পারেন, গুরুর অভিশাপকেও যিনি হাসিমুখে মাথা পেতে নেন আশীর্ব্বাদ জ্ঞানে, তিনি শিষ্য

হবার যোগ্য। এই যোগ্যতা যার নেই তিনি দীক্ষা গ্রহণ কল্লে'ও প্রকৃত শিষ্য হ'তে পারেন না। (২৬শে শ্রাবণ, ১৩৩৫)

গুরু-শিষ্যের পারস্পারিক বিশ্বাস ও নির্ভর

শিষ্যের যদি না থাকে গুরুর উপরে অসীম নির্ভর, আর গুরুর যদি না থাকে শিষ্যের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, তাহা হইলে কখনই উভয়ের মধ্যে প্রকৃত প্রেম জন্মিতে পারে না এবং শিষ্যকে দিয়া যেমন একদিকে গুরু জগৎ-কল্যাণ করাইতে অসমর্থ হন, অপরদিকে তেমনি শিষ্য গুরুর জীবন, কর্ম্ম, চিন্তা ও বাক্য হইতে মনুষ্যত্ব-গঠনের, জীবনোৎকর্ষ-বিধানের ও লোককল্যাণ-সাধনের উপাদান সংগ্রহে অসমর্থ হন। কিন্তু গুরুশিষ্যের মধ্যে যেখানে এই পারস্পরিক নির্ভর ও বিশ্বাস অখণ্ড-সত্তায় বিদ্যমান, সেখানে রামদাস স্বামী শিবাজীকে দিয়া অনায়াসে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাইতে পারেন, শিবাজীও নিজ জীবনে গুরুর ত্যাগ, বৈরাগ্য ও উদারতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অনিন্দনীয় কৃতিত্বের সহিত রাজ্যসৃষ্টি, রাজ্য-পুষ্টি ও রাজ্য-পরিচালন করিতে পারেন ; সেখানে গুরু-নানকের এক একটী সংগুপ্ত ইচ্ছা ইতিহাসের বুকে স্মৃতি-চিহ্ন অঙ্কন করিবার সামর্থ্য লাভ করে, শিখবীরও গুরুজীর জয় গাহিতে গাহিতে অবহেলে কারাবরণ, নির্য্যাতন-বরণ, মৃত্যুবরণ করিতে পারেন ; সেখানে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে নরেন্দ্রনাথকে দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্ব-শক্তির উপলব্ধি করাইয়া লইতে পারেন, বিবেকানন্দ গুরুবলে

বলীয়ান্ হইয়া নিমেষ-মধ্যে চিকাগোর দুর্গম গিরিসঙ্কটে পাশ্চাত্যের উপর ভারতের দিগ্বিজয় ঘোষণা করিতে পারেন।

কিন্তু তাহার জন্য মনে করিও না, এই বিশ্বাস এবং এই নির্ভর সহজাত সংস্কারের মত সকলের জীবনেই বিনা সাধনায়, বিনা অধ্যবসায়ে, আপনা-আপনি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। অযুত বার অবিশ্বাস করিয়া অনেকের অন্তরে বিশ্বাসের জন্য চিরস্থায়ী আসন রচিত হইবে, নিযুত বার নির্ভর হারাইয়া অনেকের জীবনে পূর্ণ আত্মসমর্পণের অমোঘ শক্তি জাগ্রত হইবে।

(২)

গুরু যদি শিষ্যের ভবিষ্যতে খুব বিশ্বাস রাখেন, তাতে শিষ্যের অসীম কল্যাণ। গুরুর বিশ্বাস শিষ্যকে অসাধ্য সাধনে inspire করে। আর, শিষ্য যদি গুরুতে নির্ভর রাখে, তাতে গুরুর প্রচ্ছন্ন সাত্ত্বিকী শক্তিগুলি, সঙ্গোপিত কল্যাণ-প্রভাবগুলি শিষ্যের মঙ্গলের জন্য অদৃশ্য ও অপার্থিব ভাবে কাজ কত্তে আরম্ভ করে।

গুরুদ্রোহ প্রশমনের উপায়

গুরুদ্রোহ বড় ভয়ঙ্কর কথা, শুনতে বাস্তবিকই ভয় করে। কিন্তু সংযমী শিষ্যের অসংযমী গুরু, কর্ম্মী শিষ্যের অলস গুরু, কৃতী শিষ্যের অকৃতী গুরু, সবল শিষ্যের দুর্ব্বল গুরু, প্রেমিক শিষ্যের কামুক গুরু, স্বদেশ-ভক্ত শিষ্যের দেশদ্রোহী গুরু, ত্যাগী শিষ্যের ভোগী গুরু, সাধক-শিষ্যের অসাধক গুরু এই দ্রোহকে

ঠেকিয়ে রাখ্‌বেন কি ক'রে? যা স্বভাবের ধর্ম্ম, তা' কৃত্রিম উপায়ে ঠেকান যায় না। একটা জিনিষ দিয়েই শুধু সকল প্রকার গুরুদ্রোহকে স্তব্ধ ক'রে দেওয়া যায়, তার নাম প্রেম। কিন্তু সেই প্রেম সাধন-সমুদ্র মন্থনের দ্বারাই পাওয়া যায় এবং সেই মন্থনের মন্দর পর্ব্বত কত্তে হয় ইন্দ্রিয়-সংযমকে।

শিষ্যের বিদ্রোহে গুরুর উপকার

শিষ্য যদি বিদ্রোহী হয়, তাতে গুরুর উপকার আছে। গুরু তাঁর নিজ জীবনের অসম্পূর্ণতা, দোষ-ত্রুটী সব ধরতে পারেন। যার অনুগত বশ্যতা দেখে নয়ন আনন্দে নাচ্‌ত, সে যখন গুরুর সম্মানকে, মর্য্যাদাকে, গৌরবকে লঙ্ঘন কত্তে সাহসী হয়, তখন গুরুর দৃষ্টি যায় নিজের অন্তরের পানে, তাঁর লক্ষ্য পড়ে যে, নিজের ভিতরে কোথায় কোন্ পাপ এতদিন অজ্ঞাতসারে শুধু বর্দ্ধিতই হচ্ছিল। শিষ্যের তীক্ষ্ণ অবিনয় তাকে দিয়ে অনুসন্ধান করিয়ে নেয়, নিজ চিত্তবৃত্তি কামে, ক্রোধে, স্বার্থপরতায় দূষিত হয়েছে কি না, বাইরে ত্রিলোকপাবন জগদ্‌গুরুর অভিনয় কর্ত্তে গিয়ে কতবার ভিতরের সত্যকে পদাঘাত করা হয়েছে। এই ভাবে শিষ্যের বিদ্রোহ, দুর্ব্বিনয়, অসন্তোষ, কপটতা, ভক্তি-হীনতা দিয়ে প্রকৃত গুরু নিজেকে লাভবান্ ক'রে নেন। এস্থলে ধর্ষণ-নীতি বা বর্জ্জন-পন্থা কোনো কাজের নয়। প্রজার বিদ্রোহ দেখে যেমন রাজার আত্ম-সংশোধন করা উচিত, শিষ্যের বিদ্রোহ দেখেও তেমনি গুরুর চরিত্র-সংশোধনে যত্ন দেওয়া

উচিত। প্রজার অসন্তোষ যে রাজা অগ্রাহ্য করে, তার ধ্বংস অনিবার্য্য। যে গুরু শিষ্যের বিদ্রোহ দেখে আত্মসংশোধন করে না, তারও ধ্বংস অনিবার্য্য।

গুরুদ্রোহের স্বরূপ

গুরুকে ধ'রে দুই ঠেঙ্গা না মারলে গুরুদ্রোহ হ'ল না, তা' মনে ক'রো না। গুরুদর্শনে যখন তোমার প্রাণে আনন্দ জন্মে না, তখনই বুঝতে হবে, সূক্ষ্মভাবে তুমি গুরুদ্রোহের পথে যাচ্ছ। গুরু-বাক্য-শ্রবণে যখন তোমার নির্ব্বিচারিত চিত্তে বিশ্বাস কত্তে অনিচ্ছা হবে, তখনই জানবে যে, তুমি বাইরে অশিষ্টতা প্রদর্শন কর আর না কর, ভিতরে ভিতরে গুরুদ্রোহী হ'য়েই আছ। গুরুপাদপদ্মস্পর্শে যখন তোমার প্রাণ সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, ব্যাকুলতায়, ভগবৎ-প্রেমে বিগলিত হ'তে না চাইবে, তখন জান্‌বে প্রকাশ্য গুরুদ্রোহীর সাথে পার্থক্য শুধু বাহ্য ব্যবহারের। কিসে গুরুর সুখ সম্পাদিত হবে, কি কর্লে তাঁর অন্তরের অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন করা হবে, তা' জেনেও যখন তুমি চুপ ক'রে ব'সে থাকৃতে পার্ব্বে, তখন জান্‌বে তুমি প্রচ্ছন্ন গুরুদ্রোহী। যখন দেখ্‌বে, গুরুর জীবনের মহনীয় অংশগুলিকে তুচ্ছ ক'রে তোমার দৃষ্টি শুধু তাঁর দোষগুলিকেই অনুসন্ধান কত্তে যাচ্ছে, তাঁর মন্দগুলিকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের কত্তে যাচ্ছে, তখন জান্‌বে তুমি গুরুদ্রোহী। গুরুনিন্দা শ্রবণে যখন তোমার অন্তরে ক্লেশ জন্মিবে না, গুরু-নিন্দুকের সাথে

প্রগাঢ় বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে যখন তোমার দ্বিধা-বোধ হবে না, লোক-সমক্ষে গুরুদেবকে হেয় হ'তে দেখ্‌লে যখন প্রাণে বাজ্‌বে না, জান্‌বে, তখন তুমি অতি ভয়ঙ্কর একজন গুরু-দ্রোহী। গুরুর রোগের সময় যদি শুশ্রূষা না কত্তে পার, ক্ষুধার সময় অন্ন না দিতে পার, ক্লান্তির সময় বিশ্রাম না দিতে পার, তবু তুমি গুরুদ্রোহী নও। কিন্তু মনে যদি তোমার অপ্রসাদ, অসন্তোষ, অবিশ্বাস, অবিনয় বা অমঙ্গল-ইচ্ছা থাকে, তাহ'লেই তুমি গুরুদ্রোহী। (২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৫)

সদ্‌গুরুর লক্ষণ

সদ্‌গুরুর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, তাঁর অফুরন্ত প্রেম, পক্ষপাত-হীন অনাবিল ভালবাসা। সদ্‌গুরুর কৃপা পেয়ে প্রত্যেক শিষ্যেরই মনে হ'তে থাকে, গুরুদেব আমাকে যত ভালবাসেন, এত আর কাউকে বাসেন না।

সংশিষ্যের লক্ষণ

সংশিষ্যেরও প্রধান লক্ষণ হচ্ছে গুরুর ভালবাসায় অকপট বিশ্বাস। লাঠি ঝাঁটা মারলেও শিষ্য ভাবেন, এর মধ্যেও গুরুর অফুরন্ত প্রেমই প্রকাশ পাচ্ছে। মহাত্মা ভোলাগিরিকে তাঁর গুরুদেব গোলাপগিরি আজমীড়ের সেই অসহ্য শীতের মধ্যে সারা রাত্রি বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলেন, ভোলাগিরি শীতে কাঁপ্‌তে কাঁপতে ভাবতে লাগলেন, এর মধ্যেও গুরুদেবের কোনও মঙ্গলময় অভিপ্রায় রয়েছে। এই হচ্ছে খাঁটি শিষ্যের

লক্ষণ। খাঁটি শিষ্য ভাবেন,—গুরো, তোমার মত স্নেহ কারো কাছে পাই নি, পাব না, পেতে চাইও না।

(৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩৫)

নারীর গুরুগ্রহণ

সাধন পাইবার পূর্ব্ব হইতেই তোমাকে মনের দিক্ দিয়া বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে। তোমাকে গুরুগতপ্রাণা হইতে হইবে। কিন্তু গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিবে কোন্ ভাবের প্রেরণায়? সমগ্র দেহমনোময় সন্তান-ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তুমি গুরুর শ্রীপাদকমলে নিজেকে উৎসর্গ করিবে। ধ্যানে জ্ঞানে তুমি নিজেকে জানিবে গুরুদেবের কন্যা, তাঁহাকে জানিবে তোমার জন্মদাতা পিতা। জ্ঞানেই জীব যথার্থ জন্ম লাভ করে। তাই ব্রহ্মবিদ্যা যাঁহার নিকট হইতে পাইবে তাঁহার দেহকে জন্মদাতা পিতারই দেহ, তাঁহার মনকে জন্মদাতা পিতারই মন, তাঁহার স্নেহকে জন্মদাতা পিতারই স্নেহ, তাঁহার আদেশকে জন্মদাতা পিতারই আদেশ এবং তাঁহার উপদেশকে জন্মদাতা পিতারই উপদেশ বলিয়া অনুভব করিতে হইবে। নিজেকে জানিতে হইবে শ্রীশ্রীগুরুদেবেরই ক্রোড়-শায়িনী একটি শিশু. তাঁহারই পবিত্র বাহুর পরিরক্ষণে পালিতা আদরণীয়া আত্মজা। এই ভাব অন্তরের মধ্যে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারা পর্য্যন্ত কোনও নারী গুরূপদেশ পাইবার যোগ্য হয় না।

প্রচলিত গুরুবাদের প্রতি আমার চিত্তের সমর্থন নাই। গুরুবাদের প্রচলিত ব্যাখ্যার প্রতিও আমার চিত্তে অনুমোদন নাই। তথাপি এই কথাটী সত্য যে, আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির প্রার্থনা লইয়া শিষ্য বা শিষ্যা যাঁহার পাদমূলে যাইয়া আশ্রয় নেয়, তাঁহার প্রতি শিষ্য বা শিষ্যার আরোপিত মনোভাব এমন উচ্চ এবং এমন পবিত্র হওয়া চাই, যেন তাহা মনের সংগুপ্ত ভোগবুদ্ধিরও উৎপাদনে সমর্থ হয়। গুরুকে গরীয়ান্ ভাবিতে পারার মধ্যে অনেক কল্যাণ এবং অনেক সৌভাগ্য নিহিত রহিয়াছে। কামের ছলনা যখন জীবনকে মোহিত করে, ক্রোধের উত্তেজনা যখন জীবনকে প্রতপ্ত করে, লোভের প্ররোচনা যখন জীবনকে চঞ্চল করে, মোহের ঘোরান্ধকার যখন জীবনকে সমাচ্ছন্ন করে, মদের উচ্ছ্বাস যখন জীবনকে আকুলিত করে, মাৎসর্য্যের নীচতা যখন জীবনকে কলুষিত করে, তখন যাঁর পাদপদ্মস্পর্শে অপাপবিদ্ধ ভগবানের প্রেমময় সুখস্মৃতি কামকে বিদূরিত করে, তখন যাঁর পাদপদ্মস্মরণে অহিংসার ক্ষমাময়ী মূর্ত্তি চিত্তাক্ষেত্রে সুশীতল সলিল বর্ষণ করে, তখন যাঁর নিঃস্পৃহ নিষ্কাম ত্যাগসুন্দর জীবনাদর্শের চিন্তনে লোভের চঞ্চলতা ক্ষণমধ্যে স্তব্ধ হয়, তখন যাঁর জ্ঞানদীপ্ত ব্রহ্মজ্যোতিরুদ্ভাসিত পরমনিষ্ঠ জীবনের আলোকে বিবেকের বাণী বজ্র-গর্জ্জনে হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া মোহধ্বান্তকে বিধ্বংস করে,

তখন যাঁর নিরহঙ্কার দৃষ্টান্তনিচয় অহঙ্কারের কলরব, গর্ব্ব-অভিমানের কোলাহল ও দর্পদম্ভের বাহ্বাস্ফোটনকে মূক করিয়া দেয়, তখন যাঁর পরসুখে সুখী মন তোমার পরসুখে দুঃখী মনকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত করিয়া তোমাকে উপরের দিকে টানিয়া তোলে, তাঁহার সহিত তোমার জীবনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল সম্বন্ধ যে অখণ্ড পবিত্রতারই উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার সহিত তোমার সকল সাধারণ ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধনিচয় যে মাতৃময়ী চিন্তার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার সহিত তোমার সকল সরল ও নিগূঢ় ভাব-বিনিময় যে শুধু ব্রহ্মানন্দের অমৃতময় রসাস্বাদনের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, একথা তোমাকে সর্ব্বাগ্রে অবধারণ করিতে হইবে।

নির্ম্মাণযুগের তুমি তপস্বিনী, তোমার জীবনের প্রভাব সহস্র জীবনের উপরে পড়িবে। তাই তোমাকে ভিত্তি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত সমগ্র জীবনটাই গড়িতে হইবে তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞাদৃষ্টির শাসনের মধ্য দিয়া, গভীর কল্যাণদৃষ্টির তত্ত্বাবধানের মধ্য দিয়া। গুরুবাদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা সহস্র সহস্র তপোব্রত-ধারিণী উন্নত-হৃদয়শালিনী মহিমময়ী মহিলার সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, তাই মা আজ তোমাকে গুরুবরণের প্রাক্কালে আবশ্যকীয় সাবধান-বাণী শুনাইতেছি।

যাঁহার প্রতি চিত্তের স্বাভাবিক অনুরাগ অনুভব করিতেছ, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বরণ করিতে পার। যাঁহার চরিত্রের

এবং সাধন-সমৃদ্ধির প্রতি তোমার শ্রদ্ধার দৃষ্টি গিয়াছে, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া বন্দনা করিতে পার। যাঁহার জীবনাদর্শ তোমার সমগ্র মন-প্রাণের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহারই পদতলে লুণ্ঠিত হইতে পার। যাঁহার আশীর্ব্বাদের স্পর্শ তোমার সকল অন্ধকার কাটিয়া দিবে বলিয়া সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে পার। কিন্তু সব-কিছুর আগে চাই নিজের মনের মধ্যে সন্তানময়ী ধ্যানশীলতার প্রতিষ্ঠা এবং এই সুপবিত্র ভাবকে নিজের ভিতরে অক্ষয় অমর করিয়া জীয়াইয়া রাখিবার সামর্থ্য। নিয়ত ধ্যান কর, যিনি তোমার গুরু, তাঁহার সহিত তোমার সম্বন্ধ পিতা ও কন্যার, তাঁহাতে এবং তোমাতে ভাব ও ব্যবহার হইতেছে জনক ও দুহিতার, তিনি তোমার বাবা, আর তুমি তাঁর মেয়ে। যেখানে এই ধ্যান তোমার স্থায়ী হইবে না, এই ধ্যান সম্ভব হইবে না, এই চিন্তা প্রাণের মধ্যে গভীর প্রেমের প্লাবন আনিতে পারিবে না, জানিও, সেখানে তোমার দীক্ষা গ্রহণ করা মস্ত ভুল, এক মহামূর্খতা। যে স্থলে এই ভাবকে প্রাণের মধ্যে দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে তুমি অসমর্থা হইবে, যে স্থলে এই ভাবটা প্রাণের মধ্যে শান্তির জোয়ার বহাইতে পারিবে না, যে স্থলে এই ভাবটীকে কৃত্রিম প্রচেষ্টা দ্বারা জোড়া-তালি দ্বারা গায়ের জোর খাটাইয়া মনের মধ্যে বসাইতে হইবে, স্বাভাবিক ভাবে এই ভাবটী অন্তর-মধ্যে নিজের স্থান নিজে করিয়া লইতে

পারিবে না, জানিও মা, সেস্থলে তোমার গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ একটা বিরাট বিষাদপূর্ণ বিয়োগান্ত নাটক মাত্র।

নারী যখন পুরুষ-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহিবে, তখন তাহাকে সর্ব্বাগ্রে এই বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। নতুবা সত্যের পরিবর্ত্তে অসত্য, জ্ঞানের পরিবর্ত্তে অজ্ঞান, ভাগবৎ প্রেমের পরিবর্ত্তে পাপময় কাম, সর্ব্বত্যাগের পরিবর্ত্তে পূতিগন্ধময় দুর্ভোগ শিষ্যের জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। (২১শে মাঘ, ১৩৩৫)

গুরু ও মতবাদের দাসত্ব

গুরুর ভিতরে যদি Propaganda-ism বা নির্দ্দিষ্ট একটা মত প্রচারের বুদ্ধি থাকে, তবে তাতে শিষ্যের মঙ্গল ষোল আনা হ'তে পারে না, কারণ তাতে শিষ্যের ভিতরে সহজাত সংস্কারগুলি তাদের full play (পূর্ণ বিকাশ) পায় না। অনেক গুরুর জেদ্ থাকে শিষ্য মাত্রকেই সন্ন্যাসী করার। অনেকের আবার জেদ্ থাকে সন্ন্যাসেচ্ছু শিষ্যকে জোর ক'রে গৃহী করার। অনেকের জেদ্ থাকে সাকার-ভক্ত শিষ্যকে যুক্তি-বলে নিরাকারবাদী করার। অনেকের আবার জেদ থাকে নিরাকার-তত্ত্ব উপলব্ধি কত্তে সমর্থ শিষ্যকেও যেন-তেন-প্রকারেণ সাকারবাদী করার। এক একজন এক একটা মতবাদের এমন দাস হ'য়ে পড়েন যে, সমগ্র শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে মার্কামারা দাসত্বটাকে প্রসারিত ক'রে না দিতে পাল্লে আর প্রাণে শান্তি পান না।

এই সব গুরু, গুরু বটেন, কিন্তু সদ্‌গুরু নন ; এঁরা জীবকে কল্যাণ দান কত্তে পারেন, কিন্তু পরম কল্যাণ দিতে পারেন না। কেন না, পরম কল্যাণ হয় নিজ নিজ প্রকৃতির পথে, নিগ্রহের পথে নয়।

গুরুর কর্ত্তব্য সাধনে উৎসাহ-দান

শিষ্যের কর্ত্তব্য হচ্ছে সাধনের মধ্যে তলিয়ে যাওয়া, সাধনের ফলে যে পথ তার জন্য উন্মুক্ত হয়, সেই পথেই নিশ্চিন্তে ও নির্ব্বিচারে চলা। আর গুরুর কর্ত্তব্য হচ্ছে শিষ্যকে জোর ক'রে গাধার টুপি বা স্বর্ণ-কিরীট পরাবার চেষ্টা না ক'রে নিয়ত সাধনের দিকেই উদ্দীপনা দান করা এবং সাধনের মধ্য দিয়ে যে প্রশান্ত প্রজ্ঞার আবির্ভাব হবে, তার বলে নিজের পথ নিজে চিনে নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা। ভগবানের সঙ্গে নিত্য-যোগ-সাধনের উপদেশ শিষ্য গুরুর কাছ থেকেই পাবে, কিন্তু কর্ম্ম-সাধনার ইঙ্গিত সংগ্রহ কর্ব্বে নিজের সাধন-লব্ধ দিব্য জ্ঞানের কাছ থেকে। (১লা বৈশাখ, ১৩৩৬)

গুরু, শিষ্য, গুরুবাদ ও সাধন

গুরু-দর্শনে শিষ্যের কিছু লাভ হয় কি না, ইহা শিষ্য সকল সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, সাধন না করিলে গুরু-সঙ্গের কল্যাণ-প্রভাব উপযুক্ত ভাবে ছড়াইয়া পড়ে না। চাঁদের জ্যোৎস্না সকলের আঙ্গিনাতেই পড়ে, যাহার আঙ্গিনা যত পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত, তাহার আঙ্গিনাতে সে তত

সুন্দর রূপ ধরে। ইহা চাঁদের দোষ বা গুণ নহে, আধারেরই দোষ বা গুণ। কতজন হুজুগ করিয়া গুরুদর্শনে যায়, কিন্তু হয়ত অনেক সময় চিত্তটাকে প্রস্তুতই করে না।

গুরু-পাদপদ্ম-দর্শনের ভূয়সী প্রশংসা শাস্ত্রকারেরা করিয়াছেন। কেহ কেহ গুরু-দর্শনকে ব্রহ্ম-দর্শনের তুল্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই কথাগুলি শুধু কল্পনাই নহে। স্থল-বিশেষে, কাল-বিশেষে এবং পাত্র-বিশেষে এই কথাগুলি পূর্ণ-সত্য। ভক্তিমান্ চিত্ত লইয়া যখন ভক্ত-সাধক গুরু-দর্শন, গুরু-স্মরণ অথবা গুরুর গুণানুকীর্ত্তন করে, তখন তাহার বুকেরই বল বাড়ে, প্রাণেরই প্রসার বাড়ে, হৃদয়ের ক্লেদ প্রশমিত হয়, চিত্ত-তাপ দূরে যায়, হতাশা অবসাদ বিনষ্ট হয়। যাহাদের ইহা হয়, তাহাদের পক্ষে গুরুবাদ পূর্ণ সত্য। তাহারা যদি গুরুকে পরমেশ্বর বলিয়াও অর্চ্চনা করে, তথাপি তাহাদের ক্ষতি হয় না, লাভই হয়। কিন্তু যেখানে তাহা হয় না, সেখানে গুরুবাদ মিথ্যা। গুরুবাদ একটা সর্ব্বজনীন সত্য নহে, গুরুবাদ সত্য বা অসত্য শিষ্যের অবস্থা বুঝিয়া।

শিষ্যকে পুরুষকার প্রয়োগ করিতেই হয়, প্রাণান্ত সাধন করিতেই হয়। গুরুর তপোলব্ধ শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে শিষ্যের কল্যাণ করে। অতপস্বী শিষ্য গুরুর সেই প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ব্যবহারে আনিতে পারে না, পরন্তু তপস্বী শিষ্য তপস্যার বলে গুরুর সেই প্রচ্ছন্ন শক্তিকে নিজের 'ব্যবহারে আনিতে সমর্থ

হয়। ইহাই গুরুর কৃপাশক্তি। সকলেই তেলো মাথায় তেল দেন। যে শিষ্য নিজেও সাধন করে, গুরুর সাধন-শক্তি তাহাকে সহায়তা করে সব-চাইতে বেশী। (২রা বৈশাখ, ১৩৩৬)

দীক্ষা-গ্রহণ কখন কর্ত্তব্য

দীক্ষা-গ্রহণের জন্য যথার্থ আকুলতা যখন আসবে, প্রাণ দিয়ে সাধন করার সঙ্কল্প যখন হবে এবং সদ্‌গুরু যখন মিল্‌বে, দীক্ষা-গ্রহণ তখন কর্ত্তব্য।

পিতৃমাতৃ-সেবা বড়, না গুরু-সেবা বড়

সংসারে থেকে পিতৃ-মাতৃসেবা এবং সংসার ত্যাগ ক'রে গুরু-সেবা, উভয়বিধ সেবাই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু পাত্রভেদে। শিষ্যের সেবা না পেলেও গুরুর চলে কিন্তু সন্তানের সেবা না পেলে মাতাপিতার চলে না। অতএব সাধারণতঃ সংসার ত্যাগ ক'রে গুরু-সেবা করার চাইতে সংসারে থেকে মাতাপিতার সেবা অধিকতর কর্ত্তব্য। কিন্তু পাত্রভেদে এমন অবস্থাও হয়, যখন শিষ্য অনন্যমনা হ'য়ে একমাত্র গুরু-সেবার ভিতর দিয়ে সহস্র-সহস্র মাতা-পিতার পরোক্ষ সেবা কর্ত্তে সমর্থ হয়। যে গুরুর জীবনের মধ্য দিয়ে এই ভাবে বহুজনের কল্যাণ বিসর্পিত হয়, আর, যে শিষ্যের সেবা গুরুর এই কল্যাণকারিণী শক্তিকেই প্রতিনিয়ত সঞ্জীবিত রাখে, এমন গুরু আর এমন শিষ্য জগতে

অতীব দুর্ল্লভ। এই রকম দুর্ল্লভ ক্ষেত্রে পিতৃ-মাতৃ-সেবার চাইতে গুরু-সেবা শ্রেষ্ঠ।

পিতৃ-মাতৃ-আজ্ঞায় ও গুরু-বাক্যে বিরোধ

মাতৃ-পিতৃ-অবজ্ঞায় আর গুরু-বাক্যে যদি কখনও বিরোধ ঘটে, তখন কর্ত্তব্য সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে মাতা-পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন, আর, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে গুরু-বাক্য প্রতিপালন। সন্তান পিতামাতার সেবা কর্ব্বে প্রথমতঃ দেহ দিয়ে, তার পরে মন দিয়ে, সর্ব্বশেষে আত্মা দিয়ে, শিষ্য গুরুর সেবা কর্ব্বে প্রথমতঃ আত্মা দিয়ে, তার পরে মন দিয়ে। সন্তানের দেহের উপর পিতামাতার শ্রেষ্ঠ দাবী, শিষ্যের আত্মার উপরে গুরুর শ্রেষ্ঠ দাবী।

মাতৃপিতৃ-দ্রোহীর গুরুভক্তি

অনেককে দেখা যায়, পিতৃমাতৃ-দ্রোহী, কিন্তু খুব গুরু-ভক্ত। তারা ভণ্ড। পিতৃদ্রোহী ও মাতৃদ্রোহী কার্য্যতঃ গুরুদ্রোহীই হয়।

প্রকৃত গুরু-ভক্তি

গুরু-ভক্তি জিনিষটা একটা সামান্য ব্যাপার ব'লে মনে ক'রো না। জগতের সকল ভক্তির পাত্রের প্রতি ভাবের সামঞ্জস্য রেখে যে গুরু-ভক্তি, তাকেই বল্‌ব খাঁটি গুরু-ভক্তি। গুরুদেবকে ভক্তি করব ব'লেই মাতা-পিতাকে অভক্তি কত্তে হবে বা আমার গুরুদেবেরই পন্থা যাঁরা আশ্রয় করেন নাই, সেই সব পূজনীয় মহাত্মাদের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ কত্তে হবে, একে

গুরু-ভক্তি বলে না। আমি আমার গুরুদেবকে হয়ত অবতার ব'লেই মনে করি, চাইকি স্বয়ং পরমেশ্বর ব'লেও বিশ্বাস করি, কিন্তু তাই ব'লে যারা আমার মত মনে করে না, তাদের নাস্তিক, পাষণ্ডী ব'লে গাল দিয়ে খড়্গহস্ত হওয়া প্রকৃত গুরু-ভক্তি নয়। গুরু-ভক্তির প্রমাণ আত্মোৎসর্গে। জগতে কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার না ক'রে আমি যখন হাস্‌তে হাস্‌তে আমার গুরুবাক্যকে জগজ্জয়ী কর্ব্বার জন্য হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে রক্তাঞ্জলি দিতে পার্ব্ব, তখন বলা চল্‌বে যে, আমি গুরু-ভক্ত। উচ্ছ্বাসের অধীরতাকে গুরু-ভক্তি বলে না. প্রকৃত গুরু-ভক্তি বহুকালব্যাপী সুধীর তপঃসাধনেই আসে। (৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬)

দীক্ষা এক বদ্ধমূল প্রথা

দীক্ষা-দান এবং দীক্ষা-গ্রহণ এমন একটা বদ্ধমূল প্রথা যে, ভারতে জন্মগ্রহণ কর্ল্লে এটী ছাড়া আর ধর্ম্মোন্নতি কারো যে কোন প্রকারে হ'তে পারে, একথা প্রায় কেউ স্বীকারই করেন না। যাঁরা সাধন-ভজন ক'রে আধ্যাত্মিক উন্নতি কর্ত্তে চান, তাঁদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনেরই মত এই যে, দীক্ষা না নিলে সাধনের সিদ্ধি অর্জ্জন অসম্ভব। ধ্রুব ভগবানকে ডাকবেন,—পুরাণকার কাহিনীর ভিতর দিয়ে জলের মত সরল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন, নারদ-ঋষি গুরু হ'য়ে এসে দীক্ষা না দিয়ে গেলে ধ্রুবকে পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীহরি দেখা দিতে

পাচ্ছেন না। পল্লীগ্রামে যাও, দেখবে নিতান্ত অশিক্ষিতা গ্রাম্য-রমণীর ভিতরে পর্য্যন্ত এ ধারণা দৃঢ় হ'য়ে আছে যে, দীক্ষা না নিলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না। এমন দৃঢ়মূল ধারণা এবং বদ্ধমূল প্রথা যে দেশে, সে দেশে সহস্র সহস্র দীক্ষাদাতা থাকবেন, আর লক্ষ লক্ষ দীক্ষা-গ্রহীতা থাকবেন, এতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

সুদীক্ষা ও কুদীক্ষা

এসব দীক্ষাপ্রার্থীর মধ্যে কেউ কেউ গভীর প্রাণের আবেগ নিয়ে দীক্ষা চাইতে যায়। এদের দীক্ষা সুদীক্ষা। এসব দীক্ষা-দাতাদের মধ্যে কেউ কেউ জীবন-ভরা তপস্যা ক'রে সেই তপস্যাকে দীক্ষার্থীর ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট ক'রে দেবার উদ্দেশ্যে দীক্ষা দেন,—এঁদের দীক্ষাও সুদীক্ষা। যে স্থলে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের দিক্ থেকেই দীক্ষা এ ভাবে সুদীক্ষা হয়, সে স্থলেই শ্রেষ্ঠ দীক্ষা হ'য়েছে ব'লে মনে কত্তে হবে। দীক্ষা-প্রার্থীদের মাঝে আবার অনেকে শুধু প্রথার মান রাখবার জন্যই দীক্ষা নেয়। সাধন করার ইচ্ছে নেই, সাধনের বলে কাম-কলুষের ঊর্দ্ধে যাবার প্রেরণা নেই, 'আমি দীক্ষিত' মাত্র এই কথাটুকু বল্‌বার জন্যই যেন দীক্ষা নেওয়া। এদের দীক্ষা কুদীক্ষা। দীক্ষাদাতাদের মধ্যে অনেকে নিজেরা কোনও সাধন-ভজন কর্ব্বেন না বা মনে মনে সাধন-ভজনে তেমন

বিশ্বাসীও নন, কিন্তু কারণ-বিশেষে লোককে দীক্ষা দিয়ে থাকেন। এদের দেওয়া দীক্ষা কুদীক্ষা। যে স্থলে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের দিক্ থেকেই দীক্ষা কুদীক্ষা হয়, সেখানে অতিশয় অপকৃষ্ট দীক্ষা হয়েছে ব'লে মনে কত্তে হবে। দীক্ষাই যদি নিতে হয়, তাহ'লে সুদীক্ষাই নেওয়া সঙ্গত,—প্রাণের ব্যাকুল আগ্রহকে জাগিয়ে, হৃদয়-মন ভবিষ্যৎ আধ্যাত্মিক উন্নতির আশায় ও উৎসাহে উল্লসিত ক'রে তবে দীক্ষা নেওয়াই কর্ত্তব্য। আর, দীক্ষা যদি কাউকে দিতে হয়, তাহ'লে মনকে বাসনার উর্দ্ধে রেখে, লালসার অতীতে রেখে, সংসার-অরণ্যের গহন পথের বাইরে রেখে অতীন্দ্রিয়ের মধুর রস আস্বাদন কত্তে কত্তে তবে দেওয়া উচিত।

দীক্ষা-গ্রহণের পূর্ব্বে আত্ম-পরীক্ষা

তোমরা ছুটাছুটি ক'রে দীক্ষা নেবার জন্য এখানে আস বা আরো দশ জায়গায় যাও, তোমাদের কিন্তু বিশেষভাবে বিবেচনার প্রয়োজন আছে যে, প্রাণ সত্য সত্যই ব্যাকুল হ'য়েছে কি না। তোমাদের বিচার ক'রে দেখার দরকার যে, দীক্ষা নিয়ে সত্যি সত্যি প্রাণপণে সাধন কর্ব্বে কি না। নিজের মনকে ভাল ক'রে বুঝে নিয়ে এ কাজে নামা ভাল। দীক্ষা গ্রহণের মানে প্রতিজ্ঞা-গ্রহণ,—এই প্রতিজ্ঞা যে, তুমি আমৃত্যু সিংহবিক্রমে প্রদর্শিত পথে নির্ভয়ে পাদচারণা কর্ব্বে, একদিনের জন্য থামবে না, একদিনের জন্য পশ্চাৎপদ হবে না। যুদ্ধে

চাকুরি নিতে গেলে যেমন bond-এ (চুক্তি-পত্রে) সই দিতে হয় যে, গোলাই পড়ুক আর শত্রু-হস্তে বন্দীই হই, তবু duty (কর্ত্তব্য) ছেড়ে পালাব না,—দীক্ষা নেওয়া ঠিক সেই রকম একটা bond (চুক্তি-পত্র) সই করা। এজন্যই দীক্ষা নেবার আগে খুব ভাল ক'রে আত্ম-পরীক্ষার দরকার। দুদিন দেরী ক'রে দীক্ষা নিলে কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু আত্মপরীক্ষা না ক'রে দীক্ষা নিলে অনেক অসুবিধাতে পড়্‌তে হয়।

দীক্ষাদাতাদের রুচিভেদ

দীক্ষাদাতাদের মধ্যেও অনেক সাচ্চা লোক আছেন, অনেক মেকী গুরু আছেন। কে খাঁটি আর কে নকল, তা' নিয়ে আমার আলোচনার কোন দরকার নেই। আমি খাঁটি লোকদের কথাই বল্‌ব। খাঁটি দীক্ষাদাতাদের ভিতরেও অনেক প্রকারের রুচির লোক দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কেউ কেউ আছেন,—শিষ্যকে বছরের পরে বছর পরীক্ষা ক'রে তবে দীক্ষা দেন। কেউ আছেন,—পরীক্ষা কত্তে সময় বেশী নেন না, একটী স্নিগ্ধ দৃষ্টির ভিতর দিয়েই শিষ্যের আভ্যন্তরীণ উপাদান-গুলির বিশেষত্ব ধ'রে ফেলেন, কিন্তু তাঁর ভিতর অনুকুল ভাবের পরিপুষ্টির জন্য দিনের পর দিন, মাসের পর মাস প্রতীক্ষা করেন। কেউ আছেন,—মনে মনে ভাবেন যে, যোগ্য হোক্ কি অযোগ্য হোক্, ব্যাকুল হোক্ কি উদাসীন হোক্, প্রার্থী হোক্ কি অপ্রার্থী হোক্, ভক্তিমান্ হোক্ কি নাস্তিক হোক্, দীক্ষা একটা দিয়ে দিই,—তারপরে যার যেমন

ভাগ্যে আছে, কালক্রমে এ দীক্ষার একটা না একটা সুফল তার জীবনের উপরে আস্‌বে। দীক্ষাদাতাদের এ রকম বহুবিধ রুচির ভেদ আছে।

অসঙ্গত দীক্ষা গ্রহণ

যিনি দীক্ষা দেবেন, দেওয়াটা তাঁর কোন্ ক্ষেত্রে সঙ্গত হচ্ছে, আর কোন্ ক্ষেত্রে অসঙ্গত হচ্ছে, সে বিচারের ভার তাঁর উপরেই থাক্। কিন্তু যিনি দীক্ষা নেবেন, নেওয়াটা তার পক্ষে সঙ্গত হচ্ছে কি না, সেই বিচার কত্তেই হবে। গঙ্গায় স্নান সেরে একটী কুমারী মেয়ে ঘাটের উপর দাঁড়িয়ে কাপড় বদলাচ্ছে, আর একটী আগন্তুক গিয়ে বল্ল,—আয় ছুঁড়ি, তোকে বিয়ে কর্ব্ব। অমনি কি নির্ব্বিচারে মেয়েটীর মেনে নেওয়া উচিত যে, এই আগন্তুককে তার বিয়ে কত্তেই হবে? বিয়েতে যেমন হঠাৎ-কথায় রাজী হওয়া যায় না, দীক্ষাতেও তেমন হঠাৎ ক'রে রাজি হওয়া যায় না। মেয়েটী ত' বিয়েতে রাজী হ'ল না, কিন্তু আগন্তুক তার চুলের মুঠি ধ'রে নিজের বাড়ী নিয়ে গিয়ে মন্ত্র প'ড়ে ফেল্ল। এতে কি বিবাহ সিদ্ধ হয়? এর নাম বলাৎকার। দীক্ষাও এ ভাবে কখনো সিদ্ধ হ'তে পারে না। দীক্ষাদাতা হয়ত খুবই সাধু, খুবই মহৎ, খুবই তপস্বী,—কিন্তু তা' ব'লেই গায়ের জোরে দেওয়া দীক্ষাকে দীক্ষার সম্মান দিতে তুমি বাধ্য নও তোমার এ অবাধ্যতায়

কোনো পাপ হবে না। দক্ষিণেশ্বর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের সাধনার স্থান ব'লে এই পবিত্র তীর্থ দর্শন-মানসে তুমি হয়ত গিয়েছ,—দেখলে একটী শিবমন্দিরের পাশে একজন মহাপুরুষ ব'সে। তিনি তোমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বল্লেন,—'ওহে, গোপনে তোমার সাথে একটু কথা আছে।' তুমি বল্লে,—'বেশ ত, বলুন।' তিনি বল্লেন,—'প্রতিজ্ঞা কর, আমি যা বল্‌ব, তা এ দুনিয়ার কারো কাছে প্রকাশ কত্তে পারবে না।' তুমি রাজী হ'লে তিনি বল্লেন,—'চুপ ক'রে বস, চ'খ বোজ।' তুমি তাই কল্লে। অম্‌নি তিনি হঠাৎ তোমার কাণের কাছে তাঁর মুখটি এনে উচ্চারণ কল্লেন,—'ওঁ সচ্চিদেকং ব্রহ্ম।' তারপরেই বল্লেন,—'এ নাম জপ কত্তে থাক।' তুমি ত' জপ ক'রেই যাচ্ছ, আর ভাবছ, এর পরে বোধ হয় ভদ্রলোক তাঁর গোপন কথাটী বল্‌বেন। কিন্তু তিনি আর গোপন কথা কিছু বল্লেন না। তুমি চ'খ খুলতেই তোমাকে বল্‌লেন,—'এই তোমার দীক্ষা হল, এখন তোমার নাম-ঠিকানাটী আমাকে দাও।' এরূপ দীক্ষাকে দীক্ষা ব'লে মানতে তুমি বাধ্য নও। প্রয়াগে গিয়েছ মাঘ-মেলা দেখতে। একজন সাধুর শিষ্যগণ তাঁর বিশাল এক প্রতিচিত্রের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মেঘমন্দ্রে স্তোত্র পাঠ কচ্ছে, আর আরতি চালাচ্ছে। তুমি একজনকে জিজ্ঞেস কল্লে যে, এত বড় একজন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ চরণদর্শনের কোনও পন্থা আছে কিনা। শিষ্যেরা একজন তোমাকে তাঁর

চরণ-সমীপে নিয়ে গেলেন। তুমি মহাপুরুষকে প্রণাম ক'রে বল্লে,—'কৃপা ক'রে কিছু উপদেশ দিন।' তিনি বল্লেন,—'কাল ভোরে স্নান ক'রে একটা হর্ত্তুকী নিয়ে আসবে।' তুমি ভাবলে, হরীতকীটী নিয়ে গেলে বোধ হয় কতই প্রাণ-মাতান মন-মাতান উপদেশ শুনতে পাওয়া যাবে। কিন্তু যখন হরীতকী নিয়ে যথাকালে গিয়ে উপস্থিত হ'লে, তখন তিনি তোমাকে টেনে তাঁর কোলের উপরে তুলে নিয়ে বললেন,—'চ'খ বোজ।' তুমি এমন একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলে না। তোমার প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বও এমন প্রবল নয় যে, হঠাৎ একটা বুদ্ধি ঠাউরে উঠতে পার। এর মধ্যেই তিনি তোমার কাণে একটী মন্ত্র উচ্চারণ কল্লেন,—'ওঁ নমঃ শিবায়।' তারপরে তোমাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বল্লেন,—'যা, এই তোর দীক্ষা হ'ল।' তুমি সেই নিভৃত গৃহ থেকে বেরিয়ে আসতেই গুরুদেবের শিষ্যেরা তাঁদের গুরু-ভ্রাতাদের তালিকার খাতায় তোমার নাম-ঠিকানা টুকে নিলেন।—এরূপ দীক্ষাকে দীক্ষা ব'লে মানতে তুমি বাধ্য নও। তবে, দেশজোড়া সংস্কার রয়েছে যে, মহাপুরুষ-বাক্য লঙ্ঘন কত্তে নেই। সুতরাং তোমার মনে খচখচি থাকতে পারে যে, মন্ত্র যখন দিয়েছেন, তখন তাঁর বাক্য যদি না রাখি, তবে আবার কোন্ জানি বিপদ ঘটে। তেমন স্থলে ঐ নাম তুমি জ'পে যেতে থাক, পরে সময়ের বশে যা হবার তাই হবে?

সুদীক্ষার প্রমাণ

দীক্ষা সুদীক্ষা কিনা, তার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, দীক্ষা গ্রহণ-মাত্র বক্ষ থেকে পাষাণ-ভার নেবে যাচ্ছে, এরূপ বোধ জাগছে কিনা। দীক্ষা সুদীক্ষা কিনা তার প্রমাণ এই যে, দীক্ষার পরমুহূর্ত্ত থেকে মনে হবে যেন এক অপূর্ব্ব আশ্রয়, এক অপূর্ব্ব অবলম্বন, এক অদ্বিতীয় মহাসহায় তুমি পেয়েছ। এরূপ যদি হয়, তবে হঠাৎ পাওয়া দীক্ষাও অনাদরের নয়।

দীক্ষাদাতার ব্যক্তিত্ব

দীক্ষা থেকে দীক্ষাদাতার ব্যক্তিত্বকে পৃথক্ ক'রে নেওয়া কঠিন কথা। এটা অবতারবাদের দেশ। তাই, সব ব্যাপারেই মানুষের ব্যক্তিত্ব একটা বিরাট জিনিষ। তোমার নিজের ব্যক্তিত্ব ছাড়া জগতের আর সকলের ব্যক্তিত্বই তোমার নিকট অতীব প্রধান। পাশ্চাত্য দেশে নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রধান ক'রে জগতের সকলের ব্যক্তিত্বকে খর্ব্ব করা হয়েছে। আমাদের দেশে নিজের ব্যক্তিত্বকে একেবারে পিষে মেরে ফেলে অপরের ব্যক্তিত্বকে প্রধান করা হয়েছে। সংস্কৃতিগত এই পার্থক্যের দরুণই এদেশে অবতারবাদ এত গভীর শিকড় চালাতে সমর্থ হয়েছে। ফলে দীক্ষার ব্যাপারেও ক্রমশঃ দীক্ষাদাতাকে ব্রহ্মের অবতাররূপে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে। গুরুকে করা হয়েছে ব্রহ্ম, এর পিছনেই অসম্ভব রকমের প্রচার-শক্তি ব্যয় করা হয়েছে, ব্রহ্মকে গুরু ব'লে ধারণা কর্ব্বার প্রয়োজনের দিকে

শক্তি বা প্রতিভা বা প্রচার-প্রচেষ্টা প্রয়োগ করা হয় নি। তারই জন্য দীক্ষাদাতার ব্যক্তিত্ব একটা অতীব প্রধান জিনিষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এর ভাল ও মন্দ দুটা দিকই আছে। কিন্তু যেখানে গুরুর ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে এত অধিক ক'রে স্বীকার করা হয়েছে, সেখানে কিছুতেই কারো সহজে বা না ভেবে-চিন্তে, আত্মপরীক্ষা না ক'রে, দীক্ষাদাতাকে ভাল ক'রে না জেনে-শুনে দীক্ষা নেওয়া উচিত নয়।

নবযুগের গুরুবাদ

এক নবযুগ সম্মুখে আসছে। সেই যুগে দীক্ষা থাকবে, কিন্তু দীক্ষাদাতা হবেন গৌণ। তিনি অনাদরের পাত্র হবেন না, বরং প্রভূত কৃতজ্ঞতার ভাজনই হবেন, কিন্তু দীক্ষা দান ক'রে তিনি মুণ্ড কিনে নেবেন না, দীক্ষা দিয়ে তিনি সেই নিত্যগুরুরই শিষ্য তোমাকে করবেন, যাঁর শিষ্য তিনি নিজে। দীক্ষাদাতা সেই যুগে দীক্ষা-গ্রহীতার গুরু নন, গুরু-ভ্রাতা। সবাই তখন একই পথের যাত্রী মাত্র, কেউ বা অগ্রগামী, কেউ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী, কিন্তু সবাই একে অন্যের ভাই বা বোন, কেউ গুরু নন, কেউ শিষ্য বা শিষ্যা নন। বহু-দেব-বাদে লাঞ্ছিত দেশে অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি যে গুরুবাদ, একলক্ষ্য জাগ্রত সমাজে তার রূপান্তর হবে। সবাই তখন এক গুরুর শিষ্য, শত শত গুরুর তখন প্রয়োজন নেই! সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় আমি এই নর-তনু বহন ক'রে বেড়াচ্ছি। (১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫)

ব্রহ্মবিদ্যা বিক্রয়

প্রাচীন ভারতে বৈষয়িক বিদ্যা শিখ্‌বার জন্য অনেককেই গুরুর নিকট যেতে হ'ত না, নিজ নিজ পিতার নিকট থেকেই অধিকাংশের বৈষয়িক শিক্ষা হ'ত। কামারের ছেলে, কুমারের ছেলে, খনকের ছেলে বা গণকের ছেলে নিজ নিজ জাত-ব্যবসা নিজ নিজ ঘরে ব'সেই প্রায় আয়ত্ত কত্ত। কিন্তু ব্রহ্ম-বিদ্যার বেলা সে নিয়ম খাটত না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ছেলেরা দলে দলে গুরুগৃহে গিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত কত্ত। এই বিদ্যাকে বিক্রয় করা চিরকালই দোষের ছিল, চিরকালই দোষের থাকবে। আর্য্যপন্থাবর্জ্জিত ব্যক্তির আহারীয়রন্ধনকারী ব্রাহ্মণ, হরিনাম-বিক্রয়কারী ব্রাহ্মণ আর বিদ্যাবিক্রয়কারী ব্রাহ্মণ, এই তিনজনকে এই জন্যই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বিষহীন উরগের সাথে তুলনা করা হ'য়েছে। অর্থাৎ বিষহীন সাপকে দেখ্‌লে সবাই ভয় করে যে, বুঝি বিষ আছে, কিন্তু কাউকে দংশন ক'রে বিপন্ন করার তার ক্ষমতা নেই, শুধু ফোঁস্‌-ফোঁসানিই সার, ঠিক তেমনি এসব ব্রাহ্মণের পৈতা আর টিকি দেখে অনেকে মনে কত্তে পারে যে, এঁদের বুঝি ব্রহ্মতেজ সত্য সত্যই আছে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এদের মধ্যে সেই তপোলভ্য মহাবস্তুর নাই এক কণাও। অর্থাৎ এঁদের ব্রাহ্মণ বলাটা "ব্রাহ্মণ" শব্দটার একপ্রকার অপব্যবহার মাত্র। শাস্ত্রাদিতে এভাবে ব্রহ্মবিদ্যাবিক্রয়কারীকে গর্হণ করা হয়েছে।

হরিনাম বিক্রয়

ভগবানের নাম ব্রহ্মবিদ্যার সারাৎসার। আগেকার দিনের গুরুগৃহ আজ নেই, কিন্তু নাম আছে, আর তার দীক্ষা র'য়ে গেছে। সেই দীক্ষা দিতে যে পয়সা নেয়, সে হরিনাম-বিক্রয়ের অপরাধে অপরাধী কিন্তু সংসারী গুরুর সংসার চালাতে হয়, পয়সা না হ'লে চলে কৈ? মঠাধিপতি গুরুর মঠ চালাতে হয়, পয়সা না হ'লে চলে কৈ? কেউ হয়ত সোজাসুজি ব'লে বসেন, অত দিতে হবে, নৈলে মন্ত্র পাবে না; কেউ বা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ব'লে থাকেন যে, অমুক অমুক জিনিষ না হ'লে দীক্ষা দিই কি ক'রে? মোটকথা কিছু পাওয়া চাই। এসব দীক্ষাকে হরিনাম বিক্রয় বল্‌তেই হবে।

প্রকৃত দীক্ষাদাতা

দীক্ষাদাতার সঙ্গে তোমার দেখা হ'ল। তিনি তোমাকে বল্লেন,—"তোমার দীক্ষার প্রয়োজন? এস আমি দীক্ষা দিচ্ছি, এর বিনিময়ে তোমার কাছে ধন চাই না, প্রতিপত্তি চাই না,—আজও চাই না, কালও চাই না; এমন কি আমাকে গুরু ব'লে লোকের কাছে পরিচয় দিতে হবে, এতটুকু বাধ্য-বাধকতা পর্য্যন্ত তোমার উপরে নেই। পার্থিব বা অপার্থিব কোন রকমেরই বিনিময় চাই না।" এ কথা ব'লে যিনি দীক্ষা দিতে পারেন, তাঁর দেওয়া দীক্ষাই প্রকৃত দীক্ষা। দীক্ষা দিবার

সময় হয়ত আমি টাকা-কড়ি কিছুই নিলাম না কিন্তু পরে নানা-ভাবে নিজ আর্থিক প্রয়োজনের দাবী মিটাবার ব্যবস্থা তোমার ঘাড়ে তুলে দিলাম, আমি সুদীক্ষাদাতা হব না। কিন্তু তোমার কাছে টাকা-কড়ি হয়ত এখনো চাইলাম না, ভবিষ্যতেও চাইব না, সরল সোজাভাবেও না, ঘুরিয়ে পেঁচিয়েও না কিন্তু তুমি যখন তোমার কর্ম্মবলে দেশের ভিতরে সমাজের মাঝে প্রতি-পত্তির এক শ্লাঘ্য আসন অধিকার করেছ, তখন আমি দাবী কত্তে বস্‌লাম যে, তুমি আমারই শিষ্য। এভাবে যিনি সুকৌশলে নিজের প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য শিষ্যের প্রতিপত্তিকে ব্যবহার করেন, তিনিও সুদীক্ষাদাতা নন। প্রকৃত দীক্ষাদাতা শিষ্যের কাছ থেকে ঐহিক বা পারত্রিক কোনো সুবিধাই আদায়ের চেষ্টা কর্ব্বেন না। ব্রহ্মবিদ্যাদানের এইটীই চিরাদর্শ। (১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬)

সর্ব্বভূতে গুরুদর্শন

জগতের সকলকে তোমার গুরু কর, অর্থাৎ সর্ব্বভূতে গুরু-দর্শন কর। সকলের সাথে এমন আচরণ কর, যেন তাঁরা প্রত্যেকে তোমার নিকটে একটী না একটী শিক্ষণীয় তত্ত্বের আবরণ উন্মোচন করেন। কারো বাক্যে, কারো ব্যবহারে তোমার শ্রবণ-মনন ভগবৎ-প্রেমরসে উদ্দীপিত হোক্। সকলের কাছেই আমাদের শিখবার আছে, কারণ সকলের ভিতরেই নিত্যগুরু অধিষ্ঠিত রয়েছেন। কিন্তু কারো কাছেই আমরা কিছুই শিখ্‌তে

পারি না বা কিছুই শিখ্‌বার মত পাই না ; কারণ আমরা কারো ভিতরেই নিত্যগুরুর অবস্থিতি লক্ষ্য করবার জন্য দৃষ্টি-পরিচালনা করি না। বিনীত ভাবে প্রেমময় নয়নে আমরা কারো পানে তাকাই না। তাকাই উদ্ধত অহমিকা নিয়ে। তাকাই প্রাণ-ভরা অহঙ্কার নিয়ে,—নিজে কত মহৎ, নিজে কত শ্রেষ্ঠ, সেই দাম্ভিকতা নিয়ে। চিত্ত বিনীত হ'লে ভগবান্ প্রত্যেকটী আধারের ভিতর দিয়ে তাঁর জ্ঞানদাতা মঙ্গলময় রূপটী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। (৭ই আষাঢ়, ১৩৩৬)

বৃথা দীক্ষা

আজকাল তোমাদের ভিতরে দীক্ষা নেবার একটা বাতিক উঠেছে। এটাকে একটা হুজুগ-বিশেষও বলা যেতে পারে। ছেলেরা ক্ষেপে আসে দীক্ষা নিতে আর চেলা হ'তে। কিন্তু বাছা, দীক্ষা নেওয়া কি সোজা কথা, না, দীক্ষা দেওয়াই সোজা কথা ? ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ দর্শন করার জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা জাগল না অথচ দীক্ষা নিলাম,—এতে যে অনেক সময় ভণ্ডামির ব্যাপার হয় হে !

হুজুগে গৃহীত দীক্ষার কুফল

ভগবানের নামে সকলেরই অধিকার আছে। সদ্‌গুরুর কৃপা সকলেরই পাওয়া প্রয়োজন। কারণ, সাধন-দীক্ষা উন্নত জীবনের দৃঢ়তম ভিত্তি গ'ড়ে দেয়। কিন্তু কারো দীক্ষা যদি

অনুকূল ঘটনার ফল না হ'য়ে বা প্রাণের আবেগের ফল না হ'য়ে হয় গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের জোগাড়-যন্ত্রের ফল, তা' হ'লে দীক্ষার মূল্য ও প্রভাব অনেক ক'মে যায়, শিষ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, গুরুশ্রদ্ধা হ'ল দীক্ষার প্রাণেরও প্রাণ। হুজুগে গৃহীত যে দীক্ষা, তাতে অনেক সময় সত্যিকার শ্রদ্ধাটা বিকশিত হ'তে পায় না। ফলে শিষ্যের ভিতর গুরুর পর গুরু চেখে বেড়াবার সম্ভাবনা থাকে। এতে নামে নিষ্ঠা কমে।

সদ্‌গুরুর শক্তি

অবশ্য সদ্‌গুরুর অমোঘ শক্তিকে আমি অস্বীকার কচ্ছি না। সদ্‌গুরুর বাক্যে, তাঁর প্রদত্ত মন্ত্রে এক অত্যাশ্চর্য্য শক্তি লুকিয়ে থাকে, যার অংশমাত্রই দীক্ষাকালে কেউ কেউ টের পায়, কেউ বা দীক্ষা-কালে আদৌ টেরই পায় না। কিন্তু সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির বিস্ময়কর প্রভাব সাধনে-অবিশ্বাসী শিষ্যকে তার ইচ্ছার অগোচরে ঠেলে টেনে নিয়ে আসে সাধননিষ্ঠার দিকে, গুরুদ্রোহী শিষ্যকে তার অজ্ঞাতসারে গুরুপাদপদ্মে নির্ভরশীল ক'রে তোলে। সদ্‌গুরুর দীক্ষা সুপাত্রে পড়ুক, অপাত্রে পড়ুক পবিত্র আধারে পড়ুক, অপবিত্র পাত্রে পড়ুক, শ্রদ্ধাবান্ শিষ্যে পড়ুক, হুজুগাকৃষ্ট শিষ্যে পড়ুক, এই অব্যর্থ শক্তি সর্ব্বত্র তার নিজের কাজ ক'রে যাবেই যাবে। সদ্‌গুরু যদি ইট, কাঠ, গাছ পাথরের কাণেও মহামন্ত্র ঢেলে দেন, এক দিনে হোক্, দশ দিনে হোক্, সেই ইট, কাঠ, গাছ, পাথরকেও প্রাণবন্ত হ'তে হবে,

গুরুবলে বলীয়ান্ হ'য়ে সেও জগতে অসাধ্য সাধন ক'রে যাবে। কিন্তু সদ্‌গুরু যতই শক্তিশালী হোন, তাঁর শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শিষ্যদের কোনও propaganda (প্রচার কার্য্য) চালানো প্রয়োজনীয়ও নয়, উচিতও নয়।

শিষ্য কখন গুরুকে প্রচারে অধিকারী?

যখন তুই জান্‌বি, তুই যথার্থ সত্যের সন্ধান পেয়েছিস্, আর সেই সত্যের সেবায় যখন তোর এক কণা ফাঁকি থাকবে না, সাধন-নিষ্ঠায় এক তিল শিথিলতা থাক্‌বে না, তখন তুই যা ইচ্ছা তাই কর্, তুই নিরপরাধ ও নির্দ্দোষ। কিন্তু সাধন-নিষ্ঠায় যার এক চুল কম্‌তি আছে, সে যদি কিছু কত্তে যায়, তবেই তা ভণ্ডামি হবে। (৯ই শ্রাবণ, ১৩৩৬)

বিপজ্জনক গুরুভক্তি

গুরুভক্তি খুব ভাল জিনিষ এবং প্রয়োজনীয় জিনিষ। গুরু-ভক্তিহীনের সাধন-ভজনে জোর বাঁধে না। কিন্তু গুরু-ভক্তির একটা বিপজ্জনক রূপ আছে, যাতে গুরুরও মঙ্গল নেই, শিষ্যেরও কুশল নেই। এক গুরু ছিলেন শ্মশানবাসী, লোকালয়ে বড় একটা আসতেন না এবং আহারীয় সংস্থানের জন্য কোনও চেষ্টা কত্তেন না। কখনো কখনো গ্রামবাসী কেউ এসে আহারীয় দিয়ে যেত, তাতেই তিনি প্রাণধারণ কত্তেন। কিন্তু গুরুদেবের কপাল মন্দ, এক ভয়ঙ্কর গুরুভক্ত শিষ্য হঠাৎ একদিন তাঁর জুটে গেল। শিষ্য বল্লেন,—গুরুদেব, আমি ঈশ্বর-

দর্শন কর্ত্তে চাই। গুরু খুসী হ'য়ে বল্লেন,—বেশ কথা, প্রাণ-পণে সাধন কর্, নিশ্চিত ঈশ্বর-দর্শন হবে। শিষ্য বল্লে,—আমি সংসার ত্যাগ কর্ব্ব। গুরু বল্লেন,—তার কোন প্রয়োজন নেই, সংসারে ব'সেই তাঁকে ডাক্, তাতেই তাঁর কৃপা হবে। শিষ্য বল্লে,—না, আমি আপনার পাদপদ্মে মাথা গুঁজে এই শ্মশানেই প'ড়ে থাকব, সংসারে আর যাব না। গুরু বল্লেন,—এখানে তোর নানা কষ্ট হবে, অসুবিধা হবে। শিষ্য বল্লেন,—হোক্, সব আমি সহ্য কর্ব্ব। গুরু বল্লেন,—থাকুবি কোথায়, এই ভাঙ্গা মঠের ভিতর একজনের বেশী স্থান হয় না। শিষ্য বল্লে,—আমি বাইরে প'ড়ে থাকুব। গুরু বল্লেন,—এখানে আহারীয় অপ্রচুর। শিষ্য বল্লে,—আমি উপবাসী থাকুব। গুরু বুঝলেন, আর বাক্যব্যয় বৃথা, অগত্যা বল্লেন,—আচ্ছা তবে থাক্। শিষ্য ভাবল, গুরুদেব তাকে পরীক্ষা কচ্ছিলেন এবং পরীক্ষায় সে অনায়াসে জয়ী হ'ল। ফলে শিষ্য মনে মনে একটা বিজয়-গর্ব্ব অনুভব কর্ত্তে লাগল। এদিকে শিষ্য ত' এসে গুরুর আশ্রম সরগরম ক'রে তুল্ল, কিন্তু গ্রামবাসীরা আগে সাধুকে যে পরিমাণ আহারীয় পেঁ ৗছে দিত, তা' আর বাড়ল না। গুরু দেখলেন, নিজে পেট ভ'রে খেতে গেলে শিষ্য মারা যায়, অতএব তিনি আধ পেটা খেতে আরম্ভ কল্লেন। গুরুদেব দেখলেন, শিষ্য বাইরে প'ড়ে থাকুলে বর্ষায় আর শিশিরে তাকে সান্নিপাতিকে ধর্ব্বে, অতএব নিজের বিশ্রামের স্থানটুকু সঙ্কীর্ণ

ক'রে এনে ব'সে ব'সে ঘুমুবার অভ্যাস কর্লেন। কিন্তু এতেও শিষ্যের গুরুসেবার আগ্রহ কম্‌ল না। দিনের বেলায় নানা-স্থানের লোক এসে উপদেশের জন্য ব'সে থাকে ব'লে শিষ্য গুরুদেবের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা কইতে পায় না, অতএব রাত্রিতে যখন গুরুদেব ঘুমিয়ে থাকেন, তখন সে ডেকে ওঠে,—গুরুদেব! গুরুদেব! গুরু জেগে উঠে বল্লেন,—কিরে? শিষ্য বল্লে,—সারাদিন লোকের ভিড়ে আপনার কাছ থেকে কোনো উপদেশ নিতে পারি না, এখন শ্মশান নির্জ্জন, এখন আমায় কৃপা ক'রে কিছু উপদেশ দিন। গুরু বল্লেন,—দীক্ষার কালে সেই যে একটী উপদেশ দিয়ে দিয়েছি, সেইটীই আগে পালন কর্ বাবা, পরে দেখবি, ঐ একটীর মধ্য দিয়েই সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ উপদেশ আপনি প্রকাশ পাবে। শিষ্য বল্লে,—সেটী ত' প্রভো পালন কর্‌বই, কিন্তু তার উপর যদি আরো কিছু উপদেশ দিতেন। তারপরে শিষ্য অফুরন্ত বাক্য-বর্ষণে শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে নিজেই যখন ঘুমিয়ে পড়্‌ত, গুরু তখন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত সমাগত দেখে ঘুমুবার আর চেষ্টা না ক'রে শয্যাত্যাগ ক'রে শৌচের জন্য বের হ'তেন। এইভাবে কিছুদিন চল্‌বার পরে গুরুদেবের কষ্টপ্রদ পিত্তশূলের ব্যারাম উপস্থিত হ'ল। গুরু দেখলেন, এই রুগ্ন দেহ আশ্রয় ক'রে জীবহিত সম্ভব নয়, তখন তিনি যোগবলে দেহত্যাগ কর্ব্বার সঙ্কল্প ক'রে নাভি পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে নেবে শিষ্যকে ডেকে বল্লেন,—তোর আর

কিছু জান্‌বার থাকে ত' জেনে নে রে, এর পরে কিন্তু আর কিছু বল্‌বার অবসর থাকবে না। শিষ্য ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বল্লে,—কেন কেন? গুরু বল্‌লেন,—আমি দেহত্যাগ কর্ব্ব। শিষ্য চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে বল্ল,—সে কি গুরুদেব, আপনি না ব'লেছিলেন, একশ বছর আপনি মর্ত্ত্যলোকে থাকবেন? গুরু বল্লেন,—বলেছিলাম ত' ঠিকই বাবা, কিন্তু তোমার মত গুরুভক্ত শিষ্য পেলে পঁচিশ বছরেই একশ বছরের কাজ হ'য়ে যায়। (২৬শে শ্রাবণ, ১৩৩৬)

গুরু-ঋণ শোধ

মাতৃঋণ, পিতৃঋণ, গুরুঋণ কেউ শোধ কত্তে পারে না। তাই ব'লে কি কৃতজ্ঞতাও দেখাব না? এই কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্যেই বার্দ্ধক্যে পিতামাতাকে প্রাণান্ত যত্নে প্রতিপালন কত্তে হয়, মৃত্যুর পরে পিণ্ডোদকাদি দিয়ে তাঁদের তুষ্টিকামনা কত্তে হয়। গুরুদক্ষিণা-দানের চেষ্টাও এই কৃতজ্ঞতার রূপান্তর।

এক এক গুরু এক এক প্রকারের দক্ষিণা পেয়ে খুসী হন বা শিষ্যকে কৃতজ্ঞ ব'লে মনে করেন। কারো দক্ষিণা রত্ন, কারো কাঞ্চন, কারো ভূমি, কারো বস্ত্র, কারো ধান্য, কারো গবাদি পশু। কিন্তু আমি তোদের নিকটে এর একটীও চাই না। আমি চাই শিষ্যের যতটুকু শক্তি আছে, ততটুকু দিয়েই জগতের অস্থিমজ্জা-ক্ষয়কারী অব্রহ্মচর্য্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা। (তারিখ নাই, ১৩৩৬ সাল)

দীক্ষামন্ত্রের বৈপ্লবিক শক্তি

এক একটা রাষ্ট্র-বিপ্লব ভারতে যে পরিবর্ত্তন এনেছে, এক একটা দীক্ষা-মন্ত্র তার শতগুণ অধিক আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন আনতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু তার ইতিহাস কখনও লেখা হয় নি।

অ-দীক্ষিতের সাধন-নিষ্ঠা

অনেক ক্ষেত্রে নাম জপিতে জপিতে আপনিই তাহার অর্থ ও শক্তির স্ফুরণ ঘটে। অনেক স্থলে সিদ্ধগুরুর মুখ হইতে শ্রবণের ফলে মন্ত্রের শক্তি আপনা-আপনি প্রকটিত হয়। অনেক সময়ে কৌশল-বিশেষের সহায়তায় মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদিত হয়। পূর্ব্বোক্ত তিনটী অবস্থার মধ্যে কাহারও জীবনে একটী, কাহারও জীবনে দুইটী, কাহারও জীবনে বা তিনটীরই প্রয়োজন ঘটে। কিন্তু যাহার (১) অধ্যবসায়, (২) সিদ্ধগুরুর বাক্যলাভ বা (৩) কৌশল-বিশেষের সহায়তা এই তিনটীরই একাধিকের একযোগে প্রয়োজন হয়, তাহারও হতাশ হইবার কারণ নাই। যেহেতু, একটীকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিলে অপর দুইটী উপযুক্ত সময়ে আপনি আত্মপ্রকাশ করে। সিদ্ধগুরুর কৃপা পাও নাই বলিয়া যদি তোমার মন্ত্র-শক্তির প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে, তবে জানিও, অধ্যবসায়-সহকারে বর্ত্তমান নাম জপিতে জপিতেই একদিন সিদ্ধগুরুর কৃপা সহজ-লভ্য হইবে। আর, প্রকৃত জপকৌশলের অপ্রাপ্তি-নিবন্ধনই যদি তোমার মন বশে না আসিয়া থাকে, তবে জানিও,

অধ্যবসায়-সহকারে ঐ নাম জপিতে জপিতেই ভগবান্ তোমাকে সকল সুকৌশল জুটাইয়া দিবেন। তুমি বিন্দুমাত্রও ভয় করিও না। নির্ভয় থাক। তোমার যাহা যাহা প্রয়োজন, এই নামই তাহা তোমার করতলগত করিবেন। সদ্গুরুর বাণী বা প্রকৃষ্টতর মন্ত্র বা উন্নততর কৌশল যাহারই অভাবে তোমার কল্যাণ ব্যাহত হউক না কেন, এই নাম জপিতে জপিতে তোমার তাহা অচিরে লাভ হইবে। মনে করিও না, এই শ্রম তোমার পণ্ডশ্রম হইতেছে। এখন যে শ্রমটুকু বর্ত্তমান সাধন লইয়া করিবে, তাহা তোমাকে প্রকৃষ্টতর সাধনের যোগ্যতা দান করিবে। তুমি কোনও সন্দেহ বা আলস্য না করিয়া ঐ নামেই শ্রদ্ধা রাখিয়া প্রাণপণে তাহার সেবা কর। এখনও দীক্ষা পাও নাই বলিয়া সাধনে হেলা করিও না। অদীক্ষিতের সকল সাধন বৃথায় যায় বলিয়া সর্ব্বদা যে জনশ্রুতি শুনিতে পাও, তাহা লোককে দীক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে। সম্প্রদায়ী না হইলে সাধন হয় না বলিয়া যে সকল কথা বহু-লোকের মুখে শুনিতেছ, সে সকল কথা অন্য সদুদ্দেশ্যে রচিত হইলেও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের পরিসর-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই রচিত হইতেছে। সুতরাং সেইদিকে মনোযোগ না দিয়া নিজের অভি-মতানুযায়ী নামের সেবাই চূড়ান্ত বিক্রমে করিতে থাক। বাকী পথ তোমার জন্য সময় মত আপনি খুলিয়া যাইবে। ইহা ধ্রুব সত্য জানিও। (১১ই ফাল্গুন, ১৩৩৬)

হঠাৎ গুরু করিতে নাই

তোমাদের কুলগুরুই ত' আছেন। কুলগুরুরা সাধন-ভজন কিছু করেন না, এজন্য এবং অন্যান্য কারণে তাঁদের উপর শ্রদ্ধা হয় না। তাই ব'লে যাকে জান না, চেন না, এমন লোকের কাছে দীক্ষা নেবে? আমার মতে তা' কখনো উচিত নয়। শাস্ত্রে আছে, এক বৎসর কাল পরীক্ষা ক'রে তবে কাউকে গুরু করা উচিত। আজ যাকে গুরু করেছ, কাল যদি দেখা যায়, তাঁর আদেশ পালন তোমার পক্ষে অসম্ভব বা অনুচিত, তখন উপায়টা হবে কি? গুরু করার মানে তাঁর আদেশ পালনের জন্য প্রাণদানে প্রস্তুত হওয়া। ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হ'য়ে গেলেও গুরুর বাক্য লঙ্ঘন করা চল্‌বে না। এই জন্যই হঠাৎ গুরু কত্তে নেই। দীক্ষা নিতে হয় মা, ভাবনা কি? অনেক সুযোগ পাবে।

"গুরু-পরীক্ষা" কথাটার প্রকৃত অর্থ

সদ্‌গুরুলাভ সব সময়ে হয় না, সকলের হয় না। আর শিষ্যের এমন ক্ষমতা কখনো হয় না যে, গুরু-পরীক্ষা ক'রে তাঁর মহত্ত্ব বিচার কত্তে পারে। অতএব, সুযোগ পাওয়ামাত্রই সদ্‌গুরু-কৃপা গ্রহণ কর্ত্তব্য। হাঁ বেটি, ঠিক কথাই বলেছিস্। সমতলের লোক পর্ব্বতশৃঙ্গের উচ্চতা বিচার কত্তে পারে না। কিন্তু তবু গুরুপরীক্ষার প্রয়োজন আছে। এঁকে আমি গুরু কর্ব্ব কি না, এঁর বাক্যকে বেদবাক্য ব'লে গ্রহণ কর্ব্ব কি না, এ

বিষয়ে দিনের পর দিন চিন্তা কত্তে কত্তে গুরুর অবিরত ধ্যান চল্‌তে থাকে। যাদের গুরুভাগ্য প্রবল, এই ধ্যানের ফলে তাদের ভিতরে আত্মসমর্পণ-বুদ্ধি এসে যায়। গুরুকে কি আর পরীক্ষা করা হয়? গুরু-পরীক্ষার নাম ক'রে প্রকৃত প্রস্তাবে শিষ্যের আত্মপরীক্ষাই চল্‌তে থাকে। গুরু কত বড়, সে কথার মীমাংসা অসম্ভব। কিন্তু আমি নির্ব্বিচারে তাঁর আদেশ পালন কর্ব্বে কি না, কত্তে পারব কিনা, তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ কত্তে বল্লে হাসি-মুখে তা' কত্তে পারব কিনা, তাঁর আশিষ লাভ কল্লে বজ্রাঘাতকেও মাথা পেতে নিতে পারব কি না,— এই আত্ম-বিচারই গুরু-পরীক্ষার উপলক্ষ্যে চল্‌তে থাকে। যখন শিষ্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গুরুর প্রতি অনুরক্ত ব'লে অনুভব করে, তখন গুরু সিদ্ধপুরুষ কি সামান্য ব্যক্তি, সে প্রশ্নই তার মনে আর আসে না।

স্ত্রীলোকের দীক্ষা

এ ত' গেল এক দিকের কথা। আরো একদিকের কথা আছে। তোমরা ত' মা স্ত্রীলোক। স্বামীর সাহচর্য্য ছাড়া স্ত্রীলোকের দীক্ষা হ'তে পারে না। স্বামী ও স্ত্রী এক সঙ্গে মিলে ভগবানের পথে চল্‌বে, এটাই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু স্বামীর যদি ধর্ম্ম-কর্ম্মে রুচি না থাকে, তিনি যদি দীক্ষা নিতে ইচ্ছুক না হন, এ অবস্থায় স্ত্রী কি সাধন-ভজন কর্ব্বে না, দীক্ষা নেবে না? দীক্ষা নেবে, কিন্তু স্বামীর অনুমতি নিয়ে।

স্বামী যদি কিছুতেই অনুমতি না দেন, তিনি যদি দেব-দ্বিজ-বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর মত হন, তাহ'লে? তাহ'লে হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী কয়াধুর মতন স্বামীকে না জানিয়েই ভগবান্‌কে ডাকতে হবে, স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা না ক'রেই সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিতে হবে।

সদ্‌গুরুর অহেতুকী কৃপা

শাস্ত্রে আছে, শিষ্যের এক বৎসরকাল গুরু-পরীক্ষার দরকার। শাস্ত্রে আরো আছে যে, এক বৎসরকাল শিষ্যকেও পরীক্ষা কত্তে হবে, তারপরে গুরু দীক্ষা দেবেন।

অথচ প্রায়ই আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, এক একজন মহাপুরুষ এক এক সময়ে এসে দলে দলে নরনারীকে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে দীক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। এর কারণ কি? এর কারণ তাঁদের অহেতুকী কৃপা। শিষ্য-পরীক্ষার জন্য তাঁদের এক বৎসর অপেক্ষা কত্তে হয় না, সূক্ষ্মদৃষ্টির বলে তাঁরা শিষ্যের ভিতরের সব সংস্কার, গঠন ও উপাদান কটাক্ষের মধ্যেই বুঝে ফেলেন। তবে কোনো কোনো শিষ্যের ভিতরে এই সম্পর্কে একটু দুর্ব্বলতাও থেকে যায়। সেটা হচ্ছে, গুরুর বিষয়ে বিশেষ কিছু জানাশুনা না থাকাতে, দু'চার দিন সাধনের পরেই নানা রকম খট্‌কা এসে চিত্তকে পীড়িত ও সংশয়ক্লিষ্ট কত্তে থাকে। এর ফলে অনেক সময় সে জ্ঞানোপদেশ আহরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে মিশে ধর্ম্মমত ও সাধন-ভজনের একটা খিচুড়ী পাকিয়ে বসে।

সদ্‌গুরু কি এই বিপদ থেকে শিষ্যকে রক্ষা কত্তে পারেন না? নিশ্চয়ই পারেন এবং রক্ষা করেনও। কিন্তু ব্যাপারটা কি রকম হয় জানো? যেমন কোনো কোনো মুসলমান নারী স্বামীর কাছ থেকে তালাক্ পেয়ে কতকদিন আর একজন পুরুষের সঙ্গ করার পরে পূর্ব্ব স্বামীকে ফিরে গ্রহণ করে। সদ্‌গুরুর শিষ্যেরাও নানা ঘাটের জল খেয়ে শেষে ঐ আদি-গুরুর পায়ের তলায়ই ফিরে আসেন। তার চেয়ে আমি বলি, অত ঝঞ্ঝাটের কাজ কি, মহাপুরুষরা কৃপা বিলাচ্ছেন, ভাল কথা, তাঁর উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর তুমি করবে কি না, কিম্বা স্বামীর গূঢ় কথা উপপতির কাছে গিয়ে বল্‌বার দরকার পড়বে, সেইটি বেশ ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে নিয়ে তারপরে তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে হয় ত' নাও। সদ্‌গুরু নিজশক্তিতে তোমাকে কাছে টানবেনই। তবু যেচে সেধে সংশয়ের মূল রেখ না।

উন্মার্গগামী শিষ্যের গুরু হওয়ার ক্লেশ

অনেকে ভাবে, গুরু দীক্ষা দিয়েই বুঝি খালাস। অনেকে মনে করে, দীক্ষাদানকালেই গুরু তার যা কিছু দেবার সবই শিষ্যকে দিয়ে দিলেন, শিষ্যের জন্য আর কিছু তাঁর দেবার নেই, ভাববারও নেই। সত্য বটে, দীক্ষাদানকালে গুরুর পুঞ্জীভূত আধ্যাত্মিক শক্তি ইষ্টনামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সুকৌশলে শিষ্যের ভিতরে প্রবেশ করে, কিন্তু শিষ্যের মঙ্গলামঙ্গল তিনি

অহর্নিশ প্রত্যক্ষ কচ্ছেন। বিপথগামী শিষ্যের জন্য তাঁর উদ্বেগের অবধি নেই, মনোবেদনার অন্ত নেই। মনোধর্ম্মের অতীত হ'য়েও তিনি নিয়ত শিষ্যকে নিত্যকল্যাণের পথে ফিরিয়ে আনবার জন্য ব্যাকুল। কত গুরু শিষ্যকে বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্য কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন, তা' তোমরা জানো? কত গুরু শিষ্যের জীবন থেকে উচ্ছৃঙ্খলতার কালিমা দূর করার আবেগে পথে পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন, তা' জানো? কত গুরু শিষ্যের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাগুলিকে ধ্বংসোন্মুখ দেখে শোকে হৃৎপিণ্ড চিরে শোণিতোৎগিরণ করেছেন, তা' জানো? উন্মার্গগামী শিষ্যের জন্য গুরুকে আহার ভুলতে হয়, নিদ্রা ত্যাগ কর্ত্তে হয়। বাবা হে, শিষ্য হওয়াও সহজ নয়, গুরু হওয়াও বড় সামান্য কথা নয়।

(৮ই বৈশাখ, ১৩৩৮)

অসাত্ত্বিক দীক্ষা

সত্যিকার দীক্ষার আকাঙ্ক্ষা অতি অল্প লোকের প্রাণেই জাগে। অধিকাংশের আকাঙ্ক্ষাই অসাত্ত্বিক। কেউ আসে রোগ সারাবার জন্য দীক্ষা নিতে, কেউ আসে হারাণো গরু ফিরে পাবার জন্য দীক্ষা নিতে, কেউ আসে সম্পত্তি-নিলাম নিবারণের জন্য দীক্ষা নিতে। এসব লোককে যারা দীক্ষা দেয়, সে সব গুরুর অনন্তকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ কর্ত্তে হয়।

প্রকৃত দীক্ষার্থীর লক্ষণ

আজ যা বিপদে পড়েছিলাম, নিতান্তই ভগবান্ নিষ্কৃতি দিলেন। নইলে পা চাট্‌তে চাট্‌তে নূতন শিষ্যেরা আজ আমাকে উদরস্থ ক'রে ফেল্‌ত।

প্রকৃত দীক্ষার্থী দেখ্‌লেই চেনা যায়। "দীক্ষা চাই" ব'লে ষাঁড়ের মত চেঁচালেই সে দীক্ষা পাবার যোগ্য হ'য়ে গেল? প্রকৃত দীক্ষার্থীকে মুখ ফুটে বল্‌তেও হয় না যে, দীক্ষা চাই। তার প্রাণের ব্যাকুল আবেগ গুরুর চিত্তে গিয়ে এমন এক কোমলতা সৃষ্টি করে, যাতে গুরু তাকে নিজের গরজে কোলে তুলে নেবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে পড়েন। তার স্বভাবে এমন একটা নম্রতা, এমন একটা কমনীয়তা ফুটে ওঠে, তার বাক্যে, আচরণে এমন একটা মধুরতা, এমন একটা মমতা আত্মপ্রকাশ করে, যার আকর্ষণ গুরু কিছুতেই উপেক্ষা কত্তে পারেন না।

দীক্ষাদানে গুরুর শক্তিক্ষয়

দীক্ষাদানে গুরুকে নিজ সাধন-শক্তির ব্যয় কত্তে হয়। শুধু একটা ইড়িং-বিড়িং ব'লে দিলেই দীক্ষা হ'ল না। এই শক্তির ব্যয়কে সাধনের দ্বারা গুরুকে নিরন্তর পূরণ ক'রে নিতে হচ্ছে। তা' হ'লেই বুঝতে পাচ্ছ, যার-তার জন্য শক্তিক্ষয় কত্তে কেউ রাজি হবে না। কষ্ট ক'রে যাকে শক্তি-সঞ্চয় কত্তে হয়েছে, শক্তির বৃথা ব্যয়কে সে কিছুতেই বাঞ্ছনীয় মনে কত্তে পারে না।

এইজন্যেই দেখা যায়, অনেক উগ্রতপা মহাপুরুষ সমস্ত জীবনে একটী দু'টীর বেশী চেলা করেনই না।

এটা কি ভাল? ভাল বৈকি! একটী দু'টী ত্যাগী সুপাত্রের পিছনে নিজেদের সমগ্র শক্তি উৎসর্গ ক'রে তাঁরা এক একটা হীরের টুকরো গ'ড়ে যান্। আর, তোমাদের মত গরুর পাল যাদের চরিয়ে বেড়াতে হয়, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তাদের চ'খে বন্যা বইতে থাকে হে, বন্যা বইতে থাকে।

তবু রক্ষা, তোমরা কেউ রোগ সারাবার জন্য বা মামলা জিতবার জন্য আমার কাছে আস নি। (১২ই বৈশাখ, ১৩৩৮)

দীক্ষা ও শিক্ষা

দীক্ষা পাওয়ার মানে, কি কত্তে হবে, সেইটী পাওয়া। আর শিক্ষা পাওয়ার মানে, কেন কত্তে হবে, সেইটী জানা। দীক্ষা দেয় ধর্ম্ম-জীবনের programme বা সাধন, আর শিক্ষা দেয় ধর্ম্মমতের philosophy বা দর্শনশাস্ত্র। দীক্ষায় লভ্য তপস্যার পন্থা, শিক্ষায় লভ্য তপস্যার রুচি। দীক্ষার ফল পথে নামা, শিক্ষার ফলে দ্রুত গমন।

দীক্ষা-গুরু ও শিক্ষা-গুরু

জীবনের পরম পথের সন্ধান যিনি ব'লে দেন, তিনি হ'লেন দীক্ষা-গুরু; এই পথের শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়ে নানা যুক্তি-বিচার-বিতর্কাদি সহকারে যিনি সাধককে সাধন-বিষয়ে অহরহ উৎসাহ যোগান, তিনি হলেন শিক্ষা-গুরু। দীক্ষা-গুরু মানে পরমবস্তুর

দাতা, শিক্ষা-গুরু মানে পরমবস্তুর প্রতি নিজ বাক্য ও আচরণের দ্বারা অনুরাগবর্দ্ধনকারী। যাঁর উপদেশ বা নিজ জীবনের ধর্ম্মানুশীলনের দৃষ্টান্ত তোমাকে দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধনে অত্যন্ত উৎসাহ-সম্পন্ন, রুচিমান্ ও অনুরাগী করে, তাঁকে বলে শিক্ষা-গুরু। ভক্তিমান্ শিষ্যের চক্ষে দীক্ষা-গুরু স্বয়ং পরমাত্মার প্রতীক স্বরূপ, আর শিক্ষা-গুরু দীক্ষা-গুরুতে নিষ্ঠার বর্দ্ধক পরমহিতৈষী বান্ধব।

শিক্ষা-গুরুর নিকটও কি মন্ত্রাদি গ্রহণীয়

দীক্ষা-গুরু যা দিয়ে গেলেন, তার কাজ ক'রেই জীবনে কুলোয় না, আবার তুমি যাবে শিক্ষা-গুরুর কাছে আর একটা মন্ত্র নিতে? এর মত মারাত্মক ব্যাপার কি আর কিছু আছে? আর দীক্ষা-গুরু শুধু একজনই হ'তে পারেন। যাঁর পায়ে সর্ব্বস্ব তুমি নির্ভয়ে বিকিয়ে দিতে পার, তিনিই তোমার দীক্ষা-গুরু বা গুরু। শিক্ষা-গুরু একজন, দশ জন, শত জন বা সহস্র জনও হ'তে পারেন। যিনি তাঁর দৃষ্টি, বাক্য বা কর্ম্মের দ্বারা, স্নেহ, উপদেশ বা দৃষ্টান্তের দ্বারা তোমার চিত্তকে সর্ব্বসন্তাপ-হারী গুরুর পাদপদ্মের প্রতি আকৃষ্ট করার সাহায্য কত্তে পারেন, তিনিই তোমার শিক্ষাগুরু বা উপগুরু। যিনি স্থিত-প্রজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ, নিত্যচৈতন্যময়, পরমানন্দবিগ্রহস্বরূপ, অতুলন পুরুষ, তিনি হ'তে পারেন দীক্ষা-গুরু। সাধনের অবস্থাভেদে উচ্চনীচ সর্ব্বাবস্থা-সম্পন্ন যে-কোনও সাধক পুরুষ হ'তে পারেন

তোমার শিক্ষাগুরু। যেখানে শিক্ষাগুরু আর দীক্ষা-গুরুর উপদেশের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনে তুমি অশক্ত, সেখানে সর্ব্বতোভাবে দীক্ষা-গুরুই প্রামাণ্য, শিক্ষা-গুরু অপ্রামাণ্য। দীক্ষা-গুরু বেদস্বরূপ, শিক্ষা-গুরু স্মৃতিস্বরূপ, জ্ঞানী শিক্ষা-গুরু মনুসংহিতাস্বরূপ, স্বল্পজ্ঞানী শিক্ষা-গুরু অর্ব্বাচীন সংহিতা-স্বরূপ। অন্য সংহিতার সহিত মতভেদে মনুস্মৃতি প্রামাণ্য। স্মৃতি ও বেদে বিরোধ-স্থলে বেদবাক্যই প্রামাণ্য।

পুনর্ম্মন্ত্রপ্রদায়ী শিক্ষা-গুরুর আবির্ভাবের ঐতিহ্য

এক শ্রেণীর গুরু আছেন, যাঁরা নিজদিগকে শিক্ষা-গুরু নামে পরিচিত করেন এবং শিষ্যদের কাণে নূতন মন্ত্র উচ্চারণ করেন। এঁদের আবির্ভাব হ'য়েছে বৈষ্ণবধর্ম্মের বহুল প্রচারের পর থেকে। এক এক জন বৈষ্ণব মহাপুরুষ কীর্ত্তন ও উৎসবাদির দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার ক'রে এক এক অঞ্চলে দৈনিক হয়ত শত শত শিষ্যকে দীক্ষামন্ত্র দান ক'রে যেতেন। কৃষ্ণমন্ত্র শিষ্যদের দান করা হ'ল সত্য, কিন্তু পূর্ব্ব থেকে শিষ্যদের ভিতরে সাধন-তত্ত্বের রসাদি সম্বন্ধে উপযুক্ত উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করা ত' আর হয়নি! এখনো দেখ্‌তে পাবে, এক একটা মহোৎসব উপলক্ষে আধুনিক মহাপুরুষেরা দৈনিক শত সহস্র ক'রে অদীক্ষিত লোককে দীক্ষা দিচ্ছেন। এত লোককে সাধন সম্পর্কে সমগ্র দার্শনিক তত্ত্বটা শিক্ষা দেবার অবসর

দীক্ষাদাতার পক্ষে হ'য়ে ওঠা অসম্ভব। সুতরাং তিনি তাঁর নিজ শিষ্যদের মধ্যেই এক এক জনকে নির্ব্বাচিত ক'রে এক এক কেন্দ্রের শিক্ষাদাতারূপে রেখে গেলেন। কালক্রমে গুরু-গিরির লোভ এ-সব শিক্ষাদাতাদের মধ্যে প্রবেশ কর্ত্তে আরম্ভ কর্লে। গুরু দিয়ে গেছেন এক কর্ণে ফুৎকার, তখন শিক্ষক বাকী কর্ণ-টাকে আর এক ফুৎকারে অধিকার কর্লেন। অজ্ঞ জন-সাধারণকে ভুলান ত' পণ্ডিত লোকদের পক্ষে কঠিন কাজ নয় বাপধন! তাই, শিষ্যকে যাতে অমুক গুরুর বা তমুক গুরুর তামাক সাজ্‌তে সাজ্‌তে দুর্লভ মানব-জন্ম বৃথা কাটিয়ে দিতে না হয়, তার জন্য দীক্ষাদাতা গুরুরই প্রয়োজন পূর্ব্ব থেকেই শিষ্যের হৃদয়কে যথা-সম্ভব রসমধুর ক'রে তুলে তাতে আনন্দময় নাম-দীক্ষা ঢেলে দেওয়া। এ কাজটা হচ্ছে যেন, জমি ভাল ক'রে চাষ ক'রে তারপরে বীজ বোনা। আর, দীক্ষা দিয়ে তারপরে বাকীটুকু শিক্ষাগুরুর উপরে অর্পণ করা হচ্ছে যেন, বীজ বুনে জমি চাষ করা, আগাছা বাছা,—এই চাষে অনেক সময়ে আসল বীজ চাষের ঠেলায়ই পঞ্চত্ব পায়, অথবা আগাছা বাছ্‌তে গিয়ে আসল গাছ উপড়ে ফেলা হয়। বৈদিক যুগের গুরু এই নিকৃষ্ট পন্থাকে গ্রহণীয় মনে করেন নি।

বৈদিক দীক্ষিতের তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ ও তদ্বিপরীত (vice-versa)

শিক্ষাগুরু যে ধর্ম্মজীবনে অতি প্রধান স্থান গ্রহণ ক'রে বস্‌লেন, তার অন্য কারণও আছে। দীক্ষাদাতা যেখানে নিস্তেজ,

নির্বীর্য্য, সেখানে শিক্ষাদাতা এসে দীক্ষাদাতার স্থান গ্রহণ কর্বেন না? অধিকাংশ মানব-মানবীই একজনকে জীবন-তরণীর কাণ্ডারীরূপে গ্রহণ না ক'রে ভব-সমুদ্র পাড়ি দিতে ভয় পায়। দীক্ষা-গুরু যদি নিজ যোগ্যতায় সে আসন দখল ক'রে রাখ্‌তে না পারেন, শিক্ষাগুরুকে সে আসন প্রদান করাই ত' কর্ত্তব্য হবে! নইলে এ বেচারীদের উপায় কি? বৈদিক সাবিত্রী-দীক্ষার পরেও লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণসন্তান আবার তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ কচ্ছে। তার কারণ এই যে, বর্ত্তমান কালের গায়ত্রীর দীক্ষাদাতা নিজ তপস্যার শক্তিতে দীন। তাঁর দেওয়া সাধন যতই অব্যর্থ হোক্, শিষ্য তা' গ্রহণ ক'রে তৃপ্তি পায় না। তাই দু'দিন পরে তান্ত্রিক দীক্ষা পুনরায় একটা নেয়। আবার কায়স্থ-শূদ্রাদিবর্ণ, যারা বৈদিক গায়ত্রী-দীক্ষায় এতদিন অনভ্যস্ত ব'লে অবাধে তান্ত্রিক দীক্ষা পেয়ে আস্‌ছে,—দীক্ষা-দাতাদের জীবনে পূর্ণতার প্রভা দেখ্‌তে পাচ্ছে না ব'লে তান্ত্রিক দীক্ষা লাভ করার পরেও পুনরায় যজ্ঞোপবীত ধারণ ক'রে গায়ত্রী মন্ত্রে বৈদিক দীক্ষা গ্রহণ কচ্ছে। গুরু নাই, তাই শিষ্যের এ দুর্গতি। নইলে বৈদিক দীক্ষার পরে পুনরায় তান্ত্রিক দীক্ষা যেমন নিষ্প্রয়োজন, তান্ত্রিক দীক্ষার পরেও বৈদিক দীক্ষা তেমন নিষ্প্রয়োজন। (১৫ই বৈশাখ, ১৩৩৮)

রজঃস্বলা নারীর গুরু-প্রণাম

প্রশ্ন।—রজঃস্বলা নারী কি নিজ গুরুদেবেরও পাদস্পর্শ

ক'রে প্রণাম কত্তে পারে না? তার যদি জ্ঞান থাকে যে, গুরুদেবই সর্ব্বদেবদেব?

উত্তর।—তিনটী দিন বই ত নয়। আর্য্য-সদাচার লঙ্ঘন করা আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

প্রশ্ন।—গুরুদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্পর্শ কল্লে?

উত্তর।- তাতে নিষেধ নেই, যদি এই প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ না হ'য়ে থাকে। (১৯শে বৈশাখ, ১৩৩৮)

বীজ-বিতরণই সদ্‌গুরুর কাজ

মানুষের মনেও এই খিল জমিটারই মত উপযুক্ত বীজের অভাবে শুধু কণ্টকের বীজই অঙ্কুরিত হচ্ছে, শাখাপত্রে প্রবৰ্দ্ধিত হচ্ছে। বটবৃক্ষের বীজ যদি এখানে কোনো রকমে পড়ে, তাহ'লে ক্রমশঃ বটের ছায়ায় চতুৰ্দ্দিক অন্ধকার হ'য়ে পড়্‌বে, কাঁটার গাছ আপনি নিৰ্জ্জীব হ'য়ে যাবে, ক্রমে হয়ত এই বটবৃক্ষকে অবলম্বন ক'রে কত নরনারী অখণ্ড-দেবতার পূজা কর্ব্বে। এই রকম সব খিল জমিতে বটের বীজ ছড়িয়ে যাওয়াই সদ্‌গুরুর কাজ।

এখন যেমন বীজ ছড়ালাম, এই রকম ক'রে বীজ ছড়ালে তাতে বটের গাছ নাও হ'তে পারে। কাকের পেটে গিয়ে জঠরানলের উত্তাপে যে বীজের বাহ্য আবরণ অনেকটা দুৰ্ব্বল হ'য়ে পড়েছে, ভিতরের শক্তি যার অতি সামান্য আনুকুল্যেই প্রকাশ পেতে পারে, তেমন বীজ চাই। তাতে শতকরা একশটা বীজেই গাছ গজায়।

বুঝতে পারিস্ নি ? সদ্‌গুরু হচ্ছেন কাক, অর্থাৎ কাকের মত যাযাবর, এক দেশ হ'তে অপর দেশে ভ্রমণ ক'রে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বটের বীজ ছড়িয়ে যাচ্ছেন,—যে বটফল তিনি নিজে খেয়েছেন, স্বাদ্ পেয়েছেন, যার সত্ত্বাকে তিনি জীর্ণ ক'রে পুষ্ট হয়েছেন, যে ফল তাঁর প্রাণকে দিয়েছে স্থৈর্য্য, মনকে দিয়েছে তুষ্টি, দেহকে দিয়েছে বল, আর রসনাকে দিয়েছে তৃপ্তি। (২১শে বৈশাখ, ১৩৩৮)

দীক্ষা নিবার রোগ

দীক্ষার ব্যারাম হয়নি ত' তোদের ? কলেরা, নিমোনিয়া, প্লেগ, যেমন এক একটা রোগ, দীক্ষা-গ্রহণ নামেও তেমন একটা রোগ আছে! এই রোগ কোনো কোনো সময়ে এক এক অঞ্চলে অতি ভয়ঙ্করভাবে সংক্রামক হ'য়ে পড়ে। তখন আর পাত্রা-পাত্রের বিচার থাকে না, যে জন্মে কখনো সাধন কর্ব্বে না, সেও একটা দীক্ষা নিয়ে রাখে, অর্থাৎ যদিই নেহাৎ মরণকালেও কাজে আসে! কারো কারো রোগ-লক্ষণ এমনি প্রকাশ পায় যে, একটা-মাত্র দীক্ষা নিয়েই চুকে যায় না, গণ্ডায় গণ্ডায় গুরু করে, কুড়িতে কুড়িতে উপগুরু করে আর, ঝুড়িতে ঝুড়িতে মন্ত্র আর 'ইড়িং বিড়িং' ভার বোঝাই ক'রে বাড়ী নিয়ে যায়। সে রকম ব্যারাম ত' বাবা তোমাদের হয় নাই ?

দীক্ষা দিবার রোগ

দীক্ষা দেবারও একটা রোগ আছে। পাত্রাপাত্র বিচার নেই, 'হুং ফট্ স্বাহা' একটা কাণের মধ্যে ফুঁকে দেওয়াই চাই। এই ব্যারাম বাবা আমার হ'য়েছিল। কুকুর ডাকুছে ঘেউ ঘেউ ক'রে, আমার ইচ্ছে হ'য়েছে তার কাণের মধ্যে একটা 'হুং ফট্' ফুঁকে দিয়ে আসি। রাত দুপুরে শেয়ালগুলি ডাকুছে হুক্কাহুয়া, আর আমার ইচ্ছে হয়েছে তাদের কাণে একটা ক'রে দীক্ষামন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়ে আসি। সাপ, বাঘ, কুমীর কাউকে বাদ দিতে ইচ্ছে হয়নি। এই রেল-রাস্তার পাথরগুলিই বা মন্দ কি, এদের কাণেও একটা ক'রে মন্ত্রপূত ফুৎকার দিতে ইচ্ছে হয়েছে। এর ফলও হয়েছে চমৎকার। ডাইনি বুড়িকে মন্ত্র দিয়ে শিষ্য কত্তে গেলাম, সে রাখ্‌লে আমার কাণ কেটে। জুজু-বুড়ীকে মন্ত্র দিয়ে শিষ্য কত্তে গেলাম, সে দিল আমার নাক ফু'ড়ে। কালনেমির গোষ্ঠীকে মন্ত্র দিয়ে শিষ্য কত্তে গেলাম, সবাই মিলে তারা দিল আমার সবল, পেশল, বিক্রমপরায়ণ বাহুযুগল দ্বিখণ্ডিত ক'রে। যারা শিষ্য ব'লে কালও আমি ছিলাম জগদ্‌গুরু, আজ তারা শিষ্য ব'লেই আমি একেবারেই ঠুঁটো জগন্নাথ। শুন্‌বে মজার কথা? এইমাত্র আস্‌ছি আমি শিষ্যগৃহ থেকে, এরা শিষ্য ব'লে আমার কত মান, কিন্তু দুদিন না যেতে এরাই করবে আমাকে অপদস্থ ও হতমান।

গুরু-শিষ্যের অধীনতা ও স্বাধীনতা

গুরু শিষ্যের অধীন, শিষ্যও গুরুর অধীন,—এটা সনাতন সত্য। কিন্তু কতটুকু অধীন ? একজন অপরের কাছে যতটুকু অধীন, অপরে তার কাছে ততটুকুই অধীন। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ মূলতঃ আধ্যাত্মিক। বিশেষতঃ এ পর্য্যন্ত অধিকাংশ গুরুই কর্ম্মযোগে ঝাঁপ দেন নাই ব'লে এবং যাঁরা কর্ম্মযোগের পথে গিয়েছেন, তাঁরা নিজ নিজ শিষ্যদের কাছ থেকে implicit obedience (দ্বিধাহীন আনুগত্য) আদায় ক'রে নিয়েছেন ব'লে গুরু-শিষ্যের মধ্যে অধীনতা ও স্বাধীনতার কোনো প্রশ্ন এ পর্য্যন্ত উঠে নাই। কিন্তু কারো ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধিকে ব্যক্তিত্বের তর্জ্জনী-হেলনে পঙ্গু ক'রে দেওয়া আমার আদর্শ-বিরোধী ব'লে আমি কখনো তোমাদের কাছে বশ্যতা দাবী করি নি। নিজ নিজ রুচি, শক্তি ও প্রতিভা অনুযায়ী কর্ম্ম ক'রে যাওয়ার স্বাধীনতা তোমাদের দিয়েছি। আমার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মধারার সঙ্গে জোর ক'রে তোমাদিগকে গেঁথে রাখ্‌বার জন্য কোনো চেষ্টা করি নি। কারণ, আমি জানি, আমাকে কর্ম্ম-জীবনেও যারা অনুসরণ কর্ব্বে, তারা কেনো ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকির ফলে আস্‌বে না, নিজের সর্ব্বস্ব উজাড় ক'রে ঢেলে দিবার জন্য নিজেদেরই প্রাণের প্রেরণায় আপনি ছুটে আসবে।—গুরু যখন শিষ্যকে সাধন দিয়েও কর্ম্মজীবনে স্বাধীনতা দেন, তখন বুঝতে হবে, তিনি নিজেও শিষ্যের interference (হস্তক্ষেপ) চান না। (২২শে বৈশাখ, ১৩৩৮)

সাধকের দৃষ্টিতে গুরু

কোনও কোনও সাধকের জন্য শ্রীগুরু বিগ্রহবান্ পরমাত্মা-স্বরূপ। তদ্রূপ সাধকের জন্য শ্রীগুরু সর্ব্বরূপৈশ্বর্য্যের আধার আনন্দময় চিৎশক্তিস্বরূপ। সেই সাধকের জন্য গুরু পূজ্য, উপাস্য ও ইষ্ট। অপরের জন্য নহে। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত মানববৃন্দের পিপাসার প্রকৃতি গুরু-প্রতীকে চিত্ত-সমাধানের অনুকূল নহে। এজন্য তাহাদের নিকটে গুরুতত্ত্ব তাহাদের সাধন-নিষ্ঠা বর্দ্ধনের সহায়ক-রূপেই ব্যাখ্যাত হওয়া সুসঙ্গত।

(২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮)

গুরু-দক্ষিণা

প্রশ্ন :—দীক্ষা গ্রহণের পর গুরুদক্ষিণা দেওয়ার প্রয়োজন কি? গুরুদক্ষিণা দিতে গেলে ত' একটা দান-প্রতিদানের ব্যাপার এসে গেল, একটা দোকানদারী গোছের হ'ল।

উত্তর :—তোমাদের কাছে আমার কিরূপ গুরুদক্ষিণার দাবী জানো? অকৃতদার বালক তোমরা, তোমাদের কাছে আমার প্রার্থনা নিজে ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং অপরকে ব্রহ্মচর্য্য-বিষয়ে উৎসাহ দান। যাবৎকাল সংসার-প্রবিষ্ট না হচ্ছ, তাবৎকাল ইচ্ছাকৃত বীর্য্যক্ষয় একেবারে সম্যক্‌রূপে বন্ধ রাখ্‌তে হবে এবং অনিচ্ছাকৃত অজ্ঞাত বীর্য্যক্ষয় যাতে ক'মে যেতে পারে, তার জন্য ব্যায়াম, উপাসনা, সৎপ্রসঙ্গ, সচ্চিন্তা, সৎকথা ও সদ্‌বুদ্ধির সেবা করবে। সংসার-প্রবেশের পরেও যাতে বৃথা

জৈব ব্যবহারের প্রাচুর্য্য না ঘট্‌তে পারে, তার জন্য চেষ্টিত হবে। সংসারীকে আপ্রাণ প্রয়াস পেতে হবে, যাতে তার সন্তান-সন্ততিগুলি বীর্য্যহীন, রুগ্ন, দুর্ব্বলচেতা হ'য়ে জন্মাতে না পারে। এতদ্ব্যতীত জীবনের যে সময়ে যে অবস্থাতেই থাক না কেন, সুখ-দুঃখ সম্পদ-বিপদ সর্ব্বাবস্থাতেই সংযম ও সতীত্বের অনুকূল ভাব নরনারী সর্ব্বসাধারণের ভিতরে প্রচার কর্ত্তে চেষ্টা কর্ব্বে। এই হবে আমার সন্তানদের গুরুদক্ষিণা। আমার কোনও সংসার নেই যে পোষণ কর্ব্বার জন্য তোমাদের অর্থ দরকার হবে। আমার আশ্রম? সে আজ আছে ত' কাল হয়ত থাকুবে না। স্থায়ী হবে ব'লে আমি কোনও আশ্রমের জন্য শ্রম কচ্ছি না। থাকুবে না জেনেই প্রাণান্ত শ্রম কচ্ছি। অর্থ আমাকে দিতে হবে না। আমি কাঙ্গাল তোমাদের চরিত্র-ধনের। (১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮)

গুরুমূর্ত্তি ধ্যান

প্রশ্নকর্ত্তা ঃ—কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা এসবে আমার বিশ্বাস নেই।

উত্তর।—কেন বিশ্বাস নেই?

প্রশ্নকর্ত্তা।—পুরাণে অনেক কাহিনী পাঠ করি, যার পরে আর এঁদের প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি আসে না, মানুষের মত মনে হয়। তার জন্যই ভগবানের জন্য ব্যাকুল চিত্ত আর ঐ সব রূপের ভিতরে নিজেকে আটক ক'রে রাখ্‌তে চায় না।

উত্তর।—তবে কোন্ রূপ ধ্যান কত্তে তোর ভাল লাগে?

প্রশ্নকর্ত্তা।—মাঝে মাঝে গুরুমূর্ত্তিই ধ্যান কত্তে আনন্দ পাই। কালী কৃষ্ণ শিব দুর্গা কাউকে কখনো চ'খে দেখি নি, পটের ছবিগুলিও পরস্পর থেকে বিভিন্ন, এজন্য প্রত্যক্ষদৃষ্ট গুরুমূর্ত্তিই ধ্যান কত্তে ভাল লাগে।

উত্তর।—গুরুও ত' মানুষই বটেন! এই দেখ্ আমার হাত, পা, চোখ, নাক, কাণ সবই তোদের মত। তোদের মত আমার আহার-নিদ্রা। তোদের মত আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মলবেগ, মূত্রবেগ। তোদের মত আমার স্বাস্থ্য, অস্বাস্থ্য, ভালমন্দ সবই আছে। তবে আমার মূর্ত্তি ধ্যান ক'রে কি লাভ হবে?

প্রশ্নকর্ত্তা।—গুরুমূর্ত্তি ধ্যানের সময়ে গুরুর মানুষ-ভাবটাকে মন থেকে দূর ক'রে দিয়ে তার চিন্ময় পরমাত্ম-ভাবটির ধ্যান করি।

উত্তর।—উত্তম। তা হ'লে কালী, কৃষ্ণ, শিব, গণেশ এঁদের সম্পর্কেও মন থেকে মানুষ-ভাবটাকে দূর ক'রে দিয়ে পরমাত্মভাব নিয়ে ধ্যান কল্লে কি হয় না?

প্রশ্নকর্ত্তা।—কালী, কৃষ্ণ, শিব, গণেশ অপ্রত্যক্ষ দেবতা, গুরু সাক্ষাৎ দেবতা। এজন্য গুরুমূর্ত্তি ধ্যানেই জোর আসে বেশী।

উত্তর।—তোরা জানিস্, আমি আমার প্রতিষ্ঠিত আশ্রম-গুলিতে আমার মূর্ত্তি পূজা কত্তে নিষেধ করেছি?

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু ভক্তেরা যদি জোর ক'রে আপনার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রে ফেলে, তখন আপনি কি কর্ব্বেন?

উত্তর।—ফটো আমারই হোক আর তোমারই হোক, কোনও একটা প্রতীক যদি কোথাও ব্রহ্মানুভূতিলাভের সাহায্যার্থে পূজিত হয়, তবে তা' কখনই জোর ক'রে ফেলে দিতে পারি না। কিন্তু যাতে আমার প্রতিমূর্ত্তি কেউ পূজা না করে, এই অনুরোধ আমি ক'রে রাখ্‌ছি।

প্রশ্নকর্ত্তা।—আপনার এই অনুরোধ ভক্তেরা রাখ্‌লে হয়।

উত্তর।—এ অনুরোধ রক্ষা করা কারো কারো পক্ষে যে কত কঠিন, তা' আমি বুঝি। তবু আমি চাই না যে, আমার মূর্ত্তির পূজা হোক্। গুরুর প্রত্যেকটী আচরণ যার চক্ষে অনিন্দনীয়, গুরুর প্রত্যেকটী অঙ্গভঙ্গী যার নিকটে দেবজনোচিত, গুরুর প্রত্যেকটী বাক্য যার বিচারে অভ্রান্ত বেদমন্ত্র, এমন ভক্তিমান্ সুপাত্রের পক্ষে গুরুধ্যানের চেয়ে উৎকৃষ্ট অবলম্বন আর কিছু হ'তে পারে না। কিন্তু তবু আমি চাই না যে, তোমরা কেউ আমার প্রতিমূর্ত্তির অর্চ্চনা কর।

গুরু ও শিষ্য একই বস্তু

প্রশ্নকর্ত্তা।—আমরা যদি কেউ জবরদস্তি ক'রে পুজো করি?

উত্তর।—আচ্ছা বেশ, ক'রো, কিন্তু ইড়িং বিড়িং কিড়িং মন্ত্রের আমদানী ক'রো না। পূজো করো, কিন্তু আমার

প্রতিমূর্ত্তি অর্চ্চনার সময়ে এই জ্ঞানটী অন্তরে জাগিয়ে রাখো যে, তুমি আর আমি একই বস্তু, দুজনাতে ভেদ নেই, পার্থক্য নেই, দূরত্ব নেই। আমিই তোমার রূপ ধ'রে শিষ্য হ'য়েছি, তুমিই আমার রূপ ধ'রে গুরু হ'য়েছ। এই ভাবনাকে জোর দেবার জন্য আমার প্রতিমূর্ত্তির সঙ্গেই বা নীচেই সমায়তন একখানা আয়না রে'খ। সেই আয়নাতে নিজের মুখ দেখ, আর প্রতিমূর্ত্তিতে আমার মুখ দেখ। উভয় মুখের ভিতরে পরম-কারণ পরমাত্মাকে দেখ। তাঁর দিব্যস্মৃতি যাতে মন থেকে নিমেষের জন্যও না দূরে স'রে যেতে পারে, তার জন্য ওঙ্কাররূপী নাদব্রহ্মকে আমার প্রতিমূর্ত্তি ও তোমার প্রতিবিম্ব উভয়ের ঊর্দ্ধে রেখো। ওঙ্কাররূপী পরব্রহ্মের করুণাই তোমাকে আমাকে দূর থেকে নিকট ক'রেছে, আপনার আপন ক'রেছে, প্রাণের প্রাণ ক'রেছে। ওঙ্কারকে প্রচার ক'রে আমি হ'য়েছি ধন্য, ওঙ্কারকে গ্রহণ ক'রে তুমি হ'য়েছ কৃতার্থ। এই ওঙ্কারের সাধকরূপে, ধ্যাতারূপে, উপাসকরূপে, প্রচারকরূপে, দর্পণে তোমার প্রতিবিম্ব আর পার্শ্বে বা উপরে আমার প্রতিমূর্ত্তি ওঙ্কারের নীচে থাকবে। তপস্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্ব্বত্র এক-তত্ত্বের অনুভূতি লাভ। জানো, তুমি আর আমি এক, জানো, আমি যার উপাসক, আমি তার সাথে এক ; জানো, তোমার উপাস্য আর আমার উপাস্য পরমাত্মা এক। এর জন্যই তোমার সব অধ্যবসায় উদ্যত হোক। (১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮)

শিষ্যের আত্মসমর্পণে গুরুর গুরুত্ব

গুরু-নির্ণয় হয় কিসে ? নির্ণয় হয় শিষ্যের আত্ম-সমর্পণে। যেখানে শিষ্য গুরুর কাছে নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিতে পালে' না, সেখানে কোনো গুরু বাস্তবিক পক্ষে মানাই হয় নি। গুরু মন্ত্র দিলেন কি না, তা দিয়ে শিষ্যের শিষ্যত্ব নির্ণয় হয় না। শিষ্য গুরুর ভালমন্দ সব আদেশ পাল্‌তে প্রস্তুত কি না, এ দিয়েই শিষ্যের শিষ্যত্ব আর গুরুর গুরুত্ব। (২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮)

ব্রহ্মবীজ সব ক্ষেত্রেই বপন চলে

এক এক বীজ বপনের জন্য এক এক প্রকার ক্ষেত্র-নির্ণয় প্রয়োজন হয়। যেমন বীজ, তেমন ক্ষেত্র। কিন্তু বট-বীজ নরম মাটিতে আর কঠিন কঙ্করে সব জায়গায়ই সমভাবে অঙ্কুরিত হয়। তার পক্ষে অনুর্ব্বর মৃত্তিকাও পরিত্যাজ্য নয়। অখণ্ড ব্রহ্মনামও তদ্রূপ। পাত্রাপাত্রের বিচার নিষ্প্রয়োজন। যে মত বা যে রুচির প্রতিই তুমি পক্ষপাতী হও না, অখণ্ড ব্রহ্মবীজ তোমার সকল সময়েই মঙ্গল কর্ব্বে।

যুগধর্ম্মের দাবী

আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে আজ পবিত্রতম বেদসার প্রণবমন্ত্রের চর্চ্চার অধিকার প্রসারিত হউক। তোমরা নিজেদের জীবনে এই অখণ্ড মহামন্ত্রের সাধনা ক'রে জ্যোতির্ম্ময় হও, জগতের শ্রদ্ধা, বিস্ময় আকর্ষণ কর। তোমাদের দৃষ্টান্ত কোটি কোটি

মানব-মানবীকে এই মহামন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট কর্ব্বে। ওঙ্কার-মন্ত্রের নির্ব্বিরোধ নিরঙ্কুশ প্রসার আজ যুগধর্ম্মেরও দাবী। যে মহামন্ত্র থেকে কোটি কোটি নরনারী বঞ্চিত, আজ তাদের জন্য এই মহামন্ত্রের প্রবেশ-দুয়ার খুলে দিতেই হবে। সবাইকে এই মহামন্ত্রের সাধনায় অনুপ্রাণিত কত্তে হবে। কিন্তু বাবা, আগে তোমরা নিজেরা হও সাধক। তবে জগৎ তোমাদের পন্থার প্রতি বিশ্বাসী হবে।

গুরুগিরির প্রসার বাঞ্ছনীয় নহে

আমার কাছ থেকে এসে মন্ত্র নিয়ে যেতে লোককে প্ররোচিত ক'রো না। তাদের প্রাণের ভিতরে অবিরাম অখণ্ড মহানাম ধ্বনিত হচ্ছে। তাদের অন্তরে বিরাজ করেন জ্ঞান-স্বরূপ সদ্গুরু। তাঁর কাছ থেকেই সবাই দীক্ষা নিক। মানুষ-গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র না নিলেও মন্ত্রজপ নিষ্ফলে যায় না। এই বিশ্বাস সকলের মনে জাগিয়ে দাও। নিজের অন্তরের বিপুল আবেশ নিয়ে মানুষ নিজের ভিতরের প্রভুকে খুঁজুক, আর নিজের কাছ থেকে নিজে মন্ত্র নিয়ে নিজের শিষ্য হোক্, নিজের চেতনার আলোকে নিজের পথ দেখুক, নিজের উপলব্ধির সম্নেহ আকর্ষণে জোর্সে নিজের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হোক। মানুষকে গুরু ব'লে মনে ক'রে বিড়ম্বনার পর বিড়ম্বনা আহরণের প্রয়োজন কি? "ওঁ সদ্গুরু" ব'লে

সর্ব্বভূতান্তরাত্মা জগদ্‌বিধাতা পরম-প্রভুকেই সে অবিরাম ডাকুক। এই যে স্বাধীন তেজস্বিতা, যা ধর্ম্মজীবন থেকে লোপ পেয়েছে বলেই ক্যাঙ্গলামোর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, সেই সজীব তেজস্বিতাকে আজ ভারতের প্রান্তে প্রান্তে স্ফুরিত ক'রে তোলাই হবে তোমাদের জীবনের আমৃত্যু একনিষ্ঠ সাধনার পরমামৃতময় সুফল।

যুগধর্ম্ম কাহাকে বলে

যুগধর্ম্ম কাকে বলে জান? যুগধর্ম্ম আপদ্ধর্ম্মের জ্যেঠতুত ভাই। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রচলিত মত ও প্রচলিত প্রথা লঙ্ঘন ক'রে যখন একজনকে চল্‌তে হয়, তখন সেটি আপদ্ধর্ম্ম। আর যখন সেই প্রথাকে লঙ্ঘন ক'রে চলার প্রয়োজন পড়ে একটা সমগ্র দেশের বা সমগ্র জাতির, তখন সেটি যুগধর্ম্ম। লোকনাথ ব্রহ্মচারী কয়েকজন অব্রাহ্মণ-সন্তানকে ব্রহ্মগায়ত্রী ও ওঁকার-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকজন অন্ত্যজকে উপনয়ন দিয়ে ব্রহ্মমন্ত্রে অধিকার প্রদান করেছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর ধীবরদিগকে ব্রাহ্মণত্বে অধিকার দিয়েছিলেন। এগুলি ব্যক্তি-বিশেষে এবং স্থানবিশেষে মাত্র ব্যবস্থা। সুতরাং এগুলি হ'ল সব আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে। কিন্তু ব্যক্তি এবং স্থান বিচার না ক'রে সকল ব্যক্তির জন্য এবং সকল স্থানের জন্য এই মহামন্ত্রের অধিকার প্রসারিত ক'রে দেওয়ার দাবীই হচ্ছে যুগধর্ম্মের দাবী।

সনাতন ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম

কিন্তু ধর্ম্ম সনাতন, শাশ্বত, ও নিত্য। যাহা সনাতন সত্য, তাহাই ধর্ম্ম। শাশ্বত সত্যে অবিচল নিষ্ঠাই প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠা। যে সকল আচার-ব্যবহার শাশ্বত সত্যে জীবকে নিষ্ঠাশীল করে, সেই সকল আচার-ব্যবহার গৌণভাবে মাত্র ধর্ম্ম এবং গৌণভাবে তারা শাশ্বত সত্যে জীবের অন্তরকে লগ্ন করার চেষ্টা করে ব'লে তারাই ধর্ম্ম ব'লে সমাজে গৃহীত ও পূজিত। এই সব আচার-ব্যবহারের মধ্যে যখন proportion and equilibrium এর (সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের) অভাব ঘটে, তখন আচার-ব্যবহারের পরিবর্ত্তন সর্ব্বজনীন-ভাবেই প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। এরই নাম যুগধর্ম্ম। কিন্তু এই সব পরিবর্ত্তন দ্বারা পরম সত্যের সঙ্গে যোগ স্থাপনের সুগমতা বিধানই প্রকৃত উদ্দেশ্য। সুতরাং আচার ব্যবহারের শত বিবর্ত্তনের মাঝেও যে পরমসত্য, পরমধর্ম্ম জীবের একমাত্র লক্ষ্য এবং প্রাপ্তি, সেই সনাতন ধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম এবং প্রকৃত ধর্ম্ম। ওঙ্কার মহামন্ত্রই সর্ব্ব-মন্ত্রের অন্তর বা প্রাণ, এজন্য ওঙ্কার-মন্ত্রেই সর্ব্ব-জীবের স্বাভাবিক গূঢ়তর অধিকার। ইহা সনাতন ধর্ম্মেরই দাবী। নানাভাবে এই মহামন্ত্রের অনুশীলন সর্ব্ব-সাধারণের কাছ থেকে দূরে গেছে। তাতে ধর্ম্মজীবনে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের অভাব ঘটেছে। সেই জন্যেই ওঙ্কার মহামন্ত্রের সুপ্রসার-সাধন আজ যুগধর্ম্মেরও দাবী। এ দাবী তপস্বী, সাধক,

ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ব্যক্তিরাই পূরণ কত্তে সমর্থ হবেন। (২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮)

কুমারী-দীক্ষার সুফল

মেয়েদের কুমারী অবস্থায় মহামন্ত্র দীক্ষা পাওয়া খুব ভাল। তাতে তারা জীবনটাকে ভবিষ্যতের জন্য শক্ত ক'রে গ'ড়ে তোলবার সুযোগ পায়। বিবাহের পরে জীবন গড়ার চেষ্টা স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষেই বিড়ম্বনা, বিশেষতঃ মেয়েদের পক্ষে। কেননা বিবাহের পরে ইচ্ছায় হোক্ আর অনিচ্ছায় হোক্, তারা স্বামীটীর ব্যক্তিগত রুচি-অরুচির অনুবর্ত্তন কত্তে বাধ্য হয় এবং সে সময়ে নিজ জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজন মত দৃঢ়তা অবলম্বন কত্তে গেলে অনেক সময় সাংসারিক অশান্তি হয়। সকলের স্বামী এক রকম থাকে না, সকল স্বামীকে মেয়েরা বাগেও আনতে পারে না। সুতরাং বিয়ের আগেই ভগবৎ-সাধন ক'রে নিজের দেহ-মন-প্রাণকে ভগবানের পায়ে অঞ্জলি দেবার অভ্যাস মেয়েদের আয়ত্ত ক'রে রাখা দরকার।

কন্যাদায়-সমস্যা তথা কুমারী-দীক্ষা

বর্ত্তমান কন্যাদায়-সমস্যা কুমারীর দীক্ষাকে আরও বেশী আবশ্যকীয় ক'রে তুলেছে। উপযুক্ত বয়সে মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না, ঘরে বসিয়ে মূর্খ মেয়েকে রাখা বিপজ্জনক, সুতরাং মেয়েদিগকে ধর্ম্মহীন নীতিবোধহীন আধুনিক শিক্ষা দিতে

হচ্ছে। তার ফলে মেয়েদের জীবনে এমন অনেক চিন্তাধারার আঘাত হচ্ছে, এমন অনেক নূতন প্রলোভনের সৃষ্টি হচ্ছে, যার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে অপরাজিতা থাকা কষ্টকর। তারই জন্য তাঁদের মানসিক শক্তিকে নৈতিক সংগ্রামে অটল অচল রাখবার জন্যে দীক্ষা দেবার দরকার। দীক্ষা যদি সুদীক্ষা হয়, দীক্ষা যদি উপযুক্ত জায়গা থেকে পাওয়া যায়, তাহ'লে আমার ধারণা এই যে, কুমারদের চেয়ে কুমারীদের জীবনের উপরে তার সুপ্রভাব গভীরতর ভাবে হ'য়ে থাকে।

কিরূপ ব্যক্তি কুমারীকে দীক্ষাদানের যোগ্য

কুমারীজীবনেই দীক্ষাগ্রহণ দরকার বটে, কিন্তু যে-কোনও ব্যক্তিই কুমারী মেয়েকে দীক্ষা দেবার উপযুক্ত হ'তে পারেন না। সর্ব্ব-সাধারণকে দীক্ষা দেবার উপযুক্ততা অনেক গুরুই আহরণ ক'রে থাকেন, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকেই যে কুমারী মেয়েকে দীক্ষা দেবারও উপযুক্ত হবেন, এরূপ মনে করা অসঙ্গত। যাঁর নিজের জীবনের কোনও আচরণের দ্বারা কুমারীর জীবনে কোনও প্রকার চঞ্চলতা সংক্রামিত হবে না, এমন ব্যক্তিই কুমারীকে দীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত গুরু। যাঁরা বাক্যের চপলতা, পরিহাস, রসিকতা প্রভৃতি নিয়ে কুমারীর জীবনের উপরে চপল প্রভাব সৃষ্টি কর্ব্বেন না, তাঁরাই কুমারীকে দীক্ষা

দিতে পারেন। দীক্ষার পরে দীক্ষিতার মনটা যেন অসহায় শিশুর মত নির্ভরপরায়ণ হ'য়ে যায়। দীক্ষাদাতা তখন যেরূপ বলেন বা চান, দীক্ষিতা তখন নিজের অজ্ঞাতসারে সেরূপ হ'য়ে যেতে আরম্ভ করে। অনেক সময়ে চেষ্টা ক'রেও সে সেই দিক্ থেকে নিজেকে সামলে আন্‌তে পারে না। ফলে যে সকল দীক্ষাদাতার ভিতরে কুমারীকে চুম্বন করা, আলিঙ্গন করা, কুমারীদের নিয়ে জড়াজড়ি করা, তাদের গালে হাত দেওয়া, বুকে হাত দেওয়া, প্রয়োজনে নিষ্প্রয়োজনে আদর-সোহাগ করার রোগ আছে, তাদের কাছে দীক্ষা নিয়ে কুমারীর সর্ব্বনাশের পথই মাত্র পরিষ্কার করা হয়। সুতরাং আদর্শ-জীবন-যাপনকারী ব্যক্তির সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্য্যন্ত একটা যাকে তাকে দিয়ে কুমারীকে দীক্ষা দেওয়ান অনুচিত।

দীক্ষাদাতার জীবন ত্যাগসুন্দর হওয়া চাই

দীক্ষাদাতা বল্‌তেই আদর্শজীবন-যাপনকারীর দিকে দীক্ষা-প্রার্থীর লক্ষ্য পড়া উচিত। সংযমব্রত যে পালন কর্ব্বে, তার পক্ষে আদর্শ হচ্ছেন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, ভোগবুদ্ধি-পরিবর্জ্জনকারী নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষ। জনক রাজর্ষির দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে সকলেরই সংযমব্রতের দৃঢ়তা বর্দ্ধিত হয় না, বরং পরিমিত ভোগ এবং সংযত ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার সম্পর্কে একটা

প্রশ্রয়ের ভাবই কারো কারো আসে। কিন্তু সর্ব্বত্যাগী, ইন্দ্রিয়-সেবা-মাত্রেরই প্রতি বীতরাগ, পূর্ণ আত্মজয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত তেজস্বী সন্ন্যাসীদের কথা ভাব্‌তে গিয়ে তার শিরায় শিরায় ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্কল্প তপ্ত রক্ত-স্রোতের মত প্রবাহিত হয়। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মত তেজস্বী মূর্ত্তির চিন্তা, শঙ্করাচার্য্যের মত সর্ব্বত্যাগসুন্দর দীপ্ত মূর্ত্তির চিন্তা, প্রভু জগদ্বন্ধুর মত সংযম-ব্রহ্মচর্য্য-সুরভিত স্নিগ্ধ মূর্ত্তির চিন্তা বাল্যকাল থেকেই অবিরাম যাদের মেরুদণ্ডে মজ্জাসংযোগ করে, তাদের মূর্ত্তিই হয় আলাদা। রাজর্ষি জনকের দিকে দৃষ্টি দিয়ে যারা জীবন গড়ে, অনেকেই তারা ধার্ম্মিকই হয়, কিন্তু পরীক্ষিত সংযমের দোহাই দিয়ে অনেক সময়ে অজ্ঞাতসারে তারা বিষ্ঠারই দাগ সর্ব্বাঙ্গে সাদরে রক্ষিত করে। তারই জন্য আমার ধারণা, দীক্ষিতের বা দীক্ষিতার চোখের সাম্‌নে যাতে ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, সংযমের নি-খাদ স্বর্ণময় জ্বলন্ত আদর্শ দেদীপ্যমান হ'য়ে বিরাজ করে, তজ্জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীরাই হবে ত্যাগেচ্ছু, সংযমেচ্ছু, চরিত্র-গঠনেচ্ছু, যুবক-যুবতীদের দীক্ষাদাতা ও দীক্ষাদাত্রী।

কুমারীকে কিভাবে সংযম-সদাচারের শিক্ষা দিতে হইবে ?

দীক্ষাদাতা তাঁর দীক্ষিতা কুমারী-শিষ্যাকে দীক্ষার দ্বারাই প্রধানতঃ নিজ জীবনাদর্শে অর্থাৎ সংযমে ও ব্রহ্মচর্য্যে অনু-

প্রাণিত ক'রে থাকেন। কিন্তু এই বিষয়ে তার মৌখিক উপদেশেরও প্রয়োজন আছে, অধিক না হউক, অন্ততঃ ইঙ্গিতে। কুমারীর দেহ যে দেব-মন্দিরের ন্যায় পবিত্র, এই দেহের অলঙ্ঘনীয়ত্ব যে বজায় রাখ্‌তে হবে, শালীনতাকে কোনও প্রকারেই যে পঙ্গু করা চল্‌বে না, এই দেহকে যে পবিত্র তীর্থভুমির ন্যায় সর্ব্বপাপমুক্ত রাখা চাই-ই, এই বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া একান্ত আবশ্যক হবে। ছেলেদের মধ্যে যে ভাবে ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ বিতরণ করা হয়, তার চেয়ে অনেক শোভন ভাবে, অনেক সন্তর্পণে, অনেক ধীরতা সহকারে ব্রহ্মচর্য্যের জ্ঞান, সংযমের আবশ্যকতা-বোধ, সংযমের স্বরূপ-নির্ণায়ক বিচার-শক্তি, আত্মবিশ্লেষণের নৈপুণ্য উদ্বোধিত ক'রে তুল্‌তে হবে। একজন স্কুল-মাষ্টারের উপদেশের যে প্রভাব, দীক্ষাদাতার বা দীক্ষাদাত্রীর উপদেশের প্রভাব তার শতগুণ। তাই এই দায়িত্ব দীক্ষাদাতাকেই নিতে হবে।

দীক্ষাদাতা কি কুমারীকে সন্ন্যাস বা গার্হস্থ্যের দিকে প্রণোদিত করিবেন?

কিন্তু তাই ব'লে কোনও কুমারীর ঘাড়ের উপরে চির-কৌমার্য্যের সঙ্কল্পকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। কোনও কুমারীকে গার্হস্থ্যের প্রণোদনাও যেমন গুরু দেবেন না, সন্ন্যাসের প্রেরণাও তেমন দেবেন না। তিনি বল্‌বেন, পবিত্র

হও, পবিত্র থাক, জগৎকে তোমার উপস্থিতি দ্বারা পবিত্র কর, পবিত্রতা-বৃদ্ধির তুমি সহায়িকা হও। কে কুমারীই আমৃত্যু থেকে যাবে, কে বিয়ে ক'রে গৃহিণী হবে, সেই চিন্তা গুরুর নয়। এই বিষয়ে তিনি থাকবেন একেবারে অপক্ষপাত। কিন্তু একটা গৃহস্থ-ঘরের দায়িত্ব নিয়ে থাকতে হ'লে যে-সব শিক্ষা একটী মেয়ের প্রয়োজন, সেই সকল শিক্ষা চিরকুমারী বা ভবিষ্য-গৃহিণী-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মেয়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাওয়া প্রয়োজন। (২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮)

গুরু-পরীক্ষার আবশ্যকতা

যাকে তাকে গুরু করা ঠিক নয়, বরং এরূপ ব্যাপারকে নির্ব্বুদ্ধিতার ফল বলা যেতে পারে। শিষ্য জানে না যে, তথাকথিত গুরু তার জীবনের বিকাশের সহায়ক হবে, না, শত্রু হবে। কিন্তু মাথা কেটে তার পায়ে দিয়ে দিল এবং পরে অনুতাপ কর্ব্বার সুযোগ নিল। অনুতাপটা পরে না ক'রে, আগেই বরং প্রতীক্ষা ক'রে গুরুনির্ণয় ঠিক ছিল। হুজুগে কখনও এত বড় ব্যাপারের চূড়ান্ত মীমাংসা কত্তে যাওয়া ঠিক নয়। অনেক গুরুদেবেরা কৌশল ক'রে, জোর ক'রে, ফন্দী-ফিকির ক'রে লোককে শিষ্য করেন, শিষ্যের জীবনের লক্ষ্যের দিকে না তাকিয়ে নিজের গরজে তার গুরু হন, শিষ্যের কাছে আগে নিজের প্রকৃত পরিচয়টা সম্পূর্ণরূপে বিস্তার না ক'রেই নিজের

গুরুত্বকে দীক্ষা দ্বারা পাকা ক'রে নেন এবং পরে যখন শিষ্য নিজের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যের সঙ্গে গুরুদেবের জীবনকে বা উপদেশকে আদর্শের দিক্ থেকে মিলাতে না পে'রে হা-হুতাশ কত্তে আরম্ভ করে, অন্তর্জ্বালায় জ্বলেপুড়ে ছট্‌ফট্ কত্তে থাকে, তখন ভালমানুষটী সাজেন। শত শত জীবনে আজ এই ঘটনা ঘটছে। তারই জন্য প্রত্যেক দীক্ষার্থীর উপযুক্ত কাল গুরু-পরীক্ষা করা দরকার। দীক্ষার ব্যাপারে "ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে"—নীতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। দীক্ষা বরং দু'দশ বৎসর না হ'ল, তবু তাড়া-হুড়া কত্তে গিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করা ঠিক্ নয়। কন্যার বিবাহে যেমন পাত্র-নির্ব্বাচন একটা অতি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার, দীক্ষা-গ্রহণেও তেমনি দায়িত্ব রয়েছে। যাকে তাকে বিবাহ কর্লে যেমন অনেক সময় বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করা অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে থাকে, যাকে তাকে গুরুত্বে বরণও তদ্রূপ।

শিষ্যের আত্ম-পরীক্ষার আবশ্যকতা

শুধু গুরু-পরীক্ষারই প্রয়োজন, তা নয়। শিষ্যেরও আত্ম-পরীক্ষার প্রয়োজন। দীক্ষা নিলেই শিষ্য হয় না, অবিচারিত চিত্তে ধর্ম্মসাধন-বিষয়ে গুরুর আদেশ পালনের জন্য সুগভীর সঙ্কল্প ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা চাই। এ দৃঢ়তা কি তোমার আছে? এইটুকু পরীক্ষা কত্তে হয়। গুরু যে উপদেশ দেবেন, তা নিঃসঙ্কোচে পালনে কি তোমার তীব্র ইচ্ছা জেগেছে? অনেক

শিষ্যেরই এরূপ তীব্র ইচ্ছা জাগে না, অথচ দীক্ষা গ্রহণ ক'রে একটা ছেলেখেলা করে। কিন্তু এই ব্যাপারেও শিষ্যের দায়িত্বের চেয়ে গুরুর দায়িত্বই অত্যধিক। অজ্ঞান ব'লেই জ্ঞানলাভের লোভে লোক শিষ্য হয়, অতএব তার আচরণে ভ্রম-ত্রুটী ত' থাকবেই। কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় কারো গুরু-পদবী গ্রহণের অধিকার নেই। সুতরাং শিষ্যের মঙ্গলামঙ্গল ভাল ক'রে না বুঝে যে ব্যক্তি শিষ্যকে আগেই মন্ত্র দিয়ে দীক্ষা দিয়ে ফেলেন, তিনি অনেক সময়ে শিষ্যের অনিষ্ট সাধন করেন। এক কণা কুণ্ঠা বা শঙ্কা যে শিষ্যের মনে আছে, তাকে দীক্ষা দেওয়া অধিকাংশ স্থলে পাপ। (২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮)

সদ্‌গুরুর আত্মবিলোপ

যে অমৃতময় অখণ্ড-নাম লাভ কর্লে, প্রাণ দিয়ে, মন দিয়ে অবিরাম এর সাধনা কর, সাধনার ফলে তোমাদের অন্তরের অবিকশিত সব শক্তি জাগরিত হবে, তোমরা নিজেদের স্বরূপ চিনতে পার্বে; কিন্তু বাবা, তোমাদের বাহ্য আগ্রহ দেখেই আমি তোমাদের দীক্ষা দিয়েছি, অন্তরের আগ্রহের কোনও প্রমাণ তোমরা নিয়ে আমার কাছে আসনি। তোমাদের হিত হবে, এই বুদ্ধিতেই তোমাদের কাছে জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু পরিবেশন করেছি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা এই নামের ভিতর দিয়ে পরমামৃত আহরণে সমর্থ হও। কিন্তু বাবা, আর একটী

কথাও ব'লে রাখ্‌ছি, আমি তোমাদের স্বাধীনতা হরণ করি নাই। আমার মতে আমার পথে চল্‌তে যেদিন বাধা হবে, এ-পথের সাথে তোমার জীবনটাকে খাপ খাইয়ে নিতে যেদিন কিছুতেই পেরে উঠবে না, আমার কথা শুন্‌লে যেদিন মিথ্যার সাথে আপোষ কচ্ছ ব'লে মনে হবে, সেদিন তৎক্ষণাৎ আমাকে বিনা দ্বিধায় ছেঁড়া কাঁথার মতন পরিত্যাগ ক'রো। সেদিন যে মুহূর্ত্তে দেখ্‌বে আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাকে সাহায্য কত্তে ইচ্ছুক এবং তোমারও মন তাঁর সাহায্য গ্রহণ কত্তে ইচ্ছুক, তখন আমার জন্য মনের কোণে এক কণা মায়াও রেখো না। যেমন, গরুর গাড়ীতে ক'রে লোক ষ্টেশনে যায় এবং ষ্টেশনে গিয়ে কলের গাড়ী ধরে। মানুষের স্বাধীনতাকে স্ফুরিত কর্ব্বার জন্যই আমি তার গুরু, পরাধীনতার লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর্ব্বার জন্য নয়। (৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮)

পূর্ব্ব-দীক্ষিতের পুনর্দীক্ষা

পূর্ব্বে একবার যার বিয়ে হ'য়ে গেছে, তেমন মেয়ের ফিরে বিয়ে দেওয়া যেমন ব্যাপার, পূর্ব্বে একবার দীক্ষা হ'য়ে গেছে, তাকে আবার অন্যত্র দীক্ষা দেওয়াও তেমনই ব্যাপার। সহজ অবস্থায় এর আমি অনুমোদন করি না।

হুজুগ ও দীক্ষা

দীক্ষা নেওয়া একটা ফ্যাসানে দাঁড়িয়েছে। যেন, দেখাদেখি নাচা। এটা জাতির মঙ্গলের চিহ্ন নয়। যাকে দেখ, তার কাছ

থেকেই একটা কাণে ফুঁ নেওয়া একটা ব্যাধি-বিশেষ। প্রকৃত বৈদ্য বিকার-গ্রস্ত রোগীকে ঔষধ দিতে রোগের সূক্ষ্ম বিচার করেন, অন্ন-পথ্য দেবার আগে উপযুক্ত কাল অপেক্ষা করেন। বলা নেই, কহা নেই, একটা ফোঁস্-মন্ত্র দিয়ে ফেল্লেই হ'ল না, নিয়ে ফেল্লেও হ'ল না।

দীক্ষার মানে নবজন্মলাভ

দীক্ষার মানে একটা rejuvenation of life (নবযৌবন সঞ্চারণা) বা আরো সত্য ক'রে বল্‌তে গেলে, দীক্ষা হ'ল rebirth (নব জন্ম)। No one can take Diksha if not inspired within by a zeal for a new life i e. rebirth (দীক্ষা কেউ নিতে পারে না, যদি নূতন জীবন, মানে নবজন্মলাভের প্রবল প্রেরণা দ্বারা চালিত না হয়)।

চাচা, আপন বাঁচা

এ সব ত বাবা অপরের বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা। কে আমার কাছ থেকে ধর্ম্ম-জীবনের দীক্ষা গ্রহণ কর্ব্বে আর না কর্ব্বে, সে সব ভাব্‌না ছেড়ে দাও। তুমি ত বাবা অনেক আগেই দীক্ষা পেয়েছ! তুমি শুধু ভাব্‌তে থাক, কিসে তোমার দীক্ষার মর্য্যাদা থাকে, কিসে তুমি নিজের জীবনকে এই দীক্ষার ভিতর দিয়ে পূর্ণরূপে বিকশিত কত্তে পার, সার্থক কত্তে পার। গুরুভ্রাতা আর গুরুভগ্নীদের দলপুষ্টি ক'রে জগদুদ্ধার না ক'রে

আগে নিজের বল বাড়িয়ে নিজেকে উদ্ধার কর। সাধন কর বাবা, সাধন কর। অসাধকের জীবনে সুখও নেই, শান্তিও নেই।

দীক্ষার পাত্রাপাত্র

দীক্ষা লওয়াটা কি একটা হুজুগের ব্যাপার? দশজনে লয়, তাই দীক্ষা লইতে হইবে, ইহাই কি দীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য? দীক্ষা কি শুধু একটা কাণে-ফুঁ? দীক্ষার কি কোনও সত্য সার্থকতা কিছু নাই?

দীক্ষা যাহারা লইতে চাহে, তাহাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য এই বিষয়ে চিন্তা করা। একটা ব্যবসায় পাতাইবার ফন্দীরূপে দীক্ষাদানকার্য্যকে গ্রহণ করিয়া একশ্রেণীর গুরুরা দীক্ষার সম্মান নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। অপর শ্রেণীর গুরুরা পাত্র-অপাত্র বিচার না করিয়া যাকে-তাকে দীক্ষা দান করিয়া দীক্ষার কৌলীন্য-নাশ করিয়াছেন। আমি চাহি না, দীক্ষার এইরূপ শোচনীয় অকৌলীন্য আর হউক।

তোমাদের ওখানে অনেকেই দীক্ষা লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এই ব্যস্ততাকে ব্যগ্রতা বলিয়া আমি মনে করি না। সুতরাং তালে-বেতালে দীক্ষা দিয়া আমি বৃথা কর্ম্মভোগ বাড়াইতে চাহি না। সত্য সত্যই যাহারা ভগবৎ-সাধনার পথে দিব্য জন্ম লাভ করিতে চাহে, দীক্ষার শুভফলদায়িত্বে

সত্য সত্যই যাহাদের দৃঢ়া আস্থা উপজাত হইয়াছে, দীক্ষা শুধু তাহাদেরই প্রাপ্য। (১৩ই আষাঢ়, ১৩৩৮)

উপাসনা-কালে মন স্থির করিবার উপায়

উপাসনা কালে মন স্থির করিবার উপায় কি? শ্রেষ্ঠ উপায় অভ্যাস। কিন্তু অভ্যাসকে সহায়তা দানের জন্য কতকগুলি বিধি-পালনও হিতকর। যেমন, স্নানান্তে উপাসনায় বস্‌লে সহজে মন স্থির হয়। "হয়ত আর দু-ঘন্টা পরেই আমার মৃত্যু হ'তে পারে",—এইরূপ বিচারও সহজে মনকে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করে। যাঁর মনটা স্থির, অচঞ্চল, শীতের সমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত ও দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল, এমন ব্যক্তির মনটীর কথা ভাব্‌লেও চিত্তস্থৈর্য্যের সহায়তা হয়।

কতকটা এই কারণেই গুরুমূর্ত্তি ধ্যানের বিধান আছে। কারণ, স্থিরমনা পুরুষের ধ্যানে মনের স্থিরতা কতকটা আসেই। ত্যাগীর ধ্যানে ত্যাগ-বুদ্ধি জাগে, যোগীর ধ্যানে যোগানুরাগ বাড়ে, জিতেন্দ্রিয় পুরুষের চিন্তনে ইন্দ্রিয়-সংযমের আগ্রহ বর্দ্ধিত হয়।

গুরুমূর্ত্তি-ধ্যান ও চিত্তস্থৈর্য্য

কিন্তু গুরু যার চঞ্চল-চেতা, লম্পট ও স্বার্থের ক্রীতদাস, সে কি কর্ব্বে? এস্থলে তার কর্ত্তব্য, শ্রীভগবানকেই একমাত্র গুরু ব'লে বিশ্বাস ক'রে তাঁরই মহিমার ধ্যান করা। অথবা

এই সময়েই বা বলি কেন, সর্ব্বসময়েই ভগবান্‌কে তোমার গুরু ব'লে চিন্তন কর্ব্বে। যিনি মন্ত্র দিয়েছেন, তাঁকে ভগবানের নামের বাহক মাত্র জ্ঞান ক'রে মনকে আদি-গুরুর চরণে লগ্ন কর্ব্বে। (১৮ই আষাঢ়, ১৩৩৮)

ব্রহ্ম-গুরু

দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরু নয়, আমার গুরু ব্রহ্মগুরু। ব্রহ্মই গুরু, যিনি আনন্দস্বরূপ, সুখস্বরূপ, একমাত্র, অদ্বিতীয়, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, শান্তিস্বরূপ, পবিত্রতাস্বরূপ, যিনি অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং সনাতনঃ, যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের পরমপ্রভু, যিনি সীমাতীত, অনাদি, অনন্ত, সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই আমার গুরু।

মানুষ-গুরু

অবশ্য, মানুষ-গুরুরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু ব্রহ্মগুরুর অভিমুখী হবার জন্যই মানুষ-গুরুর প্রয়োজন। মানুষ-গুরু শিষ্যকে যদি ব্রহ্মগুরুতে বিমুখ করে, তবে তাকে বর্জ্জন কর্ত্তে হবে।

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু

গুরুর যদি হয় শিষ্যসংখ্যা অত্যধিক, তা হ'লে শিষ্যদিগকে উপদেশ-দানের জন্য একটী ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই ভাবেই শিক্ষাগুরুর উৎপত্তি হয়েছে। জ্ঞানীগুরু দীক্ষা দিয়ে শিষ্যের

অধ্যাত্ম-জীবনের সূচনা ক'রে দিয়ে গেলেন, অজ্ঞান শিষ্য গুরুর উপদেশ পালন কর্লে'ও নিজের রসানুভূতির সঙ্গে তাকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে নিতে পার্ল্ল না। একজন উপদেষ্টা এসে তার মনের খেঁাচ ভেঙ্গে দিলেন, তার প্রাপ্ত সাধন-পথকেই সহজগম্য ক'রে দিলেন। এই হ'ল শিক্ষাগুরুর আবির্ভাবের মূলকথা। একজন মন্ত্র পেয়েছে—ক্লীং, কিন্তু বুঝ্‌তে পাচ্ছে না যে, কৃষ্ণ বস্তুটা কি। একজন উপদেষ্টা এসে ব'লে গেলেন কৃষ্ণ কি এবং নূতন জ্ঞানের আলোকে সে পুরাতন পথেই অধিকতর বিক্রমে অধিকতর বিশ্বাসে চল্‌তে আরম্ভ কর্ল্ল। এই হ'ল শিক্ষাগুরু করা। শিক্ষাগুরু একজনের শত শত থাকৃতে পারে। মৃত-সঞ্জীবনী খেলে যেমন পুরোণো শরীরেই নূতন বল আসে, তেমনি যাঁর উপদেশে পুরোণো সাধনেই নূতন উৎসাহ আসে, তাঁকেই বলে শিক্ষাগুরু।

শিক্ষাগুরুর কর্ত্তব্য

শিক্ষাগুরুর কর্ত্তব্য কি নূতন আর একটা মন্ত্র দেওয়া? নিশ্চয়ই নয়। পূর্ব্বপ্রাপ্ত মন্ত্রটাকেই জীবন্ত ক'রে দেওয়া শিক্ষাগুরুর কর্ত্তব্য। দীক্ষাগুরু মন্ত্র দিয়ে খালাস, শিক্ষাগুরু সেই মন্ত্রের প্রকৃত মহিমা শিষ্যের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট ক'রে ঐ মন্ত্রেই তার নিষ্ঠা, ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভর বাড়িয়ে দেবেন। এই আশাতেই ধর্ম্মাচার্য্যেরা এক সময়ে শিক্ষাগুরুর প্রথার

প্রবর্ত্তন করেছিলেন। কিন্তু এখন ব্যাপার দাঁড়িয়েছে উল্টো। দীক্ষাগুরু যদি এক কাণ ফুঁকেছেন, তবে শিক্ষাগুরু এসে আবার আর এক কাণে ফুঁকুবেন। এ' এক অদ্ভুত ব্যভিচার। শিক্ষাগুরুরা শিষ্যদের মনকে এক পরিতাপ-যোগ্য দ্বিধার মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন। আসল উদ্দেশ্যই হ'য়ে গেল মাটি। জেলা-বোর্ডের রাস্তার পার্শ্বে বটের ডাল লাগিয়ে তাকে বাঁচাবার জন্য জিওলের ডাল দিয়ে দেওয়া হ'ল বেড়া, ভাগ্যদোষে বটের ডাল গেল ম'রে, বেঁচে রইল ছায়াহীন, পত্রহীন অখ্যাত জিওলের ডাল। (৩১শে আষাঢ়, ১৩৩৮)

দীক্ষার মন্ত্র

যে খাদ্য পরিবেশিত হবে, তার নিজের ক্ষমতা থাকা চাই যেন, খেতে লোভ হয়। দীক্ষার মন্ত্র সম্পর্কেও সে কথা। কাণে পড়লেই যা জপ কত্তে রুচি হয়, তেমন মন্ত্রই দীক্ষার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র।

লোকাচারের দীক্ষা

যেমন demand (চাহিদা), তেমন supply (সরবরাহ)। জগতের এই হচ্ছে রীতি। জনসাধারণ চায় লোকাচারের দীক্ষা, তাই লোকাচারের দীক্ষাদাতারা আছেন। সত্য দীক্ষা যারা চায়, তাদের জন্য সত্য দীক্ষাদাতাও আছেন। সর্ব্বসাধারণের চাহিদার অনুপাতেই প্রয়োজনমত গুরুদের আবির্ভাব ঘটবে।

একদল লোক চাচ্ছে, ধর্ম্মও করব ব্যভিচারও কর্ব্ব, তাই ব্যভিচারী ধর্ম্মের গুরুরা প্রাদুর্ভূত হচ্ছেন।

(৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৮)

বারংবার গুরু-পরিবর্ত্তন

জীবের প্রয়োজন ঈশ্বর-দর্শন বা পরমা-শান্তি লাভ। এক গুরুর দ্বারা যদি তা' সম্ভব না হয়, তবে অন্য গুরুর সাহায্য নেওয়া বিন্দুমাত্রও দোষের নয়। মধুলুব্ধ ভ্রমর এক ফুলে মধু না পেলে বা এক ফুলের মধুতে পেট না ভরলে অন্য ফুলে যাবেই। কিন্তু নদী পার হবার জন্য এক নৌকায় চ'ড়ে পরে সেই নৌকায় ছেঁদা আছে সন্দেহ ক'রে নৌকান্তরে যাবার পূর্ব্বে শতবার চিন্তা করা উচিত যে, নূতন নৌকায় আবার আরো বড় বড় ছিদ্র বেরুবে কিনা। ঈশ্বর-সাধনে নিষ্ঠার দাম সবার চেয়ে বেশী। ভাঙ্গা নৌকায় জল সিঁচতে সিঁচতেও কত লোক নদী পার হ'য়ে যায়। কিন্তু জল সিঁচতে যারা রাজি নয়, ভাঙ্গা নৌকা পরিত্যাগের অধিকার তাদের থাকা উচিত এবং শাস্ত্রকারগণ সেই অধিকার সাধকমাত্রকেই দিয়ে রেখেছেন।

(৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৩৮)

গুরুমূর্ত্তি ধ্যান

মন্ত্র দিয়েছেন ঈশ্বরের কিন্তু ধ্যান করা হচ্ছে মন্ত্রদাতার মূর্ত্তির। এটা ঠিকও নয়, বেঠিকও নয়। ঈশ্বর-চেতনা নিয়ে তুমি

যে-কোনও মূর্ত্তি ধ্যান কত্তে পার। ঈশ্বর-চেতনা-বর্জ্জিত হ'য়ে তুমি কোনও মূর্ত্তিরই ধ্যানে অধিকারী নও। গুরুদত্ত মন্ত্র যদি এমন কোনও রূপের remembrancer (স্মারক) হয়, যাতে ঈশ্বরকেই মনে পড়ে, তবে সেই রূপ ধ্যান কর। গুরুর মূর্ত্তি যদি ঈশ্বরের ঐ নামটির remembrancer হয়, তবেই সেই মূর্ত্তি ধ্যান কর। ঈশ্বরীয়-ভাবহীন নামজপ নিষ্ফল। ঈশ্বরীয়-ভাবহীন রূপ-ধ্যান নিষ্ফল।

অদীক্ষিতের মন্ত্র-জপ

দীক্ষা না নিয়ে নামজপ করলে কি তার কোনও ফল হয় না? কেন হবে না, নিশ্চয় হয়। মন্ত্র প'ড়ে যাদের বিয়ে হয় নি, তাদের কি সন্তান হয় না? তবে সন্তান জন্মাতে যতদিন লাগে, ততদিন স্ত্রী-পুরুষকে একত্র থাকতে হয়, নইলে সন্তান হবে না। ভগবদ্দর্শন কত্তে যতদিন লাগে ততদিন ঐ একটী নাম নিয়েই লেগে থাকতে হয়। মন্ত্র প'ড়ে যাদের বিয়ে হয় নি, তাদের সন্তান হ'লে তার social status (সামাজিক পদমর্য্যাদা) থাকে না। এইটুকুই যা অসুবিধা। দীক্ষা না নিয়ে বা প্রদত্ত দীক্ষা অগ্রাহ্য করে নিজের মনের মত নাম জপ ক'রে যাঁরা সিদ্ধত্ব অর্জ্জন করেন, তাঁরা নিজেদের সাম্প্রদায়িক কোনও পরিচয় দিতে পারেন না। এই যা অসুবিধা। জগতে সত্যের চাইতে সম্প্রদায়ের মান বেশী হয়েছে কি না!

কিসের শিক্ষা-গুরু?

দু'ঘণ্টা ধ'রে শুনলি ত গুরুবাদের কচ্‌কচি। দীক্ষাগুরু আর শিক্ষাগুরু! মারো ঝাটা! নামই তোদের গুরু। অবিরাম নাম ক'রে যা। নামই তোদের শিক্ষা দেবে, যখন যা শিখ্‌বার দরকার। আবার শিক্ষাগুরু কিসের? I do not recognise the so-called শিক্ষাগুরু (আমি তথাকথিত শিক্ষাগুরু মানি না)। গুরুগিরির হট্টগোলে শিষ্যদের প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে।

(৭ই শ্রাবণ, ১৩৩৮)

গুরুর প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

হাঁ, গুরুর দরকার, যেহেতু অনেকের আত্মপ্রত্যয় থাকে না ব'লে নিজের নির্ব্বাচিত নামে পূর্ণ নিষ্ঠা রাখা সম্ভব হয় না। এরূপ স্থলে কেউ এসে একটী নামে দীক্ষা দিয়ে দিলে সেই নামটীতে দীর্ঘকালব্যাপী নিষ্ঠা রাখা সহজতর হয়। দ্বিতীয়তঃ, অপরের অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ করায় সুবিধা আছে। যেমন, মক্কেলের পক্ষে নিজে আইন প'ড়ে তারপরে মামলা চালান কষ্টকর, তাই আইনজ্ঞের সাহায্য নিতে হয়। যেমন গৃহস্থের পক্ষে নিজে গৃহনির্ম্মাণ শিক্ষা ক'রে তারপরে ঘর তৈরী ক'রে বাস কত্তে গেলে অনেক দেরী হয়ে যায় ব'লে ঘরামির সাহায্য নিতে হয়। যেমন, রোগীর পক্ষে নিজে ডাক্তারি শিখে রোগ

সারাতে হ'লে বিপদ ঘটে, তাই সুবিজ্ঞ প্রবীণ চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হয়। ঠিক্ এই ভাবেই গুরুর দরকার।

প্রথার দাসত্ব

কিন্তু বাবা, "গুরু চাই" 'গুরু চাই" ব'লে হট্টগোলটাই দেশে বেশী হচ্ছে। "সাধন কর্ব্ব" "সাধন কর্ব্ব" ব'লে হট্টগোল হচ্ছে কোথায়? "ভগবান্ চাই" ব'লে মানুষ আকুল ক্রন্দন কোথায় কচ্ছে? দাসত্ব, বাবা, দাসত্ব, শুধু প্রথারই দাসত্ব কচ্ছ তোমরা। বিয়ে করার উদ্দেশ্য না জেনে কচ্ছ বিয়ে, গুরু করার উদ্দেশ্য না জেনে নিচ্ছ মন্ত্র। চল্‌তি ফ্যাসানের তোমরা সবাই ক্রীড়নক মাত্র। আত্মশ্রদ্ধাও নেই, লক্ষ্যেও দৃষ্টি নেই। শঙ্খ ফুঁকে একজন গুরুপূজা কচ্ছে, তুমি কল্লে ব্যাণ্ড বাজিয়ে, ঘটার পরে ঘটা বাড়াচ্ছ, কিন্তু কেউ তলিয়ে দেখ্‌ছ না, ভগবানের দিকে কদ্দূর এগুলে, কতটুকু পবিত্র হ'লে। (৯ই শ্রাবণ, ১৩৩৮)

দীক্ষা ব্যতীত নামজপ

কোনও গুরুর নিকটে দীক্ষা-গ্রহণ ব্যতীতও নিশ্চয়ই নাম-জপ করা যায়। দীক্ষা-শব্দের মানে কি? কোনও একটা কার্য্য আরম্ভ করার সঙ্কল্প গ্রহণকেই বলে দীক্ষা। তুমি ভগবানের একটা নির্দ্দিষ্ট নাম জপ কর্ব্বে বলে সঙ্কল্প করেছ, এই ত' হ'ল দীক্ষা। এই সঙ্কল্প গ্রহণকালে তুমি যদি অপর

কারো কাছ থেকে মন্ত্রটী শুনে না নাও, তাতে কোনো দোষ নেই, যদি আমৃত্যু তুমি ঐ এক মন্ত্রেই লেগে থাক। এই ভারতবর্ষেই এমন লক্ষ লক্ষ লোক জন্মেছেন, যাঁরা কোনো মানুষের কাছে দীক্ষা নেন নি, কিন্তু ভগবানকে ডেকেছেন, ভগবানকে পেয়েছেন। "দীক্ষা নিতেই হবে, নইলে ভগবানকে মিল্‌বে না"—এই যে একটা জিদের কথা আমাদের মুখে তোমরা শুন্‌তে পাও, সেটার এক অর্থ এই যে, অপরের অভিজ্ঞতার সাহায্য পেলে সহজে কাজ হয়, আর এক অর্থ এই যে আমরা গুরুগিরির বেড়াজালে জগতের সকল রুই-কাতলা থেকে চুনোপুটি পর্য্যন্ত আটক ক'রে আমাদের শিষ্য ক'রে জগদ্‌গুরু হ'তে চাই।

'দীক্ষাহীন নামজপ' কথাটীর মানে

বলা হ'য়ে থাকে, দীক্ষাহীন নামজপ আর প্রস্তরে বীজবপন এক কথা। আমরা অমনি মানে ক'রে তোমাকে শুনিয়ে দিব যে, প্রস্তরে যেমন বীজের অঙ্কুর জন্মে না, আমাদের কাছে মন্ত্র না নিলে তেমনি মন্ত্র-জপে ফল হবে না। তোমরাও অমনি ভয় খেয়ে যাও, আর আমাদের পায়ের গোড়ায় এসে ধর্ণা দাও,—"মন্ত্র দাও প্রভু, মন্ত্র দাও"—ব'লে। আর আমরা অমনি মন্ত্র দেই, নিজেদের গুরুগিরিরও রোশনাই খোলে, ঐহিকের সঙ্গে সঙ্গে কখনো কখনো পারমার্থিক কল্যাণও হ'য়ে থাকে। কারণ, শিষ্যের ঈশ্বরপ্রাণতা গুরুর নিকটে অনেক

সময় দৃষ্টান্ত-স্থানীয় এবং শিক্ষণীয় হ'য়ে থাকে। কিন্তু বাবা, সত্যিই কি পাথরের গায়ে বীজ অঙ্কুরিত হয় না? মহাবটের ক্ষুদ্র বীজ কত বড় বড় পর্ব্বতের বক্ষ-বিদারণ ক'রে দিয়েছে এবং প্রমাণ করেছে যে প্রস্তরেও বৃক্ষ হয়, সেই বৃক্ষ পথিককে ছায়া দেয়, পাখীকে আশ্রয় দেয়, বানরকে খাদ্য দেয়, রুগ্নকে ঔষধ দেয়, মৃত্তিকাকে সার দেয়, বায়ুকে শুদ্ধতা দেয়। আসল কথা, পাথরের ফাটলে বীজটা লেগে থাকা চাই। বৃষ্টির জলে যদি বীজটাকে স্থানচ্যুত করে, তবে আর সে গজাবে কি ক'রে? অথবা অত্যন্ত রৌদ্রে যদি তাকে দগ্ধ ক'রে দেয়, তবে সে অঙ্কুরিত হবে কি করে? ঠিক তেমনি নামজপে তোমার নিষ্ঠা থাকা চাই। যে নামটী জপ কচ্ছ, অবিশ্বাসের তাপে যদি তা' ভাজা হ'য়ে যায়, তবে আর তোমার প্রাণে নামের অঙ্কুর গজাবে না। কিম্বা নানা মতের প্রবল ধারাবর্ষণে যদি নামটী প্রাণ থেকে স্থানচ্যুত হ'য়ে যায়, তা' হ'লেও সে আর তোমার প্রাণে মহা-বৃক্ষরূপে পরিণত হ'তে পার্ব্বে না। তাই তাকে জীবনে মরণে শয়নে-জাগরণে উত্থানে-পতনে প্রাণের মধ্যেই জোর ক'রে ধ'রে রাখার জন্য তোমার সঙ্কল্প-গ্রহণ প্রয়োজন। এই সঙ্কল্প গ্রহণকেই বলে দীক্ষা। এই সঙ্কল্প-গ্রহণ না ক'রে যদি নামজপ সুরু কর, তাহ'লে আজ এই নাম, কাল ঐ নাম, এরূপ ক'রে বৃথাই দিন কেটে যাবে, একটা বীজও মহীরুহে পরিণত হ'তে পার্ব্বে না। একেই বলে দীক্ষাহীন মন্ত্রজপ। (১৭ই শ্রাবণ, ১৩৩৮)

গুরু-নির্ণয়ের স্বাধীনতা

জানি হে জানি, তোমাদের সকলের নৌকাই ভাল। কিন্তু আমাকে আমার পছন্দমত নৌকায় উঠ্‌তে দাও।

শিষ্যের পছন্দই গুরু-নির্ণয় কর্ব্বে, গুরুর জবরদস্তি নয়।

(২৫শে শ্রাবণ, ১৩৩৮)

ব্রহ্মাই গুরু

তোমার উপাসনায় মানুষ-গুরুর কোনও প্রাধান্য নেই। 'একেবারে স্থান নেই'—যদি বল্‌তে পার্ত্তাম, তাহ'লেই আমি সুখী হ'তাম! মানুষ-গুরুর কৃপায় তোমার সাধন-পদ্ধতির সাথে পরিচয় হয়েছে, উত্তম, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাক, প্রাণ চাইলে তাঁর প্রতি ভক্তিমান্ হও কিন্তু জেনে রাখ তোমার গুরু ব্রহ্ম, তোমার গুরু পরমাত্মা, তোমার গুরু তিনি, যিনি অণোরণীয়ান্ আবার মহতো মহীয়ান্, তোমার গুরু তিনি, কোটি কোটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সৃষ্টি-স্থিতি বিলয় হয় যাঁর ইচ্ছায়, তোমার গুরু তিনি, যিনি ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাদির জন্ম-দাতা পিতা, স্তন্যদাত্রী মাতা, বুদ্ধিদাতা গুরু। তাই তোমাদের গুরু-স্তোত্রের মন্ত্র,—যস্মাজ্জাতং জগৎ সর্ব্বং, যস্মিন্নেব বিলীয়তে, যেনেদং ধার্য্যতে চৈব, তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ। যাঁর কাছে ইচ্ছা তাঁর কাছ থেকে তোমরা সাধন নিয়ে থাক্‌তে পার, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু জ্ঞান-মূর্ত্তি যে গুরু তোমার অন্তরের দুয়ার খুলে দেবেন, তিনি পরমাত্মা

বই আর কেউ নন। সাড়ে তিন হাত দেহধারী মানুষকে গুরু ব'লে কল্পনাই ক'রো না। বিশ্বের যিনি গুরু, তিনিই তোমার গুরু, তাঁকেই গুরু জেনে সমগ্র বিশ্বের আপন হও, নিকট হও, প্রিয় হও। মনে রাখবে, তোমাদের গুরুবাদ প্রচলিত গুরুবাদের ঊর্দ্ধে।

প্রকৃত গুরুবাদ কি ?

তাই হচ্ছে প্রকৃত গুরুবাদ, যা তোমাদের সকল বন্ধন ছেদন করে, নূতন ক'রে আরো বন্ধন সৃষ্টি করে না। আমি তোমাদের মন্ত্র দিয়েছি ব'লেই তোমাদের পায়ে পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল বেঁধে দেবার অধিকার আমার নেই। আমি যখন মহামন্ত্রের তীক্ষ্ণ ছুরিকায় তোমাদের দেহ-মনের সকল বন্ধন কেটে দিতে পারব, জানবে তখনই আমি তোমাদের হিতসাধন করেছি। আমার মূর্ত্তি, আমার ফটো, আমার গোঁড়ামি, আমার দুর্ব্বলতা, আমার ব্যক্তিগত নানা ভঙ্গিমা, এই সব নিয়ে যদি তোমরা এমন খানায় ডোব যে, জগতের সকল মঙ্গল-পন্থীদের সঙ্গে তোমাদের হৃদয়ের উদার যোগ অসম্ভব হয়, তবে জানবে, তোমাদের কাছে আমার আবির্ভূত হওয়া ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছে। তোমরাও জানো, আমারও যিনি উপাস্য এবং গুরু, সেই পরব্রহ্মই তোমাদেরও গুরু। আর, তোমাদের মধ্যে অনেকে যখন জীবকল্যাণে অপরকে সাধন প্রদান কর্ব্বে, তখন নবাগতদের জানিয়ে দেবে যে, ব্রহ্মই তাঁদেরও গুরু। শত শত

গুরুকে নয়, একজন পরমগুরুকে উপাসনা ক'রেই জগতের সকল শিষ্য একত্ব-বোধযুক্ত হোক্, একীভূত হোক্। এই হচ্ছে প্রকৃত গুরুবাদ, এই হচ্ছে বিশুদ্ধ কাঞ্চন। এতে ভেজাল নেই।

অখণ্ডের শিষ্য-সংগ্রহ

মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রসার-পদ্ধতি দেখ। যে ইচ্ছা, সে ধর্ম্ম-প্রচার কচ্ছে, কিন্তু গুরুবাদ নেই ব'লে শত শত দল বা শত শত খণ্ড হবার সুযোগ কম হচ্ছে। আর, দল হ'লেও মূল প্রবর্ত্তকের প্রতি নিষ্ঠায় সবাই অতুল।

শিখ-ধর্ম্মের প্রসার-পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য কর। আদি-গুরু নানক যেন সকল গুরুর সকল শিষ্যদের চিত্তকে এক জায়গায় এনে জুটিয়েছেন, যেখানে অলখ-নিরঞ্জন পরমপ্রভুই সকলের প্রভু, কোনো মানুষ কোনো মানুষের প্রভু নয়।

তোমরা যখন অখণ্ড-ধর্ম্মের প্রসার-সাধনের যোগ্য হবে, তখন তোমরা নিজেদিগকে গুরু ক'রো না, সকল গুরু-গৌরব বিশ্ব-গুরুতে সমর্পণ ক'রে গুরুগিরির জঞ্জাল থেকে আত্মরক্ষা ক'রো।

ব্রহ্মগায়ত্রীর বা ব্রাহ্মণত্বের অধিকার

তোমার উপাসনায় ব্রহ্মগায়ত্রী হচ্ছেন সূচনা-মন্ত্র, মানে—ব্রহ্মগায়ত্রী দিয়ে তোমার তপস্যার প্রথম দ্বারোদ্ঘাটন হচ্ছে। যে বংশে, যে দেশে, যে যুগেই তুমি জন্মে থাক না কেন, অখণ্ড-সাধক ব্রাহ্মণত্বের অধিকারী। এই বোধকে জাগাবার জন্যই ব্রহ্মগায়ত্রীর জপ। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের যা ব্রাহ্মণত্ব-বিধাত্রী,

এ হচ্ছে সে ব্রহ্মগায়ত্রী। সুজন্মা বা অপজন্মা, সম্ভ্রান্ত বা অন্ত্যজ, কুলীন বা অস্পৃশ্য, শ্রেষ্ঠ বা অপাংক্তেয় সবাই হবে ব্রহ্মগায়ত্রীর পুণ্য বারিধারায় বিগতকল্মষ, বিগত-কলঙ্ক। ব্রহ্মগায়ত্রীর গুণে হবে তারা দিব্যজ্যোতি ব্রাহ্মণ বা দেব-ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণত্ব কি? না,—মানবত্বের চরমোৎকর্ষই হল ব্রাহ্মণত্ব। নির্দ্দিষ্ট বংশে জন্মের নামও ব্রাহ্মণত্ব নয়, স্কন্ধে উপবীত-ধারণও ব্রাহ্মণত্ব নয়। মানবত্বের চরমোৎকর্ষকে লাভ করাই হ'ল ব্রাহ্মণত্ব লাভ। মানব-মাত্রেরই মানবত্বের চরমোৎকর্ষে পৌঁছিবার অধিকার আছে। সুতরাং মানব-মাত্রেই ব্রাহ্মণ হবার আকাঙ্ক্ষারও অধিকারী। এই গায়ত্রী-মন্ত্র তোমাকে সেই আকাঙ্ক্ষা প্রদান কচ্ছে। কে কোথায় জন্মেছে, কে কি ভাবে জন্মেছে, এ প্রশ্ন তোমরা ক'রো না। মানবমাত্রকেই নির্ব্বিচারে অখণ্ড-পরিবার-ভুক্ত ক'রে নাও, তার ব্রাহ্মণত্ব লাভের অধিকার স্বীকার ক'রে। তাই ব্রহ্মগায়ত্রী তোমরা মনে মনে উচ্চারণ কর না, ব্রহ্মগায়ত্রী গান কচ্ছ তোমরা উচ্চৈঃস্বরে। (২৮শে শ্রাবণ, ১৩৩৮)

গুরুমূর্ত্তি ধ্যান

প্রশ্নকর্ত্তা।—মানুষ-গুরুর মূর্ত্তি যদি আমার ধ্যান কত্তে ভাল লাগে, তবে তা কর্ব্ব না?

উত্তর।—হাঁ, নিশ্চয়ই কর্ব্বে, যদি অনুভব কর যে, ইনি তোমার কোটি জন্মের সাথী।

বহু-গুরুর বিপত্তি

কিন্তু বাবা, মনুষ্য-জীবন এমনি বিচিত্র যে, অনেক সময় একই লোককে শত গুরু কত্তে হয়। যার হয় ত জীবনে কোনো গুরুর দরকার নেই, দৈব বিভ্রাটে প'ড়ে তাকেই শত গুরুর শত মন্ত্র চাখ্‌তে হয়। যেমন চিরকৌমার্য্যাকাঙ্ক্ষিণী যুবতী হঠাৎ বলাৎকৃতা হ'য়ে শেষে নিজের সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্য পাঁচ জায়গায় খোঁজ কত্তে থাকে যে বিবাহযোগ্য বর কোথায় মিলে। শত জনের সঙ্গে এই উদ্দেশ্য নিয়ে মিলামিশা ক'রে শেষে যেমন সে বর খুঁজে পায় নিজের অন্তর্য্যামীকে। যেখানে শত জনের কাছে উপদেশ নিয়েছ, সেখানে কাকে বাদ দিয়ে কার মূর্ত্তি ধ্যান করবে বল ত? গুরু বহুবিধ। কেউ আদর্শ দিয়ে, কেউ প্রভাব দিয়ে, কেউ উপদেশ দিয়ে, কেউ উৎসাহ দিয়ে, কেউ বা মন্ত্র দিয়ে তোমার কল্যাণ করেন। এই সব গুরুদেবেরা যদি পরস্পরের মধ্যে কলহ বাধান, তখন কাকে ছেড়ে কাকে রাখবে।

অজ্ঞাত ব্যক্তিকে গুরু করিও না

বংশগত গুরুদেবেরা শিষ্যের চিন্তাপহারক না হ'য়ে বিত্তাপহারক হচ্ছেন। অনেক স্থলে নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র ও তপস্যাকে গুরুমর্য্যাদার উপযুক্ত রাখতে পাচ্ছেন না। তদুপরি ত্রিলোকপাবনক্ষম সদ্‌গুরুরা মাঝে মাঝে আবির্ভূত হ'য়ে আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণকে কৃপা কচ্ছেন। এই সকল কারণকে আশ্রয়

ক'রে কুলগুরুদের প্রতিপত্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু নূতন লোককে গুরুরূপে গ্রহণ করার মধ্যেও বিপদ কম নেই। কে জানে, কোন্ গুরু শিষ্যকে কোন্ বিপদে ফেল্‌বেন? কেউ হয়ত শিষ্যের পকেট মার্‌বেন, কেউ হয়ত শিষ্যদের বস্ত্র-হরণ কর্ব্বেন, কেউ হয়ত দেশপূজ্য শিষ্যের নাম ভেঙ্গে নিজ গুরুগিরির পসার বৃদ্ধি কর্ব্বেন। না জেনে না শুনে গুরু করার মত বিপজ্জনক ব্যাপার আর কিছু নেই। তার চেয়ে কুলগুরু লোকটি অনেক ভাল, অল্প কিছু দিলেই সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর চৌদ্দগোষ্ঠীর চরিত্র সবার জানা আছে। ভগবানকে ডাকা দিয়ে কথা, কুলগুরুর কাছে মন্ত্র নিলেও ভগবান্ ডাক শোনেন।

খাঁটি উপদেশ-গুরু

উপদেশের জন্য সকলের কাছেই যাওয়া যায়। যাঁর ভিতরে জ্ঞানের আলো ফুটে উঠেছে, তিনিই উপদেশ দিবার অধিকারী। যাঁর ভিতরে জান্‌বার আগ্রহ জন্মেছে, তিনিই উপদেশ পাবার অধিকারী। কারো কাছে উপদেশ নিতে গেলে তিনি যদি বলেন,—"এক কাণ ফুঁকে দিয়েছেন তোমার পূর্ব্বের গুরু, এখন বাকী কাণটী ফুঁকে দেব আমি, এস আমার কাছে আবার একটা মন্ত্র নাও, নইলে সাধন-তত্ত্বের ফাঁক-ফন্দি কিছু শিখাব না"—তবে বুঝতে হবে, ভাললোকের হাতে পড়া হয় নি। যিনি বল্‌বেন,—"নাম ত বাবা পেয়েছ একজনার কাছ থেকে, তা

নিয়েই থাক, তাতেই মঙ্গল হবে, ভগবানের নাম কখনো ভুল হয় না, তাঁর নাম সকল ভ্রান্তির অতীত। ঐ নামেই ডুবে যাও, ঐ নামেই ম'জে যাও, বৃথা বাবা নানা স্থানে দৌড়াদৌড়ি ক'রো না, আমাকে গুরু ক'রে পুনরায় দীক্ষা নেবার দরকার নেই,"—তিনিই খাঁটি লোক। কিন্তু এ জগতে খাঁটি লোক ক'জন মিল্‌বে ? (২৯শে শ্রাবণ, ১৩৩৮)

রোগারোগ্যের জন্য মন্ত্র-দান

হাঁ মা, নাম জপ কর্‌লে রোগ সারে। এ কথা সত্য। কিন্তু রোগ সারাবার জন্য নাম আমি দিব না। দেহ-মন-প্রাণ সব যখন ভগবানের জন্য পাগল হবে, তখন আমি নাম দিব। এখন তোমরা যে নাম তোমাদের ভাল লাগে, তেমন কোনও সুখময় প্রেমময় নাম জপ কত্তে থাক। তার ফলে যথাকালে সর্ব্বাভীষ্ট-প্রপূরক নাম তোমাদের লাভ হবে।

মন্ত্র-দীক্ষা না দিবার স্থল

জীবের যে কল্যাণ আমার দ্বারা হবে, তা মন্ত্র না দিয়েও হ'তে পারে। তবু অনেককে মন্ত্র দেই। কিন্তু এমন দিন আসছে, যেদিন আমি কাউকে মন্ত্র দিব না, তবু সবাকার ভিতরে সে কাজটুকু আমার হবে। কিন্তু মন্ত্র যদি দিতে হয়, তবে তার স্থলও আছে। যে ব্যাকুল, মন্ত্র তাকে দিতে হয়। যে দশ জনের সঙ্গে প'ড়ে হুজুগে মেতে এসেছে, তাকে নয়।

যে সমগ্র জীবনটার আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়াসী, মন্ত্র তাকে দিতে হয়, গলায় হারের সঙ্গে নাকে নোলক পরার হিসাবে কাউকে মন্ত্র দেওয়া চলে না। যে প্রাণ দিয়ে সাধন কর্ব্বে, মন্ত্র তাকে দিতে হয়। যে হয় ত বোচ্‌কা বেঁধে যত্ন ক'রে তুলে রাখবে, তাকে দিতে হয় না। যার প্রাণ ভগবানের জন্য কেঁদেছে, সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা সুপাত্র। স্ত্রীলোক যারা, তাদের মন্ত্র দিতে হ'লে তাদের অভিভাবকের সম্মতি দরকার, নইলে, সাধন-বিঘ্ন ঘটে, তুমুল অশান্তি আসে। আর রোগ সারাবার জন্য যারা মন্ত্র চায়, তারা মন্ত্র-গ্রহণ-কালে ভগবানের কথা ভাবে না, ভাবে রোগের কথা, এমন কি মন্ত্র-দাতারও অনেক সময় রোগের কথাই ভাব্‌তে হয়। এজন্য এ সব স্থলে নির্ব্বিচারে মন্ত্র দেওয়া অসঙ্গত। অবশ্য, এ কথাও সত্য, অনেক জীবহিতপরায়ণ উপদেষ্টারা পাত্রাপাত্র বিচার না ক'রে মন্ত্র দিয়ে থাকেন এবং যার যেটুকু হিত সম্পাদিত হয়, সেইটুকুকেই জগতের লাভ ব'লে মনে ক'রে থাকেন। (৭ই ভাদ্র, ১৩৩৮)

বহু-মন্ত্রীর বিড়ম্বনা

না মা, এক পাঁঠাকে দুই দেবতার কাছে বলি দিতে নেই। সব নামই যখন ভগবানের, তখন বিশ গণ্ডা মন্ত্র নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। একটী মন্ত্রেই সমস্ত মন ঢেলে দিলে তাতেই মনে শান্তি আস্‌বে, তাতেই ঈশ্বরদর্শন হবে। তোমরা

তোমাদের গুরুর কাছ থেকে যে মন্ত্র নিয়েছ, সেই মন্ত্রই জপ ক'রে যাও, অভ্যাসের ফলে ক্রমে তাতেই আনন্দ পাবে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বারংবার বহুমন্ত্র গ্রহণ কর্লে শেষে মনের এমন এক দুরবস্থা এসে যেতে পারে, যাতে কোনো মন্ত্রেই আর মন বসাতে পারবে না।

সতীত্ব-সংস্কারের মূল কোথায়?

বল্‌তে পার মা, স্ত্রীলোকের একটী ছাড়া দুইটী স্বামী গ্রহণ করা চলে না কেন? চলে না এই জন্য যে, বারংবার নূতন স্বামী গ্রহণ কর্ত্তে হ'লে শেষ পর্য্যন্ত জীবনটাকে কারো সঙ্গেই হয়ত খাপ খাইয়ে চালানো যাবে না। ফলে, যে শান্তির আশায় স্বামী বদলানো, সেই শান্তিই হয়ত আর জীবনে ঘট্‌বে না। তাই বুদ্ধিমতী মেয়েরা একজনকেই স্বামীরূপে গ্রহণ করে এবং দুঃখকষ্ট যতই হোক্, ঐ একজনকে নিয়েই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের আমৃত্যু চেষ্টা করে। জোর ক'রে লোকে মেয়েদের ঘাড়ে সতীত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়নি। মেয়েরা নিজেরাই নিষ্ঠাহীন জীবনের দুর্গতি দর্শন ক'রে সতীত্বের কল্যাণ-সংস্কারকে নিজেদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করেছে। পুরুষেরাই জোর ক'রে স্ত্রীলোকদের ঘাড়ে সতীত্বের সাধনা চাপিয়ে দিয়ে থাকলে স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বজনীনভাবে আন্দোলন ক'রে অনেক আগেই এই সংস্কারের সকল বেড়া প্রকাশ্য ভাবে ভেঙ্গে ফেল্‌ত, লক্ষ লক্ষ বৎসর ধ'রে এটাকে সহ্য কর্ত্ত না। পরন্তু সতীত্বের সংস্কার

অধিকাংশ স্ত্রীলোককেই শান্তি দিয়েছে, তাই স্ত্রীলোকেরা একই স্বামীকে নিয়ে দুঃখের ভিতর দিয়েও জীবন কাটাতে ইচ্ছুক।

দশ দিকে মন দিও না

সতীত্ব মানে এক স্বামীতে নিষ্ঠা, বহু স্বামীতে অনিচ্ছা। একই জিনিষে লেগে থাকাটার ধর্ম্মজগতে প্রয়োজন আরও বেশী। একই ভাবকে অবলম্বন ক'রে আমৃত্যু ঈশ্বর-সাধনের চেষ্টাই হচ্ছে ধর্ম্মজীবনে পরম-কল্যাণ লাভের প্রধান পন্থা। এই কারণেই আমি কারো ভাব নষ্ট করি না, কারো মতামত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করি না, কাউকে আমার মতের প্রতি আকৃষ্ট কত্তে আগ্রহ দেখাই না,—যাদের নিজেদের এখনো কোনো ভাব বা পথের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ আদৌ সৃষ্টি হয় নি, মাত্র তাদের ভিতরে নিজের ভাবকে প্রচার করি। তোমরা যখন একটা মতকে অবলম্বন করে চলেছ মা, তখন আর মত পাল্‌টাবার বুদ্ধি বা সুযোগ তোমাদিগকে আমি দিব না। ওতে আমি প্রাণের কোনও সমর্থন পাই না। যেভাবে ভগবান্‌কে ডাকৃছ, সেই ভাবেই ডেকে যাও, তাতেই শান্তি হবে। এক ভাব নিয়ে লেগে থাক মা, একভাবেই লেগে থাক, দশদিকে মন দিও না।

গুরু ও মন্ত্র-ত্যাগের ক্ষেত্র

কোনও অবস্থাতেই কি পূর্ব্বগৃহীত মত ও পথ পরিহার করা সঙ্গত নয়? সাধারণ ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু অসাধারণ ক্ষেত্র

আছে, যেখানে পরিহার করা যায়, পরিহার কত্তেও হয়। অবস্থা-বিশেষে ভগবান্ বিষ্ণুকেও বামুনের লাথি খেতে হয়, কিন্তু সেটা ভৃগুমুনির ক্ষেত্রে। সব বামুনেরাই গিয়ে বিষ্ণুকে লাথি মার্‌লে চল্‌বে না। কারো কাছে শিষ্য হ'য়ে যদি দেখ্‌তে পাও যে, তাঁর সংস্পর্শে তোমার নৈতিক আদর্শ মলিন হ'য়ে যাচ্ছে, পঙ্কিলতায় জীবন স্বচ্ছতা হারাচ্ছে, তোমার জীবনের পরম-কল্যাণের সাথে তোমার পূর্ব্বগৃহীত মত ও পথের কোনও সামঞ্জস্য ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছ না,—যদি দেখ্‌তে পাও, সরলতা আর কুণ্ঠাহীনতা তোমার ক'মে যাচ্ছে, আড়ম্বরের বহুলতায় তোমার প্রাণের অর্ঘ্য গিয়ে তোমার জীবন-দেবতার পায়ে পৌছুবার বিঘ্ন হচ্ছে, জটিলতা, সন্দেহ, কুতর্ক আর গোঁজামিল তোমার ধর্ম্ম-জীবনের পূর্ণচন্দ্রকে ক্রমশঃই রাহুগ্রস্ত কচ্ছে, তখন পূর্ব্বগুরু আর পূর্ব্বপথ পরিত্যাগ কল্লে পাপ হয় না, দোষও হয় না।

প্রচলিত গুরুবাদের বিপত্তি

মাগো, বিপত্তি ঘটেছে তোমাদের ঐ সর্ব্বনেশে গুরুবাদে। কেউ এসে মন্ত্র দিলেই তিনি একেবারে পরমেশ্বর হ'য়ে যাবেন। তাই, মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে আর তোমাদের চিন্তা কর্ব্বার স্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত থাকে না যে, এগুচ্ছ না পেছুচ্ছ। গুরু এসে মন্ত্র দিলেন ভগবানের, আর তোমরা ভগবান্‌কে চুলোয় ঢুকিয়ে কত্তে আরম্ভ কল্লে "গুরু" "গুরু"। শেষে জীবনের

উপরে এসে ছায়াপাত কত্তে লাগল, মন্ত্রদাতার জীবনের যত দোষ আর ত্রুটি,—কারণ, একেবারে ত্রুটিহীন মানব-জীবন হওয়া সুকঠিন। ভগবান্‌কে ডাকবার জন্য মন্ত্র নিয়েছিলে, কিন্তু পরিণামে অনুশীলন কত্তে লাগ্‌লে মন্ত্রদাতার ত্রুটি-বিচ্যুতির, ভ্রম-প্রমাদের, সংসার-বুদ্ধির আর চতুরতার। এই বিপজ্জনক গুরুবাদ মা যতদিন থাকবে, ততদিন বারংবার মন্ত্র পাল্‌টাবার প্রয়োজনও তোমাদের হ'তে থাকবে।

প্রকৃত গুরুবাদ

বল্ মা তোরা, কবে দেখ্‌ব, মন্ত্রদাতা পরমেশ্বর নন, যাঁর নাম, তিনিই পরমেশ্বর, তিনিই ভূতভাবন মহেশ্বর, তিনিই সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবান্, জড়কে ছেড়ে চৈতন্যকে কবে গুরু ব'লে ভাব্‌তে লোকে শিখ্‌বে? গুরু-প্রণাম কত্তে গিয়ে শত শত মন্ত্রদাতার মূর্ত্তি মানবের চোখের সাম্‌নে ফুটে না উঠে, কবে পরমমহৎ পরমাত্মার দিব্য অনুভূতি অন্তরে জেগে উঠ্‌বে?

(২১শে ভাদ্র, ১৩৩৮)

দীক্ষা ও জগৎ-কল্যাণ

তোদের এই দীক্ষাতে হোক্ নারীজাতির অসীম কল্যাণের সূচনা। তোদের ত্যাগ, তোদের তপস্যা সমগ্র নারীজাতির ভিতরে বিসর্পিত হোক্, তোদের জ্ঞান, তোদের ধ্যান সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক চাঁদের আলোর মতন আনন্দকে জাগিয়ে,

অভয়কে প্রতিষ্ঠিত ক'রে। দীক্ষার মানেই হচ্ছে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরমমঙ্গলের সাথে নিজেকে যুক্ত করা।

(২৫শে ভাদ্র, ১৩৩৮)

ভগবানের নামই প্রকৃত গুরু

গুরু খুঁজে বেড়াচ্ছ, যিনি তোমার অন্ধকার দূর কর্ব্বেন, সংশয় ছেদন কর্ব্বেন, দুর্ব্বলতা নাশ কর্ব্বেন, সিংহ-বিক্রমে লক্ষ্য-পথে চল্‌বার প্রেরণা দেবেন, তোমার তুমিত্বকে ফুটিয়ে তুল্‌বেন, জ্ঞানের মূর্ত্তিতে তোমার হৃদয়ঙ্গম হবেন, প্রেমের মূর্ত্তিতে তোমার অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তুলবেন, আনন্দের মূর্ত্তিতে তোমার মধ্যে নিত্য-প্রতিষ্ঠিত হবেন? তবে জানো, ভগবানের নামই তোমার সেই গুরু, যাঁর শরণাপন্ন হ'লে দুঃখ-দুর্গতি ভুল হ'য়ে যায়, নিত্য-সুখের উদয় হয়, প্রেমের প্রবাহ বইতে থাকে, জ্ঞানের সূর্য্য উদিত হয়, আনন্দের পারিজাত-পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। নামই তোমার গুরু, আর কোনও গুরু মান্‌বার প্রয়োজন নেই। (১লা আশ্বিন, ১৩৩৮)

মন্ত্র না নিয়া দীক্ষা

আমার কাছে দীক্ষা তুমি চাচ্ছ বটে। কিন্তু বাবা, দীক্ষা শব্দের মানে জানো? জীবনকে ভগবানের পায়ে লুটিয়ে দিব, এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর পবিত্র নাম জপ কর্ত্তে সুরু করাই হচ্ছে

দীক্ষা নেওয়া। আমার কাছ থেকে কোন মন্ত্র না নিয়েও সে দীক্ষা তোমার হ'তে পারে। তোমার অন্তরই ত জানে, জগতে কোন্ নাম পবিত্রতম। প্রাণ ভ'রে সেই নামে ভগবান্‌কে ডাকো। তথাকথিত লৌকিক দীক্ষার কোনো দরকার নেই বাবা। (৬ই আশ্বিন, ১৩৩৮)

শিষ্যের স্বাধীনতা ও গুরু

তোমাদের যে কাহারও যে-কোনও কর্ম্মপাশ ছিন্ন করিবার শক্তি আমার আছে। কিন্তু আমি কাহারও রুচি-প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিজ প্রভাব বা প্রভুত্বকে পরিচালিত করিতে ইচ্ছুক নহি। আমি মনে মনে যার সম্বন্ধে যে ইচ্ছা পোষণ করিতেছি, ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্, তোমাদিগকে বাধ্য হইয়াই তাহা হইতে হইবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সংগুপ্ত ইচ্ছার সহিত তোমাদের প্রকাশ্য কর্ম্মোদ্যমের ঐক্য না দেখিতে পাইতেছি, ততদিন আমার ইচ্ছা আমার অন্তরের নিভৃতে থাকিয়াই তোমাদের উপরে সূক্ষ্মক্রিয়া বিস্তার করিতে থাকিবে। প্রকাশ্য ভাবে আমি কোনও আদেশ দিয়া তোমাদের লৌকিক স্বাধীনতার সম্মান ক্ষুণ্ণ কিছুতেই করিব না।

তোমার পক্ষে তোমার বর্ত্তমান কর্ম্মধারা পরিত্যাগ অতিশয় কষ্টকর। কারণ, একদিকে চিন্তা-শক্তির আড়ষ্টতা, অপর দিকে প্রতিষ্ঠালোপের আশঙ্কা। দায়িত্ব-জ্ঞান নামক এক

বস্তুও কিছু আছে। কিন্তু তোমার পক্ষে প্রকৃত সঙ্কট যাহাই হইয়া থাকুক না কেন, আমি ইচ্ছা করিলেই তোমাকে সকল সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া আমার কাছে টানিয়া আনিতে পারি। কিন্তু আমি আনিব কিনা, তাহা আমার উপরে নির্ভর করিবে না,—করিবে তোমারই উপরে। (১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৩৮)

ভগবানই তোমার গুরু

মন্ত্র নেবে, যার কাছে রুচি, তারই কাছ থেকে। কিন্তু গুরু ব'লে জান্‌বে একমাত্র ভগবানকে। শিষ্য গুরুর বীর্য্য পায়। ভগবানকে গুরু ব'লে মান্‌লে তোমরা ভগবানের বীর্য্য পাবে, তেজ পাবে, মহিমা পাবে। যে যাকে মানে, সে তার মত হ'য়ে যায়। ভগবানকে মেনে তোমরা ভগবানের মত হ'য়ে যাও। আমি যে তোমাদের উপদেশ দেই, তার কারণ, আমি চাই, তোমাদের মধ্যে ভগবানের শক্তি ফুটুক, তোমরা ভগবান্ হও। তোমরা ভগবান্ হবে, এই আশাতেই আমি তোমাদের পূজা করি। বল,—ভগবানই তোমাদের গুরু। ধ্যান কর,—ভগবানই তোমাদের গুরু। অনুভব কর,—ভগবানই তোমাদের গুরু। ভগবানকে গুরুর আসনে বসিয়ে ভগবানের যে-কোনও ভক্তের উপদেশ নিয়ে সাধন-ভজন কর, তাতেই মুক্তি হবে, তাতেই শান্তি হবে। ভগবানকে গুরুর আসনে বসিয়ে তারপরে যদি পুরাপুরি নিজের সাধারণ জ্ঞানের উপরে নির্ভর

ক'রে কারো কাছে দীক্ষা না নিয়েও সাধন-ভজন ক'রে যাও, তাতেও তোমার কল্যাণই হবে এবং কালক্রমে তিনি নিজেই তোমার সাধন-নিষ্ঠা বর্দ্ধনের ও সাধন-কৌশল শিক্ষণের উপযুক্ত আনুকুল্য সৃষ্টি ক'রে দেবেন।

দীক্ষা দিবার রোগ

অনেক ব্যক্তির দীক্ষা দেবার রোগ আছে। এ রোগ কতকদিন আমারও ছিল। এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা কেউ দীক্ষা দেন পরকল্যাণের উদ্দেশ্যে, কেউ দেন নিজের স্বার্থে, কেউ দেন অভ্যাসবশে। কিন্তু যিনি যে প্রয়োজনেই দিন, দীক্ষাদাতার চরিত্রের কোনও অসম্পূর্ণতা থাকুলে, সেই অসম্পূর্ণতা পরিশেষে দীক্ষিতকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করে।

দীক্ষাদাতাকে গুরু মনে করা নিষ্প্রয়োজনীয়

সুতরাং দীক্ষাদাতাকে গুরু ব'লে মনে করা নিষ্প্রয়োজনীয়। যাঁর পবিত্র নামে তোমাকে দীক্ষা দেওয়া হ'ল সেই নিখিল-প্রভু নিখিলগুরু নিখিলমঙ্গলনিলয় পরমাত্মাই তোমার গুরু, এই ভাব নিয়ে দৃঢ় নিষ্ঠায় দৃঢ় অধ্যবসায়ে নামের সাধন করে যাও। প্রত্যক্ষ ফল এতেই পাবে। (২১শে কার্ত্তিক, ১৩৩৮)

দীক্ষার মানে

দীক্ষা নিলে কি শোকের জ্বালা দূর হয়? নিশ্চয় হয়। দীক্ষার মানে কি ছেলেখেলা? দীক্ষার মানে নবজন্মলাভ।

দীক্ষা নিয়েও যদি কারো শোক না যায়, তবে বুঝতে হবে দীক্ষাই হয়নি, একটা তামাসাই মাত্র হ'য়েছে। (২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৩৮)

দীক্ষার অপব্যবহার

যে দেশে মৃতবৎসা নিবারণের জন্য, প্রমেহ-উপদংশ রোগ সারাইবার জন্য, পুত্রসন্তান লাভের জন্য, পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য, মোকদ্দমায় জিতিবার জন্য, লটারীর টাকা পাইবার জন্য এবং প্রণয়িনী বশ করিবার জন্য লোক মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকে, সেই দেশে গুরুর পদবী লাভ করা কি বিড়ম্বনা-জনক! এই দেশে কাজ করিতে হইলে তোমাদিগকে একদিকে যেমন এসব ভণ্ড গুরুর শক্তির বিরুদ্ধে তপোলব্ধ ব্রহ্মবীর্য্য পরিচালনা করিতে হইবে, তেমনি আবার যার তার কাছে মাথা নোয়াইবার দাসসুলভ হীনতা হইতে এদেশের নরনারীকে রক্ষা করিবার জন্য বেদান্তের রুদ্রগম্ভীর বজ্র-গর্জ্জনে বসুন্ধরা কাঁপাইতে হইবে। (৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮)

পার্থিব স্বার্থলোভে মন্ত্রগ্রহণ

পার্থিব উন্নতির লোভে এক গুরুর কাছ থেকে আর এক গুরুর কাছে দৌড়াদৌড়ি করার মত মূর্খতা কিছু নেই। ইনি হয়ত স্কুলের মাইনে জোগাবেন, এজন্য এঁর কাছে মন্ত্র নিলাম; উনি হয়ত একটী চাকুরী সংগ্রহ ক'রে দেবেন, এজন্য ওঁর কাছে মন্ত্র নিলাম; আবার আর একজন হয়ত বিলেতে যাবার খরচ

দেবেন, এজন্য আবার তৃতীয় ব্যক্তির কাছে মন্ত্র নিলাম,—এর চেয়ে বুদ্ধির বিভ্রম আর কিছুই হ'তে পারে না।

স্বার্থলোভে দীক্ষার মনোবৃত্তি

দীক্ষা গ্রহণের প্রধান এবং প্রথম উদ্দেশ্যই হবে, আত্মিক উন্নতি লাভ। দীক্ষা গ্রহণ ক'রে যদি সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনও উন্নতি হয় হোক্, না হয় না-হোক্, সেই দিকে লক্ষ্যহীনই থাকতে হবে। শীতলা দেবীর কাছে লোকে পাঁঠা মানত করে যে মনোবৃত্তি বশতঃ, ঈশ্বর-প্রেমিকের কাছে দীক্ষা গ্রহণ কখনো সেই মনোবৃত্তি নিয়ে চলতে পারে না। রোগ সারাবার জন্য, মোকদ্দমায় জয়ের জন্য, স্বামি-বশীকরণের জন্য, স্ত্রী-বাধ্যকরণের জন্য, পরীক্ষায় পাশের জন্য, চাকুরী পাবার জন্য, পুত্র লাভের জন্য প্রভৃতি উদ্দেশ্য নিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করার মনোবৃত্তিই দেশ থেকে দূর ক'রে দিতে হবে।

দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য

দীক্ষার মানে কি? নবজন্ম লাভ। জন্মের সব কলুষ-কালিমার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে, অতীতের পাপময় সংস্কার-গুলির হাত এড়িয়ে নূতন ক'রে জীবনের পথ চলতে আরম্ভ করা। যে কামুক ছিল, সে কামের সেবা ছাড়্‌বে, যে লম্পট ছিল, সে লাম্পট্য পরিহার কর্ব্বে, যে পরস্বাপহারী ছিল, সে চুরি-জুচ্চোরী ছাড়্‌বে, যে পরনিন্দুক ছিল, সে পরচর্চ্চা ও

পরদোষানুসন্ধান ত্যাগ কর্ব্বে, যে অহঙ্কারী ও দাম্ভিক ছিল, সে বিনয়ী ও বিনম্র হবে,—এই সঙ্কল্প নিয়ে নূতন ক'রে জীবন-যাত্রা আরম্ভ করাই দীক্ষার উদ্দেশ্য। বড়ই যন্ত্রণা বোধ করি তখন, যখন লোকগুলি দলে দলে পার্থিব ছোটখাট প্রয়োজনের দাবী মিটাবার উপায়স্বরূপে দীক্ষার মত অপার্থিব ব্যাপারকে গ্রহণ কত্তে আসে। এ যেন ভগবানের নামকে সাড়ম্বরে উপহাস করা।

সমদীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বোধ

সমদীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে একটা গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ অবশ্যম্ভাবী। সত্যি সত্যি যাদের সুদীক্ষা হয়েছে, যোগ্যপাত্রে যেখানে দীক্ষা পড়েছে, সেখানে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যেন সহোদরের ভাব এসে যায়। কোনও কৃত্রিমতা প্রয়াস দ্বারা সে ভাব সৃষ্টি কত্তে হয় না, আপনি এসে যায়। এর ফলে আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐহিক উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়ে। ধর্ম্ম-বন্ধনে যারা সহোদর, পার্থিব জগতের কর্ম্ম-প্রসঙ্গেও তারা কেন সহোদরের মত হবে না? ফলে পার্থিব উদ্যমেও পরস্পরের সুপ্রচুর সহযোগ জন্মে এবং তা' থেকে পার্থিব উন্নতি লাভের সূচনা হয়। এর পরে চাই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত উৎসাহ. উদ্দীপনা, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, সততা, সচ্চরিত্রতা ও লক্ষ্যলাভের দৃঢ়তা।

সমদীক্ষিতের ভ্রাতৃত্ববোধের অভাব পঙ্কিলতার লক্ষণ

দীক্ষা গ্রহণ কল্লে অথচ সমদীক্ষিতের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ জাগল না, এটা কি বস্তু জানো? এটা একটা মানসিক পঙ্কিলতার লক্ষণ। পবিত্রহৃদয় ব্যক্তি কি সমদীক্ষিতকে প্রাণের প্রাণ ব'লে জ্ঞান না ক'রে পারে? দীক্ষায় হৃদয় পবিত্র হয় ব'লেই হৃদয়ে প্রেম আসে। দীক্ষার ফলে সকলের প্রতিই প্রেম আসে কিন্তু বিশেষ ক'রে আসে তাদের প্রতি, যারা এই একই প্রেমধর্ম্মে জীবন বিকিয়ে দেবার কৌশল শিক্ষা করেছে। এই প্রেমই ক্রমশঃ শক্তিশালী সমাজ সৃষ্টি করে, শক্তিশালী জাতির পত্তন করে। দৃষ্টি যখন তোমার পরলোকের দিকে, তখন তুমি গুহাবাসীর একক জীবন-যাপন ক'রো, কিন্তু ইহলোকেও যখন তোমাকে বিচরণ কত্তে হবে, তখন তোমার সমভ্রাতৃত্ব জাগতিক দুঃখ দূর কর্ব্বার ব্যাপারে পরস্পরের বল-বর্দ্ধক হবে। (৩রা পৌষ, ১৩৩৮)

নামই সদ্‌গুরু

ভগবানের পরমপবিত্র নামই প্রকৃত সদ্‌গুরু। তাঁকে নিয়ে ডুবে যাওয়াই জীবের সব চেয়ে পবিত্র কর্ত্তব্য। ঐ নামকেই দীক্ষাগুরু আর ঐ নামকেই শিক্ষাগুরু ব'লে জ্ঞান করা উচিত। নাম কত্তে কত্তে পরমাত্মার সেবায় জীবনোৎসর্গের একনিষ্ঠ সঙ্কল্প যখন এসে গেল, জানতে হবে, তখনই দীক্ষা হ'ল। নাম

কত্তে কত্তে নামের গুণেই অন্তরের সহস্র সহস্র সমস্যার সমাধান যখন হ'তে লাগ্‌ল, জান্‌তে হবে তখনই শিক্ষা হ'ল। একমাত্র নাম ছাড়া অন্য কোনও গুরুর প্রাধান্য স্বীকার করা একটা মূর্খতা-বিশেষ। নাম পবিত্রতম, নিষ্কলুষ, অপাপবিদ্ধ বস্তু। আর মানুষ-গুরুর ভ্রম প্রতিপদে, ত্রুটী ক্ষণে ক্ষণে, দেহাত্মবোধ-সুলভ নানা প্রমাদ তার অবিরাম। তাকে গুরু মনে না ক'রে নামকেই গুরু ব'লে জ্ঞান করা উচিত। নামকে শক্ত ক'রে ধর, নামকে প্রাণের পরম আরাম ব'লে জান, নামকে জীবনের চরম আশ্রয় ব'লে জ্ঞান কর, নাম-কল্পতরুর শীতল ছায়ায় তাপিত প্রাণ জুড়াও, জীবনের নববসন্তে নামে বিহগকাকলী শুনে কর্ণ পরিতৃপ্ত কর, অবিরাম অনুক্ষণ নাম স্মরণ ক'রে মনকে ত্রাণের পথে টেনে নাও, যখনি সুযোগ পাও ভগবানের নাম-কীর্ত্তন ক'রে রসনা সার্থক কর। আর সব ভুলে যাও।

গুরু-পরিবর্ত্তনের ভালমন্দ

পঞ্চাশ বার গুরু বদ্‌লাবার বুদ্ধি কোন কাজের বুদ্ধিই নয়। পঞ্চাশবার স্বামী বদ্‌লাবার বুদ্ধি কি স্ত্রীলোকের সতীত্ব-গৌরবের বর্দ্ধক হয়? অবশ্য স্বীকার কত্তে হবে যে এমন স্ত্রীলোক আছে, লোক যাদের উপর বলাৎকার ক'রে তাদের উপর স্বামিত্ব-প্রতিষ্ঠা করেছে। সেই স্থলে বলাৎকারের অপমান অসহ্য জ্ঞান ক'রে নারী উপযুক্ত ব্যক্তিকে বরমাল্য দিয়ে থাকে, না দিলে তার

অসম্মানাহত চিত্ত চিরসঞ্চিত বিক্ষোভের অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হ'য়ে মরে। এসব ক্ষেত্রে পতি মেনেও পতি ত্যাগ করা যায়। ঠিক তেমনি মন্ত্রদান যেখানে বলাৎকারের মত এসে পড়েছে, সেখানে অন্তরের বিক্ষোভকে দূর ক'রে প্রশান্ত মন নিয়ে সাধন কর্ব্বার যোগ্যতা সঞ্চয়ের জন্য অন্য গুরুর কাছে নূতন ক'রে মন্ত্র নেওয়া যেতে পারে। অনেক স্থলে নেওয়া উচিত। অনেক স্থলে না নিলে জীবন-তরী বানচাল হ'য়ে যায়। আমৃত্যু যারা চিরকুমারী থাকত, এমন কত শুদ্ধস্বভাবা নিষ্পাপা মেয়েকে যে অপ্রত্যাশিত বলাৎকারের ফলে বাধ্য হ'য়ে অন্য ব্যক্তিকে স্বামী-রূপে গ্রহণ কত্তে হয়েছে, তা বল্‌বার নয়। কারো কাছ থেকে মন্ত্র না নিয়ে যাদের আজন্ম-তপস্যার সুন্দর জীবন শুধু এক-নিষ্ঠার শক্তিতেই ভগবল্লাভ কত্তে পাত্ত, বলাৎকৃত দীক্ষার ফলে তাদের কতজনকে যে শেষে নিজের মনের মত ব্যক্তি খুঁজে নিজের মনের মত মন্ত্র নিয়ে পূর্ব্বমন্ত্র ত্যাগ কত্তে হয়েছে, তারও সংখ্যা নেই।

নামকেই পরম অবলম্বন কর

কিন্তু সব কথার সেরা কথা এই যে, নামই তোমার পরম অবলম্বন, নামটি নিয়ে আনন্দ-সাগরে ডুবে যাও। দীক্ষা যদি কারো কাছে নিয়ে থাক, সে উত্তম কথা। না নিয়ে থাকো, তাও উত্তম। দীক্ষা নিয়েছ কি না নিয়েছ, দীক্ষা নিয়েছ কার কাছ থেকে আর কার কাছ থেকে নয়, এই বিষয় নিয়ে মাথা না

ঘামিয়ে, মস্তিষ্কের সব কেন্দ্রগুলিকে ঘামিয়ে ফেল নামের সেবা নিয়ে। ধ্রুবকে দীক্ষা দিলেন দেবর্ষি নারদ। কিন্তু দীক্ষার পরে ধ্রুব "নারদ নারদ" করেন নি, "হরি হরি"ই করেছিলেন। কেউ তোমাকে দীক্ষা দিয়ে থাকেন ত' বেশ করেছেন। তিনি তোমার পূজনীয়। কিন্তু "গুরু গুরু" না ক'রে "হরি হরি"ই কর। নামের ভিতরেই সত্যগুরুকে উপলব্ধি কর। নামের ভিতরে নিখিল সত্যকে উপলব্ধি কর। নামের ভিতরে নিখিল তত্ত্বকে আস্বাদন কর। নামের ভিতরেই শান্তির আশ্রয় আর অমৃতের উৎস অনুসন্ধান ক'রে বের করে নাও। নামের মধ্যে থেকেই নিখিল কুশল আহরণ কর। নামকে জানো সর্ব্বস্ব-ধন, নামকে জানো পরম আপন।

মধু ও ভ্রমর

ওঁরা বলেন, মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন এক ফুল থেকে আর এক ফুলে যায়, জ্ঞানলুব্ধ শিষ্য তেমন এক গুরু থেকে আর এক গুরুতে যায়। এই যুক্তি দিয়ে ওঁরা সাধকদের বারংবার গুরু-পরিবর্ত্তনের প্রবৃত্তি বাড়িয়ে দেন, সাধকদের নিষ্ঠার মূল শিথিল ক'রে দেন। এই যুক্তির উপরে যাঁরা জোর দেন, প্রায়ই দেখা যায়, তাঁরা অপরের অস্থায়ী শিষ্যকে নিজ স্থায়ী শিষ্য কর্ব্বার বেলায় বড়ই উদার। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই,— এমন ফুল নেই, যাতে মধু নেই, তবু ভ্রমর ফুলে ফুলে উড়ে

বেড়ায় কেন? যেই ফুলে মধু পায়, ভ্রমর কি চিরকাল সেই ফুলেই ব'সে থাকে, না মধুটুকু পেয়েই উধাও হয়? মানব মাত্রেই কারো শিষ্য, আবার কারো গুরু। মানব মাত্রেই কারো কাছ থেকে মধু আহরণ করে, আবার কাউকে মধু বিতরণ করে। এই আহরণ আর বিতরণ তার স্বভাব-বিহিত ব্যবসায়। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে তা ক'রে যাচ্ছে। কিন্তু মানুষের জীবন অপূর্ণ জীবন, তাই মানুষের কাছ থেকে মধু-আহরণও অপূর্ণ আহরণ, মানুষের প্রতি মধু বিতরণও অপূর্ণ বিতরণ। এক্ষেত্রে শিষ্যকে কোনও এক নির্দ্দিষ্ট গুরুর লাঙ্গুলের সাথে আমৃত্যু বেঁধে রাখবার বুদ্ধি একপ্রকারের জুয়াচুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য, অনেকে না জে'নে জুয়াচুরি করেন,—ইংরাজিতে যাদের বলে honest swindler.

গুরু আর সদ্‌গুরু

গুরু আর সদগুরু এক জিনিষ নয়। যে-কেহ যে-কারো গুরু হ'তে পারেন, কিন্তু যে-কেউ সদ্‌গুরু হতে পারেন না। গুরু শুধু তাঁর শিষ্যেরই গুরু, সদ্‌গুরু তাঁর শিষ্য-অশিষ্য-নির্ব্বিশেষে "সকলের গুরু"। তপস্যার শক্তিতে সদ্‌গুরুর উচ্চ থাকে যাঁরা ওঠেন, তাঁরা সকলের শিষ্যকেই নিজ নিজ নিষ্ঠায় রেখে তার উন্নতি-বিধান করেন। সদ্‌গুরুরা অনেক ক্ষেত্রে দীক্ষা দেনও না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কয়জনের মন্ত্র

পাল্‌টে দিয়েছিলেন, প্রভু জগদ্বন্ধু কয়জনকে মন্ত্রদান করেছিলেন, ঋষি অরবিন্দ কয়জনকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপদেশ প্রদান করেছেন? তবু এঁদের প্রভাব-শক্তি শত শত জীবনের উপর আশ্চর্য্য কাজ করেছে। মধুলুব্ধ ভ্রমরের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সাধন-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিষ্ঠার মূল শিথিল করার চেষ্টা এঁরা করেন নি। কারণ, এঁরা শুধু গুরু নন, এঁরা সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু পথে ঘাটে মেলে না, তাই অধিকাংশ গুরুদেবরাই মধুলুব্ধ ভ্রমরের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে অপরের শিষ্যকে নিজ শিষ্য-সম্প্রদায়ভুক্ত কর্ব্বার জন্য অত প্রতিভা আর অত অধ্যবসায়কে অপব্যয়িত করেন।

শকুনির চীৎকারে কাণ দিও না

তুমি যার কাছ থেকেই মন্ত্র নিয়ে থাকনা কেন, নাম ক'রে যাও, ওতেই তোমার মুক্তি হবে, ওতেই তোমার শান্তি হবে। ওতেই তোমার ইহ-পর জীবনের পরমকল্যাণ সাধিত হবে। সুতরাং শকুনির চীৎকারে কর্ণপাত করো না। মন্ত্রদাতা যদি মন্ত্রের সাথে তোমাকে অসংযম আর ব্যভিচারের বীজাণু না দিয়ে থাকেন, পরানিষ্ট আর হিংসা-প্রবৃত্তির ইন্ধন যদি ঐ মন্ত্রের ভিতরেই লুকায়িত না থেকে থাকে, তবে জেনো, ঐ মন্ত্রেই তোমার সকল কল্যাণ হবে। শকুনি বল্লাম কেন? ধর্ম্ম-জগতে শকুনি তাঁরা, যাঁরা পচা গরুর মাংস ভালবাসেন।

লম্পটেরা যেমন নিজের স্ত্রীর পরিবর্ত্তে পরস্ত্রীর প্রতি একটু বেশী প্রীতি অনুভব করে। যাঁরা পরের শিষ্যকে নিজের শিষ্য করার জন্য ব্যাকুল, তাঁদের আমি শকুনির মতই দেখি। ঠিক শকুনির মত আকাশের ঊর্দ্ধদেশে বিচরণ ক'রে তত্ত্বজ্ঞানের কত মধুর আর কত গম্ভীর আলোচনাই করেন, কিন্তু দৃষ্টি থাকে কি ক'রে একটী শিষ্য বাড়াবেন। যেন ব্যাধ তাঁর জাল ছড়িয়ে ব'সে আছেন অন্য লোকের কপোত ধরার জন্য। এঁরা জগতের সব চেয়ে বড় জুয়াচোর। নিঃস্বার্থপরতার ভাণ এদের অসম্ভব রকমের, দু'বছর সঙ্গে থেকেও হয়ত চালাকী ধ'রে উঠতে পারবে না। সুকৌশলে এঁরা ধীরে ধীরে তোমার নির্দ্দিষ্ট সাধন-মার্গে ন্যস্ত মনকে টলাতে থাকবেন এবং ঝম্প দিয়ে ঘাড় ভাঙ্গবার জন্য হয়ত মাসের পর মাস প্রতীক্ষা ক'রে বেড়াবেন। রজোমতী রমণীর পরিত্যক্ত অপবিত্র বস্ত্রখণ্ডের ন্যায় অস্পৃশ্য জ্ঞানে এসব ব্যাধদের সংসর্গ পরিত্যাগ কর।

শিক্ষাগুরু কি শিখাইবেন ?

শিক্ষাগুরু কি শিখাইবেন ? নূতন একটা মন্ত্র ? জেনো, ওটা একটা ধাপ্পাবাজি মাত্র। তোমাকে শিষ্য ক'রে হয় তাঁর অর্থ, নয় তাঁর লোকমান বৃদ্ধির সাহায্য হবে, তাই তিনি মন্ত্র দিয়ে তোমাকে ত্রাণ কত্তে চান। কিন্তু যে মন্ত্রটা তুমি আগেই পেয়েছ, তাতেই তোমার ত্রাণ হতে পারে। আবার নূতন মন্ত্র

কেন? কুমিল্লা থেকে চন্দ্রনাথ যাবার টিকেট তোমার হাতেই রয়েছে। আবার নূতন টিকেট দিয়ে কি হবে? একটা যাত্রীর কটা টিকেট লাগে? প্রকৃতই শিক্ষাগুরু হয়ে যদি কেউ আসেন রে বাপ্, তিনি মন্ত্রের ঝুলি নিয়ে তোমার কাণে উজাড় কর্ব্বেন না, তাঁর জীবনের আচরণ দেখে তুমি তাঁর মত ঈশ্বরানুরাগী হবে, প্রেমিক হবে, পবিত্র হবে, সদাচারী হবে, সত্যশীল হবে, জিতেন্দ্রিয় হবে, নিষ্ঠাবান্ হবে, আনন্দময় হবে। জগৎকে খোলা চোখে দেখ বাবা, চোখ বুজে অন্ধের মত চ'ল না।

(২৬শে পৌষ, ১৩৩৮)

মন্ত্র না দিলেও শিষ্য হয়

দীক্ষিত সে হয়ও নাই, হবেও না। তার দীক্ষা হয়ত তার নিজ সম্প্রদায়ের গুরুর কাছে হবে। কিন্তু সে আমাকে বিশ্বাস করে, আমাকে ভালবাসে, আমার জীবনকে তার ধ্যানের আদর্শ ব'লে জ্ঞান করে। তার ব্যাকুল আহ্বানের পরও আমি মৃত্যুভয়ে সেখানে যাব না? শুধু মন্ত্র দিলেই ভক্ত হয়? শুধু মন্ত্র দিলেই শিষ্য হয়? মন্ত্র না দিলেও কি কারো সঙ্গে প্রাণের যোগ সৃষ্টি করা যায় না? জীবনাদর্শ দানের কোনো মূল্য নেই? জীবনাদর্শ গ্রহণের কোনো সার্থকতা নেই? তোমরা ভাবছ, আমি মন্ত্র দিয়েই জগতের গুরু হব? না, না, তা নয়, মন্ত্র না দিয়েই জগতের গুরু হব। অগ্নিশলাকার মত আমি সকলের অন্তরে প্রবেশ কর্ব্ব এবং মোহতিমিরাচ্ছন্ন

জীবনকে জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত কর্ব্ব। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান আর বৌদ্ধ কেউ আমার পর থাকবে না, আমি জগতের কারো পর থাকুব না। কারণ জগতের সকল সম্প্রদায়ই আমার আর আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের। (২৮শে পৌষ, ১৩৩৮)

একটি নামেই নির্ভর কর

ভগবানকে ডাকতে তাঁর একটিমাত্র নামের উপরে সম্যক্ নির্ভর কর। নদীর তীরে গেলে নৌকা অনেক পাবে, কিন্তু উঠতে হবে তোমাকে একটী নৌকাতেই, দুই নৌকাতে পা দেওয়ায় কোন লাভ হবে না। ভগবানের সব নামই সত্য, সব নামই শান্তির আকর, সব নামই দুঃখ-বিনাশন, সব নামই প্রেম-মধুর ধ্বনি, কিন্তু এক সঙ্গে সব সাধন কত্তে যেও না। একটীকেই সাধন কর, একটীতেই মজ, ডুব, একটীকে নিয়েই জন্ম-কর্ম্ম সার্থক কর। "এক সাধে ত' সব সাধে, সব সাধে সব যায়।"

ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের পার্থক্য বাহ্যতঃ মাত্র

ভিন্ন ভিন্ন নাও, তাদের প্রভেদ শুধু আকারে, গুণে নয়। সব নৌকাই এপার থেকে ওপারে নিতে পারবে, ছোট হোক্ আর বড় হোক্, তাতে কিছু আটকাবে না। লাল হোক্ আর নীল হোক্, তাতেও কিছু আটকাবে না। কাঠের হোক্ কি লোহার হোক্ তাতেও কিছু আটকাবে না। শক্ত ক'রে হাল ধ'রে নিষ্ঠা নিয়ে যদি লেগে থাক, তবে মাটীর গামলায় ব'সেও

তুমি নদী পার হ'য়ে যেতে পার্ব্বে। এ নৌকা কোন্ কারখানা থেকে বেরিয়ে এসেছে, নৌকার গলুইতে কোন্ মিস্ত্রীর নাম খোদান রয়েছে, তাতেও কিছু যাবে আসবে না। সব নৌকারই শক্তি এক—যাত্রীকে এক পার থেকে আর এক পারে নিয়ে যাওয়া। কোন নৌকায় একটু আরাম বেশী, কোন নৌকায় আয়াস বেশী, কিন্তু এই আরামে আর আয়াসে বিশেষ যায় আসে না, যদি তুমি একটী নৌকাতেই প্রাণপণে হাল ধ'রে থাক আর নির্ভরের পাল তু'লে দাও। ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন নাম আকারেই পৃথক্, গুণে পৃথক্ নয়। কুইনাইনের বড়ী খেলেও ম্যালেরিয়া যায়, গুঁড়ো খেলেও ম্যালেরিয়া যায়। আকারেই তারা পৃথক্, বস্তুতে তফাৎ নয়।

পরধর্ম্মে বিদ্বেষ করিও না

নদী পার হ'তে সময় সময় এক নৌকার সাথে অপর নৌকার ধাক্কা-ধাক্কি লাগে। এ-হচ্ছে সর্ব্বনাশের গোড়া। তোমার নৌকা তুমি চালাও, তোমার সাধন তুমি কর, অপরের নৌকার উপরে আঘাত না দিয়ে, অপরের সাধনে, অপরের মন্ত্রে নিন্দা, বিদ্বেষ বা গ্লানি পোষণ না ক'রে। অপর মত আর পথকে বিদ্বেষের চোখে দে'খো না, কেননা, তাতে তোমার নিজেরই সর্ব্বনাশ হবে। চতুর সাধক তাঁরা, যাঁরা এক কণা শক্তিও পর-দোষের উদ্ঘাটনে অপব্যয়িত করেন না।

(৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৮)

পরমাত্মাই তোমার গুরু

গুরুবাদের আজ এমনই অবস্থা হয়েছে যে, আসল গুরুবাদই প'ড়ে গেছেন। সদাশিব বলেছেন,—মুক্তির্ন জায়তে দেবি মানুষে গুরু-ভাবনাৎ, অর্থাৎ, মানুষকে গুরু ব'লে ভাবনা কর্লে মুক্তি হয় না। শাস্ত্র বল্‌ছেন—গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণুঃ, গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ, গুরুরেব পরং ব্রহ্ম ইত্যাদি—অর্থাৎ ভগবানের যে সৃজনী প্রতিভা, তিনিই তোমার গুরু, তাঁর যে রক্ষণী শক্তি, তিনিই তোমার গুরু, তাঁর যে সংহরণ-ক্ষমতা, তাই তোমার গুরু এবং পরিশেষে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধাতা অখণ্ড-মঙ্গলময় অখণ্ড-পরমাত্মাই তোমার গুরু। (১০ই ফাল্গুন, ১৩৩৮)

পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে

মহামেধাবী গুরুও নির্ব্বোধ শিষ্যপালের মধ্যে প'ড়ে ব্যর্থকাম হ'য়ে যান। মহাতেজস্বী গুরুও দুশ্চরিত্র ও অপবিত্র-চেতা শিষ্যদলের মাঝখানে প'ড়ে নিষ্প্রভ হ'য়ে যান্। এই জন্যই অনেক মহাপুরুষেরা অধিক শিষ্য করেন না।

মানব-গুরু ও ব্রহ্মগুরু

গুরু যতক্ষণ মানব, ততক্ষণ মানবোচিত এই সব সীমাবদ্ধতা তাঁর থাকবেই। এজন্য আর আফশোষ ক'রে কি হবে? গুরু যখন ব্রহ্ম, তখন পদ্মপত্রে জলের ন্যায় মানব-ধর্ম্মে

তিনি অলগ্ন। অতএব প্রত্যেকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত একমাত্র ব্রহ্মগুরুর। দিকে দিকে ধ্বনি উঠুক "জয় ব্রহ্মগুরু"।

জগতে সকলেই পরস্পরের গুরু-ভ্রাতা

মানুষ যখন গুরু, তখন এঁর গুরু তাঁর গুরু ব'লে ভিন্ন ভিন্ন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার কত্তে হয়। ব্রহ্ম যখন গুরু, তখন সবার গুরু এক। তখন মানুষের পাদোদক, আর মানুষের পদধূলি নিয়ে কাড়া-কাড়ির প্রয়োজন থাকে না, তখন সবাই এক অক্ষয় অব্যয় অখণ্ড গুরুর শিষ্য, সবাই এক অক্ষয় অব্যয় অখণ্ড পিতার সন্তান, জগতের ছোট বড় সবাই তখন পরস্পরের গুরুভাই।

দীক্ষাদাতাকেও গুরু-ভ্রাতা বলিয়া জ্ঞান কর

তোমাকে যিনি মঙ্গলময় ভগবানের আনন্দময় নামে দীক্ষা দেবেন, তাঁকে তোমার গুরু ব'লে জ্ঞান না ক'রে গুরুভ্রাতা ব'লে জ্ঞান কর। তাঁর মূর্ত্তি ধ্যান না ক'রে, তাঁর কথিত মন্ত্রের ধ্যান কর। এতে তাঁকে অসম্মান করা হবে না কিম্বা তাঁর যদি সাধনার সঞ্চিত শক্তি কিছু থাকে, তবে আশীর্ব্বাদরূপে তোমার ভিতরে তার সঞ্চারণার পথও রুদ্ধ হবে না।

কৃত্রিম গুরুত্ব ও কৃত্রিম শিষ্যত্ব

জগতে সকলেই সকলের কাছ থেকে সাহায্য নেবে, দীক্ষিত দীক্ষা-দাতার কাছ থেকে, দীক্ষাদাতা দীক্ষিতের কাছ থেকে।

তোমরা জানো না, কিন্তু সাধকেরা এমন দৃষ্টান্ত অনেক জানেন, যেখানে দীক্ষাদাতা মন্ত্রদানের ছল ক'রে দীক্ষিতের কাছ থেকে শক্তি আহরণই করেছেন। সুতরাং দীক্ষিত ও দীক্ষাদাতার মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ ক'রে একটা কৃত্রিম গুরুত্ব ও কৃত্রিম শিষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার কি খুব বেশী সার্থকতা আছে ?

ইষ্টমন্ত্রই গুরু

আমি ত' তোদের অনেককেই দীক্ষা দিয়েছি। কিন্তু আমি কি তোদের গুরু ? আমি যে মন্ত্র তোদের দিয়েছি, সেই মন্ত্রই তোদের গুরু। অর্থাৎ আমারও যিনি গুরু, তোদেরও তিনিই গুরু। মন্ত্র-গুরুকে প্রতিষ্ঠার জন্যই আমি তোদের গুরু।

ধারাবাহিক গুরুবাদের অবসান

আমার পরবর্ত্তীরা নূতন নূতন লোককে দীক্ষা দিয়ে সাধনের পথে টেনে আন্‌বেন বৈকি ! কিন্তু মন্ত্রদান ক'রেও তাঁরা কারো গুরু হবেন না। মন্ত্রদানকে একটা গুপ্ত ব্যাপার ক'রে রাখাতেই ব্যক্তিগত গুরুবাদ এমন শক্ত হ'য়ে শিকড় গেড়েছে। মন্ত্রদান একটা প্রকাশ্য ব্যাপার হবে এবং এক সঙ্গে ধর্ম্মনিষ্ঠ তিনজন সমসাধক আচার্য্য দীক্ষার্থীকে দীক্ষা দিয়ে মন্ত্ররূপী ব্রহ্মগুরুর শিষ্য ক'রে দেবেন। ধারাবাহিক গুরুবাদ চলবার আর প্রয়োজন নেই, যিনি যাকে দীক্ষা দেবেন, তিনি তাকে ওঙ্কার-রূপী সদ্‌গুরুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন মাত্র,—নিজে গুরু

হবেন না। এই নিষ্ঠাকে, এই সত্যকে সাধক-জীবনে ব্যাপক দৃঢ়তা দেবার জন্যই আমার গুরুবেশ ধারণ।

(২০শে ফাল্গুন, ১৩৩৮)

সকল গুরুর শিষ্যেরাই স্বজাতি

আপনি জিজ্ঞাসা কচ্ছেন, এক গুরুর শিষ্যেরা সব নিজেদিগকে স্বজাতি মনে কত্তে পারে কি না। আপনি মনে ক'রে নিচ্ছেন যে, একজন ছাড়া জগতে দুইজন গুরু থাকতে পারেন। সেই মতকে স্বীকার ক'রেই বলছি, জগতের সকল গুরুর শিষ্যরাই স্বজাতি। কাউকে পর, কাউকে দূর মনে কর্ব্বার উপায় নেই।

গুণ-বিভাগ ও জাতি-নির্ণয়

কিন্তু একটা হিসাব আছে, সেই হিসাবে এক গুরুর শিষ্যেরাও সবাই স্বজাতি নয়। যেমন, এক সার্কাসওয়ালার খাঁচার জানোয়ারগুলি সব স্বজাতি নয়। সেই হিসাবটি হ'ল প্রকৃতির। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকেরা সব একজাতি। রাজসিকেরা এক, তামসিকেরা এক। তামসিককে যদি সাত্ত্বিকতার দিকে টেনে আনতে না পারে, তা হ'লে সাত্ত্বিক জাতি তামসিকের সঙ্গে মিশে জাতি-সঙ্কর সৃষ্টি কর্ব্বেই কর্ব্বে। অথবা ওটাকে জাতি-সঙ্কর না ব'লে জাতি-সঙ্কট ব'ল্লেই কথাটা সুন্দরতর হয়। গর্ভে বা ঔরসে নয়, চামড়ার রংয়ে বা ধনের

প্রাচুর্য্যে নয়, ভাষায় বা ভৌগোলিকতায় নয়, জীবিকায় বা পাণ্ডিত্যে নয়, স্বজাতিত্ব নির্ভর করে চরিত্রের সাত্ত্বিকতা, রাজসিকতা আর তামসিকতায়। (২৪শে ফাল্গুন, ১৩৩৮)

কামুক গুরু ও কামুক শিষ্য

পল্লীগ্রামে 'বৈষ্ণব-সেবা' ও 'কিশোরী-ভজন' নাম দিয়ে ধর্ম্মের আবরণে যে কদর্য্য ব্যভিচার ও ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণ চলেছে, এর দোষ "বৈষ্ণব-সেবার"ও নয়, "কিশোরী-ভজনের"ও নয়। দোষ গুরুর আর শিষ্যের। কামুক গুরু শিষ্যকে কামুক করে, কামুক শিষ্য গুরুকে কামুক করে। আর যদি কামুক গুরুর কামুক শিষ্য হয়, তবে ত' সোণায় সোহাগা হ'ল। তখন যদি "বেদান্ত-চর্চ্চা" নাম দিয়েও কিছু কর, দেখবে সে ব্যাপারটাও অতি জঘন্য কদর্য্যতায় পূর্ণ হ'য়ে গেছে।

ধর্ম্মের নামে ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার প্রতিকারোপায়

প্রথম প্রতিকার,—যার-তার কাছে দীক্ষা নেবার প্রবৃত্তিকে প্রবল প্রচারের দ্বারা মন্দীভূত করা। দ্বিতীয় প্রতিকার,—ধর্ম্মের সঙ্গে যে ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার আপোষ নেই, সেই মতবাদ ব্যাপকভাবে সমাজের প্রত্যেকটী স্তরে ছড়িয়ে দেওয়া। তৃতীয় প্রতিকার,—যারা ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার প্রসারিত কচ্ছে, রাজদ্বারে বা সামাজিক দণ্ডে তাহাদিগকে দণ্ডিত করা। আর সূক্ষ্মতম প্রতিকার হচ্ছে—আমরা যারা ধর্ম্মের নামে ইন্দ্রিয়তর্পণকে

দোষের ব'লে মত প্রকাশ ক'রে থাকি তাদের মধ্যেই সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বপ্রযত্নে এমন অটুট পবিত্রতার সৃষ্টি করা, যাহা প্রলোভনের অতি গোপন পদ-সঞ্চারেও কণামাত্র কলঙ্কিত হয় না ; এবং তারপরে মনে মনে প্রবলভাবে প্রার্থনা করা যে, ব্যভিচারীরা সদাচারী হোক্, মিথ্যাচারীরা সত্যপ্রতিষ্ঠ হোক্, অসংযমী পাপিষ্ঠেরা সংযমী সাধু হোক্, লজ্জাকর কার্য্যানুষ্ঠান-কারীরা গৌরবজনক কার্য্যে রুচি-সম্পন্ন হোক্।

(২৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৮)

গুরুবাদ ও অখণ্ডবাদ

দেখ, যতই কোন নূতন মত আর নূতন পথের তুমি প্রদর্শক হও না, পুরোনো ব্যবস্থার সঙ্গে একটু হ'লেও আপোষ রাখ্‌তে হবে। পুরাতনের প্রভাবকে একেবারে বর্জ্জন করা যায় না। আমি বল্‌ছি—গুরুবাদ জগতে থাকবে না, থাকবে শুধু অখণ্ডবাদ, অখণ্ড-মন্ত্রকেই তোমরা গুরু ব'লে মান্‌বে, গুরু ব'লে জান্‌বে, অথচ আমি তোমাদের কাছ থেকে নিজের গুরুত্বটাকে সরিয়ে নিতে পাচ্ছি না। কারণ, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি আমাকে সরিয়ে নিলে অখণ্ডবাদ তার প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে দৃঢ় হতে পারে না। অথচ অখণ্ডবাদ যখন তোমাদের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যাবে, তখন দীক্ষাদাতারা মন্ত্রের তুল্য হবেন না, হবেন মন্ত্রের অধীন, মন্ত্রের লক্ষ্য হবেন না, হবেন মন্ত্রের সমসাধক, ব্রহ্মদাতা পিতা হবেন না, হবেন একবীর্য্যজাত গুরুভ্রাতা।

গুরুবাদ ও মানুষ-পূজা

গুরুবাদীর দেশ, ফলে মানুষ-পূজার বাড়াবাড়ি। তিনজন যদি ব'লে থাকেন, ভগবানকে ধ্যান কর, তবে ত্রিশজন বলেছেন যে মন্ত্রদাতাকে ধ্যান কর। কিন্তু আসলে তোমাকে যে ধ্যান কত্তে হবে, মন্ত্রময় ব্রহ্মের বা ব্রহ্মময় মন্ত্রের! আমি ধ্যান কচ্ছি যাঁর, তোমরাও ধ্যান কর তাঁর। আমাকে ধ্যান ক'রে কি হবে? (২রা চৈত্র, ১৩৩৮)

নামই গুরু

কেন বাবা মানুষকে গুরু ব'লে মনে ক'রে এত কষ্ট পাচ্ছ? ভগবানের অমৃতময় নামই তোমার গুরু। এই নাম আর ভগবান্ একই বস্তু। এই জ্ঞান ক'রে অনুক্ষণ নামের সেবা কর। "গুরু" "গুরু" ব'লে মানুষ-পূজা ক'রে যথেষ্ট ঠকেছ। এখন "গুরু" "গুরু" ব'লে নামের পূজা ক'রে জীবন সার্থক কর। নামকেই জীবনের সার কর। (১৫ই চৈত্র, ১৩৩৮)

আত্ম-সংশোধনের চেষ্টাই গুরুভক্তির প্রমাণ

অনেক সময় তোমাদের ব্যবহারে মনে হয়, তোমরা আমাকে ভালবাস। অথচ আমি যে আলস্যকে দুই চক্ষে দেখতে পারি না, তাকেই প্রাণপণ সমাদরে দুই বাহু দিয়া আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়াছ। কি করিয়া বুঝিব যে, আমার প্রতি তোমাদের প্রীতিটা একান্তই অকৃত্রিম? তোমাদের অসত্য-বর্জ্জনের মধ্য

দিয়া, আলস্য-বর্জ্জনের মধ্য দিয়া, অসংযম-বর্জ্জনের মধ্য দিয়া আমি দেখিতে চাহি যে, সত্যই আমাকে ভালবাস। ব্যক্তিগত ভাবে যে আদর-আপ্যায়ন তোমরা আমাকে করিবে, তাহাকেই আমি ভালবাসার প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিব না। যে কদর্য্য কুরুচি ও অকুশলপ্রদ কদাচারকে আমি সমগ্র জগতের শত্রু বলিয়া জানিয়াছি, প্রচণ্ড অধ্যবসায় সহকারে তাহাকে নিজ নিজ জীবন হইতে নির্ব্বাসিত করিলেই আমি আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাইব। (১৭ই চৈত্র, ১৩৩৮)

গুরু ও শিষ্যের অভিন্নত্ব

আমার সংস্পর্শের প্রভাব যদি আমৃত্যু তোর উপরে না থাকে, তবে আমার সংস্পর্শ ই মিথ্যা। চেষ্টা ক'রে তুই কি ক'রে দূরে পালিয়ে থাকবি? আমার অকপট কল্যাণ-বুদ্ধি তোকে আমাকে অবিচ্ছেদ্য ক'রে রেখেছে যে। গুরু আর শিষ্য দেখতে দুই, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে একটা অভিন্ন বস্তু।

দীক্ষার বয়স

দীক্ষা অল্প বয়সেই নেওয়া ভাল। আবাল্যসম্বর্দ্ধিত অভ্যাস মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত সুদৃঢ় থাকে, তার প্রভাব সুদূর-প্রসারী হয়। সংসারের কাম-কলুষে ডুবে গেলে তার পর মনকে ভগবানে বসান বড় আয়াস-সাধ্য হয়। এজন্যই প্রাচীনকালে আট বছর বয়সেই যজ্ঞোপবীত-সংস্কার হ'ত এবং জগতের কঠিনতম মন্ত্র গায়ত্রীতে তপঃ-সাধনা সুরু হ'ত।

"বাল্য ব'লে বয়সেরে উপেক্ষা ক'রো না।
বাল্যেই করিতে হবে ব্রহ্মের সাধনা।"

তবে একটি কথা আছে। বুদ্ধিবৃত্তি যার একান্ত স্থূল, তার বুদ্ধিবিকাশের উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা সঙ্গত।

অল্প বয়সে দীক্ষার কুফল

অল্প বয়সে দীক্ষা নেওয়ার একটী মন্দ দিক্‌ও আছে। সেইটী হচ্ছে এই যে, সম্পূর্ণরূপে না বুঝে এই সময়ে দীক্ষা নিতে হয়। ফলে যখন বয়সের পূর্ণ বিকাশে জগতের দশ দিকে দশ রকম মতামতের সংঘর্ষে এসে প্রাপ্ত সাধনে অবিশ্বাস জন্মে, তখন সেই অবিশ্বাসের জ্বালা বড়ই অসহনীয় হয়।

বাল্যে প্রাপ্ত সাধনে নিষ্ঠা-বর্দ্ধনের আবশ্যকতা

এর প্রতীকার কি ? এর প্রতীকার একেবারে মূলে, ডালে নয়, ফুলে নয়। অর্থাৎ প্রাপ্ত সাধন যে আবাল্য নিষ্ঠাপূর্ব্বক কর্ব্বার অভ্যাস ক'রে যাবে, সে ত' অল্প হোক্, বেশী হোক্, আনন্দ, তৃপ্তি ও আরাম এ'র ভিতরে পাবেই পাবে। সে আস্বাদ একেবারে প্রত্যক্ষ বস্তু, যুক্তি-নিরপেক্ষ, তর্ক-নিরপেক্ষ, বিচার-নিরপেক্ষ। সুতরাং কণামাত্রও আস্বাদন যে লাভ করেছে, তার আর কোনো ভয়ই নেই। সহস্র মতামতের সংঘর্ষও তাকে বিচ্যুত কর্ত্তে পারে না। চঞ্চল যদি করে, তবে তাও নিতান্তই সাময়িক।

গুরুর গুরুশ্রম

এই জন্যই আমার পরিশ্রম এত বেশী। আচার্য্যেরা বয়স্ক ব্যক্তিদের সাধন দেন, যারা সংসারের অনেক দুঃখ পেয়ে সাধনের আবশ্যকতা অনুভব ক'রে বিশ্বাস নিয়ে এসেছে শান্তির আশায়। আর আমার অবস্থা তার বিপরীত। জগৎ কখনো জানবে না, এক একটী ছেলের পশ্চাতে আমাকে কত রক্ত জল কর্ত্তে হয়েছে। একটী ছেলে বিপথে গেল ত্রিপুরায়, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলাম বাঁকুড়া থেকে, কতকটা রেলে, কতকটা হেঁটে, খেয়ে আর না খেয়ে। এ ত গেল স্থূলতম শ্রম। তারপরে বাপ্ চিঠির চোট্। এমন ছেলে আমার একটীও নেই, যার পিছনে পাঁচ সাত টাকার ডাকটিকিট না খরচ হয়েছে। কিন্তু এটাও স্থূল শ্রম। তারপরে এল মানসিক শ্রম। যে ছেলে যখন চঞ্চল হচ্ছে, তখনি তার দিকে অবিরাম শুভ সঙ্কল্পকে তীব্র তেজে চালনা ক'রে ক'রে শরীরখানা কত ক্লান্ত কত শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, তোমরা তার খবর জান না। শ্রমের ভার এই জড় শরীর বইতে অক্ষম হয়। যৌবনের উদ্দাম উন্মাদনায় যুবকেরা যাবে ভোগের উচ্ছৃঙ্খল পথে, আর সঙ্কল্পের শাসনে তাদের অজ্ঞাতসারে আমি রাখব তা'দিগকে আদর্শের সঙ্গে দৃঢ়রূপে বেঁধে। এই যে লড়াই, তা' তাঁদের কর্ত্তে হয় না, যাঁরা পরিণতবয়স্কদের জন্য এসেছেন। কারণ, পরিণত-বয়স্কেরা সদ্‌যুক্তি বোঝে। অতীত অভ্যাসই তাদের প্রধান বিঘ্ন, কিন্তু যুক্তির অঙ্কুশতাড়নে মদমত্ত মনকে

বাঁধবার প্রয়োজনীয়তা-বোধ তাদের আছে। যুবকের সে বোধ নাই। বুঝাতে গেলেও বোঝে না। কারণ, জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'তে সে বঞ্চিত। (২৫শে চৈত্র, ১৩৩৮)

বহুপন্থার দোষ-গুণ

অনেককে দেখা যায়, একস্থানে গুরূপদেশ গ্রহণ ক'রে তার পরে নানা স্থানে নানা মতের, নানা পথের উপদেষ্টাদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করে। এর ভালর দিকটা এই যে, একটা বস্তুকেই নানা দিক্ দিয়ে নানাভাবে দেখ্‌বার রুচি, প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য জন্মে। মন্দের দিক্ এই যে, পরস্পর-বিরোধী ব'লে মনে হয়, একই বিষয় নিয়ে এমন নানা যুক্তি শুনে শুনে ইষ্ট-নিষ্ঠার হানি ঘটে এবং নিষ্ঠা-হানির সঙ্গে সঙ্গে সাধনে নিরুৎসাহতা, নিরুদ্যমতা, অবিশ্বাস ও এমনকি বিদ্বেষ পর্য্যন্ত এসে পড়ে। যেমন মধু-মক্ষিকা নানা ফুল থেকে মধু আহরণ কত্তে গিয়ে অনেক সময় এমন মধু আহরণ করে, যা স্বাদে মধুর হ'লেও কাজে বিষ।

পাত্রভেদে দোষ-গুণের তারতম্য

কিন্তু বহু স্থানে গতায়াতের দোষগুণের পরিণাম যে সকলের পক্ষেই সমান হবে, তা নয়। পাত্রভেদে তারতম্য হবে। কোনো ব্যক্তির পক্ষে বহু উপদেষ্টার সঙ্গ সঙ্কীর্ণতার সংস্কার-মুক্ত অতীব তীব্র সাধনস্পৃহার জনক হয়। কোনো ব্যক্তির পক্ষে উহাই আবার নাস্তিক্য- বা অবিশ্বাসের স্রষ্টা হয়। কোনো

ব্যক্তির পক্ষে বিশ্বভুবন তুচ্ছ ক'রে একটী জায়গায় লেগে থাকাই পরমমঙ্গলের কারণ হয়। কোনো ব্যক্তির পক্ষে এক জায়গায় লেগে থাকা পরধর্ম্মদ্বেষী অসহিষ্ণু অবিচারী অবিবেকী সুপ্রমত্ত কূপমণ্ডুকতার কারণ হয়।

সাধক ও প্রচারকের পার্থক্য

তবু শেষ পর্য্যন্ত একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, সাধন যারা কর্ব্বে, তাদের জন্য উপদেশ—"কৌতুহলং বিবর্জ্জয়েৎ", আর প্রচার যারা কর্ব্বে, তাদের জন্য উপদেশ—"সব্‌সে লীজিয়ে নাম"। সাধকের কাজ অমৃতরস আস্বাদন করা, মাটি খুঁড়ে জল বের ক'রে আকণ্ঠ পান করা। তার পক্ষে নিষ্ঠাই প্রধানা বান্ধবী। প্রচারকের কাজ কোন্ পুকুরের জল থেকে কোন্ পুকুরের জল ভাল, তার জানানি দিয়ে যাওয়া, নিজে সে আস্বাদন করুক আর না করুক। অপরের মুখে শুনে শুনেও একটা আন্দাজ তাকে ক'রে নিতে হয় যে, কোন্ পুকুরের জল লোনা, কোন পুকুরের জল কটা, কোন্ পুকুরের জল ভারী, কোন্ পুকুরের জল পাতলা। অপর লোকে জল খাবে, তারই জন্য সে আপ্রাণ চিৎকার কচ্ছে, নিজে হয়ত জল কেমন বস্তু জীবনেও একবার চ'খ চেয়ে দেখেনি। এমন ব্যক্তির পক্ষে বহু স্থানে গিয়ে বহু পথের খোঁজ-খাঁজ নেওয়া আবশ্যক বৈকি।

গুরুকৃপা ও পুরুষকার

লোকে বলে গুরুকৃপায়ই সব হয়, পুরুষকার কিছুই নয়।

আমিও ত' তাই বলি, আর তার জন্যই ত' প্রাণপণে কোদাল মারি, প্রাণপণে দেশ ঘুরি, প্রাণপণে চিঠি লিখি, আর প্রাণপণে নাম জপি।

মানে,—গুরুসঙ্গই তোমার পুরুষকারকে উৎসাহ প্রদান করে। এটাই হচ্ছে তাঁর কৃপা।

ভবিষ্যতের গুরু

আমার যা ধারণা, আমার পরে আমার গোষ্ঠীতে আর কেউ গুরু থাকবেন না। বিধি অনুযায়ী দীক্ষার্থীর দীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, কিন্তু ব্যক্তিগত গুরু কেউ থাকবেন না। তখন শিষ্যগুলি গুরুকৃপা অনুভব কর্বে কার সঙ্গ ক'রে বল ত?

নামই হবেন তখন প্রত্যক্ষ গুরু। তাঁর-সেবাই হবে, গুরুসেবা। তাঁর পূজাই হবে, গুরুর পূজা। তাঁর কৃপাই হবে, গুরুর কৃপা। জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতারা গুরুকে দেখিয়ে দিবেন, কিন্তু কেউ এসে স্বয়ং গুরু হবেন না বা গুরুত্বাভিমান পোষণ কর্বেন না। (৩রা বৈশাখ, ১৩৩৯)

দীক্ষা ও সাধনা

নামে দীক্ষিত হইলেই চলিবে না, কাজেও তাহার প্রমাণ থাকা চাই। সাধন করা চাই, নামের অমৃত-রস সাধন-বলে নিষ্কাশিত করিয়া আকণ্ঠ তাহা পান করা চাই, সংসারের নিয়ত-মৃত্যু-ময়-মহাবিষের জ্বালা জীর্ণ করিয়া অমর হওয়া চাই।

কিন্তু সাধনা বলিতে আলস্য বুঝিলেও চলিবে না। তোমার সাধনা কর্ম্মময় জীবনের সাধনা, অফুরন্ত শ্রম-প্রবাহের তরঙ্গে তরঙ্গে ঐশ্বরিকী স্মৃতি উদ্দীপনার সাধনা, জীবন ও মৃত্যুকে সমজ্ঞান করিয়া শুভ ও অশুভকে সমান দৃষ্টিতে দেখিয়া নির্ভীক অন্তরে নিজ নিজ স্বাভাবিক কর্ত্তব্যে অটল অচল রহিবার সাধনা। তুমি যদি পরমুখাপেক্ষী হও, কাপুরুষ হও, অলস নিরুদ্যম হও, আমি স্বীকার করিব না যে, তুমি কখনও সাধন করিয়াছ। ভাগবতী চেতনা হউক তোমার অন্তরময়, প্রতি কর্ম্মে, প্রতি চেষ্টায় তুমি পরমাত্মার অনন্যুমেয় শক্তিরই লীলা দেখিয়া নিজ জীবনকে অনন্যুকরণীয় নিপুণতার সহিত মঙ্গলের পথে, উৎসর্গের পথে নিয়ন্ত্রিত কর। (৪ঠা বৈশাখ, ১৩৩৯)

মন্ত্র লইয়া সাধন না-করা

মন্ত্র লয় কিন্তু তারা না করে সাধন,
ব্রত লয় কিন্তু তাহা না করে পালন,
বীজ কিনে কিন্তু তাহা না করে বপন
গ্রন্থ কিনে কিন্তু নাহি করে অধ্যয়ন,
মন্দির গড়িয়া তাহে না করে অর্চ্চনা,
গাভী কিনি' তারে নাহি দেয় তৃণ-কণা,
বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে না করে রক্ষণ,
বৃক্ষ রুপি' নাহি করে সলিল সিঞ্চন,
মূলধন লভি' নাহি করে ব্যবসায়,
অলক্ষিতে সেই জন অধঃপথে ধায়।

(১৭ই বৈশাখ, ১৩৩৯)

শিক্ষাগুরু ও নিষ্ঠা

গুরুবাদ বহুরূপী। কতদেশে কত সম্প্রদায়ে যে তার কত রকমের রূপ, তার ইয়ত্তা নেই। জগতের যত জন শিক্ষা প্রদান করেন, সকলেই শিক্ষাগুরু। কিন্তু শিক্ষাগুরু হ'তে হলেই কাণে আবার একটী মন্ত্র ঠুকে দিতে হবে, এমন শিক্ষাগুরু আমরা মানি না। নিষ্ঠাই হচ্ছে সাধনের প্রাণ। বহু মন্ত্রে নিষ্ঠাহানি হয়। অনেক গুরু বহু মন্ত্র দিয়ে শিষ্যের জীবনকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-পীড়িত, সংশয়-সমাচ্ছন্ন ও বহু-ইষ্ট-নিরত ক'রে তোলেন। যাতে নিষ্ঠার চ্যুতি ঘটে, তাই সাধকের বর্জ্জনীয়। একই গুরু যদি তিনটী মন্ত্র দেন, তবে তাতেও নিষ্ঠাহানি ঘটে। যাঁরা জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তারা নিষ্ঠার বিঘ্ন কমিয়ে দেবেন। একই রমণীর যদি তিনটী স্বামী থাকে, তবে তার প্রাণান্ত হবার কথা। একটী পুরুষ তিনটী বিবাহ ক'রে কখনো শান্তিতে ঘরকন্না কত্তে পারে না। সাংসারিক জীবনেই যখন নিষ্ঠার প্রয়োজন এত অধিক, তখন ভেবে দেখ দেখি, আধ্যাত্মিক জীবনে আরো কতগুণ অধিক প্রয়োজন? স্ত্রীলোকের যেমন একটা সতীত্ব আছে, সাধকদেরও তেমন একটা সতীত্ব আছে। হনুমান যেমন বলেছিলেন,—"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি, তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামো রাজীবলোচনঃ।"

(৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯)

ব্রহ্মাই তোমার গুরু

তোমার অবস্থাটা আমি ঠিক্ ঠিক্ বুঝিতে পারিয়াছি। সদ্‌গুরু-সঙ্গে চিত্তে যে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আবেগের সঞ্চার হয়, তাহা তোমাকে কিছুদিন সাধনের দিকে প্রবলভাবে নিষ্ঠা-পরায়ণ রাখে। কিন্তু বাবা, সদ্‌গুরু ত' একটা মানব-শরীরই মাত্র নহেন যে, এই শরীরটা হইতে দূরে গেলেই তুমি সকল উৎসাহ, উদ্দীপনার আকর শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে। তিনি অসীম কৃপাপরবশ হইয়া যে নাম দিয়াছেন, সেই নামের মধ্যেই তাঁর অনন্ত অক্ষয় ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী মহাবপু লইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে তিনি তোমাকে পরমাত্মার পরমানন্দঘন মহানাম স্মরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, সেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত তিনি নিরন্তর তোমাকে তাঁহার সেই দেবজন-বাঞ্ছিত সুখময় সৎসঙ্গ প্রদান করিতেছেন। নিরন্তর ভাবিতে থাক, সদ্‌গুরু নিয়ত তোমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, তোমার দেহে মনে প্রাণে সর্ব্বত্র অতি প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্তায় বিরাজিত রহিয়াছেন। নিরন্তর ধ্যান করিতে থাক, তাঁকে ছাড়িয়া কোথাও যাওয়া যায় না, তিনি কখনও আশ্রিত সেবককে নিমেষের তরে পরিহার করেন না, নিদ্রায়, জাগরণে, দিবসে, রাত্রিতে, দুঃখে এবং সুখে, লোকালয়ে বা নির্জ্জনে তিনি তাঁর অপরিমেয় কৃপা লইয়া ছায়ার ন্যায় জীবের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান রহেন। অপরের পক্ষে যাহাই

হউক, তোমার পক্ষে সাধনের উদ্দীপনা চিরস্থায়ী করিবার জন্য একমনে একপ্রাণে এই ধ্যান ও অনুচিন্তন আকশ্যকীয় জানিবে।

একটা মানবদেহকে গুরু বলিয়া মনে করা ভ্রম। দেহধারণ করিয়া বা না করিয়া যে অবিনশ্বর আত্মা তোমাকে মৃত্যু-ভয়ের অতীত করেন, অভয় প্রদান করেন, পাপপঙ্কে নিমজ্জিত চিত্তকে শুভেচ্ছার বলে পুণ্যতীর্থে অবগাহন করিবার সামর্থ্য প্রদান করেন, সেই অদ্বয়, অব্যয়, চিন্ময় পরমাত্মাই তোমার গুরু। সর্ব্বতোভাবে ইঁহার চিরসুখদ সান্নিধ্যকে ধ্যানের ও কল্পনার বলে অনুভব করিবার চেষ্টা পাইতে থাক। প্রয়াস পাও, সফলতা অর্জ্জিত হইবেই,—আজ যাহা কল্পনা, কাল তাহা প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হইবে। চাই অবিশ্রান্ত ধ্যান। (৫ই আষাঢ়, ১৩৩৯)

মন্ত্র লওয়া ও ভবিষ্যৎ জানা

যখনি কোনো সাধু দেখবে, ভালর দিকে দুইটি বিষয়ে, আর মন্দের দিকেও দুইটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখবে। একদিকে দৃষ্টি রাখবে, যেন তাঁদের কোনও অসম্মান করা না হয় এবং তাঁদের নিন্দা করা না হয়। অপর দিকে দৃষ্টি রাখবে, যেন কাণটি তাঁদের ঠোঁটের খুব কাছে না চ'লে যায়, আর তাঁদের কাছে নিজ ভবিষ্যৎ জানবার জন্য যেন আকাঙ্ক্ষা না হয়। ভগবদ্‌ভক্ত ব্যক্তিদের অসম্মান কল্লে নিজেরই অমঙ্গল হয়।

তুমি হয় ত' কাউকে ভগবদ্ভক্ত ব'লে জ্ঞান না কত্তে পার, কিন্তু দশজনে যখন ঐরূপ জ্ঞান করে, তখন তিনি হ'লেও ত' ভক্ত হ'তে পারেন! সুতরাং তাঁর মর্য্যাদাহানি কখনই করবে না। পরনিন্দা মাত্রই দোষের, সাধুপুরুষের নিন্দা আরো দোষের। এই গেল এক দিকের কথা। অপর দিকের কথা হ'ল এই যে, সাধুপুরুষদের মধ্যেও অনেকের মানসিক রোগ থাকে। একটী হচ্ছে, সুযোগ পেলেই লোককে মন্ত্র দিয়ে শিষ্য করা, অপরটী হচ্ছে লোকের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে তাকে উদ্বিগ্ন ক'রে তোলা।

মন্ত্র লইলেই কি শিষ্য হয়?

মন্ত্র একটা দিলেই শিষ্য হ'য়ে গেল না বটে, কিন্তু এতে দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তির উপর বিশেষ অত্যাচার করা হয়। এখান থেকে কয় মাইল দূরে দুই ভাই আছেন জমিদার, তাঁদের বাড়ীতে কোনো উপলক্ষ্য ক'রে একজন সাধু এলেন। বলা নেই, কহা নেই, তিনি সুকৌশলে মন্ত্রগ্রহণে অনিচ্ছুক দুই ভ্রাতাকে দুইটী পৃথক্ ওজুহাত ক'রে মন্ত্র দিয়ে তারপরে বল্লেন যে তোদের দীক্ষা হ'ল। ছোট ভাইএর একটু তেজাল মন, তিনি ব'লে বসলেন,—"আপনি মন্ত্র দিলেন বটে, কিন্তু আমি গ্রহণ কল্লাম না।" বড় ভাইএর মন একটু দুর্ব্বল, গুরু ব'লে না মানলে যদি আবার শেষে বহুমূত্র রোগ বেড়ে যায়, এই ভয়ে তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে, যাঁর প্রতি প্রাণের গভীর বিতৃষ্ণা,

তাঁকেই গুরু ব'লে মেনে নিয়ে হৃদয়ের উপরে উৎপীড়ন সহ্য করলেন। অনেক মন্ত্রদাতাদের ধারণা আছে যে, যেন-তেন-প্রকারেণ একটা মন্ত্র কাণে ঢুকিয়ে দিতে পাল্লেই শিষ্যের কল্যাণ হ'য়ে যাবে। হয় ত' তাঁরা সরল বিশ্বাসেই মন্ত্রটীকে কাণে ঢুকিয়ে দেন, কিন্তু দীক্ষার্থী যতক্ষণ সরল বিশ্বাসে মন্ত্র না নিচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এসব দিয়ে তাকে বিষম অসুবিধায় ফেলা হয়।

দীক্ষাদাতার কর্ত্তব্য কালপ্রতীক্ষা

দীক্ষাদাতার কর্ত্তব্য, যাঁর তিনি উপকার কত্তে চান, সর্ব্বাগ্রে তাঁর মনের ভিতরে ঈশ্বরানুরাগ, বিশ্বাস ও ব্যাকুলতা সৃষ্টি করা। কৃষকের যেমন কর্ত্তব্য বীজ-বপনের পূর্ব্বে জমিতে বহু-বার হলচালন ক'রে তার সবটুকু মৃত্তিকাকে চূর্ণীকৃত করা। কথায় বলে, "শতেক চাষে মূলা।" দীর্ঘকাল যিনি প্রতীক্ষা কত্তে পারবেন, তিনিই দীক্ষাদাতা হবার উপযুক্ত ব্যক্তি। নতুবা বীজ বপনের আগেই জমি ঘাস-জঙ্গলে পূর্ণ হ'য়ে যাবে। দীক্ষাদাতার পবিত্র ব্রত যাঁরা জীবনে গ্রহণ কত্তে চান, তাঁদের উচিত পার্থিব-ভাবে ছোট্ট একটি বাগান ক'রে কিছুকাল তাতে ফুলফলের বীজ বপন ক'রে তা থেকে ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করা। এতে এমন অনেক শিক্ষা লাভ হবে, যা লোক-ব্যবহারে কাজে আসবে।

দীক্ষাগ্রাহীর কর্ত্তব্য আত্মপরীক্ষা

যে গ্রামে যাই, সেই গ্রামেই শুনি, একজন নূতন গুরুদেব এসেছেন; তিনি দলে দলে শিষ্য-সংগ্রহের চেষ্টা কচ্ছেন,

কতজনকে যে কত রকম যুক্তি দিয়ে তাঁর কাছ থেকে মন্ত্র নেবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাচ্ছেন, তার স্থিরতা নেই। শাস্ত্রজ্ঞ আর শাস্ত্রজ্ঞানহীন, কার্য্যকারণজ্ঞ আর কাণ্ড-জ্ঞানহীন সকল শ্রেণীর লোকেরাই দলে দলে গুরুতা-ব্যবসায় কচ্ছেন এবং অপরের শিষ্যকে মাথা মুড়িয়ে নিজের শিষ্য কর্‌বার জন্য আদা-জল খেয়ে লেগেছেন। এমন হওয়া কিছু বিচিত্র নয় যে, তাঁদের সকলেরই উদ্দেশ্য মহৎ, সকলেই চান জীবকে ঈশ্বরাভিমুখী কত্তে। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্যের মহিমা অভ্রচুম্বী হ'লেও যদি চেষ্টার ফলে দীক্ষাপ্রাপ্তেরা যথার্থ উপকার কিছু না পায়, তা হ'লে সেটা বড়ই পরিতাপের কথা। এই জন্য মন্ত্রগ্রাহী ব্যক্তিদেরও প্রয়োজন আত্মপরীক্ষার। সত্যই কি মন্ত্র নেবার জন্য প্রাণে ব্যাকুলতা এসেছে? মন্ত্র নিয়ে এই মন্ত্রের কি সাধন কর্ব্ব, না, লোক-দেখান ফোঁটা-তিলক কেটেই কর্ত্তব্য শেষ কর্ব্ব? অহোরাত্র নাম-কীর্ত্তন হচ্ছে,—স্বরভঙ্গ অথবা খিচুড়ী এ দুটার একটাও এর সারও নয় বা লাভও নয়, এর সার হচ্ছে প্রেম, এর লাভ হচ্ছে অভয়। মন্ত্র যিনি নেবেন, তাঁর কর্ত্তব্য হচ্ছে হুজুগ বর্জ্জন ক'রে লোক-দেখাদেখি হুড়াহুড়ি ত্যাগ ক'রে চক্ষু-লজ্জার দায় এড়িয়ে নির্ভীক চিত্তে আত্ম-পরীক্ষা করা এবং তার ফল যদি হয় মন্ত্রগ্রহণের অনুকূল, তবেই মন্ত্র গ্রহণ করা। যে ব্যাপারের সঙ্গে জীবন-মরণের সম্পর্ক, তাতে চক্ষুলজ্জাকে প্রশ্রয় দেওয়ার মতন পাপ আর কি আছে? (৫ই আষাঢ়, ১৩৩৯)

আত্মমঙ্গলে অমনোযোগী শিষ্য গুরুর ভারস্বরূপ

আমি কখনো ভাবি, আমার শিষ্য-সংখ্যা কম, কখনো ভাবি শিষ্য-সংখ্যা বেশী। যখন জগৎকল্যাণে আত্মাহুতি দানের জন্য কোটি কোটি নির্ম্মল নিষ্পাপ পবিত্র জীবনের প্রয়োজন বোধ করি, তখন ভাবি আমার শিষ্য-সংখ্যা অত্যল্প। যখন শিষ্যদের বহির্ম্মুখতা, ব্রত-নিষ্ঠাহীনতা, আত্মাদর ও ঈশ্বরানুরাগের অভাব লক্ষ্য করি, তখন দেখি, আমার শিষ্য-সংখ্যা অত্যধিক। জীবকল্যাণের প্রয়োজনে বলি-দান দিতে হলে কোটি সংখ্যাও অধিক নয়। সংশোধিত ক'রে মানুষ ক'রে তুলতে হ'লে আমার পক্ষে একটী শিষ্যই অত্যধিক। যে শিষ্য আত্মমঙ্গলে যত্ন নেবে না, জীবনের মূল্যকে বুঝবে না, মনুষ্যজন্মের গুরুত্বকে হেসে উড়িয়ে দেবে, তেমন শিষ্য ত' গুরুর স্কন্ধের গুরুভার। তোদের ভারে আমি ক্লান্তি বোধ করি, তা'কি তোরা জানিস্? অথচ ব্রহ্মাণ্ডের ভার বইবার জোর আমার স্কন্ধে আছে। সে জোর মঙ্গলময় নিজে আমাকে দিয়েছেন।

শিষ্য-পরিচয় দিবার অধিকার

আমার কর্ম্মজীবনের স্বাবলম্বন নিয়ে তোরা কতজন কত গর্ব্ব করিস, তোদের মধ্যে কতজন আমার সম্বন্ধে কত গল্প গেয়ে গেয়ে বেড়াস। যে সব কাহিনী আমিও জানি না, এমন কত কাহিনী তোরা লোককে শুনাস। কিন্তু আমার আদর্শ

অনুসরণ করিস্ না। আমার সাধন-জীবনের কত নিগূঢ় রহস্যের কথা তোদের মুখ থেকে বেরিয়ে সরলস্বভাব সাধারণ লোককে চমকিত ক'রে দেয়। তোরা মহাজনের শিষ্য ব'লে আত্মপরিচয় দেবার জন্য কেউ কেউ মিথ্যা কাহিনী রচনা কত্তে কুণ্ঠিত হস্ না। অথচ আমার সাধ-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে নিজ নিজ জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চাস্ না। সেই পরিশ্রমটুকু কত্তে তোরা পরাঙ্মুখ। বল্ দেখি, আমার শিষ্য ব'লে পরিচয় দেবার তোদের অধিকার কতটুকু ?

শিষ্য, কুশিষ্য ও অশিষ্য

গুরুর আদেশের প্রতীক্ষা না ক'রে যে তার মনের অভিপ্রায় বুঝে তদনুযায়ী চলে, সে হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শিষ্য। আদেশ দানের পরে, যে তার সম্যক্ পালন করে, সে অত্যুত্তম শিষ্য। আদেশ পেয়ে পালনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থকাম হয়, হ'য়েও আবার চেষ্টা করে, উদ্যম কিছুতেই ছাড়ে না, সে হচ্ছে উত্তম শিষ্য। আদেশ পালনের চেষ্টা করে, ব্যর্থকাম হয়ে পুনরাদেশের জন্য চুপ ক'রে ব'সে থাকে, কিন্তু পুনরাদেশ পেলে আবার চেষ্টা করে, সে হচ্ছে মধ্যম শিষ্য। আদেশ পেলে পালন কত্তে চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থকাম হ'লে আর চেষ্টা করে না, সে হচ্ছে অধম শিষ্য। আদেশটি কাণ পেতে শোনে কিন্তু পালনের বেলায়ই দুনিয়ার আলস্য ঘাড় চেপে ধরে, তালবাহানা ক'রে ক'রে শুধু কালক্ষয় করে, সে হচ্ছে কুশিষ্য। আর আদেশ

পালনেও যত্নহীন, অথচ গুরুর নামে বড় বড় বক্তৃতা ঝেড়ে নিজ লৌকিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি কত্তে তৎপর, সে একেবারে অশিষ্য। (১২ই আষাঢ়, ১৩৩৯)

দীক্ষা ও গুরু-দক্ষিণা

ত্যাগী গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লইতে অর্থের আবার কি আবশ্যকতা? গৃহী গুরুগণের পরিবারবর্গের প্রতিপালনার্থ একটা সুব্যবস্থার প্রয়োজন। নতুবা তাঁহারা সমগ্র মন-প্রাণ দিয়া অবিচ্ছেদ চেষ্টায় শিষ্যকুলের হিতসাধনে লগ্ন হইয়া থাকিতে পারেন না, সংসারের নানাবিধ অভাব ও অভিযোগ শিষ্য-কল্যাণ-প্রয়াসে বারংবার জটিল বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া থাকে। সেই জন্যই দীক্ষাকালীন গুরুবরণের বস্ত্রাদি ও অপরাপর ব্যয়ের নির্দ্দেশ রহিয়াছে। কিন্তু সংসার-ত্যাগী নিষ্কিঞ্চন গুরুর সহিত শিষ্যের কোনও ঐহিক স্বার্থের কণামাত্র সম্বন্ধ নাই। তিনি শিষ্যকে তার পরমকল্যাণের পথ জানাইয়াই নিরুদ্বেগ এবং নিত্য তার সাধন-পথ-পিচ্ছিলতা প্রশমন করিয়াই নিশ্চিন্ত, নিম্নতর জগতের অন্য কোনও প্রত্যাশার ধার তিনি ধারেন না। অর্থ-লোভ গুরুর গুরুত্বকে ম্লান করে, দীপ্তিহীন করে, নির্বীর্য্য করে। প্রাপ্তির লালসা গুরুর কল্যাণ-বিতরণের শক্তিকে খর্ব্ব করে, পঙ্গু করে, স্থূল করে। শক্তিমান নিঃস্বার্থ গুরুর সূক্ষ্ম ইচ্ছার অব্যাহত গতি শিষ্যের দেহ-মন-প্রাণে যে যুগান্তর আনয়ন করিতে সমর্থ হয়, স্বার্থী গুরুর নিকট তাহা আশা করা বাতুলতা।

এই জন্যই যাঁহারা গুরু-পদাধিষ্ঠিত, তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পূর্ণ নির্লোভতা, নিষ্কামতা ও অপ্রার্থিতা প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক।

অবশ্য আরও কয়েকটী দিক্ আছে। নির্লোভ গুরু শিষ্যের নিকটে অর্থ, বস্ত্র বা সম্পত্তি চাহিলেন না,—ইহা দ্বারা গুরুর মহিমা বর্দ্ধিত হইল। কিন্তু বিনামূল্যে রত্ন পাইলে লোকে তাহার যত্ন করে কম। পৈতৃক শালের দাম পুত্রকে দিতে হয় নাই, পিতাই তাহার কষ্টার্জ্জিত অর্থ দিয়া শাল-নির্ম্মাতার দাবী পূরণ করিয়াছিলেন,—এরূপ ক্ষেত্রে পৈতৃক মূল্যবান্ শাল দিয়া চটি-জুতার ধুলা ঝাড়িতে অনেক পুত্রকে দেখা যায়। সমগ্র সম্পত্তির বিনিময়ে শ্বশুর যে হীরকখণ্ড কিনিয়াছিলেন, বিবাহ-সূত্রে বিনামূল্যে তাহা প্রাপ্ত হইয়া সেই অমূল্য হীরকখণ্ড দ্বারা পায়ের নখ খুঁটিতে অনেক জামাতাকে দেখা যায়। দীক্ষা সম্পর্কেও এইরূপ ব্যাপার অহরহ ঘটিতেছে। বক্ষের পঞ্জরাস্থি বিক্রয় করিয়া গুরু যে অমূল্য রত্ন অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার বিনিময়ে ত্যাগী গুরু অর্থ বা বস্ত্র গ্রহণ না করিতে পারেন, কিন্তু ভাবী শিষ্যকে বারংবার বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া এই বিষয় নির্ণয় করিয়া লইবার অধিকার তাঁহার আছে যে, এই ব্যক্তি সাধন পাইলে কায়মনোবাক্যে তাহার অনুশীলন করিবে কি না, দীক্ষার মর্য্যাদা সে রাখিবে কি না। দীক্ষার্থীর অশ্রু বা উপরোধের উপরে গুরুত্ব আরোপ না করিয়া এই বিষয়ে গুরুত্ব আরোপই

তাহার অধিকতর আবশ্যক। অর্থাৎ প্রকারান্তরে বলিতে গেলে নিষ্ঠারূপ গুরু-দক্ষিণা দীক্ষার আগেই আদায় করিয়া লওয়া প্রয়োজন। (১৫ই আষাঢ, ১৩৩৯)

ধর্ম্মের নামে কদাচার

কোথাও কোথাও বৈষ্ণবদের মধ্যে একটী সম্প্রদায়ের কথা শুনা যায়, যারা বিয়ের পর স্ত্রীকে সকলের আগে গুরুদেবের হাতে সমর্পণ করে এবং তিনি তাকে গ্রহণ ক'রে প্রসাদী ক'রে দিলে পরে নিজেরা স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধ স্থাপন কত্তে পারে। এসব প্রথা অতি জঘন্য, অতি মারাত্মক। এই রকম জঘন্য কদাচার কিছুতেই চল্‌তে দেওয়া উচিত নয়। মানুষ যখন প্রবৃত্তির তাড়নায় কদাচার করে, তখনই তা' যথেষ্ট জঘন্য। মানুষ যখন বাহাদুরী দেখাবার জন্য কদাচার করে, তখন তা' আরো জঘন্য। কিন্তু যখন তা' করে দেশ-সেবার নাম ক'রে, কিম্বা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে, যখন তা' করে বড় বড় আদর্শের নিশান উড়িয়ে, তখন তার জঘন্যতা বর্ণনার অতীত। যে-কোনও প্রকারে, এইগুলি বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত। সর্ব্বজনীন প্রচার, শুদ্ধ ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শন, কদাচার-সমর্থকদের কুযুক্তি-খণ্ডন, সামাজিক শাসন, দলবদ্ধ বিরোধিতা এবং আইনের প্রবর্ত্তন প্রভৃতি সব রকম চেষ্টা যুগপৎ ক'রে, এই সব অনাচারের মূলোৎপাটন করা চাই।

স্ত্রীকে গুরুতে সমর্পণ-রূপ প্রথার মূল

গুরুর হাতে স্ত্রীকে সঁপে দেওয়ার প্রথাটা এখন যতই কদর্য্য হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকুক, একটা বিষয় লক্ষ্য কত্তে হবে যে, গোড়ায় এটা একটা অশ্লীল কদর্য্য-ব্যাপার ছিল না। এর পশ্চাতে একটা মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, এর সাথে একটা প্রাণবন্ত কর্ম্মনীতি ছিল। সেই উদ্দেশ্যটী ছিল, বিবাহিত জীবনের ভিতরে পবিত্রতা ও ভাগবতী চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করা। সেই কর্ম্মনীতিটী ছিল, নববিবাহিতা পত্নী বিবাহের পরেই এসে স্বামিগৃহে ঢুকে যাতে ইন্দ্রিয়-সেবায় নিজেকে না বিকিয়ে দেয়, পরন্তু গুরুগৃহে থেকে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম, সত্য, সদাচার, ভক্তি, বিনয়, পবিত্রতা প্রভৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত সংশিক্ষা নিয়ে যেন পরমপ্রেমের আধাররূপে এসে স্বামীর গৃহকে শুচিতায়, মঙ্গলে, আনন্দে ও প্রেমে পূর্ণ করে।

শিষ্যের উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব

এই ব্যাপারে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভাবের দিক্ দিয়ে আরও একটী বৈশিষ্ট্য ছিল। অনেক সাধক সংসারের সকল বস্তুর উপর থেকে নিজের সকল দাবী তুলে নিয়ে গুরুদেবকেই সংসারের সব-কিছুর মালিক ব'লে জ্ঞান কত্তে চাইতেন। "ধন-দৌলত, বিষয়-সম্পত্তি সবই গুরুদেবের, নিজের কিছুই নয়, কোনও বস্তুর প্রতি আমার কণামাত্রও মমত্বও থাকা উচিত নয়, সবই তাঁর, আমি তাঁর আজ্ঞাবহ কর্ম্মচারী হ'য়ে, তাঁর বিষয়

তাঁর আশয় দেখছি",—অনেকে অন্তরে অন্তরে এই ভাবের অনুশীলন কত্তে চাইতেন। তাঁদের কাছে "সব যাঁর, স্ত্রীও তাঁর",—এই মতের প্রাধান্য হওয়া স্বাভাবিক। স্ত্রীকে তাঁরা গুরুতে সমর্পণ কত্তেন, এই ভেবে নয় যে, গুরু তাঁদের স্ত্রীকে নিয়ে ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা করুন, পরন্তু এই ভেবে যে, "গুরুকে যে জিনিষ দিয়ে দিয়েছি, সে জিনিষ আর আমার ভোগের বস্তু হ'তে পারে না, স্ত্রীটী আমৃত্যু আমার গৃহে অবস্থান কল্লে'ও আমি একদিনের জন্যও তাঁর প্রতি কোনও দৈহিক ব্যবহার কর্ব্ব না,—যেমন গয়াতে বা কাশীতে গিয়ে কোনো ফল দান ক'রে এলে, সেই ফল ঝুড়ি ঝুড়িও যদি ঘরে পচে, তবু কেউ এক-বারটীর জন্যও তা' জিভ দিয়ে আস্বাদন ক'রে দেখে না।" সুতরাং বিচার করে দেখ্‌লে, মূলের দিকে চাইতে গেলে, শিষ্যের উদ্দেশ্য ছিল অতীব পবিত্র, অতীব সুন্দর।

গুরুদেবের বিশ্বাসঘাতকতা

কিন্তু শিষ্যের উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব যতই প্রশংসনীয় হোক্, গুরু যেখানে সংযমহীন, অবিদ্যাপরায়ণ, বিলাসী ও কামুক, গুরু যেখানে অসতর্ক, স্বার্থপর, অসাধক ও দুর্ব্বল, সেখানে শিষ্যাণীর দলে দুর্নীতি প্রবেশ কর্ব্বেই কর্ব্বে! এ'কে আটকে রাখবার ক্ষমতা কারো নেই। মূর্খ বা অল্পশিক্ষিতা অল্পবয়স্কা মেয়ে-গুলিকে গুরুদেবেরা যা-খুশী তাই শিখিয়ে দিলেন, সেই পাঠই মুখস্থ ক'রে মেয়েগুলি স্বামিগৃহে ফিরে এল। অধিকাংশেরই

জীবনে তদ্বিরুদ্ধ কোনও হিতকর শিক্ষার সুযোগ ঘটল না। ফলে এইসব বউগুলিই পরে মা হ'য়ে শ্বাশুড়ী হ'য়ে নিজেদের ঝি-বৌকে নিজেদের পড়া বিদ্যাই শিখাতে লাগল। গুরুদেবের বিশ্বাসঘাতকতার ফল এই ভাবেই সমাজের অংশ-বিশেষে একটা বদ্ধমূল কুপ্রথায় এসে পরিণত হয়েছে।

কদাচারের গোড়া স্ত্রী-সুশিক্ষার অভাব

এই সব কদাচারের গোড়া যে কোথায়, তা' তোমাদের খুঁজে বে'র কত্তে হবে। সেইটী হচ্ছে, স্ত্রীদের মধ্যে সুশিক্ষার অভাব। মন থাকে যার তৈরী, তার দেহকে স্পর্শ কর্ব্বে এমন সাধ্য কার? সতীত্ব-গৌরব যার ভাল ক'রে জাগিয়ে তোলা হয়েছে, তার শরীর যে অজেয় দুর্গ। অনুরোধে উপরোধে নয়, শাসানি বা চোখ-রাঙ্গানিতে নয়, কামান-বন্দুক মেরে নয়,—কোনও প্রকারেই তা দখল করা যায় না। এই মূল সূত্রটী ধ'রে যদি আমরা কাজ করি, তবেই এই দুর্নীতির প্রকৃত প্রতীকার হ'তে পারে। (১৬ই আষাঢ়, ১৩৩৯)

দীক্ষা ও সমারোহ

বিবাহে ত' হট্টগোল হবেই, কারণ এর ভিতরে সাত্ত্বিকতার প্রবেশাধিকার অনেকদিন থেকেই নেই। আমি দীক্ষাতে পর্য্যন্ত দেখেছি, রাশীকৃত লোকের হট্টগোল। শিষ্য দীক্ষা নেবেন, নিষ্ঠা ও ভক্তিবর্দ্ধক আচার-অনুষ্ঠান কতকগুলি ত'

বিপুল আড়ম্বর-সহকারে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক প্রথানুসারে গুরুদেব করাবেনই, পরন্তু শিষ্য আবার পাঁচ শত নরনারী নিমন্ত্রণ ক'রে তাদের চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভক্ষণ করিয়ে খাদ্য-সম্ভারের বাহুল্যের মধ্য দিয়ে নিজের ইষ্ট-নিষ্ঠাকে জাঁকালো ক'রে advertise (বিজ্ঞাপিত) ক'রে নিলেন। সাম্প্রদায়িক প্রথা দীক্ষা-ব্যাপারটাকে যতটুকু জটিল করেছে, তার উপরে ত' আর কেউ কথা বল্‌তে পারে না। স্থলবিশেষে ও ব্যক্তি-বিশেষে শাস্ত্রীয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ডগুলি নিখুঁতভাবে বা জমকালোভাবে হওয়া শিষ্যের পক্ষেও মঙ্গলজনক হয়। কিন্তু আড়ম্বর ক'রে লোক-খাওয়ানোর ভিতরে নাম-কেনবার সখ ছাড়া আর কি আছে?

দীক্ষাগ্রহণ ও জাতি-কুল

তুমি নিজেকে কোনও জাতি, কুল বা সমাজে আবদ্ধ ব'লে মনে করো না। দীক্ষা গ্রহণমাত্র তোমার উপর থেকে সব জাতির, সব কুলের, সব সমাজের বন্ধন কেটে গেছে। যা বন্ধনকে কাটে, তাই দীক্ষা। অন্ধকারই বন্ধনের স্থায়িত্ব-বিধাতা। যা অন্ধকারকে দূর করে, তাই দীক্ষা। ভগবদিচ্ছায় তুমি যে-কোনও কুলকে পবিত্র কত্তে পার, যে-কোনও দেশকে ধন্য কত্তে পার, যে-কোনও সমাজকে কৃতার্থ কত্তে পার। তোমার জনক বা জননী যে-কোনও বংশ বা যে-কোনও সমাজের অবতংস হোন, যে-কোনও আচারাবলম্বী বা যে-

কোনও জীবিকা-পরায়ণ হোন, দীক্ষা-মাত্রই তুমি অখণ্ড। তোমার জনক নেই, জননী নেই, জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, জাতি নেই, কুল নেই। (২৭শে আষাঢ়, ১৩৩৯)

শিষ্য, সাধন, গুরু ও পরমগুরু

তোমরা কেহই সাধন কর না, অথচ স্বরূপানন্দের সন্তান বলিয়া একটা মিথ্যা পরিচয় দিয়া বেড়াইতেছ। এইরূপ শিষ্যদের দ্বারা জগতে কোনও মহৎ মঙ্গল সাধিত হইবে না। জীবনটাকে সত্যিকার একটা সার্থকতা দিতে হইলে সাধক বলিয়া পরিচয় দিবার আগ্রহ হইবার আগে সাধন করিবার আগ্রহ হওয়া কর্ত্তব্য। অসাধক শিষ্যের আচার্য্যত্ব করিতে গিয়া আমারও বুদ্ধি স্থূল এবং জীবন অসার্থক-বাহুল্য-ভূয়িষ্ঠ হইয়া পড়িবে। অতপস্বী শিষ্যের সমাজে মহাতপস্বী গুরুও ব্রহ্মবিদ্যার জ্যোতিঃ বড় একটা বিকীর্ণ করিতে পারেন না। এই জন্যই আমি তোমাদিগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া বর্ত্তমানে সমগ্র মনঃপ্রাণ একমাত্র পরমাত্মার দিকে উন্মুখ করিবার জন্য ইচ্ছুক রহিয়াছি।

শিষ্য যদি গুরুকে ভুলিয়া যায়, কিন্তু পরমাত্মাকে না ভোলে, আমি কিন্তু তাহাকেও পূজা করি। গুরু যদি শিষ্যকে ভুলিয়া যান, পরমাত্মাকে না ভুলেন, তবে তাঁহাকে আমি কর্ত্তব্যচ্যুত মনে করি না। কারণ, পরমাত্মাই পরম গুরু, তাঁহার সেবাই

সদ্‌গুরুর সেবা এবং গুরুর ব্রহ্মনিষ্ঠাই শিষ্যের সকল মঙ্গলের মূল,—গুরুদেবের চরণ-কমলের রাতুল সৌষ্ঠব নহে, পৌরজন-মনোহারিণী বচন-মাধুরী নহে, জটাজূটশোভিত পিঙ্গল শির কিম্বা স্ফীতোদরও নহে। (২৮শে আষাঢ়, ১৩৩৯)

চক্রান্তে পড়িয়া দীক্ষা

লোকের চক্রান্তে পড়িয়া অযোগ্য পাত্র হইতে দীক্ষা গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন শুনিয়া আপনার দুর্ভাগ্যের জন্য আমি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। শাস্ত্রে গুরুকরণের পূর্ব্বে গুরু-পরীক্ষার ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। শিষ্যগণ আবেগের আধিক্যহেতু এবং গুরুগণ শিষ্যসংখ্যাবৃদ্ধির লোভহেতু এই মহামূল্য উপদেশ উপেক্ষা করিয়া আধুনিক ধর্ম্মজগৎকে কলঙ্ক-সঙ্কুল ও প্রবঞ্চনা-ভূয়িষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, যাহাকে আপনার পথ-প্রদর্শনের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, তাহার প্রতি কিংবা তাহার উপদেশের প্রতি কোনও প্রকার বৃথা-মমত্ব-বুদ্ধি না রাখিয়া ঈশ্বর-কৃপানুগত ভুজ-বিক্রমে সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউন। প্রবল পুরুষকার আপনাকে ঐশ্বরিকী কৃপার রসাস্বাদন করাইবে। দীক্ষাদাতার মূর্ত্তিধ্যান অথবা গুরুপত্নীধ্যান নিষ্প্রয়োজন। শিশুদের খেলা করিবার জন্য শিশু-পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়েরা এই সকল খেল্‌না সাধন-মন্দিরের সিংহদুয়ারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন মাত্র। অক্ষম

শিশুর জন্য যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, সজ্ঞান মানবের তাহা গ্রহণীয় নহে। (৩০শে আষাঢ়, ১৩৩৯)

শিষ্য-সংগ্রহের বাতিক

যারা আমার জিনিষ, তারা আমার কাছে আজ হোক, কাল হোক, আসবেই। এই বিশ্বাস আমার এত দৃঢ় বলিয়াই শিষ্য-সংগ্রহের বাতিক * * * আমার নাই। (৩১শে আষাঢ়, ১৩৩৯)

গুরু, শিষ্য ও সমদীক্ষিতের মধ্যে জাতিভেদ

দীক্ষাদাতা আর দীক্ষিত এই দুইজনের মধ্যে জাতিভেদ সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নই থাকতে পারে না। দীক্ষিতকে নীচ জাতি ব'লে অবজ্ঞা করা দীক্ষাদাতার পক্ষে কপটতা ব'লে আমি মনে করি। সুতরাং সমদীক্ষিত ব্যক্তিদের ভিতরেও জাতিভেদ নিয়ে কোনও কথা উঠতে পারে না, উঠা উচিত নয়। আমি অবশ্য জোর ক'রে আমার ছেলে-মেয়েদের মধ্য থেকে জাতিভেদ দূর ক'রে দেবার চেষ্টা করি নি, করা প্রয়োজন মনে করি না। তার কারণ এই যে, এরা যদি অধিকাংশেই দীক্ষাপ্রাপ্ত মহামন্ত্রের সাধন অকপটে ক'রে যায়, তা' হ'লে এদের ভিতর থেকে সর্ব্বপ্রকার জাতিভেদ আপনা আপনিই উঠে যাবে, অথচ জাতিভেদ তু'লে দেবার জন্য এই সমসাধকদের সমাজে কোনও অনাচার বা উচ্ছৃঙ্খলতাও প্রবেশ কর্ত্তে পার্ব্বে না।

(৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৮)

দীক্ষামন্ত্র ও শিক্ষামন্ত্র

একবার একজনের কাছে দীক্ষামন্ত্র নেওয়া, আবার আর একজনের কাছে শিক্ষামন্ত্র নেওয়া, যাদের এ প্রথা আছে, থাকুক, তোমাদের মধ্যে যে বারংবার মন্ত্রগ্রহণ নেই, এই প্রত্যয়ে সুস্থির থাক। মন্ত্র নিয়েছ ত' জীবনে একবারই নিয়েছ। শতবার শত মন্ত্র নয়। শিক্ষামন্ত্র আর দীক্ষামন্ত্র ক'রে চতুর্দ্দিকে বড় বেশী হট্টগোল হচ্ছে। তাতে তোমরা কাণ দিও না। নিষ্ঠাই সাধনের প্রাণ। প্রাপ্ত নামে নিষ্ঠা রাখ। দেনা-পাওনার সম্বন্ধ একটী নামের সাথেই থাকুক, শত দিকে মন দিও না। নানা মন্ত্র জপ ক'রে লাভ অতি সামান্য। একটী মাত্র মন্ত্রে মনঃপ্রাণ সমর্পণ কর্ত্তে পারলে, এক নাম জপেই সব নাম জপ করা হ'য়ে যায়। (৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৯)

গুরুর বিচিত্র আচরণ

অপরকে গ'ড়ে তোলা যার জীবনের ব্রত, তাঁর আচরণ তোমাদের ক্ষুদ্র মাপ-কাঠি দিয়ে মাপতে গেলে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় তাতে হ'তে পারে, কিন্তু সুবিচার নাও হ'তে পারে। বাগানের মালীর কর্ত্তব্য গাছের যাতে উপকার হয়, তাই করা। কিন্তু উপকার বলতে কি বুঝবে? সব সময়ে একই ব্যবহারে কি উপকার হয়? কত যত্ন, কত তদ্বির চল্‌ল গাছটাকে বড় ক'রে তুল্‌তে, তার ক'দিন পরেই পালা এল ডাল ছাঁট্‌বার।

কারণ, ডাল কিছু কিছু ছেঁটে না দিলে ফুল-ফল আসবে না। অথচ ফুল-ফলেই বৃক্ষের সার্থকতা। গুরুরও কর্ত্তব্য সেইরূপ। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীন, অলস, অকর্ম্মণ্য শিষ্যকে মহাব্রতে উদ্বুদ্ধ কর্ব্বার জন্য তার অন্তর্নিহিত শক্তিতে, তার পুরুষকারে, তার ব্যক্তিত্ববোধে রসায়ন-প্রয়োগ চল্‌তে লাগ্‌ল। ফলে বহু সদ্‌গুণের সাথে সাথে ঔদ্ধত্য, অবিনয়, অবিমৃষ্যকারিতা, অহঙ্কার, দম্ভ, দর্প, পরমতে অসহিষ্ণুতা প্রভৃতির ডাল-পালা আকাশ স্পর্শ কর্ত্তে ছুট্‌ল। এ সময় গুরুকে ডাল-পালা ছাঁট্‌বার জন্য কঠোর হস্তে কাঁচি বা কাটারি চালাতে হয়, স্থলবিশেষে কুড়াল পর্য্যন্ত ধরতে হয়। কারণ, দর্প-দম্ভের ডাল-পালা ছেঁটে না দিলে মানবের জীবন-বৃক্ষে ফুল ফোটে না, ফল ফলে না। যাকে আদরে লালন করা হয়েছিল, তাকেই আবার কঠোর শাসন করার প্রয়োজনও গুরুর আছে, যোগ্যতাও গুরুর থাকা দরকার। (৯ই শ্রাবণ, ১৩৩৯)

গৃহী-শিষ্যের প্রতি গুরুর কর্ত্তব্য

গুরুর কর্ত্তব্য সর্ব্বাবস্থাতেই শিষ্যের সংযমানুরাগ ও সংযম-শক্তিকে প্রবর্দ্ধিত করার চেষ্টা করা, স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক আসক্তিকে কমিয়ে দিয়ে উভয়কে ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত করা। শিষ্যকে স্ত্রৈণ আর শিষ্যাকে কামুকী হ'তে তিনি প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তাঁর নিজের শুদ্ধ জীবন, তাঁর পবিত্র

আচরণ বিনা উপদেশেই শিষ্য-শিষ্যার জীবনে ত্যাগ ও পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত কর্বেন,—এখানেই ত' তাঁর সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব। তার পরে প্রয়োজনস্থলে উপদেশও তিনি দেবেন। যেখানে কৌশলের অভাবে উপদেশকে নিজ জীবনে প্রতিফলিত কত্তে শিষ্য অক্ষম, সেখানে তিনি কৌশল-বিশেষেরও ইঙ্গিত কর্বেন। মহাপুরুষের স্নেহাশ্রয় পেয়েও যদি জগৎ থেকে লাম্পট্য আর কদাচার না কম্‌ল, তা হ'লে মহাপুরুষদের শিষ্য-সেবা-ব্রত-গ্রহণের সার্থকতা কোথায়?

সকলের সেরা দুর্ভাগ্য

ঈশ্বর-বিমুখতা জীবনের পরম দুর্ভাগ্য। তন্মধ্যে আবার ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা হচ্ছে সব চেয়ে বড় বিমুখতা। যে ব্যক্তি জীবসেবাকে ব্রত ক'রে ঈশ্বর ভুলে গেছে, সে মহৎ হ'লেও দুর্ভাগ্য। যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত যশের লোভে ঈশ্বর ভুলে আছে, সে আরো দুর্ভাগ্য। আর যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সুখের মোহে প'ড়ে ঈশ্বর ভুলে আছে, সে হচ্ছে সকলের সেরা দুর্ভাগ্য।

দুর্ভাগ্য-বিদূরণের ব্রত

দুর্ভাগ্য দূর করাই গুরুর কাজ। ইন্দ্রিয়-পরায়ণকে তিনি যশস্বী জীবনের উজ্জ্বল ছবি প্রদর্শন ক'রে ক্ষুদ্রতার গণ্ডীবদ্ধ গৃহ-কোণ থেকে টেনে এনে তার কূপ-মণ্ডুকতা ঘোচাবেন। আত্ম-যশোলুব্ধ রজঃপরায়ণ ব্যক্তিকে নাম-যশ প্রতিষ্ঠার

অসারতা প্রদর্শন ক'রে নিষ্কাম ভাবে সত্ত্ব-রাজসিক জীব-হিতৈষণায় নিয়োজিত কর্ব্বেন। জীবহিতপরায়ণ নিষ্কাম লোক-কল্যাণ কর্ম্মীর পরার্থচেতনাকে তিনি তাঁর অপার্থিব স্নেহ, প্রেম, আকর্ষণ, আদর্শ ও অনুপ্রেরণার বলে পরমার্থ-প্রেরণায় পরিণত কর্ব্বেন। এই কাজটী যদি তিনি না কত্তে চান, তবে তাঁকে "গুরু" এই উপাধিটী বর্জ্জন কত্তে হবে।

পরমার্থী ও পরার্থীর পারস্পরিক সম্বন্ধ

যিনি পরমার্থ-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, তিনি কি পরার্থ-ব্রত বর্জ্জন কর্ব্বেন? তা কর্ব্বেন না। তহশীলদার যদি নায়েব হয়, সে কি তহশীলদারী ছেড়ে দেয়, না, ধ'রে রাখে? এক হিসাবে ছাড়ে, এক হিসাবে ধরে। নিজ হাতে আর তহশীল আদায়-উশুল সে করে না বটে, কিন্তু তারই অধীনস্থ লোকদের দিয়ে সে তা সুচারুরূপে সম্পন্ন করায়। তহশীলদারদের কর্ম্ম-সৌকর্য্য বর্দ্ধনই তার প্রধান কর্ত্তব্য হয়। একজন নায়েব যদি জমিদার হয়, সে কি নায়েবী করে, না, ছাড়ে? এক হিসাবে করে, এক হিসাবে ছাড়ে। নায়েবের অধিকারের বাইরের কাজই তাকে প্রধানতঃ কত্তে হয় এবং প্রত্যেকটী অধীনস্থ নায়েবের কাজ যাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তার সুব্যবস্থার দিকেই তার প্রধান দৃষ্টি রাখ্‌তে হয়। পরমার্থ-উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিরও পরার্থব্রতীর সঙ্গে এই রকমই সম্বন্ধ।

ঈশ্বর-নিষ্ঠ ব্যক্তিই সকলের গুরু

ঈশ্বর-নিষ্ঠ ব্যক্তিরা এই জন্যই জগতের সকল দেশ-কর্ম্মী, স্বজাতি-সেবক, পরহিত-প্রাণ ও জীবের দুঃখে-দুঃখী মহৎ লোকদের গুরু। কেউ মহৎ হয়েছেন, লাঞ্ছনা পেয়ে তার প্রতিকারের চেষ্টায়। কেউ মহৎ হয়েছেন স্বজাতির প্রতি স্বাভাবিক প্রীতির আকর্ষণে। কেউ মহৎ হয়েছেন জীবের দুঃখ দেখে আত্মৌপম্যের দ্বারা গভীর সহানুভূতি অনুভব ক'রে। কেউ মহৎ হয়েছেন নামের লোভে, যশের তাড়নায়, প্রতিষ্ঠার প্রলোভনে। এক এক ভাব নিয়ে এক একজন কর্ম্মের পথে নেমেছেন এবং নানা ঝড়-ঝাপ্‌টা স'য়ে অনেকবার আছাড় খেয়ে হাত-পা ভেঙ্গে মার স'য়ে তারপরে অন্তরের বহু মলিনতা থেকে ঘটনার আবর্ত্তে পরিশুদ্ধ হ'য়ে মহত্ত্বের মন্দিরে এসে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু ভগবৎ-সমর্পিত-প্রাণ ব্যক্তিই এদের সকলের গুরু।

(১০ই শ্রাবণ, ১৩৩৯)

কুল-গুরু-প্রথা ও ক্রীতদাস-প্রথা

একদিক্ দিয়ে বিচার কত্তে গেলে কুলগুরু-প্রথাকে কি প্রাচীন ক্রীতদাস-প্রথারই একটী রূপান্তর-বিশেষ ব'লে মনে করা যায় না? অবশ্য আর্য্য-ভারতে ক্রীতদাস-প্রথা ছিল না, আর যদিও থেকে থাকে, তবে তা' আরব, মিশর ও পরবর্ত্তী আমেরিকার ক্রীতদাস-প্রথার সাথে তুলনায়—স্বর্গ আর নরক। কিন্তু পরে ত' এই ভারতেই ক্রীতদাস-প্রথা বিদেশ থেকে উড়ে

এসে জুড়ে বসেছিল? কুলগুরু-প্রথাকে কি তার সঙ্গে একটা দিক্ দিয়ে তুলনা করা চলে না? শিষ্য সহ শিষ্যের বংশাবলীও একটী নির্দ্দিষ্ট গুরু-বংশেরই চিরকাল অধীন হ'য়ে থাকবে, এর মধ্যে কি একটা অবিচার নেই? মহামহোপাধ্যায়ের ছেলে অপোগণ্ড মূর্খ হ'লে তাকে চতুষ্পাঠী চালাবার অধিকার যে দেশে দেওয়া হ'ত না, সেই দেশে গুরুর পুত্র নিতান্ত লঘু হ'লেও মন্ত্র দেবার একমাত্র অধিকারী, এই কথাটা কি যুক্তিসহ? গুরু শিষ্যকে চিরকালই শিষ্য ক'রে রাখ্‌বেন, সাধন ক'রে, ভজন ক'রে বা ত্যাগ, তপস্যা ও সদাচারের মহিমায় শিষ্য কখনই গুরুর পর্য্যায়ে উন্নীত হ'তে পার্ব্বেন না, এ অত্যন্ত অসঙ্গত ব্যবস্থা। আজ যে টোলের ছাত্র, কাল সে টোলের অধ্যাপক হচ্ছে, আজ যে কবিরাজের সহকারী বালক, কাল সে অধ্যয়ন ও অভ্যাসের বলে নিজেও বৈদ্যরাজ হচ্ছে কিন্তু আজ যে গুরুর শিষ্য, সে নিজে বা তার বংশে কেউ কঠোরতপা ও উগ্রসাধক হ'লেও তারা পুরুষানুক্রমে শিষ্যই থেকে যাবে,—এটী সকল সুযুক্তিকে অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে। সুতরাং এইদিক্ দিয়ে যদি বিচার কর, তবে দেশপ্রচলিত কুলগুরু-প্রথাকে অস্বীকার ক'রে চলাই সঙ্গত হ'য়ে পড়ে।

কুলগুরুকে সমর্থনের একটী দিক্

কিন্তু কুলগুরুদের আর যত দোষই থাকুক, একটি দিক্ দিয়ে সমর্থনের মস্ত কথা আছে। সেইটী হচ্ছে এই যে, এঁদের

চৌদ্দ গোষ্ঠীকে চেন, সুতরাং অসাধনজনিত অক্ষমতার কথা বাদ দিলে অন্যদিক্ দিয়ে এঁরা তোমার গুরুতর ভাবে কোনও ক্ষতি কত্তে পারেন না। কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে মহৎ জেনে বরণ করার পরে অনেক হৃদয়-বিদারক দুঃখ পেয়ে তোমাকে অনুতাপ কত্তে হ'তে পারে। এরকম শত শত ঘটনা সমাজের বুকে প্রতিনিয়ত ঘটছে ও অনেকেই কিল খেয়ে কিল চুরি কচ্ছে, তাই প্রকৃত সংবাদ বাইরে প্রচার অতি অল্পই হচ্ছে।

আদর্শ সমাজে গুরু, শিষ্য ও দীক্ষা

কিন্তু সমাজ, শিষ্য এবং গুরু এই তিনটী সম্পর্কে প্রকৃত ব্যবস্থা কি হওয়া উচিত জান? প্রথম কথা এই যে, সাধকের সমাজে কোনও মানুষকেই গুরু ব'লে মনে করা হবে না। যে-কোনও অগ্রসর সাধক, যে কোনও সাধনেচ্ছু ব্যক্তিকে দীক্ষা দিয়ে নেবেন, কিন্তু নিজেকে গুরু ব'লে অভিমান কর্ব্বেন না, দীক্ষিত ব্যক্তিকেও শিষ্য ব'লে জ্ঞান কর্ব্বেন না। যে মহামন্ত্রে দীক্ষা হ'ল, সেই মহামন্ত্রই হবেন গুরু, নিতান্ত মানবী আলম্বন প্রয়োজন হ'লে ঊর্দ্ধ্বপরম্পরায় আদি-গুরুই হবেন সকলের গুরু, দীক্ষাদাতা ও দীক্ষিত-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকে হবেন পরস্পরের গুরু-ভাই। দীক্ষাদাতার পুত্র দীক্ষাপ্রাপ্তের পুত্রকে দীক্ষা দিতে অধিকারী হবেন না,—বিবাহের কালে যেমন সগোত্র বর্জ্জন করা হয়, পরবর্ত্তীদের দীক্ষাকালেও ঠিক তেমনি এই

বিষয়টীতে কঠোর বর্জ্জন-নীতি অক্ষুণ্ণ রেখে চল্‌তে হবে। যদি ততদিনে সমাজ থেকে জাতিভেদ-প্রথা উঠে যায়, উত্তম। যদি না উঠে যায় বা আংশিক পরিবর্ত্তিত হ'লেও জন্ম দ্বারা সম্মান বা অসম্মান লাভের পদ যদি আংশিকভাবেও খোলা থাকে, তাহ'লেও অগ্রসর সাধকের কাছে দীক্ষা নেবার বেলা কেউ তাঁর জাতিগোত্রের শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতার বিন্দুমাত্র বিচার কর্ব্বে না, তাঁর জীবনের সাধুত্ব ও সাধকত্বের মর্য্যাদাই যথেষ্ট ব'লে বিবেচিত হবে। (১১ই শ্রাবণ, ১৩৩৯)

গুরুভক্তির স্বরূপ

গুরু পথ ব'লে দিয়েছেন, সেই পথই নিত্য, সেই পথই সত্য, সেই পথ প্রাণান্তেও বর্জ্জন কর্‌ব না, অন্য কোনো পথের প্রতি কোনো অবস্থাতেই আকৃষ্ট হব না, সাধন নেবার পর থেকে এক দিনের জন্যও আলস্যে কাটাব না, এইরূপ দৃঢ়তা অবলম্বনের নামই গুরুভক্তি। সেই গুরুভক্তি তোরা অর্জ্জন কর্! গুরু পথ বলেছেন, সেই পথে অবিচলিত বিক্রমসহকারে চ'লে তোরা পরমগুরুকে লাভ কর। (১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৯)

দীক্ষাই নবজন্ম-লাভ

তত্ত্বদর্শী যোগী-পুরুষের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ আর পুনর্জ্জন্ম-লাভ একই কথা। যোগী-পুরুষের চরণাশ্রয় গ্রহণ মাত্র শিষ্য নূতন মানুষে পরিণত হয়। ভিতরটা যার শুদ্ধ, চিত্ত যার

অমলিন প্রশান্ত, সে শিষ্য দীক্ষামাত্র এ পরিবর্ত্তনটাকে অনুভব করে, সদ্‌গুরু-কৃপাজনিত আধ্যাত্মিক স্ফুরণের উপলব্ধি তাকে বিস্মিত, চমকিত ও উদ্দীপিত করে। উপযুক্ত চিত্তশুদ্ধির যেখানে অভাব, সেখানে দীক্ষা ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে চিত্তের পরিশোধন করে এবং পরিবর্ত্তন আনে। শিষ্যের একাগ্র সাধন গুরুর যোগশক্তিকে শিষ্যের মধ্যে প্রস্ফুটিত করিবার সাহায্য করে।

শিষ্য চাহি না, সাধক চাহি

শিষ্য-সংখ্যা ত' বাবা বন্যার জলের শফরী-মৎস্যের মত অফুরন্ত ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু সাধকের সংখ্যা বাড়িতেছে কি ? দীক্ষা নিয়ে যদি তোমরা সাধন না কর, তবে দীক্ষা দিয়া কি লাভ ? তোমরা দলবৃদ্ধির মোহে পড়িয়া আমাকে প্রচার করিয়া বেড়াইও না, দলবৃদ্ধি কখনো আমার কাম্য বা লক্ষ্য হইতে পারে না। শিষ্যের সংখ্যা লক্ষের ঘর পুরণ করিলে বৈঠকে বসিয়া বলিবার মত একটা কথা হয় বটে, কিন্তু কল্যাণের ভাণ্ডারে এক কণা বস্তুও সঞ্চিত হয় না। লক্ষ বা কোটি অসাধক শিষ্য নহে, একটী বা দুইটী সাধক শিষ্যই আমার কাম্য। দল বাড়াইবার কুবুদ্ধি তোমরা এই মুহূর্ত্তে পরিহার কর, নিজেরা প্রত্যেকে সাধনার এক একটা জীবন্ত বিগ্রহ হইতে চেষ্টা কর, তোমাদের দেহে মনে তপস্যার তীব্র তেজ সঞ্চারিত হউক, সংবর্দ্ধিত হউক। তোমাদের জীবনের

জলন্ত ত্যাগ যখন মানুষকে আকৃষ্ট করিবে, সত্যিকার মানুষেরা তখনি তোমাদের সহিত মিলিত হইবেন, - বিজ্ঞাপনের প্ররোচনায় নয়, প্রচারকর্ম্মের ঢক্কানিনাদে আকৃষ্ট হইয়া নয়, প্রাণের অলঙ্ঘনীয় আধ্যাত্মিক আকর্ষণে। শিষ্য আমি চাহি না, সাধক চাহি, তপস্বী চাহি, একাগ্র, উদগ্র, নিষ্ঠাবান্ নামের সেবক চাহি। যাহা চাহি, তাহা দিতে চেষ্টা কর, তাহা হইতে চেষ্টা কর। তাহা হইলেই তোমাদের জন্য যুগান্ত ধরিয়া যে শ্রমস্বীকার করিয়া আসিতেছি, তাহা সার্থক হইবে, সফল হইবে। যাহা চাহি না, তাহা দিবার চেষ্টা করিও না।

(২০শে শ্রাবণ, ১৩৩৯)

দীক্ষা, না, Injection (সুচীবেধ)?

এটা দীক্ষা নয় রে বেটা, এটা হচ্ছে Injection. গুরুর যা কিছু সম্পদ, একটী নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের ভিতরে প্রবেশ ক'রে অলক্ষ্যে তার কাজ করে। এইজন্যই এতে গুরুর পাদ্য-অর্ঘ্য নেই, গুরুবরণের বস্ত্র নেই, উত্তরীয় নেই, গুরুদক্ষিণার স্বর্ণ বা রজত-খণ্ড নেই।

গুরু-শিষ্যের পরিচয়

গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ দীক্ষার ভিতর দিয়ে। সাধন পেয়েও শিষ্য যদি কাজ না করে, তবে এ সম্বন্ধ দৃঢ় হবে কি করে? গুরু রইলেন নামকে-ওয়াস্তে গুরু, শিষ্য রইলেন নামকে-ওয়াস্তে শিষ্য। চীৎকার ক'রে বেড়াচ্ছ তুমি অমুক যশস্বী যোগীর শিষ্য

অথচ তাঁর কথামত কাজ কচ্ছে না। এ চীৎকার ত' গুরুকে জুতো মারা। আমি প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছি, অমুক জজসাহেব আমার শিষ্য, অথচ সে সাধন করেই না। এ প্রচার ত নিজের কাণ নিজে ম'লে দেওয়া। দুটী ছেলে-মেয়ের বিয়ে হ'ল, লোক জান্‌ল তারা স্বামি-স্ত্রী, অথচ ছেলেটী স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ দিলে না, স্ত্রীও স্বামীকে সেবা ও আনুগত্য দিলে না, স্বামী রইল আর একটী মেয়েমানুষ নিয়ে, স্ত্রী রইল আর একটী পুরুষ মানুষ নিয়ে,—এতে স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ দৃঢ় হওয়া ত' দূরের কথা, বজায়ই থাকতে পারে না। মন্ত্র দিয়েই গুরুর ছুটী নেই, নিজ তপস্যার শক্তি দিয়ে শিষ্যের কল্যাণ কত্তে হবে। তার ধর্ম্ম-বোধকে পুষ্টি দিতে হবে, তার সাধন-নিষ্ঠাকে বর্দ্ধন কত্তে হবে। মন্ত্র নিয়েই শিষ্যের ছুটী নেই, সেই মন্ত্রের সাধন কত্তে হবে, গুরুগতপ্রাণ হ'য়ে সদ্‌গুরুর বাক্য বেদবাক্য জ্ঞান ক'রে তৎকথিত কাজ কত্তে হবে। যেখানে এরূপ, সেখানেই গুরু-শিষ্য ব'লে পরিচয় দেওয়া সার্থক এবং সেখানেই এই সম্বন্ধ তার সত্যিকার প্রতিষ্ঠা পায়। (২১শে শ্রাবণ, ১৩৩৯)

দীক্ষালাভের অধিকার

সত্য সত্যই সাধন কর্ব্বার জন্য যার চিত্ত ব্যাকুল, "সাধন ক'রে ভগবানকে লাভ কর্‌ব"—এই সঙ্কল্প প্রকৃতই প্রবল, "গুরুবাক্য মৃত্যুতেও লঙ্ঘন কর্ব্ব না" এই প্রতিজ্ঞা যার সুদৃঢ়, দীক্ষালাভে শুধু তারই অধিকার।

দুই নৌকাতে পা দেওয়ার বিপদ

দুই নৌকায় পা দেওয়া বড় বিপজ্জনক। এমন বিপদে কি কখনো নিজে ইচ্ছা ক'রে ঝাঁপ দিতে আছে? একটার মধ্যে বিশ্বাস রাখ, একটার সেবায় তনুমন :সব দিয়ে দাও, একটা স্রোতে ভেসে চল, তাতেই সর্ব্ব-দুঃখ নিবারণ হবে।

দীক্ষার মত বস্তু পরের ইচ্ছায় গ্রহণ কত্তে নেই। এই ব্যাপারে পরের বুদ্ধি গ্রহণ কত্তে নেই, নিজের প্রাণের বুদ্ধিকেই এ ব্যাপারে মানতে হয়। তবে একটা কথা হচ্ছে এই যে, পরের বুদ্ধিতে যা নিয়েছ, তা ত আর কোনো মন্দ বস্তু নয়! এতকাল তার সাধন ক'রে তোমার মঙ্গলই হয়েছে। তার প্রতি অনাদর, উপেক্ষা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন তুমি কত্তে পার না। কিন্তু যাই দেখবে একটীতে রুচি বেড়ে যাচ্ছে, তখন অপরটী ছেড়ে এক পথেই ডুব দেবে। একটা লোক সমুদ্রের দুই জায়গায় ডুবতে পারে না।

পূর্ব্ব-দীক্ষিতের দীক্ষা

অপরের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত পূর্ব্বদীক্ষিতকে আমি দীক্ষা দিতে ইচ্ছুক নই। কারণ, তাতে তার সংশয় আরো বেড়ে যেতে পারে। আমার নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ কত্তে গেলে তাতে তারও মনের সংশয় বেড়ে যেতে পারে। এজন্য তার পক্ষেও এরূপ অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক মনে করি।

কিন্তু আমার কোন শিষ্যের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ কত্তে আমি ইচ্ছুক নই। কেউ যদি শ্রেষ্ঠতর পথ পায়, শ্রেষ্ঠতর আশ্রয় পায়, তবে তাকে সমগ্র মনঃপ্রাণ দিয়ে আশীর্ব্বাদ কত্তে আমি কখনো কুণ্ঠিত নহি।

দীক্ষা কোনও পার্থিব স্বার্থের জন্য নয়

কোনো পার্থিব স্বার্থের জন্য দীক্ষা তোমরা প্রার্থনা ক'রো না। আমি যাকে তাকে সাধন দেই, ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে ভেদ করি না, আর্য্য-অনার্য্য বিচার করি না, হিন্দু কি ম্লেচ্ছ প্রশ্ন তুলি না, কিন্তু দীক্ষা কেন চাও, সেটা বিচার করি। তোমার ধনবৃদ্ধি হোক্, প্রদরের ব্যারাম সেরে যাক্, পুত্রলাভ হোক্, এসব প্রার্থনার সঙ্গে দীক্ষাকে যুক্ত ক'রো না। দীক্ষার ফলে, দীক্ষা-প্রাপ্ত সাধনে একাগ্র মনে লেগে থাকার ফলে, জীবের প্রভূত পার্থিব কল্যাণ আপনি হয়, কিন্তু সে প্রার্থনা নিয়ে কারো কখনো দীক্ষার্থী হওয়া উচিত নয়।

দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য কি ?

দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য নবজন্ম লাভ, পূর্ব্বসংস্কারের পাশ-বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে নবীন উদ্যমে পথ চলার শক্তি লাভ, দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য শ্রীভগবানকে পাওয়া। তোমার সমগ্র অস্তিত্বটাকে ভগবন্ময় ক'রে তোলা এবং সমগ্র দেহ-মনে ভগবানকে জাগিয়ে তোলাই হচ্ছে তোমার দীক্ষা গ্রহণের

উদ্দেশ্য। এর চেয়ে এক চুল ছোটও যদি হয়, তবে সে উদ্দেশ্য নিয়েও তুমি গুরু-কৃপা প্রার্থিনী হ'তে অধিকারিণী নও।

(৩০শে শ্রাবণ, ১৩৩৯)

গুরুভাবের উন্মেষ

এই বাড়ী থেকেই আমার গুরুগিরির আরম্ভ। এর আগে ছিল আমার বীতিহোত্র আর প্রভঞ্জন, তাদের নিয়েই আমার প্রথম আধ্যাত্মিক গোষ্ঠী। তাদের নিয়ে এতকাল নিরিবিলি সাধন কত্তাম। তারা আমার বল বাড়াত, আমি তাদের বল দিতাম। ঠিক গুরু-শিষ্যের মত ভাব আমাদের ছিল না। ছিল প্রেমময় সখার ভাব। কি মহান্ আত্মোৎসর্গের জন্য প্রভঞ্জন আর বীতিহোত্র তৈরী হচ্ছিল, তা আমি জানতাম আর তারা জানত, জগতের আর কেউ তা জান্‌ত না। কিন্তু এই বাড়ীতে এসে আরম্ভ হ'ল পদ্ধতিবদ্ধ গুরুগিরি। গুরুগিরির তলোয়ার প্রথমে হান্‌লাম এই বাড়ীর ছেলেদেরই ঘাড়ে। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে চতুর্দ্দিকে অসংখ্য জীব-হত্যা হ'তে আরম্ভ কর্‌লে। শেষে আমাকে নেশায় পেয়ে বস্‌ল। তখন আমি অসিদ্ধ-যোগী, দীক্ষা দিলেই কি আর কেউ সত্যিকার শিষ্য হয়? ফলে গুরু হলাম আমি শত শত লোকের কিন্তু শিষ্য হ'ল না তার মধ্যে একজনও, একজনও আমার জীবনাদর্শকে বুঝ্‌ল না, একজনও আমার হাতে হাত মিলাল না, কাঁধে কাঁধ মিলাল না, প্রত্যেক শিষ্যের জন্য খেটে খেটে

আমার জান্ যাবার যোগাড় হ'ল, কারো কারো অসম্ভব রকমের উন্নতির পরেই হঠাৎ গুরুতর অধোগতির দৃশ্য দেখে নিজের অসম্পূর্ণতা, নিজের অসিদ্ধতা স্মরণ ক'রে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসালাম। কিছুদিন পরে পড়্লাম দীর্ঘ দুই বৎসরব্যাপী রক্তবমনের রোগে। রোগ-শয্যায় প'ড়ে নিজ আচরণের হিসাব-নিকাশ হ'ল; পরমাত্মায় পূর্ণ আত্মসমর্পণ এল, পরমাত্মরূপী সদ্গুরু অন্তরে আবির্ভূত হ'য়ে বল্লেন,—"স্থিরো ভব।" অমনি স্থির হ'য়ে গেলাম, শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির লোভ কমে গেল, সম্প্রদায়-সৃষ্টির কুবুদ্ধি নাশ পেল, প্রতিদান-লাভে লোভহীন হ'য়ে মানবাত্মাকে পরমোন্নতির পথে হাত ধ'রে টেনে নেবার সামর্থ্য উপজাত হ'ল, আমি আমার হারানো সত্তাকে ফিরে পেলাম। এই বাড়ীটা আমার জীবনের একটা বিরাট বিপ্লবকে প্রত্যক্ষ করেছে।

বুদ্ধদেবের শিষ্যদের গুরুদ্রোহ

ভগবান্ বুদ্ধকেও এই বিপ্লব নিজ অন্তরে অনুভব কর্ত্তে হয়েছিল। তাঁরই স্নেহে পুষ্ট, তাঁরই তপোবীর্য্যে বীর্য্যবান্ পঞ্চশিষ্য তাঁকে কলা দেখিয়ে বলেছিল, "তুমি মিথ্যা গুরু, আমরা সত্য গুরুর সন্ধানে চল্লাম।" এই আঘাতের বেদনা তিনি সেই দিন ভুলেছিলেন, যে দিন বোধিদ্রুম-মূলে তিনি মৈত্রীর মধুময়ী বাণী অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে লাভ কর্ল্লেন।

(৪ঠা ভাদ্র, ১৩৩৯)

গুরু-নির্ভর কিসে আসে ?

আমাকে অবজ্ঞা ক'রেও তোমরা সম্মানিতই কচ্ছ, আমাকে ত্যাগ ক'রেও গ্রহণই কচ্ছ।

পূর্ণরূপে গুরুনির্ভর আসিবার পথ কি ? কেবল সাধন ক'রে যাও। নামই তোমাকে সত্য গুরুর কাছে পৌঁছে দেবে। নামই সত্যলাভের পথ, গুরুনিষ্ঠার পথ। কারণ, নামই সত্যিকারের গুরু। (৫ই ভাদ্র, ১৩৩৯)

সদ্‌গুরু কে ?

পিপাসা যার লাগে, সে লোণা নদীর জল পেলেও তাই মুখে দেয়। মানুষ মাত্রেই অফুরন্ত পিপাসায় কাতর, কিন্তু কোন্ নদীর জলে সব পিপাসা দূর হবে, তা জানে না। দেহ-নদী তার সাম্‌নে দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে, সে তাতেই ছুটে যায়, দেহের সুখ-ভোগের মধ্য দিয়ে পিপাসার পরিতৃপ্তি অন্বেষণ করে। কিন্তু শত জন্ম দেহের সেবায় কাটিয়ে দিলেও ত' পরিতৃপ্তি নেই। যে নদীতে ডুব দিলে পূর্ণ শান্তি মিলে, সেই নদীর খোঁজ যিনি ব'লে দেন, তিনিই সদ্‌গুরু।

(৬ই ভাদ্র, ১৩৩৯)

গুরুদক্ষিণা

তুমি আমার সন্তান, তোমার গুরুদক্ষিণা ব্রহ্মচর্য্য প্রচার, সংযমের প্রসার ও মনুষ্যত্বের বিস্তার। দীক্ষা পাইয়াছ কিন্তু গুরু-দক্ষিণা দাও নাই। আজ হইতে তাহা দিবার জন্য কঠোর-

তপা এবং কঠোরকর্ম্মা হও। তোমার তপস্যাই তোমার বাক্য ও চেষ্টাকে অপরের পক্ষে অমোঘ করিবে। তোমার উদ্যমই নিতান্ত দুর্মেধা যুবককেও ব্রহ্মচর্য্যের মহিমাতে বিশ্বাসী করিবে। ভগবন্নাম তোমাকে তোমার বল দিবে, ধৈর্য্য দিবে, সাহস দিবে, উৎসাহ দিবে। অবিরত শ্বাসে-প্রশ্বাসে ত্রিলোক-পাবন মঙ্গলময় নাম স্মরণ করিতে থাক এবং সাধন-পূত সদিচ্ছার প্রভাবে চতুর্দ্দিকে অনৈতিকতা-দূষিত বায়ু-মণ্ডলকে শুদ্ধীকৃত কর। (১১ই ভাদ্র, ১৩৩৯)

দীক্ষার অর্থ

মাগো, দীক্ষা নেওয়ার মানে কাণে কাণে একটী মন্ত্র নেওয়া নয়। প্রাণে প্রাণে মন্ত্রকে স্বীকার ক'রে নেওয়াই হচ্ছে দীক্ষা। এমন দিন আসবে, যে দিন কেউ কারো কর্ণে কোনও মন্ত্র শুনিয়ে দেবে না, কিন্তু তার দীক্ষা হ'য়ে যাবে।

(২২শে ভাদ্র, ১৩৩৯)

সার্ব্বজনিক গুরুবাদ প্রয়োজন

ব্যক্তিগত গুরুবাদ একটী সর্ব্বজন-মিলন-বিরোধী আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। অথচ সৎপাত্র থেকে দীক্ষা গ্রহণ সাধন-জীবনের উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। রামের গুরু একজন, শ্যামের গুরু আর একজন, যদুর গুরু একজন, মধুর গুরু আর একজন। ভিন্ন ভিন্ন গুরুর ভিন্ন ভিন্ন রকমের গোঁড়ামি আছে, যে গোঁড়ামিটী ব্যক্তিগতভাবে তাঁর হয়ত ইষ্টনিষ্ঠাবর্দ্ধক;

কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যেরা সেই সব গোঁড়ামিগুলিকে নিজ নিজ জীবনে এমন প্রাণান্ত যত্নে অনুশীলন কত্তে লাগলেন যে, আসল সাধন শিকায় তোলা রইল, কুসংস্কারের প্রাচুর্য্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সঙ্ঘে সঙ্ঘে দারুণ কোলাহলময় কলহ অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠল। এজন্যই প্রয়োজন ব্যক্তিগত গুরু-বাদের স্থলে সার্ব্বজনিক গুরুবাদ। যে ব্যক্তিই যার কাছ থেকে দীক্ষা নিক, গুরু থাকবে সকলের এক। তাহ'লে কলহ ও মতভেদ ক'মে যাবে।

কাঁহারা দীক্ষাদানের যোগ্য ?

দীক্ষা দেবেন তাঁরা, যাঁরা নিজেদের জীবনে উচ্চ আদর্শকে রূপবন্ত কর্ব্বার চেষ্টা কচ্ছেন, গৃহী হউন আর সন্ন্যাসী হউন, নিজ নিজ আশ্রমোপযোগী কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভিতর দিয়ে জন-সমাজ ও জগতের হিতকামনা কচ্ছেন; কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী বা ভক্তিযোগী যাই হোন্, নিজের জীবিকা সংগ্রহের চেষ্টার সাথে সাধক-জীবনের আধ্যাত্মিক উচ্চতার সামঞ্জস্যবিধান কত্তে সর্ব্বদা চেষ্টিত রয়েছেন; পথভ্রান্তকে সুপথে এনে, অলসকে কর্ম্মপথে পরিচালিত ক'রে, অবিশ্বাসীর অন্তরে সাধন-ভজনের বিশ্বাস অনুপ্রবিষ্ট ক'রে, অদীক্ষিতকে দীক্ষা প্রদান ক'রে জীবের অকপট হিতসাধনে চেষ্টিত রয়েছেন, কিন্তু নিজেরা কখনও "গুরু" ব'লে পূজা পাবার ইচ্ছাও করেন না, চেষ্টাও করেন না। ব্যক্তিগত সাধন-সিদ্ধিতে তাঁরা যত বড়ই হ'য়ে থাকুন, নিজেদের

অন্তরে কণামাত্র গুরুভাব পোষণ না ক'রেই যাঁরা দীক্ষা-প্রার্থীকে ও দীক্ষাপ্রাপ্তকে সেবা দিয়ে যাবেন, সাধনে উৎসাহ যোগাবেন, সৎকার্য্যে প্রেরণা দেবেন, অপরের প্রতি প্রেম ও ভালবাসা বিস্তারে সহায়তা কর্ব্বেন, দীক্ষাদানকার্য্য একমাত্র তাঁদেরই করা উচিত। দীক্ষাদান-কার্য্য যদি কারো আর্থিক লাভের বা সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জ্জনের কিম্বা লোক-প্রভাব বর্দ্ধনের উপায়-স্বরূপ করা হয়, তবে দীক্ষাদানের উদ্দেশ্য পঙ্গ হ'য়ে যাবে।

কাহারা দীক্ষা পাওয়ার যোগ্য

শুধু দীক্ষাদাতার মনের ভাব এরূপ হ'লেই চল্‌বে না, দীক্ষা-গ্রহীতারও ভাব অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। দীক্ষাদাতা নিজে যাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি পেয়ে আজ সাধারণ মানবের চেয়ে বড় হয়েছেন, তিনি তাঁরই শক্তি, তাঁরই আশীর্ব্বাদ নবদীক্ষিতের ভিতরে সঞ্চারিত কচ্ছেন। দীক্ষার্থীর মনেও এই ভাব সুস্পষ্ট থাকা দরকার। এই ভাব, সুস্পষ্টভাবে স্পষ্ট হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাকে দীক্ষা দেওয়াই উচিত নয়। একই প্রণালীর সাধন সহস্র সহস্র লোকে কচ্ছ, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দীক্ষাদাতাকে অবলম্বন ক'রে তোমরা শত শত ভিন্ন ভিন্ন দল ও সম্প্রদায় গঠন ক'রে পরস্পর কাটাকাটি কচ্ছ, আত্মীয় আত্মীয়ের গায়ে লাঠি মার্‌ছ, এই অবাঞ্ছনীয় দুর্গতি থেকে যদি সমসাধকদের রক্ষা কত্তে চাও, তা'হলে এই ছাড়া আর পন্থা

নেই। প্রত্যেক দীক্ষার্থীর মনকে আদি গুরুর শিষ্য হবার জন্য তৈরী ক'রে নাও আগে, তারপরে আদি গুরুর প্রতিনিধিরূপে তাঁর আশিস-পূত সাধন-পন্থা অকপটে দীক্ষার্থীকে দান কর। ব্যক্তিগত গুরুপদকে লুপ্ত ক'রে দিয়ে এই ভাবেই তোমাদিগকে সার্ব্বজনিক গুরুবাদকে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে হবে।

(২৪শে ভাদ্র, ১৩৩৯)

দীক্ষা ও শিক্ষা

ঈশ্বর-সাধনকে একটা সুদৃঢ় নিষ্ঠার ভিত্তিতে দাঁড় করাবার জন্যই দীক্ষার প্রচলন। কারণ, অদীক্ষিত ব্যক্তি একটী মন্ত্রসাধনে দীর্ঘকাল লেগে থাকে না, থাকুতে পারে না। দীক্ষিত ব্যক্তি যাতে প্রাপ্ত সাধনে আস্তে আস্তে নিরুৎসাহ ভাব অবলম্বন না করে, তার যাতে নামে রুচি না ক'মে যায়, তার যাতে অধ্যবসায় না প্রদমিত হ'য়ে পড়ে, তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার অর্থাৎ অনুশীলনের। সাধনপথে অগ্রসর ব্যক্তিরা অনগ্রসর ব্যক্তিদের এই অনুশীলনে সাহায্য করেন, করা সঙ্গত বিবেচনা করেন। এই হ'ল শিক্ষার মূল কথা। পরে আস্তে আস্তে এক একটী সম্প্রদায়ের ভিতরে দীক্ষামন্ত্র দানের বা গ্রহণের পরে আবার একটী ক'রে শিক্ষামন্ত্র দেওয়ার বা নেওয়ার প্রথা সৃষ্ট হ'য়ে গেল। এই প্রথা সৃষ্ট হবার মৌলিক প্রয়োজন তৎকালে যাই থাকুক না কেন, মানুষ যেদিন যুক্তি, বিচার এবং প্রত্যক্ষ উপলব্ধির উপরে নিজ সাধন-জীবনকে

প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে, সেদিন এই প্রথার প্রাচীর ভেঙ্গে পড়্‌বেই পড়বে।

সাধনে একনিষ্ঠার আবশ্যকতা

কিন্তু যাঁরা এই প্রথার উপরে বিশ্বাসী এবং নিজ নিজ জীবনে দীক্ষামন্ত্রের পরেও আবার একটী পৃথক্ শিক্ষামন্ত্র গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করেন, তাঁদের নিরস্ত করার জন্য শক্তি-ক্ষয় আমি প্রয়োজন মনে করি না। তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ বিবেকের বাণী শ্রবণ ক'রে পথ চলুন। মাত্র যাঁরা মনে করেন যে, আমার বাক্যই তাদের চাই, অন্য ব্যবস্থার প্রতি তাঁরা দৃক্‌পাত কর্ব্বেন না, তাঁদের জন্য আমার উপদেশ এই যে, একটী মাত্র মন্ত্রের ভিতরেই বাবা ডুবে যাও, দুয়ারে দুয়ারে মন্ত্র চেখে বেড়ালে কোনো লাভ হবে না ; একটী মাত্র সাধনেই নিজেকে আহুতি দিয়ে দাও; শত শত যজ্ঞানলের আঁচ লাগিয়ে জীবন সার্থক হবে না। সাধনে প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী একনিষ্ঠার। সাধন-পথ-চারীর পক্ষে দ্বিচারী বা বহুচারী হবার মত বিপদ আর কিছু নেই।

ভারতীয় জীবনে একনিষ্ঠার মর্য্যাদা

ভারতীয় জীবনে একনিষ্ঠার আদর্শ হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। মন্দোদরী গুণবতী রমণী ছিলেন, কিন্তু একজনেও আমরা তাঁর পূজা করি না, করি সীতার পূজা। কুন্তী বা দ্রৌপদী যত মহত্ত্বই অর্জ্জন ক'রে থাকুন না কেন, তাঁদের নাম শ্রবণ মাত্রই

মাথা কারো শ্রদ্ধায় নত হয় না, তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব বুঝিয়ে অনেক যুক্তিতর্ক অবতারণ কত্তে হয়। কিন্তু সতী, শৈব্যা, দময়ন্তী, চিন্তার নামটী স্মরণ মাত্র বিনা যুক্তিতে বিনা তর্কে আমরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেই। দ্রৌপদী অসাধারণ মেয়ে হ'লেও আমরা নিজেদের একটী মেয়েকেও "দ্রৌপদীর মত হও" এই আশীর্ব্বাদ করি না, আশীর্ব্বাদ করি এই ব'লে যে, "সীতার মত হও, সতীর মত হও।" অহল্যা প্রভৃতি পঞ্চ নারীকে শ্লোকের কাঠামোতে বেঁধে প্রত্যহ বাধ্যকর ভাবে প্রাতঃস্মরণীয় ক'রে রাখা সত্ত্বেও আমরা সীতার মতই মেয়ে চাই, সতীর মতই মেয়ে চাই। এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে এই যে, ভারতীয় জীবনে একনিষ্ঠার মর্য্যাদা অতীব বৃহৎ। শ্রীরামচন্দ্রের জীবন যে আমাদের চোখে এত মহৎ, তার একটা অতীব প্রধান কারণ এই যে, ইচ্ছা করলেই যিনি পত্ন্যন্তর গ্রহণ কত্তে পাত্তেন, যাঁর পিতা দশরথ স্বয়ং একজন বহুপত্নীক সম্রাট, তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পাদন কালে ধাতু-নির্ম্মিত সীতা-মূর্ত্তি দিয়ে কাজ চালালেন, তবু পুনরায় দার-পরিগ্রহের চিন্তা পর্য্যন্ত কল্লে'ন না। ভারতীয় জীবনে একনিষ্ঠার মূল্য এতই অধিক। সমাজ-জীবনেই যদি একনিষ্ঠার এত মর্য্যাদা হ'য়ে থাকে, তবে কি সাধন-জীবনে একনিষ্ঠা অধিকতর মূল্যবান্ ব'লে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়?

(২৭শে ভাদ্র, ১৩৩৯)

গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক

গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক কত দিনের ? নিত্যকালের। যিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে গুরু ছিলেন, আজও কি তিনিই গুরু হ'য়ে এসেছেন ? গুরু বলতে যদি দেহটা বোঝ, তবে নিশ্চয়ই না। গুরু কি পথপ্রদর্শক মাত্র ? পথপ্রদর্শক ত' নিশ্চয়ই, কিন্তু এই-খানেই দাঁড়ি টেনে দিও না। পথপ্রদর্শক কথাটা লিখে তার পরে একটা কমা দাও, যেন ভবিষ্যতে উপলব্ধির কষ্টি-পাথরে যদি এর অতিরিক্ত আর কোনও কথার চিহ্ন পড়ে, তাহ'লে সেই কথাটী যুক্ত ক'রে দেওয়া যায়। (৪ঠা আশ্বিন, ১৩৩৯)

মন্ত্র-বিক্রয়

মন্ত্র-বিক্রয়কারী নাকি নরকে যায় ? যায় বৈ কি ! মন্ত্র যে দেবে, তার নিঃস্বার্থ হওয়া প্রয়োজন। কোনও মন্ত্রগ্রহীতা যদি জোর ক'রে মন্ত্রদাতাকে কিছু অর্থ দেয় অথবা এক ছটাক ডাবের-জল খাওয়ায় ? সেই অর্থ জগতের মঙ্গলজনক কার্য্যে নিয়োগ করাই এস্থলে উৎকৃষ্ট পন্থা। আর মন্ত্রগ্রহীতার প্রদত্ত অন্ন-পানীয় যে মন্ত্রদাতার দেহে আছে, তার কর্ত্তব্য নিজ দেহ জগতের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত করা। মন্ত্রদাতা যদি নিজে চেয়ে অর্থ নেন ? তাতে দোষ কি ? যদি তিনি নিঃস্বার্থভাবে জগতের হিতের জন্য সেই অর্থ প্রয়োগ করেন। যদি তিনি অর্থ নিয়ে নিজের সংসারের পাঁচ রকম প্রয়োজনে ব্যয় করেন ? এই কথার আর কি জবাব দিব বলুন ! অর্থ নিতে হ'লে জগৎ-

কল্যাণের জন্যই নিতে হবে, আত্মপোষণের জন্য নয়। জগতের কোন ব্যক্তির প্রতি যদি বিন্দু-মাত্র আসক্তি থাকে, তবে তার জন্যও নয়, সে এখন যত নিঃসম্পর্কিতই হউক। অনেক সময়ে জগৎকল্যাণের নাম ক'রেও আত্মতোষণই করা হয় যে!

(৯ই আশ্বিন, ১৩৩৯)

গুরুবাদ

দেখ, সাকার-বাদ আর নিরাকার-বাদ নিয়ে যেমন ভারতের সকল ধর্ম্মালোচনাকারীদের এক বিষম সংশয়, গুরুবাদ নিয়েও ঠিক তাই। গুরু প্রয়োজন কি নিষ্প্রয়োজন, গুরু আর পরমেশ্বর এক কিনা, গুরু আর গুরুদত্ত মন্ত্র এক কিনা, গুরু-সেবা কল্লেই সাধন-ভজনের চূড়ান্ত হ'য়ে গেল কিনা ইত্যাদি প্রশ্নে প্রত্যেকের মন সমাকুল। এ বিষয়ে অতীতকালের পূজ্যপাদ আচার্য্যেরা এক এক জন এক এক রকম উপদেশ দিয়ে গেছেন। সেই সব যুগের প্রাচীন উপদেশ বর্ত্তমান যুগে প্রযোজ্য কিনা, এসব সংশয় লোকের বড় বিষম সংশয়।

অখণ্ড-গুরুবাদ

এই সব বিষয় নিয়ে সাধকদের যে সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত যেরূপ হ'য়ে থাকুক না কেন, তোমাদের গ্রহণীয় সিদ্ধান্ত আমি তোমাদের স্পষ্ট ক'রে শুনিয়ে রাখছি। সাধন দিয়ে যদি তোমরা জীবের উপকার কত্তে চাও, নিজের ভিতরে সাধন-বল উপলব্ধি করলে এবং নামের চরণে তোমাদের পূর্ণ আনুগত্য এলে, অনায়াসে তা ক'রো। কিন্তু নিজেদের ভিতরে গুরু-

অভিমান পোষণ কর্ত্তে পারবে না। তোমারও যিনি গুরু, দীক্ষাপ্রাপ্তেরও তিনিই গুরু হবেন, অর্থাৎ পরমমঙ্গলনিলয় শ্রীভগবানকেই গুরু ব'লে জানতে হবে এবং জানাতে হবে, মান্‌তে হবে এবং মানাতে হবে, বুঝ্‌তে হবে এবং বুঝাতে হবে, বল্‌তে হবে এবং বলাতে হবে, ভাবতে হবে এবং ভাবাতে হবে, প্রচার কর্ত্তে হবে এবং প্রচার করাতে হবে। জগতে আর কেউ গুরু নন। নররূপধারী জীবকল্যাণকারী মহতেরা কেউ পুরুষ-দেহে, কেউ বা নারী-দেহে অখণ্ডকে তার সাধনপথের পাথেয় অল্প কিম্বা অধিক দিতে পারেন, কারো কারো বা আধ্যাত্মিক ঋণ হয়ত হবে আবক্ষ আকণ্ঠ আমস্তক, কিন্তু অখণ্ডের গুরু-নিষ্ঠা তাঁদের কারো উপরে হবে না, তার সমগ্র প্রাণের সকল নিষ্ঠা একমাত্র শ্রীভগবানেরই চরণে। তোমরা নিজদিগকে একমাত্র তাঁরই শিষ্য ব'লে মনে কর, তোমাদের দ্বারা দীক্ষিত ব্যক্তি-দিগকেও তাঁরই শিষ্য ব'লে গণনা কর এবং গণনা করাও। ভগবানকে সম্যক্‌ বোধে আন্‌তে যখন না পারো, তখন তাঁর সাক্ষাৎ নাদাত্মক বিগ্রহ অখণ্ড-নামকেই গুরু ব'লে জান্‌বে এবং যখন তাতেও একান্ত অক্ষম হবে, তখন তোমাদের আদি-গুরুকেই সকলের গুরু ব'লে জ্ঞান করবে। দীক্ষাদাতা-দীক্ষিত নির্ব্বিশেষে আর সকলে পরস্পর জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-বিশেষে গুরুভ্রাতা মাত্র থাকবে।

ব্যক্তিগত গুরুবাদের উচ্ছেদ

এ সিদ্ধান্ত দেশ-প্রচলিত বর্ত্তমান বহু মতামতের সঙ্গে এক

নয়। এইজন্য তোমাদের নিষ্ঠা আরোপে ক্লেশ হ'তে পারে। দেশ-কালের প্রভাব অতিক্রম করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব দেখি না। তারই জন্য আমি নিজেকে "গুরু নই" জেনেও তোমাদের গুরু ব'লে অঙ্গীকার ক'রে নিচ্ছি। এই অঙ্গীকার করার মানে এই যে, আমি গুরু হ'লে তোমাদের পক্ষে আমার আদেশ অলঙ্ঘনীয় হবে, তোমরা আমার আদেশ পালনে বল পাবে,—এবং তার পরেই আমি আদেশ কচ্ছি যে, আমার সাধন-মণ্ডলীতে এর পরে তোমাদের মধ্যে কেউ কারো ব্যক্তিগত গুরু হ'তে পার্ব্বে না। একজন আদি-গুরুর প্রতি অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ ক'রে তাঁর প্রতিনিধি স্বরূপে তোমরা জীবকুলের আধ্যাত্মিক কুশল সম্পাদন কর্ব্বে এবং দীক্ষা কাউকে একক দেবে না। পুরুষ-পরম্পরাক্রমে দীক্ষা একটা সুনির্দ্দিষ্ট বিধান মে'নে চল্‌বে, যাতে ব্যক্তিগত গুরুবাদ কিছুতেই না প্রশ্রয় পায়। দীক্ষা পাবে লক্ষ লক্ষ লোক, কিন্তু গুরু হবেন না একজন দীক্ষাদাতাও। (২০শে আশ্বিন, ১৩৩৯)

দীক্ষান্তিক স্বপ্নের অর্থ

দীক্ষার পরে গৃহীত সাধনের অনুকূল নানা আধ্যাত্মিক-ভাব-পরিপূর্ণ স্বপ্ন দেখা দ্বারা দুটি বিষয় সূচিত হয়। একটী হচ্ছে এই যে, দীক্ষা-গ্রহণকারী গভীর একাগ্রতা নিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। আর একটি হচ্ছে, ভবিষ্যতের সাধন-জীবনের উন্নতি সম্পর্কে পূর্ব্বাভাস।

স্বপ্নযোগে সংস্কার-ক্ষয়

কাউকে কাউকে দেখা যায় যে, দীক্ষা নিয়েছেন এক রকম, কিন্তু স্বপ্ন দেখ্‌ছেন আর এক রকম। স্বপ্ন অবশ্য ধর্ম্মবিষয় অবলম্বন ক'রেই হচ্ছে, কিন্তু দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধনের প্রকরণ হচ্ছে এক, অথচ স্বপ্নের ভিতর দিয়ে অন্য প্রকরণের প্রকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন ধর, একজন পেয়েছে ব্রহ্মমন্ত্র, জপ কচ্ছে ব্রহ্ম-মন্ত্র, কিন্তু স্বপ্ন দেখ্‌ল হর-পার্ব্বতীর বিবাহ বা দেবাসুরের সংগ্রাম। এসব স্থলে বুঝতে হবে যে, তার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কালের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সকল প্রচ্ছন্ন সংস্কারগুলি আস্তে আস্তে আত্ম-প্রকাশ ক'রে ক্রমশঃ বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে। সাধনে যদি নিষ্ঠা না টুটে, তাহ'লে এভাবে স্বপ্নযোগে সাধকদের বহু সংস্কার কেটে যায়।

দীক্ষাগ্রহণ, সাধন-করা ও সিদ্ধিলাভ

দীক্ষাগ্রহণ হচ্ছে আত্মসমর্পণেরই শিক্ষাগ্রহণ। সাধন করার মানে নিজেকে ভগবানের পায়ে সঁপে দেওয়ার চেষ্টা করা। সিদ্ধি-লাভ করার মানে হচ্ছে নিজেকে নিঃশেষে ভগবৎ-পাদপদ্মে সমর্পণ ক'রে দেওয়ার চেষ্টায় সাফল্য লাভ করা। (২৫শে আশ্বিন, ১৩৩৯)

দীক্ষা-গ্রহণের স্থান

দীক্ষা-গ্রহণের পক্ষে কোন্ স্থান উৎকৃষ্ট? যে স্থানে মন স্বভাবতঃ শান্ত হয়। যেমন, তীর্থ, মন্দির, আশ্রম, গুরুগৃহ, ভক্ত বা জ্ঞানি-গণের সমাধি।

এই গঙ্গাতীর? ইহাও উত্তম স্থান। এক পাগলকে সেদিন দিয়েছি ব্রহ্মপুত্রের স্রোতোজলে দাঁড়িয়ে দীক্ষা, আজ দেখছি দ্বিতীয় পাগলের পালা। আর একদিন কাউকে দীক্ষা দিতে হবে দামোদরে। (২৯শে আশ্বিন, ১৩৩৯)

ভারতীয় জীবনে গুরু

ভারতীয় আধ্যাত্মিক জীবনে গুরুর স্থান একটা অবিসংবাদিত কৌলীন্যের স্থান। এমন কোনও ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মপথ ভারতে প্রায় নাই, যাহার গোড়ায় গুরুর প্রয়োজনীয়তা খুব দৃঢ়তার সহিত সমর্থিত হয় নাই। অতএব গুরুতত্ত্বের আলোচনা খুব একটা অত্যাবশ্যকীয় আলোচনা, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গুরু কি?—এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন দিক্ হইতে বিভিন্ন প্রকার হইবে। এক এক জনে গুরুকে এক এক প্রকারে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদুচিত ভাবে সদ্‌গুরুতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন।

সহজভাবে আমরা দেখিতে পাই, একজন আর একজনকে না শিক্ষা দিলে যে-কোনও বিষয়ই আয়ত্ত করা কঠিন। ক, খ, শিখিতে পণ্ডিত লাগে, কামারের কাজ, কুমারের কাজ শিখিতে শিক্ষাদাতার প্রয়োজন হয়। সেতার শিখিতে, এস্রাজ শিখিতে, গান শিখিতে, তবলা শিখিতে ওস্তাদের আবশ্যকতা পড়ে।

কিন্তু এমন দুই চারিজন আশ্চর্য্য ভাগ্যধর প্রতিভাবান্ পুরুষ জগতে সকল সময়ে জন্মিয়াছেন, যাঁরা বিনা ওস্তাদে

আশ্চর্য্য তবলা বাজান, সেতার বাজান। একটী বোবাকে আমি দেখিয়াছি, শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত নিজ কৌতূহল-প্রেরিত হইয়াই বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছে। এইরূপ ব্যক্তি দুর্ল্লভ, অতীব দুর্ল্লভ। ইহাদিগকে prodigy (অতিমানুষ-প্রতিভা-সম্পন্ন) বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কৃতিত্বের বৈভব ইঁহারা ভোগ করিতেছেন বলিয়া উক্ত হয়।

এইরূপ অসামান্য অতি দুর্ল্লভ দুই একজন ছাড়া সবাইকে শিক্ষা-লাভের জন্য অপরের নিকট সাহায্য লইতে হয়,—ইহাই গুরুবাদের বাহিরের মোটা ভিত্তি।

সুতরাং সাধারণ বিচারে সাদা চোখে গুরু একজন শিক্ষক ব্যতীত অপর কিছুই নহেন। তিনি যাহা শিখিয়াছেন, তাহাই তিনি অপরকে শিখাইতেছেন, তিনি যে সব কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহাই অপরকে কল্যাণহেতু ধরাইয়া দিতেছেন, তিনি নিজে যে পথে চলিয়াছেন, সেই পথটা দেখাইয়া দিতেছেন। কারণ, যে যে পথে চলে নাই, সে সেই পথ সম্পর্কে উপদেশ দিতে অধিকারী নহে। কলেজে ইতিহাসের এম. এ "ইতিহাস" পড়ান, ফিজিক্স এর এম, এ, "ফিজিক্স" পড়ান। এই দৃষ্টিতে গুরুকে যখন দেখি, তখন তাঁর প্রণামের মন্ত্র—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

এই অবস্থাতেই তাঁর বন্দনা হয়,

"তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিলেন, পথ দেখাইয়া দিলেন, তারপর তাঁর ছুটী।

পথ দিয়া আমি চলিয়াছি। গভীর অন্ধকার। পথও চিনি না, চিনিলেও বিপদের অন্ত নাই, আলো নাই, হাতে লাঠি নাই। কোন্ সময়ে খাদে পড়িয়া মরিব,—ঠিক্ নাই। বাস্তবিক কিছুকাল পরে খাদে পড়িলামও। তারস্বরে চীৎকার করিতেছি উদ্ধারের জন্য,—'যদি কেউ দয়াল থাক, তুলিয়া দাও।' দয়াল একজন মিলিল। তিনি বলিলেন,—'টানিয়া তোমায় তুলিব, কিন্তু বাছা! আমাকে "বাপ" বলিয়া ডাকিতে হইবে।" ইচ্ছা নাই "বাপ" ডাকিব, কিন্তু ঠেকিলে বাঘেও ধান খায়। অগত্যা স্বীকার করিলাম, অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া বাপই ডাকিব। তিনি হাতে টানিয়া তুলিলেন, একটী লাঠি দিলেন, আর একটী বাতি দিলেন,—সুদূরে এক জ্যোতিঃ দেখাইয়া দিলেন—লক্ষ্য। বাতি পাইলাম—নাম, লাঠি পাইলাম—প্রণালী,—পথ চলিলাম—সেই সুদূর লক্ষ্যে তাকাইয়া—এই লক্ষ্য "শ্রীভগবান্"। গুরু কোথায় গেলেন আর কি করিলেন, তাহা আমার খুঁজিবার প্রয়োজন বা অবসর রহিল না। এই অবস্থা—কর্ম্মযোগীর,—তিনি গুরুদত্ত সাধনটাকে প্রধান মনে করিয়া গুরুকে মাত্র পথ-প্রদর্শক বলিয়া গণনা করেন। ইঁহাদেরই প্রণামের মন্ত্র 'তৎপদং দর্শিতং যেন' ইত্যাদি।

কর্ম্মী গুরুদত্ত সাধনটাকেই বেশী আদর করেন। কারণ, গুরুর খোঁজ রাখিবার তাঁর অবসর নাই, অতএব গুরু স্বভাবতঃ কতকটা দূরেই। আর পরব্রহ্ম এখনও লাভ হয় নাই, অতএব লক্ষ্যও অনেকটা দূরে। হাতের মুঠায় রহিয়াছে গুরুদত্ত সাধন, এই সাধনটাকে তিনি সর্ব্বতোভাবে কাজে লাগাইয়া ছাড়িবেন। সাধন করিবার আগে গুরুদেবকে একবার তিনি স্মরণ করিতে পারেন, কিন্তু সমগ্র মন ও প্রাণ তাঁর পড়িয়া থাকে 'সাধনতত্ত্বে'। তান্ত্রিক সাধকেরা কতকটা এই প্রকৃতি-বিশিষ্ট। তাঁরা গুরুকে অনাদর করেন না, কিন্তু সাধনকেই জীবনের চরম চরিতার্থতার পক্ষে সর্ব্বে-সর্ব্বা বলিয়া মনে করেন।

একই গুরু বিভিন্ন শিষ্যের নিকট বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হইতেছেন। একজন গুরুকে পথপ্রদর্শক মাত্র মনে করিয়া, পথটী জানিবার ও পথটী চলিবার দিকেই সমগ্র মন দিলেন। ইঁহার ভিতরে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসের প্রাচুর্য্য এবং নিজ ভবিষ্যৎ নিজে গড়িবার আগ্রহ অত্যধিক। তাই ইনি গুরু-সেবা বলিতে সাধারণ আমরা যাহা বুঝি, তাহার প্রতি কতকটা উদাসীন হইলেও পথটা কি, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া লইতে তাঁর আগ্রহ অফুরন্ত এবং ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অন্ন পরিবেশন করিলে যেমন সে আহারে বিলম্ব করে না, তদ্রূপ গুরুদত্ত পথ বুঝিয়া লইবার পরে এই পথের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে তাঁর আলস্য নাই, ভয় নাই, অবসাদ নাই। তিনি তাঁর পরমপ্রিয়ের স্পর্শ

নিজের মধ্য দিয়া পাইবার জন্য ব্যগ্র, গুরুর মধ্যে নিজেকে বিকাইয়া দিবার রুচি তাঁর নাই। ধনী পিতার উপার্জ্জনক্ষম পুত্রের মেজাজটা তিনি প্রাপ্ত হন। তাঁর বিচার-প্রণালী নিম্নরূপ।

গুরু কে?—না যিনি অন্ধকার দূর করেন। আমার সম্মুখে একটা হ্যারিকেন ল্যাম্প আছে। ইহাই কি অন্ধকার দূর করিতেছে? প্রথমতঃ তাহাই মনে হইবে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, এই হ্যারিকেনের ভিতরে যে অগ্নি রহিয়াছেন, অন্ধকার দূর করেন তিনি। হ্যারিকেন গুরুর দেহ, ভিতরের অগ্নি —পরমাত্মা। পরমাত্মার প্রভা এক একটা নির্দ্দিষ্ট দেহের মধ্য দিয়া অত্যন্ত ভাস্বরভাবে প্রকাশিত হয়, তাই দেহটার আদর! যে লণ্ঠন (অর্থাৎ দেহ) ভাঙ্গা, যার চিম্‌নি (অর্থাৎ মন) অনুজ্জ্বল সেই লণ্ঠনের ভিতরে অগ্নি থাকিলেও আলো বিকীরিত হয় না। তাই দেখা যায়, শাস্ত্রে অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জ, বাচাল, অস্থির-চিত্ত ব্যক্তিকে গুরুরূপে গ্রহণ নিষেধ। ইহার কারণ এই যে, দেহের অপূর্ণতা, লণ্ঠনের ভগ্নতা তন্মধ্যস্থ অগ্নির জ্যোতির্বিকীরণী শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে।

মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণের উপদেশ ইঁহার জন্য। যে পথ চলিলে প্রকৃতই নির্ব্বিঘ্ন-যাত্রা হইবে,—সেই পথ যদি না পান, তাহা হইলে এই শ্রেণীর শিষ্য নিরাপদ পথ পাইবার জন্য গুরু হইতে গুর্ব্বন্তরে গমন করিবেন। যেখানে সহজ-চক্ষে গুরুকে সামান্য মানব বলিয়া মনে হইতেছে,

যেখানে সাধন করিবার পরেও সত্যের আভাস মিলিতেছে না, যেখানে গুরুমুখনিঃসৃত অভয়বাণী মনকে একনিষ্ঠ করিতে পারিতেছে না, সেখানে মধুহীন পুষ্প ছাড়িয়া মধুগর্ভ পুষ্পের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে এই শ্রেণীর শিষ্যকেই এবং এই অবস্থাতেই শাস্ত্র নির্দ্দেশ দিতেছেন। অবশ্য, এইরূপ একস্থান হইতে অপরস্থানে ভ্রমিতে ভ্রমিতে জীবন কাটিয়া যাইতে পারে, সেই বিপদ আছে। কিন্তু এখানে শিষ্যের যুক্তি এই যে, বিপথে চলিয়া পরমাত্মাকে না পাওয়ার চাইতে দুই চারি জন্ম সত্যপথ লাভের আশায় ঘুরিয়া বেড়ান ভাল এবং এই যুক্তির ভিতরে গভীর সত্য যে নিহিত নাই, তাহা নহে।

প্রথমেই ঝোঁকের বশে বা খেয়ালের বশে গুরুকরণ করিলে, এই বিপদ অনেকের পক্ষেই অবশ্যম্ভাবী। চিন্তাপহারক শ্রীগুরুর সাক্ষাৎ লাভের জন্য যেখানে আত্মপ্রস্তুতির অভাব এবং শ্রদ্ধিত চিত্তে সাত্ত্বিক মনে প্রতীক্ষমাণ হইয়া রহিবার শক্তির যেখানে অভাব, সেখানে এইরূপ বিপদ অপরিহার্য্য। তাই, সদ্‌গুরুর (অর্থাৎ যিনি সত্য এবং যিনি গুরু), যাঁর ভিতরে সত্য জাগ্রত হইয়াছেন, এমন গুরুর জন্য অপেক্ষা করিতে হয় এবং তিনি যেদিন আসিবেন, সেদিন যাতে তাঁর জন্য হৃদয়-আসন যোগ্যভাবে পাতিয়া দিতে পারি,—সেজন্য নিজের সরল, সহজ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া যাইতে হয়। ইহাই সদ্‌গুরু লাভের কৌশল।

সদ্‌গুরু বহুপুণ্যে বা তাঁর অহেতুকী কৃপায় লব্ধ হয়। যে ভূমিতে হল কর্ষিত হইয়া আছে, তাহাতে কৃপার বারি ও বীজ পতিত হইলে দেখিতে না দেখিতে রমণীয় শ্যাম-শোভায় পূর্ণ হয়।

দীক্ষাগুরু আর শিক্ষাগুরু লইয়া যে এক দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে বৈষ্ণব-সমাজে চলিতেছে, তার মূল উৎস এই অপেক্ষা করিবার শক্তির অভাবে, নিজেকে সদ্‌গুরুর কৃপার জন্য উন্মুখ করিয়া শবরীর ন্যায় প্রতীক্ষা করিয়া রহিবার ধৈর্য্যের অভাবে এবং আত্মপ্রস্তুতির রুচির অভাবে।

শাস্ত্রে কুলগুরু হইতে দীক্ষা লইবার নির্দ্দেশ আছে এবং পৈতৃক গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া সকলেই কুলগুরু গ্রহণ করিলাম বলিয়া মনেও করিয়া থাকেন। কিন্তু পিতার গুরুর যিনি পুত্র বা কন্যা, তিনি বাস্তবিক প্রস্তাবে হয়ত নিজ জীবনে সত্যের জাগরণ অনুভব না'ও করিয়া থাকিতে পারেন। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে দীক্ষা লইলে প্রকৃত পথ জানিবার জন্য বেচারী শিষ্যের "মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায়" পর্য্যটন করিয়া বেড়ান ছাড়া আর গতি কি থাকিতে পারে?

কিন্তু কুলগুরু শব্দের মানে-ই যে আমরা বুঝি না, কুল্‌কুণ্ডলিনী যাঁর জাগিয়াছে, তেমন গুরু কুলগুরু। তিনি আমার পূর্ব্বপুরুষের গুরু না'ও হইতে পারেন, এমন কি হয়ত আমার পৈতৃক দাস-বংশে তাঁহার জন্ম হইতে পারে। কুল-

কুণ্ডলিনী যাঁর জাগিয়াছে, তিনিই কুলগুরু। তাঁকে গ্রহণই কুলগুরু-গ্রহণ। তাঁকে বর্জ্জনই কুলগুরু-বর্জ্জন।

কুলকুণ্ডলিনী নীচ বংশেও জাগিতে পারে,—যথা, কবীর, দাদু রুহিদাস, স্ত্রীলোকেও জাগিতে পারে, যথা, - মীরাবাঈ, যমুনাবাঈ, রামকৃষ্ণসহধর্ম্মিণী ইত্যাদি। কুলগুরুই গ্রহণীয়, অতএব স্ত্রীলোকের ভিতরে সত্যের জাগরণ ঘটিলে, এই যুক্তির বলেই তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করা যায়। তথাপি শাস্ত্রে স্ত্রীগুরু গ্রহণ নিষেধ আছে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ সংক্ষেপে বলিলে এইটুকুই বলিতে হয় যে,—গুরু শিষ্যের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ মঙ্গলের জন্য দায়ী এবং সর্ব্ব বিষয়ে উপদেশ দিতে বাধ্য ও অধিকারী। সাধক-জীবনের এমন বহু সমস্যা আছে, যাহা পুরুষ-শিষ্যকে সমাধান করিয়া দিতে স্ত্রীগুরুর পক্ষে অসুবিধা হইবে। কারণ, যে ক্ষেত্রে স্ত্রীশিষ্যেরা একমাত্র ভক্তিমার্গানুগামিনী হইয়া সকল চিত্ত-বিপ্লব প্রশান্ত করেন, ঠিক সেই ক্ষেত্রে পুরুষ-শিষ্যের স্বাভাবিক পুরুষোচিত প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট করিয়া দেয়। পৃথিবীর ইতিহাস বহুবার দেখাইয়াছে যে, একটী পুরুষের কামনা-বাসনার ইন্ধন যোগাইতে জগতের কত প্রাণ-হনন হইয়াছে, কত দেশ ধ্বংস হইয়াছে। কোনও নারীর কামনার যজ্ঞে জগৎ এমনভাবে নিজেকে আহুতি দেয় নাই।

সাধক-মাত্রের পরম শত্রু দুর্ব্বার কাম। নারী-শিষ্যারও কাম থাকে,—এমন কি শাস্ত্র ত' নারীর কাম পুরুষের আটগুণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু নারীর সংযম-সামর্থ্যও অষ্টগুণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পুরুষের কাম পুরুষজাতির নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার সুযোগ পাইয়া তার মনকে নিয়ত বিভ্রান্ত করিতেছে! এই বিভ্রম দূর করিবার দায়িত্ব গুরুর। স্ত্রী-গুরু এই দায়িত্ব অতি অল্পক্ষেত্রেই নিঃসঙ্কোচে পালন করিতে পারিবেন। এই আশঙ্কাতেই শাস্ত্র স্ত্রীগুরু নিষেধ করিয়াছেন। নতুবা স্ত্রীগুরুতে গুরুশক্তির বিকাশ হয় না,—তার মধ্যে ব্রহ্মজাগরণ ঘটে না,—ইহা নহে।

কুলকুণ্ডলিনী যাঁর জাগিয়াছে, তাঁর পরীক্ষা লওয়া আর এক জন জাগরণশীল ব্যক্তির পক্ষেই সম্যক্ সম্ভব। সুতরাং শিষ্যের পক্ষে গুরুর কুলকুণ্ডলিনী জাগিল, কি, না-জাগিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু একটী দুইটী সরল সোজা পরীক্ষার উপায়ও আছে। যাঁর সংস্পর্শমাত্র স্বভাবতঃ বিনা উপদেশে চিত্তের নিম্নগামিনী বৃত্তিগুলি থমকিয়া দাঁড়ায়, আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বান অন্তর জুড়িয়া বহিতে আরম্ভ করে, বুঝিতে হইবে, তাঁর কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়াছে। যাঁর সংস্পর্শমাত্র বিনা প্রশ্নে মনের দীর্ঘপোষিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যেন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হইয়া যায়, বুঝিতে হইবে, তাঁর কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়াছে। যাঁর বাহিরের উপদেশ অপেক্ষা ভিতরের শক্তি আমার মধ্যে

অধিক ক্রিয়াশীলা, সত্ত্বভাবের প্রেরয়িত্রী, বুঝিতে হইবে, তিনি কুলগুরু।

কুলকুণ্ডলিনী যাঁর জাগ্রত হইয়াছে, তেমন সিদ্ধ গুরুর স্নিগ্ধ দৃষ্টিই প্রকৃত দীক্ষা,—কাণে মন্ত্র শুনার নামই সকলস্থলে দীক্ষা নহে। গুরুর কুলকুণ্ডলিনী-জাগরণ হইল কিনা,—তার পরীক্ষা এইখানে।

যাহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী মহাশক্তি, তাহাই আমার এই ক্ষুদ্র দেহ-মধ্যে যখন অনুভূত হয়, তখন তার নাম কুলকুণ্ডলিনী। অর্থাৎ পরমাত্মা আর কুলকুণ্ডলিনী একার্থবাচক দুইটী শব্দ। ক্ষুদ্র দেহ-ভাণ্ডে আসিয়া তিনি দেহের প্রভাব মান্য করিতেছেন, যেমন একজন অরণ্যচারী পরম-যোগী গৃহস্থ-গৃহে আসিলে গৃহস্থের পারিবারিক শৃঙ্খলাগুলি কতকটা মানিয়া চলেন!

"পঞ্চ ভূতের ফাঁদে
ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে।"

(রামকৃষ্ণ)

দেহ-মধ্যে ব্রহ্মশক্তি যেন শত-শৃঙ্খল-বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন, তিনি দেহের মনের প্রভু হইয়াও দেহের অভ্যাস ও মনের সংস্কারের কাছে হাত জোড় করিয়া নতজানু হইয়া ভৃত্যের ন্যায় বসিয়া আছেন। ইহাকেই বলে ঘুমন্ত কুলকুণ্ডলিনী।

"ঘুম পাড়াতে মন্দ ছেলে
মা আমার ঘুমিয়ে গেলি।"
(সতীশচন্দ্র)

ঘুমন্ত জননী আদ্যা-শক্তি জগন্মাতা কি ভাবে জাগেন, তাহা একমাত্র সদ্‌গুরুবক্ত্‌ গম্য। কিন্তু যখন জাগেন, তখন দেহের প্রত্যেকটী অণু-পরমাণুকে চুম্বকের শক্তি প্রদান করেন। যিনি দেখিতে কদাকার হইয়াও অব্যক্ত আকর্ষণে আমাকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে টানিয়া নিতে পারেন, তিনিই কুলগুরু। কুলগুরু মন্ত্রদান করিতে পারেন, নাও পারেন,—মন্ত্রই প্রধান নহে, তাঁর অন্তরের তপঃপূত ইচ্ছাশক্তিই প্রধান। তাঁর অভয়প্রেরণা বিনা-উপদেশে শিষ্যের ভিতরে যাবতীয় যোগক্রিয়া, যাবতীয় অনুভূতি, যাবতীয় অতীন্দ্রিয় আস্বাদনকে স্ফুরিত করিয়া দিতে পারে। শিষ্যের আধার কিঞ্চিৎ শুদ্ধ হইলে দর্শন-মাত্রেই সে তার গুরুকে চিনিতে পারে। এস্থলে শিষ্যের গুরুবিচার কর্ম্মি-শিষ্যের মত নহে। তাহা পরে বলিতেছি।

যেখানে গুরুর শুদ্ধ ইচ্ছা শিষ্যের ভিতরের ব্রহ্মচেতনা জাগাইয়া দিতেছে, সেখানে শিষ্যের চোখে দেহটা পড়েই নাই। শিষ্যের মর্ম্মভেদী দৃষ্টি গুরুর পাঞ্চভৌতিক দেহকে অতিক্রম করিয়া ভিতরের স্বরূপ দর্শন করে।

এই স্বরূপ-দর্শনের দুইটা স্তর আছে। এক স্তরে শিষ্য নিজের ভিতরে গুরুশক্তির বিভিন্ন ক্রিয়াকে দর্শন করিতেছে।

ইহাকে সগুণ স্তর বলিব। অপর স্তরে শিষ্য নিজের ভিতরে গুরুশক্তির বিকাশকে দর্শন করিতে করিতে ডুবিয়াছে, তাঁর শক্তিকে তার স্বরূপ হইতে পৃথক্ বলিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছে না। ইহাকে বলিব নির্গুণ স্তর।

সগুণ স্তরে শিষ্য গুরুকে প্রণাম করে, "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেব মহেশ্বরঃ" বলিয়া। নির্গুণ স্তরে শিষ্য গুরুপ্রণাম করে, "গুরুরেব পরং ব্রহ্ম" বলিয়া।

সগুণ স্তরে শিষ্য গুরুকে প্রণাম করে, "যস্মাৎ জাতং জগৎ সর্ব্বং যস্মিন্নেব বিলীয়তে, যেনেদং ধার্য্যতে চৈব"—বলিয়া।

নির্গুণ স্তরে শিষ্য গুরুকে বন্দনা করে,—"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং, দ্বন্দ্বাতীতং" প্রভৃতি বলিয়া।

সগুণ স্তরে শিষ্য কতকটা ভক্তিপন্থী, শান্ত-দাস্যাদি ভাবক্রমে। নির্গুণ স্তরে শিষ্য চরম জ্ঞানযোগী, দ্বৈতভাবে বা অদ্বৈতভাবে। গুরুতত্ত্বের কঠিন স্থানটায় আসিয়াছি। ইহা সঠিক বুঝা কতকটা সাধন-শক্তির উপরে নির্ভর করিবেই।

সগুণ স্তরে শিষ্যের নিকটে গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু মহেশ্বর। ব্রহ্মা কেন বলা হইল? যেহেতু গুরুর সূক্ষ্ম কৃপাশক্তি শিষ্যের ভিতরে এক মস্ত-বড় সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। শিষ্য গুরুর শক্তিকে আধ্যাত্মিক চেতনার স্রষ্টারূপেই প্রথম সময়ে উপলব্ধি করে। ব্রহ্মা বলিয়া একজন

রক্তবর্ণ দেবতা আনিয়া দাঁড় করাইবার প্রয়োজন নাই। গুরুর শক্তি শিষ্যের অন্তরে নব নব সৃষ্টির উন্মেষ ঘটাইতেছে,—কত দিব্য অনুভূতির বীজ পড়িতেছে, কত অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন অঙ্কুর মেলিতেছে, কত অপূর্ব্ব সুষমা-মণ্ডিত বিচিত্রতা মাথা তুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেছে। গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, তারকা সৃষ্টি পাইয়া নিজ নিজ কক্ষে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল, গুরুকৃপায় অন্তরের অনুভূতি-রাজ্য শূন্যময় অন্ধকারের পরিবর্ত্তে জ্যোতির্ম্ময় সৃষ্টিতে পরিণত হইল। সৃষ্টির অনুভূতির চরমে পৌছিলে, এই অনুভূতিগুলিকে পুষ্ট করিবার জন্য গুরুশক্তি ক্রিয়া আরম্ভ করিল। এখানে গুরু পোষক, বর্দ্ধক, পালক। চিত্তের প্রত্যেকটী মঙ্গলময়ী বৃত্তি এখানে গুরুশক্তিতে সুপরিপুষ্ট হইতেছে, প্রবর্দ্ধমান হইতেছে, বিস্তার লাভ করিতেছে। এতক্ষণ গিয়াছে Creation (সৃষ্টি), এখন আরম্ভ হইল Consolidation (সংগঠন),—এখন গুরুশক্তি পোষণী শক্তিরূপে প্রতিভাত ও অনুভূত হইতেছে। অতএব, এই ক্ষেত্রে গুরু বিষ্ণু।

সৃষ্টি থাকিলেই ধ্বংসের প্রয়োজন। ধ্বংস ছাড়া জগতে কোনও সৃষ্টিই হয় নাই। চিত্তবৃত্তির প্রকাশশীল সাত্ত্বিক স্বভাবের যখন সৃষ্টি হইতেছে, ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তের তমঃ স্বভাবের প্রস্ফুরিক বৃত্তিগুলি গুরুশক্তিতে বিনষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনটী তীক্ষ্ণাগ্রবিশিষ্ট

ত্রিশূল নিজ হস্তে সম্পূর্ণ আয়ত্তে রাখিয়া গুরুশক্তি ধ্বংসের তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ করিল। সৃষ্টি-লীলায় চিত্তে সাত্ত্বিক প্রেরণা জাগিয়াছে, ধ্বংসতাণ্ডবে অসাত্ত্বিক কামনা, বাসনা, লালসা, ধ্বংস হইতে আরম্ভ করিল ; সুতরাং "গুরুরেব মহেশ্বরঃ।"

এতক্ষণ শিষ্য সগুণস্তরে ছিলেন। কিন্তু গুরুশক্তির সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-লীলা যখন যুগপৎ প্রত্যক্ষ হইতে আরম্ভ করিল, যখন একযোগে ত্রিধারা আসিয়া সংযুক্ত হইল, ত্রিবেণীর দুয়ার যখন খুলিল, তখন সৃষ্টির ধারা আর ধারা রহিল না, স্থিতির ধারাও আর ধারা রহিল না, সংহারের ধারাও আর ধারা রহিল না—হইল দুস্তর মহাসমুদ্র। যেদিকে তাকাও অফুরন্ত জলরাশি,—গুরুশক্তির মহিমার পারাপার নাই, সীমা নাই, ইয়ত্তা নাই। বাক্য তখন মূক, বুদ্ধি তখন স্তব্ধ, অনুভূতি তখন অনির্ব্বচনীয়। তখনই শিষ্য জানিলেন,—"গুরুরেব পরং ব্রহ্ম"। শিষ্যের জীবনে নির্গুণ স্তর আরম্ভ হইল।

নির্গুণ স্তরের প্রথম অবস্থায় দ্বৈত প্রকাশমান। শিষ্য নিজেকে গুরু হইতে পৃথক্ দেখিতেছেন। তাঁকে পরব্রহ্ম জানিয়াও ডুব দিয়া তাঁর সঙ্গে এক হইতেছেন না।

নির্গুণ স্তরের দ্বিতীয় অবস্থায় অদ্বৈত প্রতিষ্ঠিত। শিষ্য গুরুকে পরব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, নিজে সেই মহা-সমুদ্রে আপাদমস্তক নিমজ্জিত হইয়াছেন এবং নিজেতে ও

গুরুতে অভেদ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। এই শিষ্যকে পরমহংস বলা হইয়া থাকে। আধারই আধেয় কিন্তু চরম অবস্থায় ভেদজ্ঞানরহিত। যাহা বলিতে একযুগ লাগে, তাহা পরমাত্মার কৃপায় সংক্ষেপে এইখানেই আপাততঃ শেষ হউক।

(চৈত্র, ১৩৩৯)

তরুণের দীক্ষার ভাল ও মন্দ

দীক্ষা-গ্রহণ ছোট থাকতেই উত্তম, কেননা, তাতে সাধনের অভ্যাস অতি সহজেই মজ্জাগত হ'য়ে যায়। কিন্তু দীক্ষা-গ্রহণকারী যদি দীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে অসমর্থ হয়, তাহ'লে দীক্ষার পূর্ণ সুফল হ'তে দেরী লাগে। এই জন্যই প্রত্যেক পরিবারের পরিবেশ এমন থাকা দরকার, যেন ছোট কালেই বালক ও বালিকারা দীক্ষার প্রয়োজন, দীক্ষার অর্থ ও দীক্ষার উদ্দেশ্য উপলব্ধি কত্তে পারে।

আসক্তির খেলা

পরিণাম চিন্তা কত্তে গেলে এই মানব-জীবনটা একটা নিতান্তই খেলো জিনিষ, একটা অন্তঃসারশূন্য ক্ষণিকের কুহেলিকা। এই আছে, এই নাই। এই মুহূর্ত্তে সুস্থ, এই মুহূর্ত্তেই অতি ঘৃণ্য ও ন্যক্কারজনক নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত। এই সুখের দোলায় দুল্‌ছ, আবার এই এখনি আচম্বিতে দুঃখের সমুদ্রে ডুবে মরছ। এমন অচিরস্থায়ী, ক্ষণ-পরিণামী জীবনের ভবিষ্যৎ ভাবলে এ জগতের যে-কোনও সুখ-সম্ভোগ-সৌভাগ্যের

উপরেই অনাস্থা আসা উচিত। তবু দেখ, জগৎ জুড়ে কত জন কত কাজই না ক'রে বেড়াচ্ছে। কেউ কুস্তি-কসরৎ কচ্ছে, কেউ বা সার্কাস দেখাচ্ছে, কেউ ঘুড়ি উড়াচ্ছে, কেউ সূদের কড়ি গুণছে, কেউ শাল-দোশালা গায়ে দিচ্ছে, কেউ বা ঘোড়-দৌড়ের মাঠে জুয়ার টিকিট কিনছে। এ সবই হচ্ছে স্রেফ আসক্তির খেলা। আসক্তির ঝোঁকে মানুষ দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হ'য়ে লক্ষ্যহীন মন আর ছন্দোহীন প্রাণ নিয়ে অবিরাম চরকি-বাজীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভগবানে মজা বনাম দীক্ষা

কিন্তু এত ব্যর্থতা, এত নিষ্ফলতা, এত ঘোরা-ঘুরি এবং এত অস্থিরতার ভিতরেও মানুষের জীবন তখনি সার্থক, যখন তার মন সকল চঞ্চলতার ঊর্দ্ধে স্থিত শ্রীভগবানে মজে। ভগবানে ম'জে যাওয়ার জন্যই দীক্ষা। বাইরের সহস্র দুঃখ-সংঘাতের ব্যথা-যন্ত্রণা থেকে নিজেকে সম্যক্ উদাসীন, অনাসক্ত, অস্পৃষ্ট রেখে সরল মেরুদণ্ডে পথ চলার জন্যই দীক্ষা। এই জন্যই দীক্ষা-লাভ জীবনের এক মহৎ সৌভাগ্য। (২৬শে পৌষ, ১৩৪০)

শিষ্যরূপী জানোয়ার

আজকাল শিষ্যেরা গুরুদেবের কাছ থেকে একটা মন্ত্র নিয়ে মনে করে যেন গুরুদেবকে কৃতার্থ ক'রে দিল। তার মত একজন শিষ্য পেয়ে কি অমুক অঞ্চলে গুরুদেবের পসার বাড়ে নি? তার মত একজন প্রতিষ্ঠাবান্ বা কৃতবিদ্য শিষ্য কি গুরুদেব সহজে

পেতেন ? সে যদিও একটা কাণা কড়িও গুরুদক্ষিণা দেয় নি কিম্বা দেবার অভিপ্রায়ও পোষণ করে না, তবু তার মত ব্যক্তি যে গুরুদেবের শিষ্য ব'লে নিজেকে পরিচিত করে, এতেই কি গুরুদেবের মান-মর্য্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নি ? গুরুদেবেরই কি এজন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত নয় ? কোনো কোনো শিষ্য আবার এ'রকমও মনে করে যে, গুরুদেব হিমালয়ে ব'সে বহু বৎসর তপস্যা করলে কি হয়, তিনি এতদিন বনে জঙ্গলে ব'সে যে সত্যকে উপলব্ধি করলেন, শিষ্য ত' এক বছর ঘরে ব'সে সাধন ক'রেই তা উপলব্ধি করেছে, সুতরাং গুরুদেবের শ্রেষ্ঠতা কোথায় ? কোনো কোনো শিষ্য এই রকমও মনে করে,— "গুরুদেব সাধক-পুরুষ হ'লেও আমার মত সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি পড়েন নি, কিম্বা আমার মত, হেগেল, ক্যাণ্ট, স্পিনোজা, স্পেন্সার, মিল, কোম্‌টের মতামত অবগত নন।" কোনো কোনো শিষ্য এই রকম অভিমানও পোষণ করে,— "লোকে গুরুদেবকে মহাপুরুষ ব'লে জ্ঞান কর্লেও আমার মত প্রকৃত ত্যাগী তিনি এখনো হ'তে পারেন নি, তাঁর ত' দেখছি কেবলি বিষয়-লিপ্সা, কেবলি বহির্ম্মুখ শত কাজে রুচি, কেবলি বাহ্য ব্যাপারে আসক্তি।" এই রকম ক'রে জগতে যে কত গুরুর কত রকমের শিষ্যরূপী সব পোষা জানোয়ার আছে, তার ইয়ত্তা নেই। কেউ মনে করে,—"গুরুদেব আমার মন্ত্রদাতা হলেও শিব-পূজা-রহস্য আর গীতার তত্ত্ব আমার মত বোঝেন না।"

কেউ বা মনে করে,—"গুরুদেব ব্যাখ্যান খুব ভাল দিলেও আমার মত কীর্ত্তন কত্তে পারেন না, এই বিষয়ে তিনি আমার চেয়ে নিকৃষ্ট।" কেউ বা মনে করে,—"গুরুদেব অবশ্য আদর্শ-পরিবেশনের কাজে পটু কিন্তু কর্ম্ম-পরিচালনা কি আর আমার মত ভাল রকম জানেন?" কেউ বা মনে করে,—"গুরুদেব আমাদের হিতের জন্য যে সব উপদেশবাণী বলেন, সেগুলি সম্পর্কে তাঁর প্রকৃত তত্ত্বোপলব্ধি কিছুই নেই, কিন্তু আমি যে সব কথা বলি, সবই সম্পূর্ণরূপে তত্ত্বোপলব্ধির সাক্ষাৎ ফল।" মহা-মন্দভাগ্য-বশে গুরুরা এই জাতীয় সব নিকৃষ্ট শিষ্যকে দীক্ষা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই সব অপাত্র শিষ্যেরা একজনও গুরুবাক্য-পালনের জন্য জীবনে কোনও মহান্ ত্যাগ বা বিরাট স্বার্থহানি স্বীকার কত্তে সমর্থ হয় না। নামেই তারা শিষ্য থাকে, কাজে শিষ্য কখনো হয় না।

গুরুদেবের অসতর্কতা

এতক্ষণ ত' শিষ্যদের উপরে খুব এক চোট নিলাম। কিন্তু এর পৃষ্ঠান্তে গুরুদেবদের সম্পর্কেও দু'চারটী অপ্রিয় কথা না ব'লে উপায় নেই। একটী তরুণ যুবককে সরল-বিশ্বাস-পরায়ণ দেখে একজন তাকে একটী মন্ত্র দিয়ে হয়ত গুরু হলেন। কিছুদিন যাবার পর সরল-বিশ্বাসী যুবক নিজের অন্তর্নিহিত আবেগ ও অগ্রগমনোন্মুখ সংস্কারকে তাঁর সঙ্গে বনিয়ে চল্‌তে পারল না। তার মন্ত্র-পরিবর্ত্তন করা দরকার হ'য়ে পড়ল।

নূতন মন্ত্র সে নিল, নূতন গুরুর আশ্রয় সে স্বীকার কল্প', অকুণ্ঠ নিষ্ঠায় সাধন চল্‌ল। তখনও ঐ তরুণ বয়সের গুরুদেব নিজ শিষ্যদের দিয়ে চারিদিকে প্রচার করিয়ে যেতে থাকলেন,—"জান না বুঝি, তোমাদের অমুক আমারই ত' শিষ্য হে।" এক-জন একদা আমার শিষ্য হবার চেষ্টা কচ্ছিল, পরে সে দেখল, আমাকে নিয়ে তার পোষাবে না, সে আমার কাছ থেকে এক মন্ত্র পেয়েছিল, কিন্তু পরে সে এই মন্ত্র পরিত্যাগ ক'রে অন্য গুরুর কাছে অন্য মন্ত্র নিল। এরূপ ক্ষেত্রে তার প্রতি আমার ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত? একজনের স্ত্রী স্বামীকে 'ডিভোর্স' ক'রে অন্য জনের সঙ্গে বিবাহিত হ'লে সেই স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী ভাবা বা বলা যেমন পাপ, একজন অন্য গুরুর আশ্রয় নিয়ে সাধন-পরিবর্ত্তন করার পরে তাকে নিজ-শিষ্য ব'লে পরিচয় দিতে থাকা তেমন পাপ। যাকে তুমি ছেড়ে এসেছ, তাঁর সঙ্গে ভদ্র-ব্যবহার রক্ষা কচ্ছ ব'লেই তাঁর শিষ্যই রয়েছ, এটা একটা অতি ভ্রান্ত যুক্তি।

শাশ্বত গুরু

গুরু অন্ধকার দূর করেন। দ্বিধা, কুণ্ঠা, সঙ্কোচ অন্ধকারেরই রূপান্তর। যাঁকে গুরু ব'লে ভাবতে গিয়ে মন কুণ্ঠায় জড়িয়ে আসে, দ্বিধায় সঙ্কুচিত হয়, যাঁকে গুরু ব'লে ভাবতে বসা মাত্র মন নিজের প্রতি নিজে বিদ্রোহী হয়, যাকে গুরু ব'লে স্বীকার কত্তে মন হয় তিক্ত, বিরক্ত, বিষণ্ণ, কোনও একদিন তাঁর কাছে

ঋণ তোমাকে স্বীকার কত্তে হয়েছিল ব'লেই তাঁকে জনসমাজে তোমার গুরু ব'লে চালিয়ে দিতে হ'লে সেটা ভণ্ডামি। ভণ্ডামি চিত্তে সন্তোষ না দিয়ে দেয় বিক্ষোভ। গুরুর সঙ্গে শিষ্যের যে সম্বন্ধ, তার যথার্থ নির্ণয়ের দুটি মস্ত বড় কষ্টিপাথর আছে। একটী হচ্ছে এই যে, তাঁর স্মরণে, তাঁর মননে, তাঁর দর্শনে, তাঁর স্পর্শনে. বৈকুণ্ঠ লাভ হয়, অর্থাৎ সকল কুণ্ঠা, ভয়, দ্বিধা সঙ্কোচ, দুর্ব্বলতা, সন্দিগ্ধতা, সংশয় নিমেষে দূর হয়ে যায়, নিমীলিত হৃদয়-পদ্ম আনন্দের উচ্ছ্বাসে, উল্লাসের প্রাচুর্য্যে শত-দল বিকশিত ক'রে দেয়, অণ্ডমধ্যস্থ নিদ্রিত গরুড়-পক্ষীর পক্ষ-বিস্তার হয়, অনন্ত নভোমণ্ডলে ডানা খুলে সে নির্ভয়ে সূর্য্যাভিমুখে অভিযান করে। এইটী হ'ল প্রথম। দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, তাঁর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কোনও হেতুবাদ বা যুক্তিকে আশ্রয় ক'রে নয়, তিনি তোমাকে কোনো মন্ত্র দিয়েছেন বা কোনো উপদেশ করেছেন, তাঁরই জন্য নয়। তিনি কোনো মন্ত্র বা উপদেশ তোমাকে না দিয়েও যদি তোমার সর্ব্বসত্তার স্বরূপ হ'য়ে থাকেন, তবে তিনি তোমার গুরু। এই খানেই গুরুর যাথার্থ্য, এইখানেই গুরু শাশ্বত।

আমাকে মানিও না

এই জন্যই আমি তোমাদের সর্ব্বদা বলি, যেদিন বা যে মুহূর্ত্তে দেখবে যে, আমার কথা স্মরণে তোমাদের মনে কুণ্ঠা-হীনতা জাগে না, জাগে ভয়, সঙ্কোচ, জাগে সন্দেহ, সেই দিন

সেই মুহূর্ত্তে তোমরা আমাকে একখানা ছেঁড়া নেকড়ার মতন অনাদরে বর্জ্জন করো। আমি যে তোমাদের গুরু, এই কথাটী যেন লোকাচার মানবার জন্যই না স্বীকার কর। আমি যে তোমাদের গুরু একথা যেন তোমাদের মনের কথাই হয়। যখন আমি সত্যই তোমার গুরু, সেই তখন আমি তোমার জীবনে দুর্জ্জয়, তখন আমার ইচ্ছা তোমার জীবনে ঘটাবে অঘটন, তখন আমি অতি সাধারণ তোমাকে দিয়ে অতি অসাধারণ কাজ করাতে সমর্থ। আর তোমার মনে যেখানে আমার গুরুত্ব সম্পর্কে সংশয়, সেখানে আমাকে নিয়ে জীবনভরা ভণ্ডামির অনুষ্ঠান ক'রে লোকের কাছে তুমি হয়ত ভক্ত-ভাই ব'লে পূজা পেতে পার, কিন্তু তোমার অন্তরের ভাণ্ডার হবে তাতে দিনের পর দিন কেবলই রিক্ত। নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ দিয়ে এ সব আমি অনুভব করেছি, তাই তোমাদের গুরু সেজে আবার তোমাদের পরম কুশলে কারো ব্যাঘাত না ক'রে বসি, তারই জন্য বারংবার তারস্বরে ঘোষণা কচ্ছি, যখই আমাতে কণা মাত্র অবিশ্বাস আসবে, তখনই আমাকে বর্জ্জন ক'রো। তোমাদের জোর ক'রে ধরে রেখে আমার আনন্দ নেই, অন্তরে আর বাহিরে, অন্দরে আর বৈঠকখানায়, গৃহকোণে আর খোলা ময়দানে, নির্জ্জনে আর জন-কোলাহলে যেখানেই আমাকে পাও, যেদিন দেখ্‌বে প্রতি স্থানেই আমাকে স্বীকার করার মধ্যে তোমার অবারিত আনন্দ, সঙ্কোচ কণামাত্রও নেই; সেখানেই তুমি

জানবে আমি তোমার গুরু, সেখানেই আমি বুঝব, তুমি আমার শিষ্য। শিষ্য তুমি হতে চাও না, অথচ তোমার ডর-ভয়-দুর্ব্বলতা প্রভৃতি মনোধর্ম্মের সুযোগ নিয়ে নিজেকে তোমার গুরু ব'লে জাহির করে যাব আর তোমার ঘাড় আমার পায়ের তলায় জোর ক'রে চেপে ধর্‌ব, একে আমি অমার্জ্জনীয় অপরাধ ব'লে মনে করি।

অবতারের দেশ

দেখ্‌রে, এটা অবতার-বাদের দেশ। অবতার-বাদ আর গুরু-বাদ পরস্পর পরস্পরের হাত-ধরাধরি ক'রে চলেছে। একটা মানলেই অপরটা প্রায়-ক্ষেত্রেই এসে যায়। যদি অন্য অবতার তোমার মানতে ইচ্ছা নাও হয়, তবু তুমি তোমার গুরুদেবকে অবতার ব'লে অনায়াসে পূজা সুরু ক'রে দিত পার। তাতে প্রথম কয়েক দিন লোকমতের বাধা দেখা গেলেও তোমার দল পুরু হবার সাথে সাথে সে বাধাও দূর হ'য়ে যায়। তখন তুমি তোমার গুরুদেবকে অবতার ব'লে সকলের দ্বারা পরিপূজিত করারারই জন্য আস্তে আস্তে অন্যান্য লোক-প্রচলিত অবতারদের কিছু কিছু প্রশংসা বা পূজা সুরু কর। এই ভাবে এই দেশে সকল মহাপুরুষেরই অবতার ব'লে পুজিত হবার চমৎকার সুযোগ রয়েছে, যা অন্য দেশে নাই। এ কথা বল্‌লে খুব ভুল হয় না যে, সারা পৃথিবী এক যীশুখৃষ্ট ছাড়া অন্য কাউকে অবতার ব'লে দাঁড় করাবার সুযোগই পেল না, কিন্তু এই ভারতে পুরাণে

দশাবতারের কথা বর্ণিত হয়েছে, কোনো কোনো শাস্ত্রে আরও অনেক অবতারের কথা দেখা যায়, আর আধুনিক যুগে অনেকানেক মহাপুরুষ অবতার ব'লে পূজা পেয়েছেন ও পাচ্ছেন। অধিকাংশ অবতারই বিষ্ণুর অবতার, কেউ কেউ বা শিবের অবতার। এর পরে কেউ কেউ আবার শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার বা শ্রীরামকৃষ্ণের অবতার-রূপেও আত্মপ্রকাশ করেছেন বা কচ্ছেন। এর ভিতরে এই দেশ কোনো অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য দেখতে পায়নি।

প্রতি জনে অবতার হও

এই যে এ-দেশের লোক এর ভিতরে কোনও অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য দেখতে পেল না, তার আসল কারণটা ভেবে দেখছ। পাগলের মাথায় যেমন এক এক সময়ে এক একটা ঝোঁক চাপে, আমাদের দেশের জনসাধারণের এক একটা বিরাট বিরাট অংশে যে এক এক সময়ে তেমন এক জনকে অবতার ব'লে স্বীকার করার, প্রচার করার, পূজিত করান'র ঝোঁক চাপে, তার পশ্চাতে আমাদের দেশেরই এক বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, এ দেশের মানুষই প্রথমে অনুভব করেছিলেন যে, প্রতি জীবই ব্রহ্ম-স্বরূপ, জীবে শিবে ভেদ নেই ; স্রষ্টা ও সৃষ্টির অভেদজ্ঞানই এ ভাবে প্রকারান্তরে অবতারবাদকে এমন ভাবে প্রশ্রয় দিয়েছে, এমন ভাবে বহুপল্লবিত ক'রে তুলেছে। তাই আমি বলি, তোমরা প্রতি জনে নিজ নিজ অবতারত্বকে

প্রাণে প্রাণে অনুভব কত্তে সমর্থ হও। আমাকে গুরু মেনে তোমরা আমাকে আর কি তৃপ্তি দেবে? তোমরা প্রতি জনে এক এক জন বিশ্বগুরু হ'য়ে আমাকে তৃপ্ত কর। (১লা চৈত্র, ১৩৪০)

মন্দির, কুলগুরু ও দীক্ষামন্ত্রের দান

মন্দিরগুলি হিন্দুর ধর্ম্মবোধকে বাঁচিয়ে রেখেছে, এক একটা মন্দিরকে আশ্রয় ক'রে এক একটা মত যেন ঝড়ের মুখে মাথা গুঁজে বেঁচে রয়েছে। তাই, শত শত খণ্ড দেবতার পূজা ক'রেও এঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। ভক্তেরা এক একটা মন্দিরকে আশ্রয় ক'রে যদি না অর্চ্চনা কত্তেন তাহ'লে পরধর্ম্মীদের দুর্ম্মদ 'আক্রমণের মুখে হিন্দুধর্ম্ম ব'লে কোনও একটা জিনিষের অস্তিত্বই থাকৃত না। তাই খণ্ড দেবতার উপাসকদের আমি শত্রুবোধে বিদ্বেষ করি না। এই খণ্ড প্রতিমার উপাসক উপাসিকারা ভুল বা ত্রুটি যাই ক'রে থাকুন, একটা নিমেষেও এই যুক্তিকে অস্বীকার করেন নি যে, ইটই পরম-দেবতা নন; কাঠই পরমদেবতা নন, মাটিই পরম-দেবতা নন, রং রাংতা আর যাই দিয়েই বিগ্রহ গড়ে থাকুন না কেন, যতক্ষণ না প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, ততক্ষণ বিগ্রহ জড় পদার্থই। এই যে জড়ের অতীতে একটা নিবদ্ধ দৃষ্টি, তা'ই তাঁদের বিগ্রহ ভগ্ন হবার পরেও ধর্ম্মবোধকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ভারতের বাইরে অন্য দেশে যাও, দেখ্‌বে নিরাকার উপাসকদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দেখতে না দেখতে তাদের প্রাচীন কালের

পূজা-অর্চ্চনা, দর্শন-শাস্ত্র, দেবতা সব বাতাসে মিলিয়ে গেছে। ভারতে তা যায় নি। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, এই বোধ থেকে ভারতের ধর্ম্মের উৎপত্তি, উপলব্ধি থেকে তার সৃষ্টি, কোনও ব্যক্তি-বিশেষের উপলব্ধিই বিশ্বজনের মনের উপরে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা সেখানে নেই,—এই সত্যকে যে-কেউ নিজে সাধন ক'রে উপলব্ধি কত্তে পারো, এই তার দৃপ্ত ঘোষণা। তাই, এই উপলব্ধিকে অস্বীকার না ক'রে মানুষ যেখানে খণ্ড ভাবে প্রতীকোপাসনায় প্রমত্ত হয়েছে, সেখানে অসির ঝনৎকারে বা সামরিক প্রতাপে তাকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয় নি। এক একটা দীক্ষামন্ত্র আশ্রয় ক'রে এক এক জন খণ্ড দেবতা মানুষের মনে স্থায়ী আসন গেড়েছেন, তাঁকে কোনও প্রকারেই কেউ স্থানচ্যুত কত্তে সফল হয় নি। একটু ভাবলেই অবাক্ হবে যে, কি অদ্ভুত ভাবে মন্দির, কুলগুরু, দীক্ষামন্ত্র এঁরা সবাই মিলে হিন্দুজাতিটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুজাতি

তাঁরা কিন্তু বাঁচার মতন ক'রে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি। কোনও প্রকারে ঝড়ের মুখে বালুতে মাথা গুঁজে যেমন ক'রে মরুভূমিতে উটগুলি বাঁচে, ঝড় না থামা পর্য্যন্ত মাথা আর বালুকার তল থেকে তোলে না, ঠিক তেমনি ক'রে, কবে ঝড় আপনা-আপনি থেমে যাবে, তার প্রতীক্ষায় নিতান্তই অদৃষ্টবাদ আশ্রয় ক'রে প'ড়ে থাকার দ্বারা যে বাঁচা, তাকে ঠিক ঠিক

বাঁচা বলে না। অতএব হিন্দুজাতি ঠিক ঠিক বাঁচার মতন ক'রে বাঁচতে পেরেছে, একথা স্বীকার করা সম্ভব নয়। তাঁর দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের উচ্চতা পৃথিবীর নানা দেশে সমাদৃত হয়েছে, এটাই তাঁর বাঁচার প্রমাণ নয়। বাঁচার প্রমাণ নূতন সৃষ্টিতে। যে হিন্দুজাতি শত শত অনার্য্য জাতিকে শিক্ষা দিয়ে, কৃষ্টির প্রভাবে, সভ্যতার মহিমায়, আর্য্য ক'রে নিজেদের সমকক্ষ ক'রে তুলেছিলেন, তাঁদেরই বংশধর আমরা ঘরের ছেলে-মেয়েদের দলে দলে বের ক'রে দিতেই কেবল লাগলাম, কেউ চ'লে গেলে তাকে আর ফিরিয়ে আন্‌বার কোনও সুযোগই রইল না। আমাদের যোগ্যতা এসে শেষ পর্য্যন্ত এইখানে দাঁড়াল যে, সমগ্র স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন ক'রে ক'রে কেবল পাঁতি দিতে লাগলাম যে, কে কি করলে তাকে সমাজ থেকে বের ক'রে দিতে হবে মাথায় ঘোল ঢেলে, আর নগর-প্রদক্ষিণ করিয়ে, নির্ব্বাসন দিতে হবে গাধায় চড়িয়ে। আমরা বেঁচে আছি, একথা যেমনই সত্য, আমরা বাঁচার মতন ক'রে বাঁচতে পারি নি, একথাও তেমন সত্য। যে সময়ে মিশর, পারস্য, ব্যাবিলোন, অ্যাসিরিয়া, মিট্যানি আদি সুসভ্য দেশের প্রাচীন জাতিরা কেবল প্রত্নতত্ত্বের গবেষণারই বিষয় হ'য়ে রইল, সে সময়ে আমরা এখনও নিঃশ্বাস টানি, পিতৃপরিচয় দেই, একথা যেমনি সত্য, তেমনি আমাদের ক্ষয়শীলতা বাড়তে বাড়তে, আমাদের পঙ্গুত্ব বাড়াতে বাড়াতে আমরা সত্য সত্যই এক মহাবিধ্বংসের শেষ প্রান্তে এসে

দাঁড়িয়েছি, একথাও তেমনি সত্য। কিন্তু এই অবস্থার কারণটা কি? তা আজ তোমাদের ভাবতে হবে।

আমাদের পূজা ব্যক্তিপ্রধান

আমার মতে, তার কারণ হচ্ছে, আমরা ব্যক্তিকে করেছি প্রধান, সমষ্টিকে করেছি উপেক্ষা। সব ব্যাপারে ব্যক্তিই আমাদের তোষণের পাত্র। আমরা মন্দির গড়ি কিন্তু তা কেবল ব্যক্তির প্রয়োজন মিটাবার জন্য, সমষ্টির জন্য নয়। হয়ত আমরা শত জনে মিলেই একটী মন্দির গড়ার অর্থ দিয়েছি, কিন্তু সেখানে আমাদের সকলের হ'য়ে পূজা করেন একটী মাত্র ব্যক্তি, একটী পুরোহিত। প্রসাদ আমরা সবাই নিতে পারি, উৎসবায়োজন আমরা সবাই মিলে কত্তে পারি কিন্তু পূজার বেলায় আমাদের সকলের প্রতিনিধি হ'য়ে একটা মাত্র লোক তার পূজা নিবেদন করেন আর সেই সময়টাতে আমরা কেউ তাস খেলি, কেউ তামাক টানি। আমাদের পূজা একার পূজা, সকলের পূজা নয়, তাই আমরা অত ধর্ম্মচর্য্যা ক'রেও কেবল বেঁচেই আছি, বাঁচার মত বেঁচে থাকতে পারি নাই।

বাঁচার মতন বাঁচার পথ

কিন্তু আজ বাঁচার মত বেঁচে থাকবার আহ্বান এসেছে। এ আহ্বান মহাকালের। যে এ আহ্বান শুনবে না, সে মহাকালেরই ত্রিশূলের আঘাতে প্রাণ দেবে। কাল নির্ম্মম

পুরুষ। ধ্বংসেই তার আনন্দ। যেখানে সৃষ্টির গতিবেগ থেমে গেছে, সেখানে যাতে বিষাক্ত বীজাণুর সৃষ্টি হ'য়ে জগৎ-সভ্যতার দেহে গ্যাংগ্রিণ না জন্মাতে পারে, তার জন্য মহাকাল তার তীক্ষ্ণ ছুরিকা দিয়ে অবর্দ্ধমান অঙ্গকে হাসতে হাসতে কেটে ফেলে দেয়। এই কাজে তার কারো মুখ চাওয়া-চাওয়ি নেই। তাই, আমি নিয়ত তোমাদের বলি, মন্দির গড়, যেখানে পাবে আশ্রয়, আর যেখানে সকলে মিলে করবে সকলের আরাধ্যকে সমবেত হ'য়ে উপাসনা, কে তার কোন্ গুরুর কাছ থেকে কোন্ সাম্প্রদায়িক মন্ত্র নিয়ে সাধন করে, সেই প্রশ্ন যেখানে উঠবে না, আর কে নীচ চণ্ডালাধম, আর কে উচ্চ ব্রাহ্মণোত্তম, তার জিজ্ঞাসার যেখানে অবসর থাকবে না, কে উপাসনা করবে এই একটী মাত্র কথাই হবে যেখানে বিচার্য্য। জগৎভরা হাজার জন গুরু নিজ নিজ তপঃ-প্রতিভার অনুযায়ী ভাবে শিষ্য-দল সংগ্রহ ক'রে ক'রে করুন হাজার হাজার নূতন সম্প্রদায়ের পত্তন, তাতে হবে না তোমাদের জন্য কোনও জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি। যে নামে কারো আপত্তি থাকতে পারে না, যে নাম সকল নামের প্রাণ, যে নাম সকল নামের আধার, যে নাম থেকে সকল নামের উদ্ভব, যে নামেতেই সকল নামের পরিপূর্ণ বিলয়, সেই নামটী মাত্র মনে রেখে সকলকে তোমরা একবার ডেকে বল,—"যতই থাকুক বাইরের ব্যাপারে বিচিত্র পার্থক্য, তথাপি হে সাধক, এস আমার সাথে সাথে

ব'স, এস আমরা সকলে সামগ্রিক ভাবে সমগ্র বিশ্বের কুশলকে ধ্যানে রেখে প্রাণভরা ডাকে ভগবানকে ডেকে দেখি,—ওঁ নির্ম্মলং নিষ্কলং পূর্ণং ভেদবুদ্ধেবিমর্দ্দকম্, হে নির্ম্মল, হে ভেদ-বুদ্ধির বিমর্দ্দক, তোমাকে আমরা প্রণাম করি।" সকল সাম্প্রদায়িকতার আজ মুলোচ্ছেদ এই পথেই করা চাই। কেননা, তা না হ'লে তোমাদের অস্তিত্ব অচির কাল মধ্যেই লুপ্ত হবে। বাঁচার মতন বাঁচার যেমন আহ্বান এসেছে, জেনো বাঁচার মতন বাঁচার পথও তার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে। যদি সাহস ক'রে এপথ ধরতে পারো, মৃত্যু তোমাদের কখনই নেই।

একা বাঁচিবার চেষ্টা

একা বাঁচবার চেষ্টা ক'রে কেউ বাঁচতে পারবে না। সবাই কেবল এতকাল ধ'রে একাই বাঁচতে চেয়েছ, তার ফলে বাঁচবার যোগ্যতা তোমাদের এক কণাও বাড়ে নাই। বাঁচতে হ'লে সকলকে একত্র বাঁচতে হবে। কাউকে বাদ দিয়ে কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে বেঁচে যাবে, সেই কল্পনা পরিহার করো, কেননা, সে কল্পনা কখনও সত্যে পরিণত হবে না। এ যুগ অতি জটিল যুগ, যার জন্যে এযুগের কল্কি অবতারের কল্পনা কত্তে গিয়ে শাস্ত্র-রচয়িতাদের অশ্বারোহী কৃপাণধারী একজনকেই ভাবতে হয়েছে ; এ কাল অতি সঙ্গীণ কাল, যে কালে একটী মাত্র ব্রাহ্মণের ভ্রূকুটির ভয়ে রাজ্যেশ্বর তাঁর সিংহাসন থেকে নেমে

এসে রাজ-মুকুট ঋষির পায়ে ফেলে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস টানে না, যে যুগে সঙ্ঘবদ্ধ বর্ব্বরেরা সঙ্ঘশক্তিহীন দেবপুরুষদের ঘানিতে জুড়ে সরষে থেকে তেল বের করে। এ যুগে একা বাঁচতে চাইলেই বাঁচা যায় না, সবাই মিলে বাঁচার চেষ্টা চাই, আর চাই, বাঁচারই-জন্য মরার জন্য তৈরী হ'য়ে থাকা। কিন্তু তাও একা নয়, কেননা, একা মরলে হয়ত তুমি দুই পাঁচ কি বড়জোর দশ জনকে বাঁচাতে পারবে, কিন্তু তার বেশী নয়। সবাই মরার জন্য প্রস্তুত হ'লে তবে সবাই বাঁচতে পারবে। তাই, তোমাদের জীবনপণই কেবল সামগ্রিক ভাবে হবে, তা নয়, মরণপণও সামগ্রিক ভাবেই হওয়া চাই। তোমাদের মরণ-ভয়কে জয় করার জন্য মৃত্যুরূপা জননীকে তোমরা কত না উপচারে পূজা করেছ, কত তার বিধি, কত তার ব্যবস্থা, কিন্তু মরণভয় তোমাদের যায়নি। যা করেছ, একাই করেছ; যা করেছ, একার জন্যই করেছ। তাই, তোমাদের অকপট সাধনাও মিথ্যা হ'য়ে গিয়েছে। (১৪ই চৈত্র, ১৩৪০)

তুমিই আমার গুরু

প্রশ্ন:—আপনার গুরু কে?

উত্তর:– আমার গুরু তুমি। তোমাকে মন্ত্র দিতে গিয়েই হঠাৎ স্পষ্ট ক'রে অনুভব করলাম যে, আমি যা দেই উপদেশ, তা নিজে পালন কচ্ছি না। তাই থেকে আমার জীবনে এক

অভিনব বিপ্লব এল। সেই বিপ্লবের তরঙ্গতাড়নে আমার অনেক আপোষ, অনেক নিষ্পত্তি ভেসে গেল। সেই বিপ্লব আমাকে বিদ্রোহী ও রণোন্মাদ করল। সেই বিপ্লব আমাকে অজস্র অশ্রুধারে ডুবিয়ে দিল। তাই থেকে আমি আমাকে চিনলাম, তাই থেকে আমি আমার শাশ্বত পথকে ভাল ক'রে ধরার প্রেরণা পেলাম। আমি অখণ্ড-মহামন্ত্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠাকে নিজ জীবনে মেনে নিতে এমন ভাবে বাধ্য হলাম যে, এই মহামন্ত্রকে বাদ দিয়ে আমার চিন্তা-চেষ্টা, জীবন-মরণ সবই অর্থহীন। তাই বল্‌ছি তুমিই আমার গুরু।

অখণ্ডের গুরু-পরম্পরা

প্রশ্ন :—কিন্তু সকল সম্প্রদায়েই গুরু-পরম্পরার পরিচয় দেওয়ার প্রথা আছে। আমাদের গুরু-পরম্পরা-পরিচয় কি হবে?

উত্তর :—তোমাদের গুরু-পরম্পরা-পরিচয় হবে, পরব্রহ্ম, অখণ্ডনাম, স্বরূপানন্দ। এর মাঝখানে আর অন্য কোনও পরিচয়ের তোমাদের পথ নেই।

প্রশ্ন।—আপনার সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, আপনি স্বয়ংসন্ত, নিজ স্বভাবেই পরমহংস, কেউ কেউ বলেন, আপনার অনেক জন গুরু। আমাদের কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে আমরা সঠিক জবাব দিতে পারি না। তাতে লজ্জিত হ'তে হয়।

উত্তর :—তুমি তোমার গুরুতে নিষ্ঠাবান্, এই কথাটুকু যতক্ষণ তোমার পক্ষে সত্য, ততক্ষণ এ সব প্রশ্নের জবাব দিতে পার না ব'লে তোমার লজ্জার কিছু আছে ব'লে মনে করা ভ্রম মাত্র। আমার নিজের জীবন-কথা আমি নিজে কি বল্‌ব, জগতে কেউই বুঝি সাহস ক'রে নিজের জীবনকথা বল্‌তে পারেন না। যীশু, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতিরাও নিজেদের জীবনের সকল কথা ব'লে যেতে সাহস পান নি। তাঁদের জীবনের সবচেয়ে যেটুকু অসাধারণ সময়, সেইটুকু সম্পর্কে নিজেরা কিছুই বলেন নি, ব'লতে বসেছেন অন্য লোকেরা, যাঁরা সেই সময়ে তাঁদের জানেন নি। আমিই বা সাহস ক'রে নিজের সেই সময়কার কথা বল্‌ব কেমন ক'রে? যে সময়ের কথা বল্‌তে ওঁদের মতন মহাপুরুষেরও অসাধারণ অরুচি দেখা যায়, সেই সময়কার কাহিনী সব ব'লে আমি তোমাদের উপরে উৎপাত করব না। তবে, হ্যাঁ, আমার অনেক গুরুর কথা বলেছ ত? সে কথাও সত্য। আমার অনেক গুরু ব'লেই তোমাদের গুরু-পরম্পরা-পরিচয়ের মাঝখানে এঁরা কেউ আস্‌বেন না।

জীবনের বিকাশ-পথে অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

প্রশ্ন :—আমরা আপনার সেই অনেক গুরুদের সম্পর্কেই জানবার জন্য কৌতূহলী হয়েছি।

উত্তর :—তা বলায়ও শত বিঘ্ন। একটী নিমেষের জন্য যাঁর কাছে মনের বিনতি আসে, তাঁর সাথে সঙ্গে সঙ্গে এমন এক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়, যাতে মনের শত শত সহস্র সহস্র জটিল ভঙ্গিমার রং পরণ চলে। তার সম্পূর্ণ বর্ণনা দিতে বস্‌লে কত অসুন্দর কথারও অবতারণা কত্তে হয়। তাই, এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া অতি শক্ত। তবু তুমি জিজ্ঞাসু, তাই যতটুকু সহজ মনে বল্‌তে পারি, বলে যাব। বয়স আমার তখনো আট হয়নি, পিতামহের গৃহে এক জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষকে দেখ্‌লাম। তিনি চলে যাওয়ার পরও মন বড় টান্‌ল। প্রখর রৌদ্রে পুরা এক মাইল হেটে রেল-ষ্টেশানে গিয়ে মহাপুরুষকে আমার যা-ছিল পয়সা-কড়ি, সব তাঁকে দিয়ে দিলুম। মহাপুরুষ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে শুধু তাকালেন। মনে হ'ল, আমাকে যেন কিনে ফেল্‌লেন। বল, ইনি আমার গুরু কি না? এই বয়সেই পিতামহ আমাকে তাঁর মুক্তার মত সুন্দর হস্তাক্ষরে পবিত্র ব্রহ্ম-গায়ত্রী মন্ত্র লিখে দিয়ে বল্‌লেন, "কণ্ঠস্থ কর, পৈতা হ'লে কাজে আসবে।" দুই দিনেই তা মুখস্থ হ'য়ে গেল। রোজই তা আবৃত্তি কত্তে লাগ্‌লাম। বল, পিতামহ গুরু হলেন কিনা? কিছু দিন পরে একজন অতীব প্রাচীন সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এলেন পিতামহের গৃহে। বহু শাস্ত্রালোচনা হ'ল। পিতামহ থেকে, আমরা যাঁরা বালক ব'লে শাস্ত্রের কিছুই বুঝি না, তাঁরা পর্য্যন্ত সকলেই মেনে নিতে বাধ্য হ'লাম যে, ইনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি। পণ্ডিত চ'লে যাবার জন্য

রাস্তায় নেমেছেন, এমন সময় পিতামহের মনে হ'ল যে. পৌত্রকে পৈতার আগেই ব্রহ্মগায়ত্রী লিখে দিয়েছেন কণ্ঠস্থ কত্তে, সেটা ধর্ম্মানুমোদিত হ'ল কিনা, এই ব্রাহ্মণকে তা জিজ্ঞাসা কল্লে হ'ত। তিনি আমাকে বল্লেন,—"যা তো গিয়ে কথাটা জিজ্ঞেস ক'রে আয়।" আমি ছুটে গিয়ে পণ্ডিতকে রাস্তায় পেয়ে জিজ্ঞেস কল্লাম যে, ঠাকুরদাদা ব্রহ্ম-গায়ত্রী লিখে দিয়েছিলেন, আমি পাঠ কচ্ছি, জপ কচ্ছি, ঠিক হচ্ছে ত?" তিনি বল্লেন,—"সর্ব্বনাশ, তুমি যে ভয়ঙ্কর অন্যায় কাজ কচ্ছ! তোমার ঠাকুরদাদাকে এখনি গিয়ে বল যে, একাজ চল্‌বে না।" আমি এসেই ঠাকুরদাদাকে কথাটা বল্‌তে তিনি হেসে উঠ্‌লেন,—বল্লেন,—"কেবল বই পড়েই শাস্ত্রজ্ঞ রে, তত্ত্বকে জানেন নি। যা, আমি বল্‌ছি, আরো বেশী মন দিয়ে ব্রহ্ম-গায়ত্রী জপ কত্তে থাক্। পৈতে যেদিন হয় হবে।" অর্থাৎ পিতামহ কেবল গায়ত্রীটি লিখে দিয়েই ক্ষান্ত হ'লেন না, এতে নিষ্ঠাও বাড়িয়ে দিলেন,—এখন বল, তিনি গুরু হ'লেন কিনা? কিছু দিন পরে হিন্দুর ঘরের ব্রাহ্মণ-ছেলের যেমন ভাবে উপনয়ন-সংস্কার হ'য়ে থাকে. তাই হ'ল। পিতামহ আমার অপর এক ভ্রাতার আচার্য্য হ'য়ে বস্‌লেন. কুলগুরুমশায় এসে আমার আচার্য্য হয়ে বস্‌লেন। নিয়মানুযায়ী যথাকালে তিনি আমাকে গায়ত্রী মন্ত্র মুখে মুখে ব'লে দিতে লাগ্‌লেন, কিন্তু আমি তাঁর আগে আগেই মুখস্থ করা গায়ত্রী ব'লে যেতে লাগ্‌লাম। একই ঘরে ব'সে তিন চার জনের উপনয়ন হচ্ছিল।

পিতামহ ব'লে দিলেন,—"আচার্য্যের আগে আগে বলতে নেই।" তখন আমি কুলগুরুমশায়ের বলার পরে পরে ব'লে যেতে লাগ্‌লাম। তিনিও খুব সন্তুষ্ট হলেন। এখন বল,—তিনি গুরু হলেন কিনা? এর কিছু দিন পরে পিতৃদেবের লোহার কারখানায় একটা দুর্ঘটনা ঘটল। অনেক ওজনের একটা লোহার যন্ত্র উপরে টানান ছিল লোহার শিকল দিয়ে। শিকল ছিঁড়ে সেই লোহাটা পিতৃদেবের পায়ের উপরে প'ড়ে গেল। তিনি গুরুতর ভাবে আহত হ'লেন এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁকে তিন মাসের অধিক কাল শয্যাশায়ী হ'য়ে থাকতে হ'ল। সেই সময়ে পিতার শয্যাপার্শ্বে আমাকে অনেক সময় থাকতে হ'ত। সেই সময় তিনি আমাকে শিখালেন ভগবানের কাছে প্রার্থনা কত্তে। বল্‌লেন,—"পৈতে হয়েছে, ত্রিসন্ধ্যা ত' করবেই, কিন্তু সংস্কৃত মন্ত্রের অর্থ ত' বোঝ না। তাই, সোজা সরল বাংলা ভাষায় ভগবানের কাছে প্রার্থনাও করবে। আর প্রতিদিন ডাইরি লিখবে।" ডাইরি লেখার বিবরণ সব ব'লে দিলেন এবং প্রার্থনার ভাষাও জানিয়ে দিলেন। তার ভিতরে একটী কথা ছিল এই,—"হে ভগবান্, আমাকে সৎসাহস দাও।" এখন বল, বাবা গুরু হ'লেন কি না? এর পরে বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক বল্‌লেন,—"যে কোনও মন্ত্র লক্ষবার জপ কল্লে সিদ্ধি লাভ হয়।" সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা সুরু হ'ল। কৃষ্ণ, রাম, গণেশ, দুর্গা, সরস্বতী থেকে সুরু ক'রে শেষে একেবারে কালী পর্য্যন্ত সব দেবতার নাম

ও তৎকাল-জানিত সকল মন্ত্র লক্ষ বার ক'রে জপ করা হ'তে লাগ্‌ল। কখনো রুদ্রাক্ষ দিয়ে, কখনো তুলসীর মালা দিয়ে, কখনো মাছ-ধরার জালের কাঠি দিয়ে জপ চল্‌তে লাগ্‌ল। কখনো ঠাকুর-ঘরে ব'সে, কখনো লোকভয়ে ঘরের কারে বসে, কখনো নির্জ্জনতার জন্য বনের মধ্যে বাঁশ-ঝাড়ে ব'সে বা শিয়ালের গর্ত্তে ব'সে জপ চল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু সব মন্ত্রই গিয়ে ক্রমে ক্রমে প্রণবে পরিণত হ'তে লাগ্‌ল। প্রণবই যে সর্ব্বমন্ত্রের সমাহার, প্রণব থেকেই যে সকল মন্ত্রের সৃষ্টি, প্রণবেই যে সকল মন্ত্রের লয়, একথা তখন জানতে পারি নি বা বুঝতে পারি নি, কিন্তু এক এক মন্ত্র বা নাম ধ'রে জপ সুরু হত, লক্ষ জপ পার হ'য়ে যেত, তখন হঠাৎ দেখতুম প্রণবই জপ কচ্ছি, অন্য মন্ত্র আর নেই। এই সময়টায় আমার প্রথম জীবনের গুরুগিরি সুরু হয়। ননীলাল কুণ্ডু, তারাপদ দত্ত, বঙ্কিম মজুমদার ইত্যাদি এই সময়কার সব শিষ্য-দল আমাকে ঘিরে বসেছে, তারাও যে যেমন পাচ্ছে সাধন ক'রে যাচ্ছে। এই সময়কার এমন অনেক জীবন্ত ব্যাপার হয়েছে, যা সাধারণের বিশ্বাস করা কঠিন। তাই, সে সকল কথা কেউ কখনো জানবে না, সেই সময়টায় আমার পিতা ও পিতৃব্যের কাজে-কর্ম্মে ব্যবহারে সর্ব্বদা কত কত অলৌকিক শক্তির খেলা দেখে হাজার লোক হচ্ছে চমৎকৃত, তাই, আমার অভিজ্ঞতায় নিজের ঘটনা যা যা এসেছে, তাকেও আমি নিতান্ত স্বাভাবিক ব'লেই মনে কত্তাম। তাতে

আমার মনে কোনও উদ্বেগ বা উল্লাস সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু একটা জিনিষ এই এসে দাঁড়াল যে, আমার বৈদিক সন্ধ্যার মন্ত্র-তন্ত্র, বাংলায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার মহাবাক্য, সবই একসঙ্গে চলে গেল, রইল শুধু এই মহামন্ত্র প্রণব, যাঁকে ছেড়ে দিলে আমার অস্তিত্বই থাকে না। এখন বল ত' সেই স্কুলের মাষ্টার মশাই আমার গুরু কিনা? বয়স বেড়ে চলেছে, সাধু-পন্থে নেমে গেছি, কিন্তু মনের ভিতরে এক অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা আমাকে পীড়া দিচ্ছে। এই রকম নিঃসঙ্গতা-বোধ এলেই মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা কত্তে চায়। অবশ্য দীক্ষার প্রয়োজন আমি অনুভব করিনি। কিন্তু এই সময়ে এক গৃহী সাধক এসে নিজে সেধে আমার সঙ্গে আলাপ জমালেন। মিষ্টি কথা-বার্ত্তায় প্রাণ নরম হ'ল। তাঁকে প্রেমপূর্ণ পত্রাদি লিখ্‌তে আরম্ভ কল্লাম। কিছুদিন পরে তাঁর সঙ্গে হাওড়াতে বলদেও-পাড়াতে মিলন হ'ল। তিনি আমাকে মন্ত্রাদি দেবার আগেই দেখলাম তাঁর শিষ্যদের কাছে আমাকে তাঁর শিষ্য ব'লে পরিচয় দিলেন। মনটা একটু সন্দিগ্ধ হ'ল। কিন্তু পরদিন ভোর সময়ে স্নান সেরে আসতেই তিনি বল্‌লেন,—"বস ত' সামনে।" বস্‌লাম। বল্লেন,—"চোখ বোজ ত।" বুজলাম, তাঁর উদ্দেশ্য কিছুই ধারণা কত্তে পারি নি। তিনি আমার কাণে এক মন্ত্র দিয়ে বল্লেন,—'তোমার দীক্ষা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে মনটা হ'ল বিদ্রোহী। দীক্ষা ত' আমি চাই নি, দীক্ষার ত' আমার দরকার

নেই। একি উৎপীড়ন। কিন্তু তবু মন্ত্র ত' ভালবেসেই হয়ত দিয়েছেন, হয়ত আমার ভালর জন্যই দিয়েছেন। তাই, মনকে কোনও-প্রকারে প্রবোধ দিয়ে মনের আপত্তির মধ্য দিয়েই সেই মন্ত্র জপতে লাগলাম। এখন বল, ইঁনিও গুরু হলেন কি না? এই সময় থেকেই আমার দ্বিতীয় স্তবকের গুরুগিরি আরম্ভ হ'ল। তোমরা আমার সেই সময়ের শিষ্য। কিন্তু তোমাদের মন্ত্র দিতে গিয়ে দেখি আমার এই নূতন গুরুদেবের দেওয়া মন্ত্র তোমাদের দিতে অক্ষম হ'য়ে যাচ্ছি। আমার সেই আবাল্যের সাধনার ধন ছাড়া অন্য জিনিষ দিতে আমার মন কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়েছে। অথচ তোমাদের দীক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি ক'রেই তোমরা আমার কাছে এসেছ। আমি সেই গৃহী সাধকের দেওয়া মন্ত্র নিজেও বর্জ্জন কর্লাম, তোমাদের মধ্যে দু-একজনকে সেই মন্ত্র দিয়েছিলাম ব'লে তা' আবার বদ্‌লে নূতন ক'রে অখণ্ডমন্ত্র দিয়ে বল্লাম, আগের সব মিথ্যা, অখণ্ডমন্ত্রই মন্ত্র, বাকী সব নিরর্থক। আমার দ্রোহভাবে মহাপুরুষ রুষ্ট হ'লেন। তিনি ভাব্‌লেন এবং তাঁর চেয়ে অনেক বেশী ভাব্‌লেন তাঁর অনুগত শিষ্যগণ, যে আমাকে তাঁর শিষ্য ব'লে দাবী করা তাঁর শাশ্বত অধিকার; আমি ভাবলাম তাঁকে গুরু ব'লে প্রচার করা আমার অমার্জ্জনীয় মিথ্যাচার। কোথায় তিনি আমাকে উৎপীড়ন করেছেন, আমার অঙ্কুর-জীবনের শিকড়ের দিকে না তাকিয়ে হঠাৎ একটা মন্ত্র দিতে গিয়ে আমার জীবনতরুর আসল

মূলটাকে কোথায় আঘাত করেছেন, তার ফলে সত্যই যে আমার হৃৎপিণ্ড থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ হচ্ছে আর আমাকে মরণ-যন্ত্রণা দিচ্ছে, একথা তিনি বুঝতে অক্ষম। আর, জীবনের অভিক্ষা-ব্রত যাঁর কাছে পাই নি, সঙ্কীর্ত্তনের হরিওঁ-মহাসাধন যাঁর কাছ থেকে আসে নি, পবিত্র-প্রণব-মহামন্ত্র যিনি আমাকে দেন নি, তাঁকেই জীবনের ধ্রুবতারা ব'লে কেন স্বীকার কত্তে হবে, আমি বুঝতে অক্ষম। উপকারের ঋণ, ভালবাসার ঋণ, স্নেহের ঋণ আমার অন্তর স্বীকার করে, তাঁর প্রাপ্য ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দিতে আমার কুণ্ঠা নেই, কুণ্ঠা তার চাইতে বেশী জিনিষ দিতে। কি বিদ্‌ঘুটে অবস্থা! ভদ্র মন চায় আপোষ কত্তে, ঝগড়ায় কাজ কি? বিপন্ন বিপর্য্যস্ত বিত্রস্ত মন চায় ছুটে পালাতে,—সে আপোষের প্রস্তাবকে গ্রহণের অযোগ্য ব'লে জ্ঞান করে। এমনি এক মহাদুঃখকর ধর্ম্মসঙ্কটে প'ড়ে গেলাম। ক্ষুদ্র-বৃহৎ কতকগুলি ঘটনা যেন দাবানল জ্বালিয়ে দিল। উভয় দিকেই কতকগুলি অতীব অসুন্দর ব্যাপার ঘটে গেল। কিন্তু পৃথিবীর সকল ব্যাপার নিয়ে আপোষ চলে, অন্তরের গূঢ়তম সাধন নিয়ে আপোষ চলে না। এখানে আপোষ করার মানে অপমৃত্যু। এখানে আপোষ করার মানে সেই শৈশবের গায়ত্রী-জপ থেকে সুরু ক'রে উদ্ভিন্ন যৌবনের সকল প্রাপ্তিকে অস্বীকার করা। এখানে আপোষ করার মানে নিজেকে নিজে প্রবঞ্চনা করা। তিনি ভেবেছিলেন যে, আমাকে তাঁর কাছে দীক্ষা

নিতে ইচ্ছুক ভেবে তিনি মন্ত্র দিয়েছেন, আমি বুঝেছি যে, তিনি আমার মনের কোমল ভাবের সুযোগ নিয়ে অনিচ্ছুক অবস্থায় হঠাৎ দীক্ষা দিয়েছেন। এই কথাটা ধ'রেই বিরাট মনোমালিন্য সৃষ্টি হ'য়ে গেল। মন্ত্রটা পাবার পরে তাঁকে সেবা দেবার খুব চেষ্টা করেছি, মন যাতে তাতে বসে, তার জন্য মন্ত্র-দাতার সাথে হৃদ্যতার উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু হায়, অশান্তির দাবদাহে প্রাণ ত' আর বাঁচে না। তাঁর স্নেহ-পরায়ণ চিত্তটীর কথা ভেবে তাঁকে মহাসমাদরে অন্তরে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি, আর ভিতর থেকে বিক্ষোভের অগ্ন্যুৎপাত চতুর্দ্দিকে লাভাপ্রবাহ প্রবাহিত ক'রে আমাকে গন্ধকের ধোঁয়ায় অস্থির করে, দহনের জ্বালায় অধীর করে। তিনি যে মন্ত্র দিয়েছিলেন, অতীতে সেই মন্ত্র আমি কখনো জপি নি, তাই একে অনাবশ্যক ব'লে, মনে কত্তে পাচ্ছি না, আল্লা জপেছি লক্ষবার, গড্ জপেছি লক্ষবার, কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ কিছু বাদ যায়নি, তন্ত্রসার দেখে দেখে বীজমন্ত্রও অনেক এক ধার থেকে জপেছি, কিন্তু নূতন পাওয়া এ মন্ত্রটা নয়। তাই এর আবশ্যকতা একেবারে অস্বীকার কত্তে পাচ্ছি না, কিন্তু জীবনের অতীত অভিজ্ঞতা, জীবনের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন, জগতের সম্পর্কে নিজ কল্পনার ভাবী মানচিত্র, এ সব কিছুরই সঙ্গে এ মন্ত্রের মিলন-সাধন সম্ভব হচ্ছে না। জোর ক'রে মনকে যত বেশী নত কত্তে চাই, মন তত বেশী ক'রে ঘাড় বাঁকিয়ে প্রতিবাদ করে। আমার পিতৃদেবের

একটা গান আছে,—"কে আমায় পরিয়ে দিল প্রীতির এমন কণ্ঠমালা ; এ যে, রাখ্‌তে নারি, ফেল্‌তে নারি, বল্‌গো একি হ'ল জ্বালা।" আমার অবস্থা তাই হ'ল। স্নেহ, ঋণ, কিছুই অস্বীকার কত্তে পাচ্ছি না। দেবাসুর-সংগ্রামে প্রাণ ক্ষত-বিক্ষত হ'তে লাগ্‌ল। এ বিপদ থেকে আমার কি উদ্ধার নেই ? কোথায় যাই, কোথায় গেলে এই অপ্রার্থিত দীক্ষারূপ রাক্ষসীর হাত থেকে রক্ষা পাই। কেঁদে বুক ভাসিয়েছি,---"হে পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা কর। মহাপুরুষ ব'লে জগতে আমার কোনও পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। আমি কেবল শিষ্যলোভাতুর হ'য়ে নিজেকে কপট শিষ্য সাজিয়ে বহু জনকে শিষ্য ক'রে অফুরন্ত ভণ্ডামি নিজের সঙ্গে করেছি। হে পরমাত্মা, আমাকে তুমি মুক্তির পথ ব'লে দাও। আমাকে তুমি রক্ষা কর।" পশুবলে বলাৎকৃতা রমণী যেমন ক'রে আর্ত্তনাদ করে, আমার প্রাণে তেমন হাহাকার, তেমন চীৎকার চলেছে। রেলে চড়ি, কেবল কাঁদি ; পথ চলি, কেবল কাঁদি ; নির্জ্জনে বসি, কেবল কাঁদি। হায়, আমার উপায় কি ? এ সূর্য্য-গ্রহণের কি রাহুমুক্তি নেই ? যে দীক্ষালাভকে আমার জীবনের পক্ষে আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করেছি, অপ্রার্থিত ভাবে তাই এসে প'ড়ে আমাকে এত অশান্তিতে দগ্ধ কর্ব্বে, একথা কে আগে জানত ? হঠাৎ ভগবান্ মাতৃ-মূর্ত্তিতে আমার অন্তরে স্নিগ্ধ সাজে ফুটে উঠ্‌লেন। তখনি ট্রেণ ধরলাম। ছুটে গেলাম সেই গৃহে, যেই গৃহ পরিত্যাগ ক'রে

চলে এসেছি। গর্ভধারিণী জননী-দেবীর চরণে পতিত হয়ে কেঁদে বললাম,--"মা, আমাকে এই দীক্ষা-সঙ্কটে রক্ষা কর।" মা হেসে বল্লেন,—"ভয় কি, তুমি আমার চিরকালের মাতৃভক্ত সন্তান, আমি তোমার মনের কাঁটা খুলে দিব।" তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বর। আমি গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে এক গণ্ডূষ জল হাতে নিয়ে মহাপুরুষের দেওয়া আমার সেই অসহ্য মন্ত্র বহুবার জপ ক'রে চিরতরে তাকে জাহ্নবী-সলিলে বিসর্জ্জন দিলাম, যেন স্বপ্নেও সে আর আমাকে উৎপীড়ন না কত্তে পারে। তার পরে মা আমাকে আমার প্রাণের আরাধ্য অখণ্ড-মহামন্ত্র দিয়ে দিলেন। এই ভাবে প্রাণে আমার কতকটা শান্তি ফিরে এল। এখন বল ত', মা আমার গুরু কিনা? এ ভাবে মন আমার অনেকটা শান্ত হ'য়ে এসেছে, এমন সময় প্রেরণা পেলাম দশনামী সন্ন্যাসীর সম্রাট ও প্রণব-মন্ত্রের সিদ্ধ-সাধক মহা-মণ্ডলেশ্বর জয়েন্দ্র পুরীর চরণ দর্শন করার। অনেক অন্বেষণের পরে হরিদ্বারে তাঁর দেব-দুর্ল্লভ দর্শন লাভ হ'ল। এবার স্বেচ্ছায় তাঁর অনুগত হলাম। তিনি আবার আমাকে ঐ প্রণব মন্ত্রই শোনালেন। অন্য মন্ত্রদাতার প্রতি মনের যে বিদ্বেষ, যে শত্রুতার ভাব, যে আক্রোশ এসেছিল, তা এখন একেবারে দূর হ'য়ে গেল। প্রাণে শান্তি এল, অন্তরের উদ্বেগ গেল, দ্বিধা-আড়ষ্টতা পালাল। এল আমার তৃতীয় পর্ব্বের গুরুগিরি। লক্ষ্য এখন একমাত্র ওঙ্কার, সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে,

উর্দ্ধে, অধোদেশে, দেহে, মনে, প্রাণে, আত্মায়, ভাষণে, গানে, জীবনের ইতিক্রমে আর স্বপ্নের বিলাসে, সব শুধু ওঙ্কার ; দ্বিধাহীন দ্বন্দ্বহীন নিঃসংশয় ওঙ্কার। এখন বলত' বাবা, ইনি আমার গুরু হ'লেন কিনা ?

দীক্ষার প্রয়োজন ছিল না

দীক্ষার প্রয়োজন ছিল না। ছিল প্রয়োজন সৎসঙ্গের, সদুপদেশের, সদুৎসাহের এবং সংপ্রেরণার,—মন্ত্রদীক্ষার নয়। তবু কেমন ক'রে একটা দীক্ষা হ'য়ে গেল, তাই পর পর তিনটা দীক্ষা দিয়ে সকল ব্যাপারের হ'ল সংশোধন। এমন বিচিত্র ও দুঃখপূর্ণ যার দীক্ষা-জীবনের ইতিহাস, তার আবার গুরু-পরম্পরা কেন ? ব্রহ্মাণ্ডের সকলের জীবনই কি একটা নির্দ্দিষ্ট ধরা-বাঁধা গণ্ডীর ভিতর দিয়ে গতানুগতিক ভাবেই চলবে ? এই গতানুগতিকতার শৃঙ্খল কেটে দেবার ক্ষমতা কি ব্রহ্মাণ্ড-পতির নেই ?

দীক্ষার লক্ষ্য

আমার নিজের জীবনের এই নিবিড় দুঃখ তোমাদের সম্পর্কে আমাকে বড় হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছে। এই জন্যই এখন আর আগের মত তোমরা দীক্ষার্থী হ'য়ে এলেই আমি উল্লসিত হই না। এই জন্যই আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, আমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখে তোমরা নিঃসংশয়িত হয়েছ কি? যে-কোনও প্রকারে মহামন্ত্র কাণের ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে রুচি পাই না।

এই জন্যই তোমাদের প্রতিজনকে জিজ্ঞাসা করি, তোমরা পুরুষ হ'লে পিতামাতার, স্ত্রীলোক হ'লে স্বামী ও অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে এসেছ কি না। এই জন্যই দীক্ষাদানের পরে তোমাদের প্রত্যেককে এই একটী কথা স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিতে আমার কখনো ভুল হয় না যে, দীক্ষিত হ'য়েই অন্যান্য গুরুর শিষ্যেরা যেমন ক'রে নিজেদের গুরু-ভাই ও গুরু-ভগ্নীর সংখ্যা বাড়াবার জন্যে আদা-জল খেয়ে লেগে যায়, তোমরা তেমন ক'রো না। তোমরা দল বাড়াবার জন্যে চেষ্টিত হবে না, একথা আমি অভ্রান্ত ভাষায় ব'লে দিই। সমগ্র জগৎ বরং অদীক্ষিত থাকুক, তবু যেন দীক্ষা নেবার পরে দ্বিধায়, কুণ্ঠায়, দ্রোহে আর অশান্তিতে আমার মতন ক'রে আর কেউ দগ্ধ না হয়, এমন ক'রে অন্তরের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ কেউ না করে। দীক্ষার লক্ষ্য শান্তি এবং নিষ্ঠা,—সেই শান্তি, সেই নিষ্ঠাই যেন সবাই পায়।

গুরু-পরম্পরার তাৎপর্য্য

গুরু-পরম্পরার একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। তা হচ্ছে Continuity of the same ideal—একই ধারার ও আদর্শের ক্রমাবগমন। তাই, তোমাদের গুরু-পরম্পরা-পরিচয় হবে, পরব্রহ্ম—অখণ্ড-নাম—স্বরূপানন্দ। পরব্রহ্ম থেকেই অখণ্ড-নামের প্রকাশ, অখণ্ড-নামের আশ্রয়েই স্বরূপানন্দের বিকাশ। তোমরা অন্য কোনও গুরু-পরম্পরাই স্বীকার ক'রো না। কেননা তা কত্তে গেলেই তোমাদের আদর্শের মধ্যে বিরাট

বিরাট সব ওলটপালটের সৃষ্টি হবে এবং একমাত্র প্রণবমন্ত্রকে পরমোপাস্য জেনে সকল মতের সকল পথের সকল সাধকের জন্য একত্র মিলনের যে পবিত্র মঞ্চ তোমরা ধীরে ধীরে গ'ড়ে তুলছ এবং অতি সুনিশ্চিত ভাবে যে মঞ্চের সুদৃঢ় বিস্তার দিনের পর দিন হচ্ছে, তা দেখ্‌তে না দেখ্‌তে তা হ'লে ধ্বসে যাবে। অখণ্ড-তত্ত্বের ভিত্তিতে সমগ্র ভারতেরই মাত্র নয়, সমগ্র এশিয়ারই মাত্র নয়, সমগ্র বিশ্বের নানা ভিন্নপন্থীকে যাতে তোমরা একত্র পেতে পার, তার জন্য তোমাদের সমবেত উপাসনাতে আমার প্রতিচিত্র বর্জ্জন কত্তে পর্য্যন্ত আমি নির্দ্দেশ দিয়েছি, আর প্রতিচিত্র যদি ব্যবহৃতও হয়, তবে তারও ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি ক'রে কৃতিত্বের দাবী তোমাদের জন্য নয়, সর্ব্ব-সম্প্রদায়কে এক স্থানে এনে মিলাবার কৃতিত্বের দাবীই যেন তোমরা কত্তে পার। তাই, তোমাদের গুরু-পরম্পরা-পরিচয় হচ্ছে—পরব্রহ্ম—অখণ্ডনাম—স্বরূপানন্দ। অন্য কোনও গুরু-পরম্পরাই তোমরা স্বীকার কত্তে পার না, কেননা তা কত্তে গেলেই তোমাদের নানা বিষয়ে নানা আপোষ-রফার প্রয়োজন ও তাগিদ এসে যাবে, যাতে ক'রে তোমাদের সামগ্রিক আদর্শ টুকুরো টুকুরো হ'য়ে বিনাশ প্রাপ্ত হবে। কোনও সুবিধার প্রত্যাশাতেই তোমরা সেই আপোষের পথে পাদচারণা ক'রো না। সমূহের হিতের জন্য তোমাদের সাধনা, তোমাদের ত্যাগ সমগ্রের বিকাশের জন্য, তোমাদের মন্ত্র সমগ্রের মন্ত্র। তার

নিষ্কলুষতা বজায় থাকা দরকার—আমার কোনও জিদের মান রাখার জন্য নয়, সমগ্র ভারতের প্রাচীন সাধনার অস্তিত্ব রক্ষারই জন্য। চারিদিক থেকে বিকট মৃত্যু বিরাট মুখব্যাদান ক'রে আর্য্যসাধনাকে গ্রাস করার জন্য ছুটে আসছে। তোমাদের সৃষ্টি তাকে কার্য্যতঃ প্রতিরোধ ক'রে নিখিল বিশ্বকে অমৃতের আস্বাদন দেওয়ার জন্য, যে অমৃত এক জনে চাখতে গেলেই নিখিল বিশ্বকে ভাগ দিয়ে আস্বাদ কত্তে হয়, যে অমৃত বিতরণের কালে অসুর ব'লে কাউকে বঞ্চনা করা চলে না। তোমাদের সৃষ্টি বিরাট ঐতিহাসিক প্রয়োজনে, ব্যক্তির মুক্তিটুকুর জন্য নয়। তোমাদের সৃষ্টি সমষ্টির এক বিরাট বিপুল বিশ্বরূপ-ধারণের প্রয়োজনে, ব্যষ্টির ব্যক্তিগত তত্ত্বোপলব্ধির বা রসাস্বাদনের প্রয়োজনে নয়। তোমাদের প্রয়োজন বৃহৎ, তাই তোমাদের গুরুপরম্পরা পরব্রহ্ম থেকে শুরু, তাই তোমাদের গুরুপরম্পরার অখণ্ডনামের মধ্য দিয়ে বিকাশ। (১৭ই চৈত্র, ১৩৪০)

দীক্ষা, গুরু ও দীক্ষার বাজার

তুমি দীক্ষালাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। অধিকাংশ সাধকেরই পক্ষে দীক্ষালাভ ভগবানকে পাইবার জন্য অত্যাবশ্যক ব্যাপার। এই জন্যই ভারতের প্রায় ধর্ম্মগুরুরাই দীক্ষার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং প্রায় সকল মতাবলম্বী সাধকদের পুরাণ-কথাতেই বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাধকদের কি ভাবে দীক্ষা লাভ হইবার পরে

ভগবল্লাভ হইয়াছিল, তাহার বিস্তারশঃ বর্ণনা দেখা যায়। তাঁহারা যেই উদ্দেশ্যে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত আমার মতামতের কোনও বিশেষ বিরোধ নাই। কিন্তু আমি অতিরিক্ত একটা কথা তোমাকে বলিতে চাহি যে, দীক্ষা না নিয়াও যদি তুমি একনিষ্ঠ প্রযত্নে ভগবানকে একই নিয়মে একই রীতিতে একই অধ্যবসায়ে বৎসরের পর বৎসর যুগের পর যুগ ডাকিয়া যাও, তাহা হইলে ভগবান্, দীক্ষা পাও নাই বা নাও নাই বলিয়া, তোমাকে উপেক্ষা করিবেন না। তোমাকে উদ্ধার করা, তোমাকে দর্শন দেওয়া, তাঁহার স্নেহের কোলে তোমাকে তুলিয়া লইয়া বিগতমোহ করা যে তাঁহারই নিজের এক বিরাট প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই তিনি খেলায় খেলায় এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া বসিলেন। তাই দীক্ষা নেওয়াটার উপরে এত বেশী গুরুত্ব আরোপ না করিয়া তাঁহাকে ডাকার উপরেই যাবতীয় গুরুত্ব আরোপ কর। তাঁহাকে ডাকটাকেই প্রধান বলিয়া জান। তাঁহাকে ডাকা না-ডাকার উপরেই সব নির্ভর করিতেছে, তাহা জানিয়া, দীক্ষা পাও নাই বলিয়া মনের যে অবসাদ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা দূর কর।

আরও একটা বিষয়ে আমি তোমাকে খোলাখুলি কয়েকটা কথা বলিতে চাহি। আমার নিকটেই তোমাকে দীক্ষা লইতে হইবে, ইহার কোনও মানে নাই। আমা অপেক্ষা যোগ্যতর মহত্তর উন্নততর মহতের সাক্ষাৎকার পাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব

কিনা, তাহা দেখ এবং তাহার জন্য যত কাল সঙ্গত প্রতীক্ষা বা পর্য্যটন কর। যাঁহাকে দেখিলাম. তাঁহারই কাছ হইতে একটা দীক্ষা নিয়া বসিলাম, যাঁহার নাম লোকমুখে খুব শুনিলাম, তাঁহারই পিছে পিছে দীক্ষার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইলাম, ইহা এক মারাত্মক সৌখিনতা। জগতে অনেককে এই সখের মাশুল বড় কড়া হাতে গণিয়া গণিয়া দিতে হইয়াছে। আমাকে দেখিয়া তোমার ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই আমি তোমার গুরু হইবার যোগ্য, ইহা তোমাকে কে বলিল ? আমার মুখের কথায় বড়ই মধু, ইহার জন্য তুমি আসিয়া আমার শিষ্য হইবে. ইহা কোন্ দেশী সদ্‌যুক্তি ? বিবাহ করিবার আগে যেমন পাত্র বা পাত্রীকে মানুষ বহু বার বুঝিতে চেষ্টা করে, এবং একটা ভুল সম্পর্ক স্থাপন করিয়া শেষে না জীবন ভরিয়া অনুতাপের যন্ত্রণায় কাঁদিতে হয়, তাহার জন্য যতটা সম্ভব সতর্ক হয়, দীক্ষার ব্যাপারে তেমন অথবা তাহার শতগুণ সতর্কতার প্রয়োজন। আমাকে ভাল লাগে, ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা করে, বেশ ত', যত ইচ্ছা ভক্তি-শ্রদ্ধা কর। হুট করিয়া আমাকে একেবারে গুরুর আসনে বসাইয়া দিয়া তাহার পরে মনকে কেবলই আঁখি-ঠার দিয়া দিয়া শাসন করিয়া চলিতে হইলে, তাহার বিপদ কিন্তু কম নহে।

সাধারণতঃ আমি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া থাকি। শেষ রাত্রিতে জাগিয়া কাজ করা আমার আট বছর বয়স হইতে অনুশীলিত অভ্যাস। নিদারুণ ভ্রমণাদি ক্লেশে পিষ্ট না হইলে

সাধারণতঃ গ্রামের কোনও লোকই আমার আগে শয্যাত্যাগ করেন না। শেষ রাত্রে উঠিয়া যখন পূর্ব্বাকাশের পানে তাকাই আর প্রায়োদ্‌ভিন্ন উষার সৌন্দর্য্য উপভোগ করি, তখন সকলের আগে আমার যে কথাটা মনে হয়, তাহা হইতেছে এই যে, পথ-প্রদর্শন করিতে গিয়া যেন কাহাকেও সংশয়ে না পরিচালিত করি। পৃথিবীতে গুরুর অভাব নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, তোমাদের ন্যায় দীক্ষার্থীরও অভাব নাই। দীক্ষা-প্রার্থনার চাহিদা খুব বেশী, তাই দীক্ষাদানের দোকানও সাজিয়াছে সহস্র সহস্র। কিন্তু কে বিচার করিয়া দেখিয়াছে যে, দীক্ষাদাতা সকল সময়েই দীক্ষাপ্রার্থীর মঙ্গলের জন্যই দীক্ষা দান করিয়াছেন, না, অনেক সময়ে তিনি অপরের উপরে অনায়াসে কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আগ্রহেই লোককে দীক্ষা দান করিবার সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করিতেছেন? যখন দেখি, একই সন্ন্যাসি-গুরুর দুই শিষ্য বা একই গৃহি-গুরুর দুই পুত্র একই ব্যক্তিকে বা একই পরিবারের লোকগুলিকে নিয়া টানাটানি করিতেছে, তখন দীক্ষাদাতার উদ্দেশ্য-মধ্যে নীচ স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছু আছে বলিয়া বিশ্বাস করিব কি করিয়া? যখন দেখিতে পাই যে, একই ব্যক্তিকে বা পরিবারকে দীক্ষিত করিবার জন্য একই সঙ্গে তথাকথিত গুরুদেব আর তথাকথিত শিষ্যের মধ্যে "টাগ্-অব-ওয়ার" বাঁধিয়া গিয়াছে, তখন ইহাকে নিছক ব্যবসায় ছাড়া আর কি নাম দিব? তোমাদের কাহারই দীক্ষা ছাড়া কিছুতেই

ভগবদ্দর্শন হইবে না বলিয়াই ভগবানকে পাওয়াইয়া দিবার বাজারে এত দালালি। একজন মহাপুরুষ কাহাকেও দীক্ষা পালটাইয়া নূতন করিয়া তাহাকে দীক্ষা লইতে বাধ্য করিলেন। কেন? না, তাহা না হইলে যে এই ব্যক্তির ভগবদ্দর্শন হইবে না। শিষ্য আসিয়া দুদিন আগে যাহাকে দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন, গুরুদেব নামে পরিচিত মহাপুরুষ আসিয়া সব জানিয়া শুনিয়াও তাহাকে ধরিয়া আবার আর একটা মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া গেলেন। কেন না, জীবোদ্ধারই ত' তাঁহার সুমহৎ ব্রত! সমগ্র ভারত জুড়িয়া এই কাণ্ড চলিতেছে। মহাপুরুষ শিষ্য-দেব যাঁহাকে দীক্ষা দিয়া গিয়াছেন দুদিন আগে, মহাপুরুষ গুরু-দেব আসিয়া তাঁহারই পুত্র-কন্যাদের দীক্ষা দিয়া দিয়া নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং সম্পত্তির চৌহদ্দী বাড়াইয়া গেলেন। এ কথা তিনি বলিতে পারিলেন না, তোমাদের গুরুদেব আসিলে তাঁহার কাছ হইতেই দীক্ষাটা নিয়া নাও। কেহ বা ভয় প্রদর্শন করিয়া, কেহ বা প্রলোভন দেখাইয়া, কেহ বা মধুর বচন বলিয়া, কেহ বা শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া, কেহ বা নিজ জীবনের অসাধারণ অলৌকিক ব্যাপার সমূহ নিজে বলিয়া বা অনুগত-জনদের দ্বারা বলাইয়া, কেহ বা দেশ-বিদেশে ভ্রমণের কৃতিত্বে গর্ব্বগরিমা জাহির করিয়া, কেহ বা নিজ গুরুদেব বা পিতৃদেবের মহিমা গাহিয়া গাহিয়া এ ভাবে অপরের শিষ্যকে নিজের শিষ্য করিবার জন্য অসাধারণ অধ্যবসায় প্রয়োগ করিতেছেন। ইহারই নাম দীক্ষার বাজার।

তুমি সেই বাজারে ঢুকিতে যাইতেছ। শোণপুরের মেলায় গরু কিনিতে গিয়া যেমন করিয়া ক্রেতা নাস্তানাবুদ হয়, দীক্ষার বাজারে দীক্ষা পাইতে গিয়াও শিষ্যের তেমন প্রতি পদে নাস্তানাবুদ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। তাই আমি বলি, দীক্ষা কাহার কাছ হইতে নিবে, তাহা এখনই স্থির করিয়া ফেলিবার দরকার নাই। যেই ভগবানের জন্য তোমার দীক্ষা হয়ত প্রয়োজন, তাঁহাকে বারংবার কাতর প্রাণে প্রাণের নিবেদন জানাইতে থাক, তোমার প্রতীক্ষার ফলে তোমার সর্ব্বাভীষ্ট-প্রপূরক যেন তোমার কাছে এমন ভাবে আসিয়া আবির্ভূত হন, যাহার পরে আর দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোন অবসর থাকে না। দীক্ষা নেওয়াটা খুব বড় কথা নয়, দীক্ষা নিবার আগে সাধন করিবার জন্য নিজেকে সর্ব্বতোভাবে তৈরী করিয়া রাখাই বড় কথা। ক্ষেত্রে বীজ বপনের চেয়ে বড় কথা হইতেছে, বীজটী বপনের পরে যাহাতে সত্যই অঙ্কুরিত হইতে পারে, তেমন ভাবে তাহাকে হলকর্ষণ করিয়া পাট করিয়া, নিষ্কণ্টক করিয়া, নিস্তৃণ করিয়া রাখা।

দীক্ষা আমি কত হাজার লোককে দিয়াছি। আরও কত লক্ষ লোককে হয়ত দিব। তাই, তোমাকে দীক্ষা দিয়া ফেলাটা আমার কাছে একটা কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু দীক্ষা নেওয়াটা তোমার পক্ষে অহিতকর না হয়, সত্যই দীক্ষা তোমার জীবনের পরম সম্পদ আহরণের সহায়ক হয়, তাহারই জন্য আমার

দুশ্চিন্তা অধিক। আমার বরং দুই চারি হাজার শিষ্য কম হইল, তথাপি যেন আমার কাছে আসিয়া শেষে কেহ অনুতাপের অশ্রুধারায় বক্ষ না সিক্ত করে।

আমি বড় সরল মনে, বড়ই অকপট অন্তরে তোমার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। ইহা হইতে কোনও অনাবশ্যক দুঃখ আহরণ করিও না।

গুরুগিরির উল্লাস ও দায়িত্ব

এ প্রশ্ন অবশ্যই তুমি করিতে পার যে, হাজার হাজার লোককে যিনি দীক্ষা দিয়াছেন, তিনি তোমারই দীক্ষার প্রসঙ্গে কেন এত কথার অবতারণা করিতেছেন। তাহার জবাব এই যে, এক দিন দীক্ষা দিতে গিয়া কতই না উল্লাস অনুভব করিতাম, সে কথা আমার স্মরণে জাগিয়া আছে। দীক্ষা নিয়া শিষ্য নির্ভয় হইল কিনা, তাহার অপেক্ষা আমার নিজের তৃপ্তি কতটা হইল, তাহাই আমার বেশী লক্ষ্য করিবার বস্তু ছিল। মন্ত্র নিয়া শিষ্য আমাকে মানিবে কিনা, আমাকে গুরু বলিয়া অন্তরে উপলব্ধি পাইল কিনা, তাহা অপেক্ষা আমি যে তাহার গুরু হইলাম, ইহাই আমার অধিকতর তৃপ্তিপ্রদ হইত। যদিও সেই দিনও ছল-বল-কৌশলের দ্বারা কাহাকেও শিষ্য করিবার জন্য চেষ্টা করি নাই, তথাপি কেহ যদি কাণের কাছে বসিয়া পরামর্শ বা ইঙ্গিত যোগাইত যে, একবার একটা লোকের কাণে কোনও প্রকারে একটী মন্ত্র ঢুকাইয়া দিতে পারিলেই, আজ না

হউক কাল সে অনুগত হইবেই হইবে, তাহা হইলে সেই উপদেশ, ইঙ্গিত বা পরামর্শকে একেবারে গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করিয়া দিবার মতন মনোভাব আমার ছিল না। গুরুগিরি করিয়া আমি হইতাম উল্লসিত, শিষ্য-নামধারী ব্যক্তিগণের মনের অবস্থা কি হইত, তাহা আমার জানিবার প্রয়োজন ছিল না। সেই যুগ ভগবানের কৃপায় অতি তাড়াতাড়িই অতিক্রান্ত হইয়া চলিয়া যায়। তাহার পর হইতে আমি দীক্ষাদানের মধ্যে আমার নিজের উল্লাসকে আর খুঁজিয়া দেখি নাই, দেখিয়াছি দীক্ষিতের অন্তরের উল্লাসকে। তাই, সেদিন হইতে বলিতে সুরু করিয়াছি, দলে দলে তোমরা দীক্ষা নিতে ত' আসিতেছ, তোমরা আগে তোমাদের প্রকৃত কুশল কোথায়, তাহা বিচার করিয়া ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। ইহার ফলে কত জন আমার দোকানে তৈরী মাল থাকিতেও আমার দিতে-অনিচ্ছা দেখিয়া অন্য দোকানে গিয়া পেট ভরিয়া মিঠাই-সন্দেশ খাইয়াছে, অন্যত্র দীক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমি মনে কোনও বেদনা অনুভব করি নাই। গুরুগিরির দায়িত্ব আমাকে অধিকতর ধীরগামী করিয়াছে। অনেকের মনোভাব এইরূপ দেখা যায় যে, তাঁহার দ্বারা যদি জগতের উদ্ধার না হয়, তবে তিনি জগতের উদ্ধার চাহেন না। আমার মনোভাব ইহার বিপরীত। আমার দ্বারা যদি জগতের উদ্ধার না হইয়া অন্য শত শত অপর ব্যক্তির দ্বারাও হয়, তাহা হইলে আমি সেই শত

শত ব্যক্তির নিকটে অন্তরে অন্তরে চিরকৃতজ্ঞতার বাঁধনে বদ্ধ থাকিব। জগতের উদ্ধারই আমার প্রয়োজন, আমি নিজেই ব্যক্তিগত ভাবে তাহার নিমিত্ত হইলাম কি না, ইহা আমার নিকটে অতি তুচ্ছ কথা। তাই আমি তোমাদের দীক্ষা নিতে আসিবার আগে শত-বার পরীক্ষা, প্রতীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিতে নির্দ্দেশ দিতে আনন্দ পাই। সরলতার পথকে আমি জানি প্রকৃত নিরাপত্তার পথ। আমি তাই তোমাদের কাছে সরল মনে সকল কথা লিখিলাম।

গুরুমূর্ত্তি ধ্যানের ভিত্তি কোথায়

দীক্ষা নিবার পরে গুরুদেব তোমাকে মুখে বলিয়া দিন আর না দিন, তোমার দেশের সাধক-গোষ্ঠীসমূহের বহু-শতাব্দী-সঞ্চিত স্বাভাবিক সংস্কার-বশে তোমাকে শ্রীগুরুমূর্ত্তি ধ্যান করিতে হইবে। আমি বলিব, আমাকে ধ্যান করিও না, অন্য একজন গুরুদেব বলিবেন, তাঁহাকে ধ্যান করিতেই হইবে, এই যে গুরুদেবদের উপদেশের মধ্যে পার্থক্য, তাহাতে দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধকের সাধনসিদ্ধির পথে গুরু-ধ্যানের আবশ্যকতার পার্থক্য হইবে না। গুরু-মূর্ত্তি ধ্যান গুরুদত্ত নামে নিষ্ঠাবর্দ্ধনে এতই সহায়ক যে, অনেক অতি কঠোর-যুক্তিবাদী গুরুও শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যাপারটায় নিজেদের মতামতের গোঁড়ামি পরিহার করিয়া শিষ্যকে গুরুমূর্ত্তি ধ্যানে প্রশ্রয় দিয়াছেন। সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনের মুখে সাময়িক পত্রে সংস্কারকেরা যত কড়া কড়া

নিবন্ধ-প্রবন্ধই এই সম্পর্কে লিখিয়া থাকুন না কেন, তাহা দ্বারা প্রকৃত সাধকদের উদগ্র যাত্রাপথের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন নাই। অর্থাৎ ইচ্ছায় অনিচ্ছায় গুরুমূর্ত্তি ধ্যানটা প্রকাশ্যে বা গোপনে প্রতিটি সাধন-গোষ্ঠীর মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে। এই একটী মাত্র খুঁটির জোরেই প্রতিটী নূতন পুরাতন ধর্ম্মসাধনগোষ্ঠী নিজের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া যাইতেছে। এই একটী মাত্র খুঁটির জোরে ডাণ্ডাধারী দীক্ষা-দাতারা ঘরে ঘরে যাইয়া জোর করিয়া লোককে দীক্ষা দিয়া যাইতেছেন এবং মনে মনে আশ্বস্ত হইতেছেন যে, আজ কিম্বা দশ বৎসর পরে গুরুর মূর্ত্তিটী ইহাকে ধ্যান করিতেই হইবে। এই একটী মাত্র খুঁটির জোরে স্থানে স্থানে প্যাণ্ডাল সাজাইয়া বিরাট হোমযজ্ঞাদির আয়োজন করিয়া লোককে আকৃষ্ট করিয়া সাধু দর্শনার্থীকে ভিতরের ঘরে পাঠাইয়া সঙ্গে সঙ্গে আচম্বিতে তাহার কর্ণে এক মন্ত্র ফুৎকার করিয়া দিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে,—‘দীক্ষা তোমার হইয়া গেল।” ভারতের কোনও কোনও প্রদেশে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীরা সরলা নিরীহা গ্রাম্য-বালিকার হাত ধরিয়া টান দিলেই যেমন সে মনে করিয়া বসে যে, তাহার সেখানেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ঠিক তেমনি এই ভাবে মন্ত্র নেওয়া হইয়া গেলেই শতকরা নব্বই জনেই মনে করিয়া বসে যে, দীক্ষা সত্যই বুঝি হইয়া গেল। ইহাই হইতেছে ইহাদের খুঁটি। একবার মনে যদি ছাপ পড়িয়া যায় যে, দীক্ষা হইয়াছে,

তাহার পরে হাজার হও তুমি নাস্তিক বা সন্দেহবাদী, একদিন না একদিন গুরুদেবটীর মূর্ত্তি তোমাকে ধ্যান করিতেই হইবে। ইহাই ইহাদের খুঁটি। এই জন্যই ভয়প্রদর্শন, প্রলোভন-বিস্তার, কৌশলাবলম্বন ইত্যাদি কোনও উপায়কেই ইঁহারা অসদুপায় মনে করেন না। আমার পুণ্যশ্লোক পিতামহের গৃহে এক সাধুবেশী অতিথি আসিয়া মাসাধিক কাল অন্নধ্বংস করার পরে একদিন খাইতে বসিয়া আবদার ধরিলেন যে, আমার খুল্লতাত যদি না সস্ত্রীক তাঁহার কাছ হইতে দীক্ষা নেন, তাহা হইলে তিনি অন্নগ্রাস গ্রহণ করিবেন না। খুল্লতাত হাসিয়া বলিলেন,—"বেশ ত', দীক্ষা নিব। আহার ত' আগে করুন।" তিনি আহার করিয়া উঠিবার পরে খুল্লতাত তাঁহার বিছানাপত্র ও অন্যান্য জিনিষ সব রাস্তায় নিয়া রাখিয়া আসিয়া তাঁহাকে বাহিরে নিয়া বলিলেন,—"আর এ গৃহে নহে, অন্যত্র যাও।" কিন্তু অতিথিকে খুশী করিবার জন্যও যদি দীক্ষা সেখানে নিতেন, তাহা হইলে একদিন না একদিন তাঁহার মূর্ত্তি ধ্যান করিবার মতন প্রয়োজন-বোধ আসিয়া যাইত। বিবাহে যেমন বালিকার সম্মতি নেওয়া সঙ্গত, দীক্ষাতেও তাহাই। কিন্তু অসম্মতিতেও বিবাহ দিয়া দিলে বালিকা যেমন তাহা বাধ্য হইয়া মানিয়া লয়, দীক্ষার ব্যাপারে ভারতীয় মনে সেই রকম একটা বদ্ধমূল দুর্ব্বলতা রহিয়া গিয়াছে, যাহার সমর্থনে যুক্তির জোর কিছুই নাই, আছে প্রথার দাসত্ব। আবার, গুরুমূর্ত্তি

ধ্যানে নিষ্ঠা আসে, এই অকাট্য সত্যটীকে উড়াইয়া দেওয়া যায় নাই বলিয়াই গুরুদেবেরা শিষ্যদের উপরে অপ্রতিহত ক্ষমতা লইয়া বিরাজও করিতেছেন। এই একটী মাত্র কারণেই বারংবার বলা হইয়াছে যে, নাম, নামী ও নামদাতা এই তিনে মিলিয়া এক, একই এই তিনটীতে বিভক্ত হইয়া প্রপঞ্চের জগতে শিষ্যকে ভবপারে ভেলা ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছেন। এই জন্যই বলা হইয়াছে, গুরুতে মানুষ-বুদ্ধি করার মতন অপরাধ নাই, তাঁহাকে ইষ্ট, অভীষ্ট, পরমেষ্ট, সর্ব্বাধিপতি এবং ইহ-পর-জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়া জানিতে হইবে।

দীক্ষা একটা নিতে গেলেই এই সকল অবস্থা আসিয়া পড়ে। সবল, প্রবল, তেজস্বী মন এই সকল আরোপিত কথার সহিত বাস্তবের যতক্ষণ না মিল পায়, ততক্ষণ অস্বীকার করিবার চেষ্টা করে, ইহা লইয়া তাহার মনে বিষম কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সূচনা হয়, অন্ধকারে লড়াই করিতে গিয়া নিজেরই অস্ত্রাঘাতে নিজেই ক্ষতবিক্ষত হইয়া যখন সে সংগ্রামের সামর্থ্য হারায়, তখন মনকে প্রবোধ দিয়া বলে যে, প্রমাণিত না হইলে কি হয়, উহাই প্রকৃত সত্য, অতএব আমি বৃথাই এতকাল যুদ্ধ করিয়া করিয়া হয়রাণ হইলাম, এখন আমার বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণই কর্ত্তব্য। বাস্, ইতি হইয়া গেল, দেশপ্রচলিত গুরুবাদের বিজয়ডঙ্কা চারিদিকে বাজিয়া উঠিল, একজন এই রকমের পাষণ্ডদলন করিয়া গুরুদেব লোক-মহিমার উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গে আরোহণ

করিলেন, আর এই একটী বিষম পরাজয়ের ইতিবৃত্ত জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, গানে, কবিতায়, কাহিনীযোগে প্রচার করিয়া করিয়া সুকণ্ঠ চারণের দল নিজেদের সঙ্কীর্ণ সাধনগোষ্ঠীকে জগন্ময় বিস্তারের প্রয়াস পাইল।

ইহাই অবস্থা।

তাই তুমি দীক্ষা চাহিয়াছ বলিয়াই আমি বলিতে পারি না যে, এস, দীক্ষা লইয়া যাও বা আমার অবসর যখন হইল না, তখন অন্য কোথাও গিয়া দীক্ষা-কার্য্যটী যেমন তেমন করিয়া সারিয়া ফেল। তোমাকে প্রতীক্ষা করিতে, আত্মপরীক্ষা করিতে এবং শ্রীভগবানের করুণামুখাপেক্ষী হইতে বলা আমি কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করিতেছি।

বেলারাণীর গল্প

একটি গল্প বলিলে তোমার জানিবার বিষয়টুকু তুমি সহজে হয়ত ধরিতে পারিবে। বেলারাণী বড় চমৎকার স্বভাবের মেয়ে, সকলেই তাহাকে ভালবাসে। কেহ তাহাকে একটী গোলাপ-ফুলের মালা দিয়াছে, কেহ দিয়াছে চমৎকার একখানা দর্পণ, কেহ এক জোড়া সোণার দুল; যাহা কাণে কেবল দোলে আর মনে করাইয়া দেয়, কে ইহা দিয়াছে। একজন আসিয়া সব চেয়ে বড় জিনিষটার খোঁজ দিল, বরের সন্ধান দিল, বেলার বিবাহ ঠিক হইল। কন্যাযাত্রীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বেলা বিবাহের আসরের দিকে যাইতেছে, তখন সেই ভালবাসার জনদের এক

জন বলিয়া বসিল,—"ওগো বেলা, আমার দিকে একটীবার তাকাও, আমিই কি তোমার বক্ষোবিলম্বী ফুলমালাটী দেই নাই উপহার? তোমার যে অত সুবাস আজ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার জন্য আমিই কি নহি কৃতিত্বের অধিকারী?" বেলা বলিল,—"হইতে পারে তোমার কাছে আমার ঋণ অপরিসীম কিন্তু আমি আজ ছুটিয়াছি বরের সন্ধানে, আমি আর তোমার পানে তাকাইতে পারি না, আমার বিবাহের লগ্ন বহিয়া যাইবে যে!" একটু না যাইতেই আর এক জন আসিয়া বলিল,—"বেলা গো বেলা, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমার দেওয়া দর্পণখানায় রোজ তুমি তোমার সুন্দর মুখখানা শতবার দেখিয়া কত পরিতৃপ্তি পাও। তুমি যে সুন্দরী, তাহা আমি না হইলে তোমাকে বুঝাইয়া দিত কে? নিজেকে অত সুন্দরী জানিয়াছিলে বলিয়াই না আজ তুমি অতি সুন্দর বর পাইবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছ! এজন্য কি আমার কৃতিত্বের দাবী কিছুই নাই?" বেলা বলিল,—"হয়ত তোমার সব কথাই অবিকৃত সত্য, কিন্তু আমার বর আমার জন্য কত কাল অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবেন? আমি চলিলাম, তোমার পানে তাকাইবার আমার অবসর নাই।" দুই পা অগ্রসর না হইতেই আর এক জন আসিয়া বলিল,—"বেলা, ও বেলা, অত ছুটিবার প্রয়োজন নাই, আমার দিকে একবার তাকাও, আমিই তোমাকে বরের সন্ধান দিয়াছি, আমি না বলিলে তাঁহার নাম-গোত্র-বংশপরিচয়

তোমাকে কে দিতে পারিত? একটু থামো, অত তাড়াহুড়ার প্রয়োজন কি গো, একবার আমার মুখপানেই তাকাইয়া দেখ না যে, তোমার বর আর আমি একই কি না?" এ কথার উত্তর কি দিতে হয়, বেলা তাহা জানে না। বেলার মতন আরও কত মেয়েকে বর-সন্ধানী ভদ্রলোকেরা এই কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কেহই ইহার উত্তর দিতে সাহস পায় নাই। যে কথার উত্তর ইহার আগে কেহ কোথাও দেন নাই, সে কথার উত্তর চট্‌ করিয়া বেলাই বা দিতে পারিবে কি করিয়া? কিন্তু তথাপি সে গতানুগতিক-পন্থী মেয়ে নয়। যে বরকে সে কখনো দেখে নাই, যে বরের নামটীও এই মাত্র সে শুনিল, তারই প্রতি তাহার অন্তরের সমস্ত অভিলাষ প্রধাবিত। সে থামিল না। জবাবও দিল না। পথ চলিতেই লাগিল। কিছুদূর যাইতেই বেলা দেখিল,—একটী বয়স্কা মেয়ে-মানুষ আসিয়া পায়ে গড় করিয়া প্রণাম করিল। বলিল,—"পেন্নাম হই মা-ঠাকুরুণ, ধন্যি দেশের মেয়ে, আমাদের ঘর পুণ্যিময় করিতে আসিয়াছ। আমি হইলাম কিনা, তোমার এই বরের বাড়ীর চাকরাণী। দাসী বল, ঝি বল, আত্মীয়া বল, অভিভাবিকা বল, মাসীমা বল, পিসীমা বল; আমিই এ বাড়ীর সব কিনা! কত্তাবাবু আমাকে কত সেনেহ করেন। এস না মা ঠাকুরুণ, একটু খানি বসোনা, একটু নরম গরম দুটী চারিটী প্রাণের কথা কই।" বেলা হাসিয়া বলিল,—"তুমি এ বাড়ীর কে, তাহা আমি আগে জানিব কি

করিয়া ? বাড়ীর যিনি মালিক, আগে তাঁর সাথে হউক পরিচয়, তাহার পরে সকলের পরিচয়ই আস্তে আস্তে পাইব। এখন পথের মাঝখানে দেরী করাইও না ভাল মানুষের মেয়ে।” কিছুক্ষণ না যাইতেই আর একজন বলিল,—“ওগো বৌদি, তুমি আমাকে চেন না বুঝি ? আমি যে তোমার ননদ গো ! এস না ভাই একটু আমোদ-আহ্লাদ করি।” বেলা হাসিয়া বলিল,—“হয়ত তুমি মিথ্যা বল নাই ভাই, কিন্তু ভাই আমার ত' বরের সাথে এখনো কোনও সম্পর্কই স্থাপন হইল না। আগে তাঁর কাছে যাই, আগে তাঁকে পাই, আগে তাঁর সোহাগে সোহাগিনী হই, তার পরে না তোমাদের কাহার সঙ্গে কি সম্পর্ক, তাহার নির্ণয় হইবে।” বেলা কেবলি চলিতে লাগিল। একটু দূর যাইতেই একটী সুন্দর সুকান্ত যুবক আসিয়া বলিল,— “ও বৌদি, তুমি বুঝি আমাকে একেবারে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে চাও ? এস না বৌদি, দশ মিনিট একটু দশ-পঁচিশ খেলি। তার পরে তুমি দাদার কাছে যাইও। আমি দাদার ছোট ভাই। আমাকে দর্শনেই একেবারে বিমুখ করিও না বৌদি ! দাদার কাছে গেলে ত' একটী বারের জন্য আমাদের পানে তাকাইবে না। তাই অতি মিনতি করিয়া বলিতেছি, বৌদি, একটী বার আমার কথাটী রাখো না !” এইবার বেলার মনে আশার রশ্মি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে বরের কাছাকাছি নিশ্চয়ই আসিয়াছে। এতক্ষণ পথে পথে নানা

জনের নানা কথায় কেবলই তাহার সংশয় ও উদ্বেগ বাড়িয়া চলিতেছিল। সে অধরে সরস হাসি ফুটাইয়া বলিল,—"এখন আর আমার সময় নষ্ট করিও না লক্ষ্মী ভাইটী আমার, বরের কাছে আগে যাই, তাঁকে আগে পাই, তারপরে তিনি নিজেই আমাকে তোমার সঙ্গে দশ-পঁচিশ খেলিবার জন্য পাঠাইয়া দিবেন। তার জন্য ভাবনা করিও না ভাই। আমি ত' পরের মেয়ে, তুমি তাঁর আপন ভাই। তোমার কিসে শান্তি, তোমার কিসে আনন্দ, তার দিকে তাকাইয়া তিনি নিজেই তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন তাঁর আর আমার সাথে দশ-পঁচিশ খেলিবার জন্য। এখন রাস্তা ছাড় লক্ষ্মী ভাই।"

বেলারাণীর বর অন্বেষণের এই গল্পটীর সহিত নিজের জীবনটী মিলাইয়া দেখ। হয়ত আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহার কতক বুঝিতে পারিবে। (১৯শে চৈত্র, ১৩৪০)

দীক্ষা ও আত্ম-পরীক্ষা

আগে আত্ম-পরীক্ষা কর, দীক্ষা সময়-মত উপযুক্ত স্থানে হবে। (১৯ চৈত্র, ১৩৪০)

প্রকৃত গুরু-দক্ষিণা

ব্রহ্মা থেকে সুরু ক'রে অণু-পরমাণু সকলের নিকটেই তোমাদের অফুরন্ত ঋণ। সেই ঋণ অপরিশোধ্য। তবু তা' শোধ করার জন্য আমৃত্যু উদগ্র উদ্যম চাই। তবেই তোমাদের

পক্ষে গুরু-দক্ষিণা দেওয়া হ'ল ব'লে জান্‌বে। গুরুদেবকে একটীমাত্র হরীতকী দক্ষিণা দিয়ে আজ একটা প্রথার মাত্র মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছ। কিন্তু জানবে, প্রকৃত গুরু-দক্ষিণা টাকা দিয়ে হয় না, ভূমি দিয়ে হয় না, পরন্তু, নিজের জীবন নিখিল ভুবনের উৎকৃষ্টতম মঙ্গলের জন্য অবিরত নিয়োজিত রাখার ভিতর দিয়ে হয়। তোমরা প্রকৃত গুরু-দক্ষিণা দিতে সমর্থ হও, তোমাদের প্রতি এই হচ্ছে আমার অকপট আশীর্ব্বাদ।

(১৯শে চৈত্র, ১৩৪০)

অদীক্ষিতের ওঙ্কার-জপ

অদীক্ষিত অবস্থায় মন্ত্রজপে নিষ্ফলতা আসে, ইহাই সাধু-বৈষ্ণব-সজ্জনগণের মুখে শুনিয়া আসিতেছ। কিন্তু আমি তোমাকে আশ্বাস দিতেছি, দীক্ষিত বা অদীক্ষিত সর্ব্বাবস্থায় ওঙ্কার জপ চলিবে। দীক্ষা-ব্যতীত মন্ত্রজপ মরুভূমিতে বীজ-বপন-তুল্য ব্যর্থ হয়, একথার সমর্থনে তুমি শাস্ত্র-বচন আমাকে শুনাইতে পারিবে। কিন্তু শাস্ত্র যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই আজ আমার লেখনীর মধ্য দিয়া তোমাকে এই আপ্তবাক্য শ্রবণ করাইতেছেন যে, অন্য মন্ত্রের ব্যাপার যাহাই হউক, দীক্ষিত বা অদীক্ষিত যে-কোনও অবস্থায় ওঙ্কার-জপ করিবে, সেই অবস্থাতেই ইহার শুভফল তোমার লব্ধ হইবে,—একটী বারের মন্ত্র-জপও তোমার নিষ্ফল হইবে না, ব্যর্থ যাইবে না।

দীক্ষার সুফল

দীক্ষার অবশ্য একটা সুফল আছে। দীক্ষা হইতেছে মন্ত্রের খুঁটী। দীক্ষা দ্বারা কোনও মন্ত্র লব্ধ হইলে সেই মন্ত্র বারংবার পরিবর্ত্তনের সুযোগ ও রুচি কমিয়া যায়। ইহাতে মন্ত্রে সাধকের নিষ্ঠা অটুট রাখার সাহায্য হয়। দীক্ষার অন্য সুফল আছে। দীক্ষাপ্রাপ্ত মন্ত্রের দীক্ষাদাতা নিশ্চয়ই সাধনের কোনও কৌশল বলিয়া দিবেন, ইহা প্রত্যাশা করা যায়। কৌশল-সমূহ মনঃস্থৈর্য্য সাধনের সহায়তা করে। দীক্ষা দ্বারা মন্ত্রলাভের তৃতীয় বা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কুশল এই যে, প্রত্যেকটী বিভিন্ন মন্ত্র যেই দার্শনিক ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান, তাহা দীক্ষাদাতার উপদেশে ও জীবন-প্রণালীতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। মন্ত্র করিবে জপ, আর তাহার দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে থাকিবে অজ্ঞ, ইহা সাধক-জীবনে এক স্ববিরোধী অস্বস্তিকর অবস্থা। দীক্ষাদাতা প্রকৃতই উপলব্ধি-সম্পন্ন শক্তিমান্ সাধক হইলে, সাধনকালে অদৃশ্য-ভাবে তাঁহার শক্তির সহায়তা পাওয়া যায়। এই জন্যই দীক্ষা নেওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

দীক্ষায় গোপনতার কারণ

কিন্তু দীক্ষাদাতার পশ্চাতে যেখানে দীক্ষাদাতার স্বদল-পুষ্টি বা স্বমত-বিস্তারই হইবে প্রধান লক্ষ্য, সেখানে দীক্ষা একটা নিতান্ত esoteric বা গুপ্ত ব্যাপার না হইয়া পারে না। আমি তোমাকে যেই মন্ত্র দিলাম, তাহা যদি দশ জনে জানিতে পারে,

তাহা হইলে নানা জনের নানা মন্তব্যে, নানা টিপ্পনীতে, নানা ব্যাখ্যায় তোমার মন দীক্ষাপ্রাপ্ত মন্ত্র হইতে টলিয়া যাইতে পারে,— তাই তোমার মন্ত্রগুপ্তির খুবই আবশ্যকতা আছে। কিন্তু দীক্ষাদাতারা যে একমাত্র এই আশঙ্কাতেই গুরু-মন্ত্রকে "গোপয়েৎ মাতৃ-জারবৎ" করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নহে। ইহা অন্যতম কারণ হইলেও ইহা অপেক্ষা অনেক বড় একটা কারণ এই মন্ত্রগুপ্তির পশ্চাতে রহিয়াছে। তাহা কেহ কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলেন নাই, কিন্তু অন্তরে অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। তাহা হইতেছে দার্শনিক মতবাদের সংঘর্ষের ভীতি। অন্য কথায় ইহাকে দার্শনিক মতবাদের সংঘর্ষের অরুচিও বলিতে পার। হিন্দুর স্বাভাবিক প্রকৃতি সংঘর্ষ এড়াইয়া চলা। ইস্‌লাম মক্কায় থাকাকালে সংঘর্ষ এড়াইয়া চলিতে ভুল করে নাই,—কোরেশী পুরোহিততন্ত্রের সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য প্রকাশ্যে দীক্ষা নমাজ প্রভৃতি সম্ভব হয় নাই। মদিনায় আসিয়া সেই গোপনতার প্রয়োজন ফুরাইয়া গেল, তাই সংঘর্ষের ভয়কে পরোয়া না করিয়া প্রকাশ্যে দীক্ষা, নমাজ প্রভৃতি হইতে লাগিল। বৈষ্ণব শাক্তের, শাক্ত বৈষ্ণবের মতবাদকে কেবল অপছন্দই করিয়াছে, তাহা নহে, মনে মনে ভয়ও করিয়াছে। বৈষ্ণব-দার্শনিকতায় এমন কোমল পেলব মধুর জিনিষ আছে, যাহার আকর্ষণ শাক্ত-দীক্ষিতকে হয়ত স্বপথ-ভ্রষ্ট করিতে পারে। শাক্ত-দার্শনিকতায় এমন পৌরুষ,

এমন বীর্য্য, এমন তেজস্বিতা রহিয়াছে, যাহার আকর্ষণ বৈষ্ণব-দীক্ষিতকে হয়ত টলাইয়া দিতে পারে। বৈষ্ণবের শাক্ত হওয়া, শাক্তের বৈষ্ণব হওয়া কিছু বিচিত্র ঘটনা নয়। শাক্তদের পরম্পরাগত সাহিত্য নাই, তাই শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কঠিন হইতে পারে। কিন্তু বনমালীর নূপুর-নিক্কনে বিতৃষ্ণ-ব্যক্তিরা মহামেঘপ্রভা ঘোরা মুক্তকেশী চতুর্ভুজার শোণিত-স্রাবী খড়্গ-ঝলকে উদ্দীপ্ত-চেতা হইয়া শাক্ত-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহাও সত্য। বৈষ্ণবদের পরম্পরাগত সাহিত্য আছে বলিয়া অনেক জগাই-মাধাই-এর উদ্ধারের অর্থাৎ শাক্তগণের বৈষ্ণব-সাধন গ্রহণ করার প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত আছে। বৈষ্ণব নিজের দর্শনকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছেন, কিন্তু নিজ শিষ্যকে কালীমন্দিরে, শিব-মন্দিরে, জৈনমন্দিরে যাইতে সম্মতি দিতে পারেন নাই। শাক্তসম্পর্কেও ঠিক এই কথাই। বৈষ্ণবের পূজা, উৎসব, কীর্ত্তনাদিকে শাক্ত শুদ্ধ, প্রসন্ন প্রশান্ত মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাহার প্রচ্ছন্ন কারণটী কিন্তু দার্শনিক মতবাদের সংঘর্ষ এড়াইয়া চলার প্রবৃত্তি। অসীম পরমাত্মাকে নাম এবং রূপের দ্বারা সীমিত করিবার পরে তাঁহার সম্পর্কে দার্শনিক বিচারও সীমার পথ ধরিয়া চলিতে বাধ্য। সেই দার্শনিকতা চৌহদ্দী মানিয়া চলিতেই সদা ব্যস্ত,—চৌহদ্দী না কমে, তার দিকে খরদৃষ্টি। সুতরাং প্রকাশ্য সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য দীক্ষাকে জীবনের একটী অতীব গোপনীয় আচারে পরিণত

করিতে হইয়াছে। দীক্ষা যখন গোপনে হইল, তখন দীক্ষার ফলস্বরূপে অবশ্যম্ভাবী-রূপে প্রাপ্ত যে দার্শনিক মতামত, তাহাও স্ব-সম্প্রদায়ের বাহিরের লোকের নিকটে রহিল রহস্যময় ও অজানিত,—তাই তর্কের এবং দ্বন্দ্বের অবসর কমিয়া গেল। এই দিক হইতেও মন্ত্রদীক্ষার গোপনীয়তা একটা বড় রকমের আবশ্যকতা।

সর্ব্ব-স্বীকৃতির মহামন্ত্র

কিন্তু আমি যেই মন্ত্রে দীক্ষিত বা অদীক্ষিত নির্ব্বিশেষে সর্ব্বমানবের পূর্ণাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতেছি, সেই মন্ত্রে রহিয়াছে সর্ব্বমন্ত্রের স্বীকৃতি, সর্ব্বরূপের স্বীকৃতি এবং সেই জন্য ইহা নাম এবং রূপের ঊর্দ্ধে। সকলকে যে স্বীকার করে, সে সমষ্টিহেতুতে এত বৃহৎ যে, খণ্ড খণ্ড সর্ব্বনামের স্বীকৃতির মধ্য দিয়া সে অ-নাম বা নামাতীত, খণ্ড খণ্ড সর্ব্বরূপের স্বীকৃতির মধ্য দিয়া সে অ-রূপ বা রূপাতীত। তাই, কোনও প্রকার দার্শনিক মতবাদকেই তাহার ভয় করিবার কিছু নাই,—ব্যাঘ্রিনী যেমন তাহার যুবতী কন্যাকে ভয় করে না। এই জন্যই ইহার নাম অখণ্ড-নাম, এই জন্যই ইহার সাধনে গুরু মিলে উত্তম, না মিলে তবু সাধন সফল। সব মন্ত্র, সব তন্ত্র, সব মত, সব পথ যেখানে মিলিয়াছে, এস আমরা সবাই সেখানে আসিয়া পরস্পরের সহিত পরস্পর মিলিত হই। সকলের যেখানে স্বীকৃতি, এস আমরা সেখানে অন্তরের সন্নিধি জানাইয়া

পরস্পর পরস্পরকে স্বীকার করি। ওঙ্কার কোনও সাম্প্রদায়িক মন্ত্র নয়, ইহা স্বীকৃতির মহামন্ত্র, মিলনের মহাধ্বনি, সমন্বয়ের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা। (১৭শে চৈত্র, ১৩৪০)

দল গড়িতে আসি নাই

দল গড়িবার জন্য আমি আসি নাই। এই জন্যই কেহ আমার স্নেহ-পাশ ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেলে তাহার জন্য আকুল অধীর হই না, বুঝ-প্রবোধ দিয়া তাহাকে আমার কাছে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করি না। যে চলিয়া যাইতেছে, সে নিশ্চিতই তাহার বিবেককে অনুসরণ করিতেছে। যেখানে এই প্রশ্ন উঠিবে যে, আমাকে মানিবে, না বিবেককে মানিবে, সেখানে আমার স্পষ্ট স্বরে নির্দ্দেশ এই যে, বিবেককেই মানিতে হইবে, আমার কথা ভাবিতে গিয়া নিজের মনকে দুর্ব্বল করিও না। বলিতে পার, আমার কাছে সে ঋণী আছে, তাই আমার কথা না ভাবিয়া পারে না। কিন্তু বাছা, সে কি একবার হিসাব করিয়া দেখিয়াছে যে, জগতে কত সময়ে কত অবস্থায় কত জনের কাছে কত প্রকারের ঋণ সে সংগ্রহ করিয়াছে? সেই সকল ঋণ কি সে পরিশোধ করিয়াছে, কিম্বা আশা করে যে, পরিশোধ করিতে পারিবে? মনুষ্য-জীবন একটা ঋণের পসরা। ঋণ ছাড়া একটী পদক্ষেপ করিতে পার না, পার নাই। জন্মিয়াছ ঋণের মধ্যে, বাড়িয়াছ ঋণের অধীনে, লয় পাইবে ঋণগ্রস্ত

থাকিয়া। ঋণকে শোধ করাই যদি আমার প্রতি তোমার দুর্ব্বল হইবার হেতু হয়, তবে বলিব, আর সকলের প্রতি তোমার ঋণের পরিমাণটাও একবার স্মরণ কর, তাহাদের প্রতিও মনটাকে একটু সরস, সরল, বিনম্র ও কৃতজ্ঞ কর। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে, সকলের ঋণ শোধের তোমার সামর্থ্য নাই, তাই সব চেয়ে বড় ঋণটী আগে ধর, বিবেকের ঋণ আগে পরিশোধ কর, তারপরে অন্য দিকে মন দিবে। তোমাদের সহায়তা করিতে আমি আসিয়াছি, দাসত্বের নিগড়ে কর-চরণ শৃঙ্খলিত করিয়া নিজের ইচ্ছামত তোমাদের পরিচালন করিতে আসি নাই। তোমরা তোমাদের নিজের পথে পূর্ণবিক্রমে চলিবে, এই জন্যই তোমাদের প্রয়োজন আমাকে। তোমরা সকলে নিজ নিজ পথ চলা বন্ধ করিয়া দিয়া আমার খোঁয়াড়ে ঢুকিবে, এজন্য তোমাদিগকে আমার প্রয়োজন নহে। যেই দলে সকল দলের স্থান, যেই সঙ্ঘ সকল সঙ্ঘের আশ্রয়, যেই মতে সকল মতের মিল, যেই পথে সকল পথের সমন্বয়, আমার লক্ষ্য সেই সঙ্ঘ, সেই মত, সেই পথ। তাই দল গড়িবার বুদ্ধি আমার বুদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকর।

শিষ্যের অবাধ্যতা ও গুরু

তোরা গুরুদেবের একটা সামান্য নির্দ্দেশ পালন কত্তে পার্লি না, কি ক'রে তোরা আশা করবি যে, গুরুদেব তোদের জন্য কৃপার অনন্ত ভাণ্ডার খুলে দেবেন? তবে, প্রকৃত গুরু শিষ্যের

অবাধ্যতায় তার উপরে বিরক্ত হন না, এটাও সত্য। প্রথমে তিনি মনে মনে বিচার করেন যে, নিশ্চয়ই শিষ্যের অবাধ্য হবার মত সঙ্গত কোন কারণ আছে। সেই কারণ অনুসন্ধান ক'রে তিনি আগে কারণটীকে দূর করেন। তার পরেও যদি দেখেন যে, শিষ্য এখনো অবাধ্য হচ্ছে, তাহ'লে তিনি শিষ্যকে সদুপদেশ দিয়ে সংশোধন করার চেষ্টা করেন। তার পরেও যদি অবাধ্য হয়, তা' হ'লে তাকে আর শিষ্য ব'লে মনে না ক'রে খেলার সাথী ব'লে মনে করেন। খেলার সাথীরা যদি বোকামি করে, তা' হ'লে কেউ তার জন্য রাগ কত্তে পারে?

(৮ই বৈশাখ, ১৩৪১)

গুরু-বন্দনার আবশ্যকতা

ভারতের প্রায় প্রত্যেক সাধক-সম্প্রদায়েরই দেখা যায় যে, সাধন বা উপাসনা সুরুর প্রারম্ভেই গুরু-বন্দনা রয়েছে। এর তাৎপর্য্য এই যে,—গুরু-বন্দনার ফলে গুরুদত্ত সাধনের প্রতি একনিষ্ঠ ভাব জন্মে। এতে সাধন জমাট হয়। নিত্য নূতন পন্থায় নিত্য নূতন প্রণালীতে উপাসনা কত্তে গেলে ক্রমশঃ মূল সাধনের প্রতি একটা অনাস্থা এসে যায়, যার ফলে শেষে আর কোনো সাধনেই মন থাকে না বা মন বসে না। তাই সকল অনাস্থা ও সকল অ-নিষ্ঠার মূলোৎপাটনের জন্য গুরু-বন্দনার ব্যবস্থা। এইটী হচ্ছে প্রথম তাৎপর্য্য। কিন্তু দ্বিতীয় বা গভীরতর তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে, অনিত্য বস্তুতে গুরু-ভাব

আরোপের দ্বারা স্বকীয় সাধন-নিষ্ঠায় অনিত্যতা-বোধ সঞ্চারণ যাতে না হয়, তার জন্য নিত্য সত্য নিরঞ্জন অদ্বিতীয় পরম-প্রভুই যে সাধকের অনন্যশরণ অনন্যাশ্রয় শ্রীগুরু, এই কথা সাধকের সাধনের সুরুতেই স্মরণ করিয়ে দেওয়া অত্যাবশ্যক।

(২৪শে বৈশাখ, ১৩৪১)

গুরু-পরীক্ষা

—দীক্ষা? এক বৎসর গুরু-পরীক্ষা কর। এক বৎসর আত্ম-পরীক্ষা কর। দীক্ষা হবে তার পরে।

গুরু-পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বলতে পার, "গুরু-পরীক্ষার" প্রয়োজনীয়তা কি? গুরু যে-সাধনের কথা ব'লে দেবেন, সেই মত চল্লেই ত' হ'ল। গুরু ভাল না মন্দ, সাধক না অসাধক, সেই চিন্তা দিয়ে আমার দরকার কি? বেশ কথা। দীক্ষা নেবার পরে দীক্ষিতের মনে এই ভাবই থাকা দরকার। নইলে সাধনে দানা বাঁধে না, ভজনে জোর আসে না। কিন্তু আত্ম-পরীক্ষা ছাড়া ত' কারোই দীক্ষা নেওয়া উচিত নয়! গুরু-পরীক্ষার চেষ্টার ফলে আত্ম-পরীক্ষাই পাকা হয়। সোণা পরীক্ষা কত্তে গিয়ে নিকষ-পাষাণেরও নৈকষ্যের পরীক্ষা হয়। এজন্যই গুরু-পরীক্ষা দরকার।

(২৫শে বৈশাখ, ১৩৪১)

গুরু-পরীক্ষা ও আত্ম-পরীক্ষা

বাবা সকল, এক বৎসর গুরু-পরীক্ষা কর, এক বৎসর আত্ম-পরীক্ষা কর, তার পরে হবে দীক্ষা। কাল'ও কয়েকজন এসেছিল, তাদেরও এই একই উপদেশ দিয়েছি। বলছ, "গুরু-পরীক্ষার" কি প্রয়োজন আছে? যাঁকে গুরু ব'লে মেনেছি, আজীবন তাঁর দেওয়া উপদেশ পালন ক'রে যাব।" আজীবন যাতে তা' পারো, তারই জন্য গুরু-পরীক্ষার দরকার। আজ হঠাৎ এক আবেগে এসে যাঁকে গুরু করলে, দুদিন যাবার পরে যদি তোমারই পূর্ব্ব-সঞ্চিত অপরাধ সমূহের জন্য তাঁর উপদেশ মতন চল্‌তে দ্বিধা আসে? আজ মনের অগাধ ভক্তি নিয়ে এক জনকে গুরু করলে, তিনিও তোমাকে অন্তরের অকপট স্নেহ দিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ উপদেশ দান করলেন, কিন্তু দুদিন যাবার পরেই যদি তোমার মনে হয় যে, পড়া-শুনা ভাল ক'রেত' আমি করিনি, পরীক্ষায় ফেল ত' আমি হবই, কিন্তু হয়ত বা পাশ ক'রেও যেতে পাত্তাম, যদি এই গুরুর কাছ থেকে এই মন্ত্রটীই না নিতাম। দাও গুরু ছেড়ে বা গুরুদেবের নিন্দা করাকে যারা জীবনের এক মহাকর্ত্তব্য ব'লে পরিগণিত করেছে, এমন লোককে এনে মহাসমাদরে জিজ্ঞাসা কর যে, এখন কি উপায় অবলম্বনীয়। অতীতে হিসাব ক'রে চল নাই, ব্যবসায় না শিখে তাতে টাকা দিয়েছ অকাতরে ঢেলে, অবিশ্বাস্য চরিত্রের লোককে বিশ্বাস ক'রে সম্পত্তির তদারক গছিয়ে দিয়ে এখন

নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় ও দারুণ দারিদ্র্য-দশায় প'ড়ে চার দিকে মানসম্মান বজায় রেখে চল্‌তে পাচ্ছ না,—দাও গুরুদেবের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে, নিশ্চয়ই তাঁর দেওয়া মন্ত্র থেকেই এই অকথনীয় দারিদ্র্য এসেছে। এক বছর ধ'রে গুরু-পরীক্ষা ক'রে দীক্ষা নিলে এই সব জটিল নীচতার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে শিষ্যকে পড়্‌তে হয় না। কেননা, গুরু-পরীক্ষা কত্তে কত্তেই আত্ম-পরীক্ষাও হ'য়ে যায়।

দীক্ষিতের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত

দীক্ষা নেবার পরে অনেকের মনোভাব আবার এমনও হয় যে, এই অঞ্চলে গুরুদেবকে চিন্‌ত কে হে? আমি দীক্ষা নিয়ে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম, তাই না দলে দলে লোকেরা সবাই এসে তাঁর শিষ্য হল! কেউ ভাবেন,—আরে, আমার বাড়ীতে পর পর দশটা মহোৎসব ক'রে আমরা গুরু-দেবের মহিমা প্রচার ক'রেছি বলেই ত', নইলে তিনি আমাদের চাইতে একটা অসাধারণ মানুষ কিসে হলেন? কেউ কেউ ভাবে,—বেয়াইন ঠাকুরুণ ধরলেন যে, এসো এখানে দীক্ষা নাও, তাই নিলাম। নইলে আমার দীক্ষা নেবার এখন দরকারটাই কি ছিল? আবার ছোট শ্যালীটাও কিছুতেই ছাড়বে না,—বলতে লাগ্‌ল, জামাই বাবু, দীক্ষা আপনাকে নিতেই হবে, নইলে ছাড়্‌ব না,—দশ জনের অনুরোধে প'ড়ে দীক্ষাটা নিয়েছি। তা' দীক্ষা নেবার ফলে দশ জনের উপরে যদি

আমার কর্ত্তৃত্ব নেতৃত্ব চালাবারই সুবিধা না হ'ল, তা' হ'লে আর এ দীক্ষায় লাভ কি হ'ল ? ছেড়ে দাও এ সব সম্পর্ক ; আগে যেমন ছিলাম তেমনই ভাল। কেউ ভাবেন,—দীক্ষা যখন নিয়েছি, তখন গুরুদেব আমার ঘরের বাঁধা হ'য়েই রইলেন। অখাদ্য যদি রেঁধে দেই, তবু গুরুদেবকে বল্‌তে হবে. চমৎকার খেলাম। তিনি যদি স্বপাকভোজী হন বা তাঁর নির্দ্দিষ্ট লোক ছাড়া অন্যের হাতে খেতে অসুবিধা থাকে, তা' হ'লেও জোর-জবর ক'রে তাদের হেঁসেল থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজেরাই রান্না ক'রে খাওয়াব এবং অন্য গুরুভাই-ভগিনীরা এসে গুরুদেবকে রান্না ক'রে খাওয়াতে চাইলে তর্জ্জন ক'রে বল্‌ব, আমাদের হাতে খান ব'লে কি তোমাদের হাতেও খাবেন ? যাও, যাও, বেরিয়ে যাও হেঁসেল থেকে। কলহসৃষ্টিতে অনিচ্ছুক গুরুদেব যদি এই সকল অত্যাচারের মধ্যে পড়ে নীরবে কেবল ক্ষুধায়ই কষ্ট পান, তাতেও শিষ্যের কিছু ক্ষতি নেই,—পাড়ার লোকের মধ্যে তার প্রাধান্যটা বজায় থাকলেই চল্‌বে। গুরুদেব আমাদের গ্রামে এসে কোন্ সাহসে অন্য শিষ্যের বাড়ীতে উঠবেন ? অন্যেরাই বা আমার জিনিষকে কোন্ সাহসে নিজেদের ঘরে তুলবেন ? গুরুদেব যে আমাদের সম্পত্তি ! আমরা কিন্তু গুরুদেবের নই। তাঁর যে আদেশ পালনে আমাদের নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়ে, মাত্র ততটুকুই প্রাণ দিয়ে পালনীয়, কিন্তু তাঁর কোনও আদেশে যদি অন্যের প্রতিপত্তি

বেঁড়ে যায়, তা' হ'লে সে আদেশ অপালনীয়, অগ্রাহ্য। আমিত্বের বা অহমিকার এই পূজা নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সত্যিকারের গুরুরা ত' বিশ্বের সম্পদ। সমগ্র বিশ্বের প্রতি জনের রয়েছে তাঁদের উপরে অধিকার। একজন পদস্থ সম্মানিত ধনবান্ ব্যক্তির চাইতেও তাঁরা একজন ভক্তিমান্ ব্যক্তির প্রতি অধিকতর পক্ষপাতশীল। অপরিচিত নূতন স্থানে অনাদৃত অবস্থায় রেলের প্লাটফরমে ব'সেও তাঁরা যেই মনটী নিয়ে জগতের হিত-চিন্তা কচ্ছেন, আবার লক্ষপতি, কোটিপতির গৃহে ব'সে মহাসমারোহময় সম্বর্দ্ধনার মাঝেও ঠিক সেই মনটী নিয়েই জগতের কল্যাণ-সাধনে তাঁরা ব্যস্ত। কোটিপতি যখন স্বর্ণ-ভৃঙ্গারে ক'রে জল এনে গুরুদেবের পদধৌত কচ্ছেন, তখনো তিনি সেই লোকটীর কথা ভুলতে পারেন না, আগের রাত্রে একখানা ছিন্ন কন্থায় দিয়েছিল যে শু'তে, আর পানীয় জল দিয়েছিল একটা ভাঙ্গা মাটির খোরাতে ক'রে। সংসারী মনদিয়ে শিষ্য হ'লে বা শিষ্য হবার পরেও সংসারী মনটীকে শ্রীগুরুদেবের সম্পর্কে মাথা তুলতে দিলে এই সব অশান্তি হয়। তাই, এক বৎসর গুরুপরীক্ষা ক'রে তার পরে দীক্ষা নেওয়া সংসারী লোকদের পক্ষে ভাল।

গুরুর শিষ্য-পরীক্ষা

বলছ,—"আপনি কি আমাদের যোগ্যতা অযোগ্যতার পরীক্ষা ক'রে দীক্ষা দিতে পারেন না? সকলকে একই সঙ্গে

বিমুখ কচ্ছেন। যে যোগ্য, অন্ততঃ তা'কে দীক্ষা দিন।" আমার দৃষ্টিতে যোগ্য তোমরা সবাই। কিন্তু আমার মনে এখন দীক্ষা দেবার অভীপ্সা নেই। শিষ্য দেখ্‌লে আমি চিনতে পারি, কে কি হবে। কিন্তু আমার যখন দীক্ষার অভীপ্সা থাকে, তখন যদি এমন লোকও আসে, শিষ্য হবার পরেই যে এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে এসে তাতে পটাসিয়াম সায়ানাইড মিশিয়ে আমাকে হত্যা করবে, আমি জেনে-শুনে তাকে দীক্ষা দেই। আমি হয়ত অপমৃত্যুই মরলাম, কিন্তু আমার দীক্ষাদানের অভীপ্সার কালে যে দীক্ষা নিয়েছে, সে আমাকে হত্যা করার পরেও আমার দেওয়া জিনিষের মহিমাতেই পরম-কল্যাণকে এক সময়ে না এক সময়ে লাভ করবে। অতি দুর্বৃত্ত অনেক লোককে আমি অকাতরে দীক্ষা দিয়েছি, তাতে কেউ অতিশয় সাধু-পুরুষে পরিণত হয়েছে, আবার কেউ কেউ বা নিজ দুর্বৃত্ততা আমারই বিরুদ্ধে প্রয়োগ ক'রে ক'রে তার কর্ম্ম-ফলকে ক্ষয়িত কচ্ছে। কারণ, যখন আমারই বিরুদ্ধে তার দুর্বৃত্ততা, তখন সে আমাকে অতিশয় তীব্র ভাবে ধ্যান কত্তে বাধ্য হচ্ছে। এতে তার পরোক্ষভাবে কর্ম্মক্ষয় হচ্ছে। তবে, স্থল-বিশেষে শিষ্য-পরীক্ষার জন্য আমিও এক বছর, দু' বছর, তিন বছর অপেক্ষা করি এবং তাতে শিষ্যের কুশলই হয়। তোমাদের আমার পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। তোমরা স্কুল-কলেজের ছাত্র, তোমাদের কাছে দেশের ও দশের কত আশা। জগৎকে কল্যাণ, আনন্দ,

সমৃদ্ধি দানই হবে তোমাদের আদর্শ। সেই আদর্শের দিকে তাকিয়ে চল্‌তে থাক, সৎসঙ্গ কর, মহতের জীবনী আলোচনা কর, আলস্যমূলক সকল বিলাস ও ব্যসন পরিহার কর। তার পরে যেদিন যার দীক্ষার সময় হবে, তখন, আমিই যদি তোমাদের গুরু হ'য়ে থাকি, তবে আমার সাথে তোমাদের আশ্চর্য্যজনক ভাবে দেখাও হ'য়ে যাবে, দীক্ষাও হ'য়ে যাবে। এখন তাড়াতাড়ি ক'রে দীক্ষা নেবার দরকার নেই বাছারা।

(২৯শে বৈশাখ, ১৩৪১)

গুরু-ভক্তির ফল

গুরুভক্তি অবশ্য সাধন-জীবনের উন্নতিলাভে এক অসাধারণ সহায়িকা। এক হিসাবে ইহাকে সাধন-জীবনের দৃঢ় ভিত্তিও বলিতে পার। এই ভিত্তি শিথিল হইলে সাধনে উন্নতি বড়ই কঠিন, বড়ই দুরূহ। গুরুবাক্যে অবিচলিত বিশ্বাস পথের অর্দ্ধেক বাধা-বিঘ্ন অনায়াসে হরণ করিয়া নেয়। গুরুভক্তির সহায়তায় অহমিকা নাশ পায়, দর্প-দম্ভ পলাইয়া যায়, চরিত্র নম্র, কোমল ও মধুর হয়। ইহা অবশ্য-স্বীকার্য্য সত্য। গুরু-ভক্তির ফলে গুরুর নিজের কিছু উপকার হউক আর না হউক শিষ্য সত্য সত্যই লাভবান্ হন। (৩১শে বৈশাখ, ১৩৪১)

শিষ্যের দুর্বিনয় ও গুরুর ক্ষমা

দুর্বিনীত শিষ্যকে গুরুদেব যদি দৃষ্টান্ত শুনাইতে যান যে, কত কত শিষ্য গুরুর অসীম অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করার

পরেও নম্র, বিনীত, অদোষদর্শী মনে গুরুর আদর্শকে সেবা দান করিয়া তাঁহার অফুরন্ত আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইয়াছে, তাহা হইলে অহংপ্রমত্ত অজ্ঞান শিষ্য মনে করিবে যে, ইহা হইতেছে গুরুদেবের কথার চালবাজি, জোর করিয়া মানুষের উন্নত শিরকে তাঁর পদতলে নত করার ইহা কৌশল, একদল সুচতুর পরপিণ্ডোপজীবীর ব্যবসায় চালু রাখিবার ইহা ফন্দী। সুতরাং বিজ্ঞ ও বিবেচক গুরু তামসিক-ভাবাচ্ছন্ন শিষ্যকে "বিনয়ী হও, নম্র হও, সেবাপরায়ণ হও, ত্যাগ-স্বীকারে সমর্থ হও, অহংবুদ্ধির অভ্রংলিহ চূড়াকে নামাইয়া সাগরের জলে ডুবাও"—ইহা বলার প্রয়োজন থাকিলেও কেবল কাল-প্রতীক্ষায় চুপ মারিয়া থাকেন। কিন্তু শিষ্যের বিনয় তাহার আধ্যাত্মিক সাধনকে প্রগাঢ় করে,—দুর্বিনীত শিষ্যের সাধন প্রগাঢ় হয় না। প্রকৃত গুরুর ক্ষমাশীল না হইয়া উপায় নাই। মুখে প্রয়োজন মত একটু রুক্ষ রুদ্রভাব কখনো প্রদর্শন করিলেও গুরুহত্যার জন্য বদ্ধপরিকর পাপিষ্ঠ শিষ্যকেও তিনি ক্ষমা না করিলে কে করিবে? অন্যে কটু কথা বা অপমানজনক বাক্য সহিবে না। এমন কি মাতা-পিতার মত আত্মীয়তমেরাও নহে। কিন্তু গুরু যে সকল আত্মীয়ের চাইতে অধিক আত্মীয়! তাই তিনি সব সহিবেন। গুরুর গলা কাটিবার জন্য যে শিষ্য ছুরি শানাইতেছে, তিনি তাহাকেও অন্তরের অন্তরে ক্ষমা করিবেন, ক্ষমাপ্রার্থী হইল কি না হইল, তাহার বিচার গুরু করিবেন না।

শত অপরাধ করিয়াও ক্ষমা না চাহিয়া এই একটী স্থানে চিরকাল ক্ষমা মিলিবে, লৌকিক প্রয়োজনে বাহ্য আচরণে যদি কঠোরতা প্রকাশও পায়, আত্মিক প্রয়োজনে অন্তরের অন্তরে তিনি চির-প্রেমময় পরমক্ষমাশীল সদ্‌গুরু। অপরাধ করিয়া বা না-করিয়া তাঁহার নিকটে ক্ষমাপ্রার্থী হইলে ত' হিমালয়ের তুষার-কিরীট নিমেষে গলিয়া করুণার গঙ্গাধারায় পরিণত হইয়া তরতর বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। ধরিত্রীকে বলা হয় সর্ব্বংসহা। গুরু কোটি ধরিত্রীর ক্ষমা একত্র নিজের ভিতরে ধারণ করিয়া আছেন। সুতরাং আশ্বস্ত হও।

(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১)

গৃহী শিষ্যের পক্ষে সন্ন্যাসী গুরু

গৃহীদের পক্ষে সন্ন্যাসী গুরুর নিকট দীক্ষা নেওয়া কি অবিধি? সন্ন্যাসী গুরুর পক্ষেও কি গৃহীকে দীক্ষা দেওয়া দোষ? 'আশ্রমী' গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার কথা আছে। 'আশ্রমী' বল্‌তে কেউ কেউ বুঝেছেন, গৃহস্থাশ্রমী। তাঁদের যুক্তি এই যে, সর্ব্বাশ্রম-পরিত্যাগীই হচ্ছেন সন্ন্যাসী, সুতরাং সন্ন্যাসীকে আশ্রমী বলা চলে না। কিন্তু কেউ কেউ 'আশ্রমী' বল্‌তে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের ভিতরে যে-কোনও আশ্রমের মর্য্যাদা-রক্ষাকারীকে বুঝেছেন। এঁদের মতে ব্রহ্মচারী বা গৃহস্থ বা বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী এঁরা যে-কেউ উপযুক্ত হ'লে শিষ্যকে দীক্ষা দিতে

পারেন। সেই শিষ্যও গৃহীই হবেন বা ত্যাগীই হবেন, এর কোনো কথাই নেই। সেবা, পরিপ্রশ্ন ও প্রণিপাত নিয়ে যে-কেহ নিজেকে গুরুর শাসনাধীন করার জন্য কাতর মিনতি ক'রে প্রপন্ন হবে, তাকেই গুরু দীক্ষা দিতে পারেন। গুরুর প্রয়োজন গুরুত্ব, শিষ্যের প্রয়োজন প্রপন্ন হওয়া। এই দুইটী হচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা. কে গৃহী আর কে সন্ন্যাসী সে প্রশ্ন তার পরে। শুকদেব ত্যাগী, কিন্তু গৃহী জনক তাঁর উপদেষ্টা। আবার রাষ্ট্রপতি শিবাজী গৃহী, আর সন্ন্যাসী রামদাস স্বামী তাঁর গুরু। তবে সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য গৃহী মণ্ডন মিশ্রকে শিষ্যত্বে গ্রহণ ক'রে আর গৃহী থাকতে দেন নি, সন্ন্যাসী ক'রে নিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী কেশব ভারতীর শিষ্য শ্রীগৌরাঙ্গ সংসার ত্যাগ ক'রে-ছিলেন। এই সকল দেখে গৃহীদের পক্ষে সন্ন্যাসীর শিষ্য হওয়াতে ভয় আসা স্বাভাবিক। কিন্তু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসের প্রতি অপরিসীম পক্ষপাত থাকা সত্ত্বেও গৃহী শিষ্য থাকা অসম্ভব হয় নি, সন্ন্যাসী ভোলাগিরি হাজার হাজার গৃহীকে দীক্ষা দিয়ে ধর্ম্মাশ্রয়ী করেছেন, সুতরাং গৃহীদের ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। কিন্তু অনেকের দৃষ্টিতে গুরুদেব হচ্ছেন, হল্‌দির গুঁড়ো। হরিদ্রার চূর্ণ যেমন সব তরকারীতে লাগে, গুরুদেবটীকেও তেমন সব কাজে পাওয়া চাই। পাঁজি দেখে গৃহপ্রবেশের, ধান্যরোপণের, শস্যকর্ত্তনের, দ্বিরাগমনের, সাধভক্ষণের, বিদেশগমনের দিন-ক্ষণ-লগ্ন তিনি ব'লে দেবেন,

আবার বৎসরান্তে সালতামামির হিসাব-পত্র তিনিই খতিয়ে দেখবেন যে, শিষ্যের কোন্ প্রজা এখনো খাজনা পৌঁছে দেয় নি, কোন্ খাতক এখনো সুদ চুকিয়ে দেয় নি, শিষ্যের কন্যার বর খোঁজা, শিষ্য-পুত্রের জন্য প্রাইভেট টিউটার জোগাড় করা, শিষ্যের গোয়ালের জন্য একটী দুগ্ধবতী ভালো গাভী এনে দেওয়া, এসবও তাঁরই কাজ। অনেক হতভাগা যেমন বিয়ে ক'রে শ্বশুর-বাড়ীতে ঘর-জামাই থাকে, এসব গুরুরা তেমন মন্ত্র দিয়ে তারপরে শিষ্যের বাড়ীর পোষ্য হ'য়ে থাকেন। গুরুদেব সম্বন্ধে যাদের ধারণা এইরূপ বিকৃত, তাদের পক্ষে গৃহস্থ গুরু ছাড়া অন্য গুরুর ছায়া থেকেও এক যোজন দূরে থাকা ভাল।

(৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১)

গুরু-ভাব বর্জ্জিত দীক্ষা

'নিজেকে গুরু না ভাবিয়া আদি গুরুর চরণে নিজের সমগ্র গুরু-ভাব বিসর্জ্জন করিয়া যে দীক্ষাদান, তাহা এক বিচিত্র এবং অপূর্ব্ব বস্তু হইবে। আবার নিজেকে দীক্ষাদাতার শিষ্য বলিয়া গণনা না করিয়া দীক্ষাদাতা নিজে যেই আদিগুরুর শিষ্য, নিজেকেও সেই আদিগুরুরই শিষ্য বলিয়া অনুভব করতঃ যে দীক্ষা গ্রহণ, তাহাও এক অতি বিচিত্র এবং অপূর্ব্ব বস্তু হইবে। তোমরা তোমাদের অন্তরের সংস্কার এই আগামী যুগের অবশ্যম্ভাবী সুব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া গড়িতে

থাক। সীমাবদ্ধ বা ব্যক্তিবদ্ধ গুরুবাদ চিরকাল সঙ্ঘকে পুষ্টি এবং বৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। তোমরা নিজেদের পূর্ব্ব-সংস্কারমুক্ত নূতন মন লইয়া পুষ্টিবন্ত ও বৃদ্ধিশীল সঙ্ঘ-গঠনে কৃতকার্য্য হও। দীক্ষা দাও কিন্তু গুরু সাজিও না, দীক্ষা নাও, কিন্তু আদিগুরু ব্যতীত কাহারও শিষ্য বনিও না।"

(৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১)

গুরুবাক্যই একমাত্র সত্য

প্রশ্ন :—গুরুর্ব্বচঃ সত্যমসত্যমন্যৎ,—কথাটার মানে কি ?

উত্তর :—গুরুবাক্য ব্যতীত অপর বাক্যে যে সত্য আছে, একথা ভাবতে গেলে সাধকের সাধন-নিষ্ঠায় হানি আসে। তাই তাকে জোরসে উপদেশ দেওয়া হয়েছে,—"একমাত্র গুরুবাক্যকেই সত্য জেনে অপর সকল বাক্য বা উপদেশে অনাস্থা ক'রে গৃহীত পথে সিংহ-বিক্রমে চল।" কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মূলসত্য হচ্ছে গুরুবাক্য অর্থাৎ গুরুদত্ত সাধন, আর জগতের যত শাস্ত্র বা হিতোপদেশ সব হচ্ছে সেই মূল সত্যের অনুপূরক! উপদেষ্টা যত বড়ই হোন, আর শ্রোতা যত উচ্চাধিকারীই হউক, একটী মাত্র বাক্য বা একটী মাত্র সাধনের মধ্যে পূর্ণ সত্য কখনো আটক প'ড়ে থাকতে পারে না। কিন্তু একটী মাত্র বাক্যকে বা একটী মাত্র সাধনকে অবলম্বন ক'রে অবিরাম অবিশ্রাম চলতে থাকলে অন্তরের অনুভূতির ভিতর দিয়ে জীব পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎকার পায়। তখনই সে বুঝতে

পারে যে, জগতের যত মত আর যত পথ, সবই গুরুবাক্যের অনুপূরক বা পার্শ্বচিত্র মাত্র। তার আগে সে তা বুঝতে পারে না। শুধু যুক্তি দিয়ে একথা বুঝাও যায় না, যতক্ষণ না অনুভূতির প্রত্যক্ষ আস্বাদন লাভ করা যায়। যুক্তির পর যুক্তি মস্তিষ্কের ভিতর ঢুকে কচ্‌কচি আর গজ্‌গজি কত্তে থাকে, কিন্তু কার সঙ্গে যে কার কি সামঞ্জস্য, তা' ধরা পড়ে না। তাই গুরুদত্ত সাধন নিয়ে একনিষ্ঠ প্রযত্নে অবিশ্রাম সাধনা ক'রে সত্যকে নিজের চখে দেখার জন্য, নিজের কাণে শোনার জন্য, নিজের জিহ্বায় আস্বাদনের জন্য, নিজের প্রাণে বুঝার জন্য অন্য দিক থেকে অভিনিবেশ তুলে নিয়ে এসে সবটুকু অভিনিবেশ এক জায়গায় দেবার জন্যই বলা হ'য়েছে,—গুরু-বাক্যই একমাত্র সত্য, অন্য সব অসত্য। (৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১)

ব্যক্তিগত গুরুবাদের কুফল

বর্ত্তমান গুরুবাদ ব্যক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। ফলে, ব্যক্তিটীর যতদিন পরমায়ু, একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ বর্দ্ধনশীল ধর্ম্ম-গোষ্ঠীর বিস্তার মাত্র ততদিন। ব্যক্তিগত গুরু দেহ-রক্ষা কর্লেন, আর হয় তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মগোষ্ঠী লয় পেল, নতুবা সঙ্ঘের মধ্যে বা বাইরে একই সাধন-ধারা অবলম্বন ক'রে দুই বা ততোঽধিক নূতন গুরুরা আবির্ভূত হ'লেন এবং সকলের আধ্যাত্মিক শক্তি একই লক্ষ্যে প্রযুক্ত না হ'য়ে নিজ নিজ পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মগোষ্ঠীর সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত হ'ল। এঁদের দেহান্তের পরে আবার

এঁদের এক এক জনের শিষ্যদের মধ্য থেকে তিন চার পাঁচ জন ক'রে গুরু বেরুলেন এবং এঁরা নিজ নিজ ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র ক'রে পুনরায় নূতন নূতন ধর্ম্মগোষ্ঠীর পত্তন করলেন। এভাবে বংশানুক্রমে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগের ন্যায় ক্রমশঃ ধর্ম্মগোষ্ঠীও বিভক্ত হ'য়ে যেতে লাগ্‌ল। ফলে, পরিণামে একই আদিগুরুর শিষ্যানুশিষ্যদের মধ্যে কোনও প্রকারের প্রেমের, হৃদ্যতার বা ঐক্যের বন্ধন আর রইল না। প্রত্যেকেই সম্প্রদায় বিস্তার কর্ত্তে লাগ্‌লেন নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের মহিমাকে প্রধান ক'রে নিয়ে এবং একই সাধন-ধারার মধ্য দিয়ে দিনের পর দিন যত গুরুর আবির্ভাব হ'তে লাগ্‌ল, ততই শুধু ভেদ, বিচ্ছেদ এবং দূরত্বের সৃষ্টি হ'তে লাগ্‌ল। এই কারণেই উদারতম ধর্ম্মের অধিকারী হ'য়েও আপনারা দৃঢ়তম ধর্ম্ম-সঙ্ঘের আশ্রিত ব'লে গর্ব্ব কর্ত্তে পারেন না। আপনাদের ধর্ম্মসঙ্ঘ অতি দুর্ব্বল, আক্রমণ মাত্রেই পতনোন্মুখ, বাইরের কোনও উৎপাত এসে বিভীষিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হওয়া মাত্র তাসের ঘরের ন্যায় ফুৎকারে উড্ডয়নশীল।

(৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১)

আদিগুরুই একমাত্র গুরু

এই কারণেই ধর্ম্মসঙ্ঘ থেকে ব্যক্তিগত গুরুবাদের উচ্ছেদ সাধনের প্রয়োজন এসেছে। যে যাকে দীক্ষা দিক্, গুরু সেই একজন, যিনি আদিগুরু। যে যার কাছ থেকে দীক্ষা নিক্,

শিষ্য সে মাত্র একজনের, যিনি আদিগুরু। এক আদিগুরুর শিক্ষাই শিষ্য-পরম্পরায় যুগের পর যুগ প্রবাহিত হচ্ছে, সুতরাং এই শিক্ষা, এই দীক্ষা, এই তত্ত্ব, এই সাধন, এই আদর্শ, এই অনুশীলন একমাত্র আদিগুরুরই দেওয়া,—এই বিশ্বাসটীকে, এই প্রত্যয়টীকে, এই নিষ্ঠাটীকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক'রে তুলতে হবে! গঙ্গোত্রী থেকে যে ধারা বহির্গত হ'য়েছে, তা'ই হরিদ্বারে এসে সমতল ভূমির বুকের স্পর্শ পেল, তা'ই আবার প্রয়াগ, কাশী, পাটনা, কল্‌কাতা হ'য়ে এসে সমুদ্রে পড়্‌ল। কোনও দেশের মাটী লাল ব'লে হয়ত গঙ্গার জল একটু লাল হ'য়েছে, কোনও দেশের মাটী বেলে ব'লে হয় ত' গঙ্গার জল একটু ঘোলাটে হয়েছে, কিন্তু যে দেশের বুক স্পর্শ ক'রেই এই জল ব'য়ে যাক্‌, জল কিন্তু গঙ্গারই, এ জলকে কেউ প্রয়াগের জল, কাশীর জল, পাট্‌নার জল বা কল্‌কাতার জল বলে না, যেখান থেকেই যে এক গণ্ডূষ গ্রহণ করে, সেখানেই এর নাম দেয় গঙ্গার জল। ঠিক এই রকম ভাবে আদিগুরুকে একমাত্র গুরু মেনে সকল দীক্ষা-দাতার সকল শিষ্য যখন নিষ্ঠার সঙ্গে একই সাধন কর্ব্বে, ধর্ম্ম-সঙ্ঘে বল এবং ঐক্য আস্‌বে তখন। জান্‌তে হবে আদিগুরুই একমাত্র গুরু। (৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১)

দীক্ষাদাতাদের দায়িত্ব

আদিগুরুতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা স্থাপন ক'রে যখন কোনও ধর্ম্ম-সঙ্ঘ নিজেকে স্থাপন কত্তে উদ্যত হবে, তখন দীক্ষাদাতারা

অনেকেই হয়ত নিজ নিজ ব্যক্তিত্বকে আদিগুরুর পায়ে নিঃশেষে বলি দিয়ে সম্প্রদায়-পোষণে সক্ষম হবেন, কিন্তু দেশ-প্রচলিত গুরুবাদের অনুরাগী অপরাপর বহু ব্যক্তির অনুকরণে দীক্ষাপ্রাপ্তরা হয়ত নিজ নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিলাষ ও আব্‌দারের পরিপূরণার্থে নানা বাধা সৃষ্টি কর্ব্বে। কিন্তু এসব বাধা প্রেমের ও সত্যের বলে দূরীভূত ক'রেই ভবিষ্যতের প্রত্যেক দীক্ষা-দাতাকে দীক্ষিতের প্রাণে আদিগুরুর প্রতি অকুণ্ঠিত আত্ম-সমর্পণ সৃষ্টি কত্তে হবে। এইটী দীক্ষাদাতাদের একটী সুবিশাল দায়িত্ব এবং অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য। (৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১)

দীক্ষা, তাহার উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিগত গুরুবাদ

ভগবান্‌কে লাভ করা, ভগবান্‌কে জীবনের জীবন-রূপে পাওয়াই দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য। দীক্ষা ব্যতীতও ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। কিন্তু তদ্রূপ ক্ষেত্রে নিষ্ঠা কম থাকে বলিয়াই বিলম্ব ঘটে এবং অনেক ক্ষেত্রে দীক্ষাহীনতার দরুণ বারংবার মত ও পথের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া দিগ্‌ভ্রম জন্মে। পিতৃ-পিতামহের গুরু-বংশ হইতে দীক্ষা না লইয়া অন্য গুরুর কাছ হইতে দীক্ষা লইলে দোষ হয় না, তবে, যে গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লইবে, তিনিও যদি সর্ব্বপ্রকারে পিতৃ-পিতামহের গুরুর বা গুরু-বংশাবতংসের সমান হন, তবে আর অন্যত্র যাইয়া কি লাভ হইল? যে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্য

দিয়া বর্ত্তমান নরদেহে আমার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাতে আমার কাছ হইতে দীক্ষিত হইলে আমি নিজেকে তোমাদের গুরু বলিয়া ভাবিতে ও ভাবাইতে, বুঝিতে ও বুঝাইতে, চলিতে ও চালাইতে বাধ্য হইতেছি এবং হইব, কিন্তু আমার জীবদ্দশায় মৎপ্রেরিত কোনও সাধকের নিকটে বা আমার পার্থিব দেহের অবসানাবস্থায় মদাদর্শ-সেবক কোনও পরহিতকারীর নিকটে দীক্ষা নিলে দীক্ষাদাতা সর্ব্বপ্রকারে নিজ গুরুভাব বিসর্জ্জন দিয়া তোমাকে স্বকীয় কনিষ্ঠ ধর্ম্মভ্রাতা-রূপে গ্রহণ করিয়া একদিকে দীক্ষার নিষ্ঠাবর্দ্ধক উদ্দেশ্য অটুট রাখিবেন, অপর দিকে ব্যক্তিগত গুরুবাদের প্রসারজনিত সকল অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়ার প্রভাব হইতে সমাজকে রক্ষা করিবেন। একই মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াও গুরুরা কুলপরম্পরায় একই আদর্শকে প্রচার করেন নাই, ব্যক্তিগত প্রভুত্ব এবং খামখেয়াল এক এক সময়ে এক এক প্রকারের মুদ্রাদোষ উৎপন্ন করিয়া একমন্ত্রের উপাসকদের ভিতরেই শত ভেদ শত ছেদ সৃষ্টি করিয়াছে। এই কারণেই আমার নির্দ্দেশ পালিয়া চলিতে হইলে আমার অনুসরণকারীরা নিজেরা দীক্ষাদাতা হইয়াও গুরুবোধকে নির্ব্যক্তিক করিয়া রাখিবে।" (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১)

গুরুগিরির উভয় সঙ্কট

কেহ যদি গুরুগিরি না করেন, তাহা হইলে এক শ্রেণীর ত্রাণেচ্ছু ব্যক্তিদের পরিত্রাণের পথ কন্টকাকীর্ণ হইয়া থাকে।

আবার যিনি গুরুগিরি করেন, তিনি ক্রমশঃ নিজ আধ্যাত্মিক অধিষ্ঠান হইতে স্খলিত হইয়া পতিতই হইতে থাকেন। ইহা গুরুগিরির এক নিদারুণ সঙ্কট। এই কারণে আমার অনুবর্ত্তিগণ সর্ব্বপ্রকার গুরু-অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া আমার ধর্ম্মকে প্রচার করিবেন এবং নিজেদের উপরে ব্যক্তিগত ভাবে যাহাতে নবদীক্ষিতেরা গুরুভাব আরোপ না করেন, তদ্রূপ ভাবে ধর্ম্মের প্রসার-সাধন করিবেন।" (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১)

জগতের গুরু হও

আমি তোমাদের সম্পর্কে অন্তরে কি কামনা পোষণ করি জানো? আমি চাই তোমরা প্রত্যেকে এক একজন জগদ্‌গুরু হও। একদা ভারত নিখিল জগতের গুরু ছিল, আজ সে নিখিল জগতের শিষ্য হ'য়েছে বল্লেও ভুল বলা হয়, আজ সে নিখিল জগতের ক্রীতদাস হ'য়েছে। এই দাসত্ব, এই পরানুকরণ, পরেচ্ছার এই অর্থহীন অনুবর্ত্তন, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরসেবার জন্য বাধ্যকর জীবন-গ্রহণ,—এই দৈন্য থেকে, এই লজ্জা থেকে, এই পরাভব থেকে তোমরা ভারতকে উদ্ধার কর। জগতের উপরে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে প্রভুত্ব বিস্তার ক'রে তোমরা রক্তশোষী, বিত্তশোষী, শান্তিশোষী উপদ্রবে পরিণত হও, এ আমার কামনা নয়। কিন্তু নির্ব্বীর্য্য ক্লীবের মত উপুড় হ'য়ে প'ড়ে থেকে থেকে নিজের ঘরে ব'সে সুদূর দেশের অধিবাসী জাপানী, মার্কিনী, জার্ম্মেণ প্রভৃতি বিদেশীর লাথি

খেয়ে যে মরছ,—এই দুর্দ্দশার দ্রুত অবসান আমি চাই। তারই জন্য তোমাদের ভিতরে অবিলম্বে জগদুদ্ধারকারী বিশ্ব-গুরুর অচিন্তনীয় শক্তির আজ আবির্ভাব প্রার্থনা কচ্ছি।

(২৫শে আষাঢ়, ১৩৪১)

নির্ব্যক্তিক গুরুবাদের প্রয়োজনীয়তা

ব্যক্তিগত গুরুবাদকে এতদ্দেশ হইতে উচ্ছেদ করা অতীব কঠিন। কিন্তু ভাবী কালের গুরুগণের স্বার্থত্যাগ ও আত্ম-ত্যাগের ফলেই তাহা সম্ভব হইবে। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী ভারতের প্রায় দুই হাজার বৎসরের ঐতিহ্য ব্যক্তিগত গুরুবাদের প্রশ্রয়দাতা। এই গুরুবাদ কেবলই অকুশল করিয়াছে, ইহা মনে করা সঙ্গত হইবে না। ব্যক্তি-বিশেষকে গুরু অর্থাৎ ব্রহ্ম-প্রতীক জ্ঞান করিয়া ঐকান্তিক অভিনিবেশ প্রদানের ফলে অনেক চঞ্চলচেতা বহির্বিচরণকারী বিক্ষিপ্ত মন নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে নিবিষ্ট হইয়া বসিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং ইহার দরুণ অনেক পতিতের উদ্ধার হইয়াছে। সত্যকে সর্ব্ব সময়েই স্বীকার করিয়া নিতে হইবে, সত্যকে অস্বীকার করার চেষ্টার ভিতরে বাহাদুরী থাকিতে পারে কিন্তু মঙ্গল নাই। ব্যক্তিগত গুরুবাদের ভিতরে সত্য এবং কুশল ছিল বলিয়াই ইহা এরূপ ব্যাপক প্রসার লাভ করিতে পারিয়াছে, কিন্তু ব্যক্তিত্ব-বর্জ্জিত গুরুবাদ তদপেক্ষা বৃহত্তর মঙ্গল, মহত্তর সত্য,

ব্যাপকতর তত্ত্বোপলব্ধি সর্ব্বসাধারণের করায়ত্ত করিবে। বেদান্তের প্রাংশুলভ্য পরমতত্ত্ব এতদিন দুই দশ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপলব্ধি-গম্য ছিল, কিন্তু নির্ব্যক্তিক গুরুবাদের সুপ্রসার সেই মহাবস্তুকে আপামর সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সহজ-লভ্য করিবে। ইহা জগতের এক পরম প্রয়োজন এবং এই পরম-প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার ইহাই সন্ধিক্ষণ।

(৩১শে শ্রাবণ, ১৩৪১)

বিনা দীক্ষায় শিষ্য

দীক্ষা ছাড়া কি শিষ্য হওয়া যায় না? আমার দীক্ষিত শিষ্যের সংখ্যা যত, তার চেয়ে অদীক্ষিত শিষ্যের সংখ্যা অনেক গুণ বেশী। তুমি সেই রকম শিষ্যই থাক। আমি কি মন্ত্র জপ করি, কেমন ক'রে জপ করি, আমার আধ্যাত্মিক আশীর্ব্বাদ কি, তা' ত' আর কারোই অজানা নয়। আমি গোপন ক'রে কোনো জিনিষই রাখিনি। আমার 'গুরুতা'য় trade secret (ব্যবসায়ীর গুপ্ততা) ব'লে কোনো জিনিষ নেই। আমার ফটোখানার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলবে,—"মশাই, আপনার মন্ত্র নিচ্ছি।" ব্যস। তারপর থেকে অবিরাম নাম-সাধন ক'রে যাও। আমার কাছ থেকে দীক্ষা না নিলেও তুমি আমার শিষ্য এভাবে হ'তে পার। কাণ পাকুড়ে নিয়ে মন্ত্র না দিলেই শিষ্য হ'তে পার্ব্বে না, এমন ত' নয়!

(১২ই ভাদ্র, ১৩৪১)

দীক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য

দীক্ষা জীবনের এক পরম সংস্কার। কিন্তু সেই সংস্কারের মানে কি? মৃতের উপরে কাষ্ঠসংস্কারে যেমন শবদেহের বিনাশ ঘটে, দীক্ষারূপ সংস্কারে তেমন কামনা-বাসনা-রূপ পূতিবস্তুতে আচ্ছন্ন আত্মার কদর্য্যতা দূর হয়, আত্মা শুদ্ধ, নিষ্পাপ এবং স্বভাব-প্রতিষ্ঠিত হন। এভাবে যে পূর্ব্বসংস্কারের বিলোপ-সাধন, তারই জন্য দীক্ষা-গ্রহণ প্রয়োজন। কাণে একটা ফুঁ নিয়ে কোনও প্রকারে লোকাচারের অনুবর্ত্তনের জন্যই দীক্ষা-গ্রহণ নয়। কথায় বলে,—দীক্ষা না নিলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না। তার মানে হচ্ছে এই যে, মনের ময়লা কাটাই হচ্ছে দীক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য। দীক্ষার বলে যার মনের ময়লা কেটেছে, তার হাতের জল সকল শুভ কার্য্যে সিদ্ধবস্তু। দীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হচ্ছে, মনের ময়লা কাটান, লোক-দেখান শিষ্য হওয়া নয়। (১২ই ভাদ্র, ১৩৪১)

আমার প্রতিচিত্রই আমার প্রতিনিধি

আমার মুখ থেকে অভয়-মন্ত্র শুনে নিলে তোমার যে উপকার হবে, আমার নিজের আদেশ এই যে, আমার প্রতিমূর্ত্তির সাম্নে দাঁড়িয়ে যদি সেই মন্ত্র নাও, তবে তাতেও তোমার সেই উপকারই হবে। আমার প্রিয় ভক্তদের জন্য এটী আমার চিরন্তন অঙ্গীকার। দেশ-কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এই সীমাবদ্ধ দেহে

বদ্ধ থেকে আমি আমার অনন্ত অসীম সত্তাকে আমার প্রত্যেক অনুরাগী জনের নিকটে নিয়ে হাজির কত্তে পাচ্ছি না যে, সকলের কাণে এই জড়-রসনায় উচ্চারণ ক'রে অখণ্ড-নাম প্রবেশ করাই। অথচ আমার প্রাণের সাধ, তিন ভুবনে একটী প্রাণীও যেন অখণ্ড-নামের মঙ্গল-মধু থেকে বঞ্চিত না থাকে। জোর ক'রে কাউকে আমি মহামন্ত্রের সাধক কত্তে চাই না, কিন্তু প্রাণে যার রুচি আছে, যে মহামন্ত্রের সাধন কর্ব্বে, সে যেন কোনও কালে, কোনও যুগে আমার পার্থিব দেহের অনুপস্থিতির দরুণ নিজেকে মঙ্গলমধু থেকে বঞ্চিত দেখে ব্যথিত না হয়। এজন্যই আমার নির্দ্দেশ এই যে, অখণ্ড-মন্ত্র গ্রহণ ক'রে সাধক-জীবন গ্রহণের পক্ষে যখন প্রয়োজন উপস্থিত হবে, তখন আমার যে-কোনও প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিচিত্রই আমার পরিপূর্ণ প্রতিনিধি। (১২ই ভাদ্র, ১৩৪১)

অদীক্ষিত শিষ্য দ্বারা গুরুর অমরত্ব

এমন কুদিন আসতে পারে, যেদিন মানবদেহধারী একজন ব্যক্তিও এই জগতে আমার প্রতিনিধিরূপে পবিত্র ওঙ্কারমন্ত্র প্রচার কর্ব্বেন না। সবাই হয়ত নিজেকে প্রধান ক'রে, দেশ-প্রচলিত প্রথানুযায়ী নিজের গুরুত্বকে দীক্ষাভিলাষী ব্যক্তিদের সমক্ষে উপস্থিত ক'রে নিজে পরব্রহ্মের সাথে অভেদরূপে পূজা পাবার বাসনা নিয়ে সঙ্কীর্ণ এক সাম্প্রদায়িক পরিবেষ্টন সৃষ্টি ক'রে অপর দশজন সমসাধন-প্রচারকদের সাথে কলহ সৃষ্টি

কর্ব্বে। দীক্ষাদাতা হ'য়েও আত্মবিলোপ ক'রে নিজের গুরুত্বকে সম্পূর্ণরূপে শিষ্যের হিতের কাছে, জগতের হিতের কাছে, পরমোৎকৃষ্ট আদর্শবাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে বলিদান ক'রে চলার মানুষ যদি জগতে না থাকে, তখন কি অখণ্ড-দর্শন প্রচারক এবং সাধকের অভাবে এই অখণ্ডবাদ জগৎ থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে ধুয়ে মুছে যাবে? নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না। আমার প্রতিচিত্র বা প্রতিমূর্ত্তিও যদি জগতে না থাকে, তাহ'লে তখন নবযুগ-নির্ম্মাতা মহাসাধক তপস্বী আমার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্পণ ক'রে ওঙ্কাররূপী অখণ্ড-মন্ত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে নূতন আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম-প্লাবনে জগদ্-ব্রহ্মাণ্ড পরিপ্লাবিত কর্ব্বেন। আমার অমরত্ব আমার দীক্ষিতানুদীক্ষিত শিষ্যের দ্বারা না হ'য়ে অদীক্ষিত শিষ্যের ভিতর দিয়ে এভাবে স্বীকৃত হবে। (১২ই ভাদ্র, ১৩৪১)

দীক্ষাদানের উত্তরাধিকারী

প্রশ্ন :—এমন কি হ'তে পারে না যে, দেশ-কাল-পাত্র বিচার ক'রে আপনি হয়ত কাউকে ভবিষ্যতে আপনার প্রতিনিধিরূপে সকলকে দীক্ষাদানের অধিকার দিয়ে যাবেন।

উত্তর :—খুব হ'তে পারে। তা' অস্বাভাবিকও হবে না। সেই সুপাত্র এলে সে তার যোগ্য অধিকার যথাকালে পাবে। কিন্তু এই নশ্বর দেহের দীর্ঘকাল অস্তিত্বের বিশ্বাস কি? মৃত্যু দূরে নয়, এই কথা ভেবে কাজ কর্ত্তে হবে।

(১২ই ভাদ্র, ১৩৪১)

উত্তম শিষ্যের লক্ষণ

দেখ্, রহিমপুর আশ্রমে যখন এলি, তখন দেহে, মনে, স্বাস্থ্যে বা উৎসাহে কোনো কাজের যোগ্য ছিলি না। তোর স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য নিজের হাতে আমি তোর তলপেটে দৈনিক একশ কলসি ক'রে জল ঢেলেছি। শরীর কঠিন শ্রমে অপটু, এজন্য তোকে অন্য গুরুতর কাজ থেকে বিশ্রাম দিয়ে রান্নার অল্পশ্রমসাধ্য কাজ কত্তে পাঠিয়েছি। ব'লে গেলে সেই চিঠি লেখা কিম্বা লেখা চিঠির নকল করা ছাড়া কোনো গুরুতর মস্তিষ্ক-শ্রমের কাজও কখনো তোকে দিই নাই। কিন্তু আজ এখানে এসে আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠানের প্রায় অধিকাংশ বৃহৎ কাজের দায়িত্ব এসে তোর উপরে পড়্‌তে যাচ্ছে। তুই খুব উপযুক্ত, এজন্যই পড়্‌তে যাচ্ছে, তা' নয়। কিন্তু তুই লেগে আছিস্, অন্যেরা জলস্রোতের তৃণের মত ঘাটে কতক্ষণ লেগে থেকে আবার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। এই একটা মাত্র কৃতিত্বের দরুণই তুই ধীরে ধীরে অপর সকল সহকর্ম্মীর উপরে নেতৃত্ব করার অধিকার পেতে যাচ্ছিস্। এসময় বাছা, মাথাটা ঠিক্ রেখে চল্‌তে হবে। নতুবা পুনর্ম্মূষিক হ'তে বেশী সময় লাগবে না। গুরুর কাছে কুণ্ঠাহীন আনুগত্যে, দ্বিধাহীন নিষ্ঠায়, মৃত্যুসঙ্কল্প-দৃঢ়তায় আমৃত্যু লেগে থাকার পুরুষকারই উত্তম শিষ্যের লক্ষণ।

(১৩ই ভাদ্র, ১৩৪১)

পরমাত্মাই গুরু

আপনি আমাকে গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ইহা আপনার অন্তরের সৌজন্য এবং সুবিনীত ভাবের পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাবা, জগতের একজনের সম্পর্কেও আমার মনে গুরুভাব নাই। দীক্ষিত এবং অদীক্ষিত আমার সকল ভক্তকে আমি আমার সতীর্থ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। একমাত্র গুরু নিখিলেশ্বর পরমাত্মা। তাঁহাকেই গুরু বলিয়া জানিবেন এবং তাঁহারই উদ্দেশ্যে অন্তরের গুরুভাব অর্পণ করতঃ তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিবেন। (১৬ই ভাদ্র, ১৩৪১)

দীক্ষাগ্রহণান্তর সাধন না করা

মঙ্গলময় নামে দীক্ষা পাইয়া তৎপরে সেই নামে অরুচি বোধ করা এক মহাদুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া জানিও। মহাদুঃখ ললাটে না থাকিলে কেহ দীক্ষা পাইয়াও নামে অবহেলা করে না। অদীক্ষিতেরা যে নামে অবহেলা করে, তাহার যুক্তি বুঝিতে পারি। স্বয়ং-নির্ব্বাচিত নাম বলিয়া সকল সময়ে নামে মন একনিষ্ঠ হইয়া লাগিয়া থাকিতে চাহে না, বারবার ভিন্ন ভিন্ন নামকে অবলম্বন করিতে প্রলুব্ধ হয়। কিন্তু দীক্ষিতের ত' মন একটী মাত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে একনিষ্ঠ করা অতি সহজ। দীক্ষারূপ অনুষ্ঠানটীই এই সহজতার সম্পাদক। তথাপি যখন নাম ভাল লাগিতেছে না, তখন

জোর করিয়া মনকে নামে বসাও। মন যতই বিদ্রোহী হইবে, তুমিও ততই রণোন্মুখ হও। মন যতই অবাধ্য হইবে, তুমিও তত কড়া শাসনে রত হও। অবশ্য দুর্দ্দমনীয় মন তোষামোদে বাগ মানিবে না, তাহাকে জবরদস্তির দ্বারা অনুগত করিতে হইবে। দীক্ষিত হইলে অথচ সাধন করিবে না, ইহা তোমার পক্ষে যেমন ক্ষতিকর, তোমাকে যিনি দীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহার পক্ষেও তেমন অপ্রশংসার। অবশ্য কোনও কোনও মহাপুরুষ জীবের কুশল সম্পাদনের বুদ্ধিতে অপাত্রেও ব্রহ্মনাম প্রদান করেন, কিন্তু তুমি যে অপাত্রই থাকিতে চাহ, ইহা কি মূর্খতার পরিচায়ক নহে? (১৬ই ভাদ্র, ১৩৪১)

নারীর গুরুরূপে আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা

স্ত্রীদেহধারিণীদের গুরুরূপে আবির্ভূত হওয়ায় ক্ষতি কি? অতীতে যখন ভারতবর্ষে গুরুবাদ ছিল না, তখন বহু নারী আচার্য্যারূপে পুরুষ-শিষ্যদের বেদ পড়িয়েছেন, শাস্ত্র শিখিয়েছেন। অত্রিবংশীয় বিশ্ববারা ছয়টী ঋক্ রচনা করেন, অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্‌দেবী ঋগ্‌বেদের একটী সূক্তে আটটী মন্ত্র রচনা করেন, অত্রিবংশীয়া অপালা ঋগ্‌বেদের একটী সূক্তে আটটী মন্ত্র রচনা করেন, ইন্দ্রের জননী অদিতি ঋগ্‌বেদের তিনটী ঋক্ রচনা করেন, যমী ঋগ্‌বেদের দুইটী

ভিন্ন সূক্তে দশটী মন্ত্র রচনা করেন, অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতী ঋগ্বেদের একটী মন্ত্র রচনা করেন, কাক্ষিবানের কন্যা ঘোষা ঋগ্বেদের দুইটী সূক্ত রচনা করেন, সূর্য্যা ঋগ্বেদের একটী সূক্ত রচনা করেন। এঁরা সকলেই গুরু বা গুরুস্থানীয়া। বেদ-রচনার পরবর্ত্তী যুগে অর্থাৎ উপনিষদের যুগে আত্রেয়ী ও গার্গী নিজেদের অধ্যাত্মজ্ঞানে অতুলনীয়া হয়েছিলেন এবং বহু জ্ঞানার্থীকে জ্ঞান-শিক্ষা দিয়েছিলেন। এতগুলি নারীর গুরু-রূপে আবির্ভাবে অতীত কালে যদি কোনও ক্ষতি না হ'য়ে থাকে, তবে আজও ক্ষতির কারণ কিছু নেই। কিন্তু তবু যদি জিদ্ কর যে, নারীর গুরুত্বে লাভ কি, তবে তা'ও সানন্দে বল্‌ব। তোমরা একটু ফুরসুৎ পেলেই নারী জাতিকে এক অতি নিকৃষ্ট জাতি ব'লে অবজ্ঞা ক'রে থাক। দুই চারিজন শক্তিশালী স্ত্রীগুরু আবির্ভূত হ'য়ে তোমাদের সেই ভ্রম ভেঙ্গে এবং স্ত্রীজাতির সেই গ্লানি দূর ক'রে দিচ্ছেন। তোমরা কাম-চর্চ্চায় ও নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি-বিষয়ক ধ্যানে এত ঘোরতর ভাবে নিমগ্ন হচ্ছ যে, নিজের জননীকে পর্য্যন্ত পূজার দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পার না। এই জন্য নারী-দেহ ধারণ ক'রে কেউ কেউ আবির্ভূত হ'য়ে তোমাদের অন্তরের বিচলিত মাতৃ-শ্রদ্ধাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়ে যাচ্ছেন। স্ত্রীজাতির প্রতি সম্যক্ কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পাদনে যোগ্য পুরুষ-গুরু কদাচ মিলে, এই কারণে অবহেলিতা স্ত্রীজাতির প্রতি পরিপূর্ণ ভাবে গুরুর

কর্ত্তব্য প্রতিপালনের প্রয়োজনে শক্তিশালী স্ত্রী-গুরুদেরও আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী হচ্ছে।

(২৩শে ভাদ্র, ১৩৪১)

নারীর স্ত্রী-গুরু, পুরুষের পুরুষ-গুরু

স্ত্রী-গুরুই বল, আর পুরুষ-গুরুই বল, উভয়ের মধ্যেই কার্য্যপরিচালনের কতকগুলি সীমাবদ্ধতা আছে। স্ত্রী-লোকেরা শুধু স্ত্রী-গুরুর কাছেই দীক্ষা নেবে, পুরুষেরা শুধু পুরুষ-গুরুর কাছেই দীক্ষা নেবে, এই জাতীয় নিয়ম প্রতিষ্ঠা কত্তে পাল্লে অবশ্য সেই লেঠা কতকটা চুকে যায়। যেমন ধর, একটী পুরুষ অনুরাগিণী স্ত্রী নিকটে থাকা সত্ত্বেও কামবেগ-ধারণে অক্ষম হ'য়ে পরনারীর প্রতি আসক্ত ভাব অনুভব কচ্ছে। স্ত্রী-গুরুর নিকটে গিয়ে একথা প্রকাশ ক'রে বলা তার পক্ষে কঠিন কাজ, আর স্ত্রী-গুরুর পক্ষেও আবশ্যকীয় সকল উপদেশ দেওয়া সহজ নয়। অথবা ধর, একটী নারী স্বামীর যথেষ্ট যত্ন-সোহাগ সত্ত্বেও একটী পরপুরুষের প্রতি অন্তরের তীব্র আকর্ষণ অনুভব কচ্ছে। এক্ষেত্রে পুরুষ-গুরুর কাছে গিয়ে এসব কথা খুলাখুলি ব'লে প্রতিকারের পন্থা জানতে চাওয়া তার পক্ষে একরূপ অসম্ভব এবং খুব সহজ ক'রে কথাটা ব'লে ফেললেও পুরুষ-গুরুর পক্ষে এতৎসম্পর্কিত আবশ্যকীয় উপদেশ নিজ স্ত্রী-শিষ্যকে নিঃসঙ্কোচে দেওয়া অতি কঠিন। নৈতিক জীবনের এতজ্জাতীয় সঙ্কটের মুহূর্ত্তে নারীদের পক্ষে

নারী-গুরু এবং পুরুষদের পক্ষে পুরুষ-গুরু বিশেষ সহায়তা কত্তে পারেন। (২৩শে ভাদ্র, ১৩৪১)

আধ্যাত্মিক সঙ্কটে গুরু

সঙ্কট যতক্ষণ নৈতিক, ততক্ষণ নারীকে পুরুষ-গুরুর চেয়ে স্ত্রী-গুরুই শ্রেয়ঃ মনে কত্তে হবে এবং পুরুষকে নারী-গুরুর চেয়ে পুরুষ-গুরুকেই বরণীয় জান্‌তে হবে। কিন্তু শিষ্যের সঙ্কট সর্ব্বদা শুধু নৈতিকই থাকে না, আধ্যাত্মিক সঙ্কটই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সঙ্কট। অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিশ্বাসই শিষ্যের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিপদ। ইষ্টে অবিশ্বাস, মন্ত্রে অবিশ্বাস, সাধন-পন্থায় অবিশ্বাস এসবের চেয়ে বৃহত্তর সঙ্কট সাধক-জীবনে আর কিছু নেই। সেই সময়ে যিনি এই হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে এনে দিতে পারেন, বিচলিত অবস্থাকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত কত্তে পারেন, প্রকৃত গুরু হচ্ছেন তিনি। সেই সময়ে কার চিবুকে আছে দাড়ি, আর কার কাণে আছে দুল, কার নাকের নীচটায় আছে গোঁফ, আর কার হাতে আছে চুড়ী কিম্বা বলয়, এই বিচারের অবসর নেই। তখন স্ত্রী-দেহধারিণী হোন, আর পুরুষ-দেহধারী হোন, নিজের আধ্যাত্মিক সম্পদ দিয়ে যিনি শিষ্যের হিত-সাধন কর্ব্বেন, তাঁর মত বন্ধু নেই, তাঁর মত আত্মীয় নেই, তাঁর মত হিতৈষী নেই। তখন তিনিই পিতা, তিনিই মাতা, তিনিই ভ্রাতা, তিনিই পালয়িতা, তিনিই রক্ষাকর্ত্তা, তিনিই পরিত্রাতা। (২৩শে ভাদ্র, ১৩৪১)

গুরুর আত্ম-বিলোপ

তোমার গুরুদেব সম্পর্কে যে সকল কথা লিখিয়াছ, তৎসম্পর্কে স্বপক্ষে বা বিরুদ্ধে আমার কোনও মতামত প্রকাশ না করাই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু একটী কথা না বলিয়া পারিব না। আমি আমার শিষ্যদিগকে অকাতরে উপদেশ দিয়া থাকি যে,—'আমার ভিতরে দোষ দেখিলে তোমরা সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে উপকৃত ও সুন্দরতর করিও, আমার ভিতরে সংশোধনাতীত দোষ দেখিলে বিনা দ্বিধায় এবং নির্ম্মম চিত্তে আমাকে বর্জ্জন করিও, আমার প্রতি আনুগত্য বা বাধ্যতার অনুশীলন করিয়া করিয়া নিজ স্বাধীন সত্তায় বিসর্জ্জন-দিবার কোনও প্রয়োজন নাই, আত্মশক্তির বিশ্বাসকে পরাকাষ্ঠায় নিয়া পৌঁছাইয়া তোমরা পরমোপাস্য পরব্রহ্মকেই তোমাদের গুরু বলিয়া উপলব্ধি করিতে যত্নবান হইও,—ইত্যাদি।' কোনও গুরু জগতে যাহা বলেন নাই, আমি আমার শিষ্যদিগকে তাহা বলিয়াছি। পৃথিবী জুড়িয়া শিষ্যরা গুরুর নিকটে আত্মবিলোপ করে, আমি শিষ্যদের নিকটে আত্মবিলোপ করিয়াছি। শিষ্যকে প্রধান রাখিয়া আমি ক্রমশঃ যবনিকার অন্তরালে সরিয়া যাইতেছি। তাহাকে সর্ব্বকার্য্যে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া আমি নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে নিজ স্বাধীন সত্তার সঙ্গে সঙ্গেই বারিধির অতল তলে নিমজ্জিত করিয়া দিতেছি। আমার প্রভুত্ব, আমার কর্ত্তৃত্ব, আমার ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব আমি নির্ম্মম ভাবে

শিষ্যের আত্মপ্রকাশের নিকটে নিষ্পেষিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। ইহা আমি বর্ত্তমান যুগের গতি, রীতি এবং প্রয়োজনের মুখপানে তাকাইয়া করিয়াছি, একথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে না। (২৬শে ভাদ্র, ১৩৪১)

অদোষদর্শী গুরু

কিন্তু আমার পরিপূর্ণ আত্মবিলোপের ভিতর দিয়া আমার জীবনের সার্থকতা আসিতে পারে, আমার আত্মবিলোপে আমার শিষ্যের কোন্ সার্থকতা থাকিতে পারে? গুরুরূপে একটী শিষ্যকেও যে জীবনে কোনও আদেশ প্রদান করিলাম না, পরন্তু দিনের পর দিন আর যুগের পর যুগ কেবলই প্রতীক্ষা করিয়া গেলাম যে, তার সহজ স্বভাবে সে আপনি যাচিয়া কখন আদেশ চাহিবে, আমার এই নিজস্বতার বিসর্জ্জন আমার পক্ষে মহাশ্লাঘার হইতে পারে, কিন্তু আমার এই বিসর্জ্জনে আমার শিষ্যের শ্লাঘার কি আছে? কোনও শিষ্য এই একটা কথা কখনও ভাবিয়া দেখে নাই কিম্বা এই বিষয়ে কখনও প্রশ্ন পর্য্যন্ত করে নাই। বারংবার কদর্য্য অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়া শিষ্য আমার নিকটে ক্ষমা পাইয়াছে, পরনারীকে সে আক্রমণ করিয়াছে দেখিয়া কাঁদিয়া অধীর হইয়াছি কিন্তু তাহাকে বর্জ্জন করি নাই, পরস্ব সে অপহরণ করিয়াছে দেখিয়া ব্যথায় ঢলিয়া পড়িয়াছি কিন্তু তাহাকে ত্যাগ করি নাই, গুরু-দ্রোহ করিয়াছে দেখিয়া লজ্জায়, ক্ষোভে, বেদনায় মথিত হইয়াছি,

কিন্তু অভিসম্পাত করি নাই। শত দোষ, সহস্র ত্রুটী উপেক্ষা করিয়া প্রাণময় স্নেহ দিয়া তাহাকে ভালই বাসিয়াছি। মানবের পরিজ্ঞাত অপরাধের তালিকামধ্যে এমন কোন্ অন্যায় আছে, যাহা আমার কোনও না কোনও শিষ্য না করিয়াছে? ব্যথিত হইয়াছি, তাহার কুশলের জন্য বিশ্বনাথের চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছি, তাহার চরিত্র-পরিবর্ত্তনের জন্য সঙ্কল্প করিয়া লক্ষ লক্ষবার জপ করিয়াছি, কিন্তু 'তুই আমার পরিত্যক্ত'—এই কথা মুখে বা মনে একটী বারের জন্য উচ্চারণ করি নাই। এই যে করি নাই, ইহাতে আমার লাভ হইয়াছে, কিন্তু শিষ্যের লাভ কি হইয়াছে? (২৩শে ভাদ্র, ১৩৪১)

শিষ্যের অদোষদর্শিতা

অথচ শিষ্যের দিক্ হইতে যদি বিচার করিতে হয়, শিষ্য যদি নিজের অন্তরের দিকে তাকাইয়া চলে, তাহা হইলে চৈতন্য-ভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবন দাসজীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া তাহাকে বলিতেই হইবে,—

'মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে,
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য, কহিলুঁ তোমারে।'

শিষ্য যখন স্বস্থ, শিষ্য যখন সুস্থমনা, শিষ্য যখন নিশ্চিতই সাধন-পরায়ণ, শিষ্য যখন সাধনের ফলে প্রেমময় অবস্থায় আরূঢ়, শিষ্য যখন নাম-সাধনের প্রকৃত ফলকে আয়ত্ত করিয়াছে,

শিষ্য যখন নামে একান্ত রুচি-সম্পন্ন এবং আস্থাবান্ হইয়াছে, সেই সময়ে তাহাকে অকাতরে একথা আপনা আপনি বলিতে হইবে,—

'যদ্যপি আমার প্রভু শুঁড়ি-বাড়ী যায়,
তথাপি আমার প্রভু নিত্যানন্দ রায়।'

তুমি যখন তোমার গুরুদেব সম্পর্কে নানা অপ্রিয় মন্তব্য করিয়া আমার নিকটে পত্র দিতেছ, তখন আমি প্রত্যুত্তরে তোমাকে জানাইতেছি যে, শিষ্যের প্রতি গুরুর অদোষদর্শিতা যদি গৌরবজনক বা মঙ্গলজনক হইয়া থাকে, তাহা হইলে গুরুর প্রতি শিষ্যের অদোষদর্শিতা আরও গৌরবজনক, আরও মঙ্গলজনক।

(২৩শে ভাদ্র, ১৩৪১)

গুরু

দ্বিতীয়াংশ

গুরু, গুরুবাদ, ও দীক্ষা
সম্পর্কিত উক্তি-সমূহের
সংগ্রহ

“শান্তির বারতা”
হইতে সঙ্কলিত

হুজুগে পড়িয়া দীক্ষা

হুজুগে প'ড়ে দীক্ষা নিতে এস না, বাবা সকল। আত্ম-পরীক্ষা ক'রে দেখ, কিজন্য দীক্ষা নিতে চাও এবং দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রাণের অকপট ব্যাকুলতা এসেছে কিনা। দীক্ষা নিলেই ত' হবে না, দীক্ষান্তে গুরূপদিষ্ট সাধন-ভজনে অকপট চিত্তে আত্মসমর্পণ কত্তে হবে। সাধন-ভজন প্রাণপণে কর্বে কিনা, বাবা, সেইটী আগে বুঝে দেখ। পরে এসে দীক্ষা নিও।

পরের প্ররোচনায় দীক্ষা

অন্য লোকেরা দীক্ষা নিচ্ছেন দেখে তাঁদের দেখাদেখি দীক্ষা নেওয়াকে বলা যায় হুজুগে দীক্ষা। দীক্ষা নেওয়া অবশ্য ভাল কাজ। শুধু ভাল কাজ বল্লে কম বলা হবে, আমাদের দৃষ্টিতে দীক্ষা গ্রহণ হচ্ছে জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর এবং মহত্তম কাজ। দীক্ষা নিতে পারা জীবনের এক পরম সৌভাগ্য। দীক্ষা নেওয়ার মানে জীবনের অনিশ্চয়তার অবসান, পদ্ধতিবদ্ধ সাধনের সূচনা। এই জন্যই অপরের প্ররোচনায় প'ড়ে দীক্ষা নেওয়াও উচিত নয়। কেউ তোমাকে সৎপথ আশ্রয় কত্তে বলেছেন, এটাকে প্ররোচনা না ব'লে প্রেরণা বলা উচিত। কিন্তু দীক্ষার মত গুরুতর কাজ অপরের বুদ্ধিতে করা উচিত নয়। এ কাজটীতে নিজের অন্তরের পরিপূর্ণ আবেগ, পরিপূর্ণ আকুলতা এবং পরিপূর্ণ সম্মতির প্রয়োজন। নিজের মনে দ্বিধা রেখে পরের কথায় চলা এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভ্রমাত্মক।

জোর করিয়া দীক্ষা

অবশ্য, কোনো কোনো মহাপুরুষেরা জোর ক'রেও দীক্ষা দেন। জোর ক'রে দীক্ষা দেওয়া ভাল কি মন্দ, তা' মহাপুরুষেরা বুঝুন গিয়ে। কিন্তু কেউ জোর ক'রে দীক্ষা দিতে চাইলে, তা' তোমার কিছুতেই নেওয়া উচিত নয়। বিকার-রোগীকে ডাক্তার জোর ক'রেই ঔষধ খাওয়ান, একথা সত্য। কিন্তু যতক্ষণ বিকার থাকে ততক্ষণ ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ জোর ক'রে খাওয়াতে হয়। দীক্ষার সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া চলে না। দীক্ষাটী দিয়েই গুরু খালাস। তারপরে শিষ্যকেই ত' নিয়মিত প্রতিদিন প্রাতে, দুপুরে, সায়াহ্নে ও শয়নকালে দীক্ষা-প্রাপ্ত নামের সেবা কত্তে হবে। একটীবার মাত্র গুরুদেব মন্ত্রটী কর্ণ-কুহরে শুনিয়ে দিলেই ত' আর হ'ল না। তাই জোর ক'রে দেওয়া দীক্ষাও গ্রহণ কত্তে নেই।

দীক্ষা ও গুরুজনের সম্মতি

দীক্ষা গ্রহণের আগে পিতামাতা এবং অপরাপর গুরুজনদের সম্মতি নিয়ে আসা ভাল। তাতে সাধন-পথের কাঁটা কমে। স্ত্রীদের পক্ষেও স্বামীর অনুমতি গ্রহণ একান্ত আবশ্যক, নইলে বড় বিঘ্ন হয়। অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছেন, যাঁরা দীক্ষা দেবার কালে গুরুজনের অনুমতির তোয়াক্কা রাখেন না। তাঁদের প্রদত্ত দীক্ষা অনেক সময়ে পূর্ব্বসম্বন্ধীদের সাথে দীক্ষাপ্রাপ্তের একটা গুরুতর আদর্শগত সংঘর্ষ সৃষ্টি ক'রে দেয়। যেখানে সমাজের

প্রচলিত অন্ধতার বিরুদ্ধে ধর্ম্মমত কাজ কত্তে চায়, সেখানে এরূপ অবস্থা কতকটা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমি তোমাদের সমাজকে কিভাবে সংস্কৃত কত্তে চাই জান? তোমরা তোমাদের পিতামাতার সম্মতি নিয়ে এসে দীক্ষা পাবে এবং দীক্ষার শক্তিতে সেই সমাজের ভিতরে প্রবেশ ক'রেই কুসংস্কারের জঞ্জাল দূর কত্তে লেগে যাবে, যেই সমাজের ভিতরে তোমার, তোমার পিতামাতার, তোমার পিতামহ-মাতামহের জন্ম, পুষ্টি ও বিকাশ। জীর্ণ সমাজকে নূতন আদর্শ দিতে হবে, কিন্তু তার প্রতি শত্রুভাব পোষণ ক'রে নয়, তা'কে আপন জেনে। যাদের চিরপ্রচলিত মত ও পথ তুমি পরিত্যাগ ক'রে এসে নব্যমন্ত্রে নব্যতন্ত্রে দীক্ষা নিলে, তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা তোমার কাজ হবে না, তাঁদের ভিতরে প্রবেশ ক'রে তাঁদের দৃঢ়মূল সংস্কারকে তাঁদেরই সমর্থনের মধ্য দিয়ে টেনে উৎপাটিত কত্তে হবে। এজন্যই আমার কাছে যদি আস, গুরুজনদের সম্মতি নিয়ে আসবে।

দীক্ষা মানে নবজন্ম

মনে রেখ, আজ তোমাদের নবজন্ম হ'ল। অতীতের সমস্ত পাপ-তাপ তোমাদের চিরতরে পরিত্যাগ কল্ল'। শুদ্ধ, স্নাত শিশুটীর মত আজ তোমরা নিষ্পাপ হ'লে। তোমাদের অতীতের জ্ঞাত অজ্ঞাত সহস্র পাপরাশি আজ বিনষ্ট হ'ল। জেনে যত পাপ ক'রেছ, না জেনে যত পাপ ক'রেছ, বুঝে যত পাপ ক'রেছ, না বুঝে যত পাপ ক'রেছ দেহে যত পাপ ক'রেছ, মনে যত পাপ

ক'রেছ, বাক্যে যত পাপ ক'রেছ, অভিপ্রায়ে যত পাপ ক'রেছ, জাগ্রতে যত পাপ ক'রেছ, নিদ্রায় যত পাপ ক'রেছ, সব পাপ আজ তোমাদের বিদূরিত হ'ল। নিজের ইচ্ছায় যত পাপ ক'রেছ, পরের প্ররোচনায় যত পাপ ক'রেছ, স্ববশে যত পাপ ক'রেছ, অবশে যত পাপ ক'রেছ, নিজের স্বার্থে যত পাপ ক'রেছ, নিষ্প্রয়োজনে যত পাপ ক'রেছ, অভ্যাস বশে যত পাপ ক'রেছ, খেয়াল-বশে যত পাপ ক'রেছ, সব পাপ আজ তোমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আজ সঙ্কল্প কর, আর পাপের সঙ্গে কোনো আপোষ কর্ব্বে না। আজ প্রতিজ্ঞা কর, এর পর থেকে জীবনের প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তকে পূর্ণ পবিত্রতার মধ্য দিয়ে যাপন কর্ব্বে। (২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮)

দীক্ষার মর্ম্মগ্রাহিনী মূর্ত্তি

মন্ত্রদান কি শুধু একটা শব্দ শুনিয়ে দেওয়া ? দীক্ষা-দানের মানে হ'চ্ছে, আমার শব্দরূপ সত্তায় তোমাদের দেহ-মন-প্রাণের প্রত্যেকটা পরতে, প্রত্যেকটা তরঙ্গে, প্রত্যেকটা অণুতে পরমাণুতে প্রবেশ করা। তোমাদের 'কর্ণ-রন্ধ্র-পথে আমি তোমাদের সর্ব্বাঙ্গে, তোমাদের প্রতি অঙ্গের প্রতি প্রত্যঙ্গে, তোমাদের প্রতি প্রত্যঙ্গের প্রত্যেকটী অংশে এই ব'লে প্রবেশ ক'রে রইলুম যে, তোমাদের আমি জগতের মঙ্গলের কাজে পরিচালিত কর্ব্ব, জগতের মহৎ কল্যাণে প্রেরণা যুগিয়ে যাব। ইচ্ছা ক'রেও আজ তোমরা আমাকে তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে

পার না। আমার যা প্রকৃত সত্তা, আমার যা প্রকৃত মূর্ত্তি, আমার যা প্রকৃত স্বরূপ, সে তোমাদের ভিতরে, অন্তরের অন্তস্তলে, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে, জ্ঞান ও কর্ম্ম-কেন্দ্রগুলির মূলদেশে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ফেলেছে। এরই নাম দীক্ষা, এরই নাম শিষ্য-গ্রহণ! দীক্ষার এইটীই হচ্ছে মর্ম্ম-গ্রাহিণী মূর্ত্তি।

শিষ্যের জগন্মঙ্গল-প্রয়াসে গুরুর নব নব আবির্ভাব

সুতরাং জগৎকল্যাণের অমোঘ প্রেরণা নিয়ে যখন তোমার যে অঙ্গ যে-কোনও কাজ কর্ব্বে, জানবে আমি তোমাতে এসেছি। তোমার চক্ষু, তোমার কর্ণ, তোমার জিহ্বা, তোমার ওষ্ঠ, তোমার বক্ষ, তোমার পৃষ্ঠ, তোমার উদর, তোমার শ্রোণি, তোমার প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়সমূহ, তোমার গুপ্তাঙ্গসমূহ সবকিছুর ভিতরে আমার হবে তখন আবির্ভাব, যখন তুমি তাকে কর্ব্বে ব্যবহার জগন্মঙ্গল উদ্দেশ্যে। তুমি একথা জান না, তাই আমি জানিয়ে দিয়ে গেলাম। কিন্তু আমার এটাই প্রাণের সবচেয়ে প্রিয়তম কামনা যে, তোমাদের দেহ-মন-প্রাণ যেন অবিরাম জগৎ-কল্যাণের প্রয়াসের ভিতর দিয়ে আমার সেই নিত্য নব আবির্ভাবকে উপলব্ধি করে। দেহের প্রতি অংশের প্রত্যেকটী পিপাসাকে জগৎকল্যাণ-কর্ম্মের প্রেরণায় তোমরা রূপান্তরিত কর। তোমাদের জগন্মঙ্গল-প্রয়াস তোমাদের ভিতরে আমার পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবকে উপলব্ধি করাক। (২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮)

ভ্রূমধ্যবিহারী শ্রীভগবান্

ভগবান্ তোমাকে দৃষ্টিশক্তি দেননি ব'লে তুমি কখনো তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রো না। জান্‌বে, দৃষ্টি কেড়ে নিয়ে তিনি তোমাকে জগতের বারো আনা প্রলোভনের বাইরে রেখেছেন। এখন তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে তোমার জ্ঞানের চক্ষু উন্মীলন কত্তে চেষ্টা কর। সেই চক্ষু খোলে ভ্রূমধ্যে নিত্যকাল ভগবানের মঙ্গলময় উপস্থিতির চিন্তনে। জানো, তিনি পরম করুণাময়, তিনি নিখিল আনন্দের কন্দ, তিনি সর্ব্বসুখের আকর, তিনি রসময়, প্রেমময়, ক্ষেমময়। তিনি একটী নিমেষের জন্যও তোমাকে পরিত্যাগ করেন না। প্রজ্ঞারূপে, অভয়রূপে, সান্ত্বনারূপে নিয়ত তিনি তোমার ভ্রূমধ্যে বিরাজ করেন। একটী মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি তোমার কাছ থেকে দূরে স'রে যান না। ভ্রূমধ্য-বিহারী শ্রীভগবান্‌কে সকল বোধশক্তি দিয়ে অনুক্ষণ বিরাজমান ব'লে অনুভব করার চেষ্টা কর। এতেই তোমার অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাবে।

দীক্ষা ও জগন্মঙ্গল

তোমার এই দীক্ষা একাকী তোমার কুশলের জন্য নয়, তোমার সাথে সাথে নিখিল জগতের প্রত্যেকটী মানব-মানবী, প্রত্যেকটী প্রাণী, প্রত্যেকটী অণু-পরমাণু পর্য্যন্ত কুশলবন্ত হবে, তারই জন্য আজ তুমি আমার কাছে দীক্ষা গ্রহণ কচ্ছ। "একলা আমি মুক্ত হ'তে চাই না প্রাণনাথ, আমায় তুমি যুক্ত কর

বিশ্বজনার সাথ",—এই হবে তোমার মূলমন্ত্র। তারই জন্য তুমি আমার নিকটে দীক্ষিত হচ্ছ। একমাত্র নিজের উদ্ধারের জন্য নয়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধারের জন্য তোমার এ সাধন-গ্রহণ। তোমার মুক্তির সাথে সাথে নিখিল বিশ্বের মুক্তি সাধিত হবে, এরই জন্য আজ হ'তে তোমার সংজ্ঞা হবে অখণ্ড। তোমার লক্ষ্য, তোমার আদর্শ কখনো তোমার ব্যক্তিগত উদ্ধারের চিন্তাদ্বারা খণ্ডিত বা সীমাবদ্ধ হবে না। ব্রহ্মাণ্ডের সকলকে নিয়ে পরমানন্দের লীলা তোমরা করবে। ভেদাভেদ বিস্মৃত হ'য়ে উচ্চনীচের পার্থক্য বিদূরিত ক'রে দিয়ে সকল অজ্ঞ, অন্ধ, পঙ্গু জীবের পূর্ণ নিষ্কৃতির পথ তোমারই একাগ্র, উদগ্র, একনিষ্ঠ সাধনের ফলে নির্গত হবে। এই কথাটী কখনো ভুলে যাবে না। "জগন্মঙ্গলোঽহং"—আমি জগতের কল্যাণকারী, এইটীই তোমাদের আদর্শ, জানবে।

দীক্ষারূপ নবজন্মলাভ ব্যর্থ হইতে দিও না

কখনো ভুলে যেওনা যে, দীক্ষালাভ প্রকৃত প্রস্তাবে নবজন্ম লাভ। এই নবজন্ম লাভ ক'রে ভগবৎ-প্রেমের নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কলুষ জীবন-যাপনের জন্য তোমরা বদ্ধপরিকর হও। কতবার কত জীবের গৃহে কতরূপে জন্ম গ্রহণ করেছ। অসাধনে সব জন্মই বৃথা হয়েছে। এমন কি মানব-গৃহে মানুষরূপে জন্ম গ্রহণ করার পরেও এতদিন এই জন্মকে সার্থক করার জন্য কিছুই কর নাই।

আজ যখন দীক্ষাযোগে নূতন জন্ম তোমাদের হ'ল, তখন এই নূতন জন্মগ্রহণ যাতে ব্যর্থ না হয়, তার জন্য কঠোর-সঙ্কল্প-সম্পন্ন হও। হেলায়, খেলায়, ঔদাসীন্যে অতীতে বহু সময় ক্ষেপণ করেছ, আজ থেকে সঙ্কল্প কর যে, প্রত্যেকটী নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে কাজে এনে ছাড়্‌বে। কামারের ভস্ত্রাও বৃথা কাজ করে না, আর তোমার ফুস্‌ফুস্‌টাই কি কেবল বৃথা শ্রম কর্ব্বে? প্রতি শ্বাসে প্রতি প্রশ্বাসে ইষ্টনাম স্মরণ ক'রে এদের সার্থকতা লাভের সুযোগ দাও। (১লা পৌষ, ১৩৪৮)

সাধনে একনিষ্ঠার আবশ্যকতা

দুই নৌকায় পা দেওয়া ভাল নয় বাবা। একটী জিনিষ নিয়েই থাক। বারংবার মন্ত্র নেওয়া আর দশ গণ্ডা মন্ত্র জপ করা বড় ঝকুমারি। মনকে একনিষ্ঠ কর, একটা নিয়ে লেগে থাকার ধৈর্য্য, সাহস ও দৃঢ় মনোবৃত্তি অর্জ্জন কর। ডুববে ত' একজনকে নিয়েই ডোব, ভাসবে ত' একজনকে নিয়েই ভাস, মর্‌বে ত' একজনকে নিয়েই মর, বাঁচবে ত' একজনকে নিয়েই বাঁচ। বিবাহে যেমন চাখাচাখি চলে না, দীক্ষায়ও তেমনই জান্‌বে। এক ভৃত্যের যেমন বহু প্রভু থাকুলে চলে না, মন্ত্রেও জান্‌বে তেমন। একটী মাত্র মন্ত্রকে অবলম্বন ক'রে সঙ্কল্প কর্‌বে —"মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্, শরীরং বা পাতয়েয়ম্,—হয় এই মন্ত্রে পূর্ণ সিদ্ধি অর্জ্জন কর্ব্ব, নয় শরীর পাত কর্ব্ব,—এর মাঝে আর মধ্য-

পথ নেই, আপোষ নেই।"—এই মন্ত্রে সম্পূর্ণ নিষ্ঠা নিয়ে নিজেকে ডুবিয়ে দিলে ঐ একই মন্ত্রের ভিতর দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সকল মন্ত্র তোমার সাধন করা হ'য়ে যাবে। "একজনারে জান্‌লে আপন, বিশ্বভুবন আপন তোর।"

ভগবানের নিকট প্রার্থনা

ঘুম থেকে উঠেই প্রত্যহ পিতামাতার চরণে প্রণাম কর্‌বে। হাত-পা-মুখ-চোখ ধু'য়ে কাপড় ছেড়ে মেরুদণ্ড সরল ক'রে আসনে বস্‌বে এবং ভগবান্‌কে উদ্দেশ ক'রে মনে মনে বল্‌বে,—"হে ভগবান্, হে সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বর, তুমি আমাকে সৎ কর, মহৎ কর, চরিত্রবান্ কর, কর্ত্তব্যপরায়ণ কর। হে বিশ্বস্রষ্টা পরম-প্রভু, তুমি আমাকে স্বাস্থ্য দাও, বীর্য্য দাও, সততা দাও, সৎ-সাহস দাও, তুমি আমাকে জগৎ-মাঝে নির্ভীক ভাবে চল্‌বার শৌর্য্য দাও, তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে আত্মদান কর্‌বার শক্তি দাও।" প্রত্যহ এইরূপ প্রার্থনার অভ্যাস ক'রে ক'রে যখন চিত্ত নির্ম্মল হবে, মন সরস হবে, আধ্যাত্মিক পিপাসা ক্রম-বর্দ্ধমান হবে, দীক্ষা তোমাদের তখন দিব।

পুত্রকন্যার প্রতি পিতামাতার কর্ত্তব্য

নিজ নিজ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দীক্ষা গ্রহণ করাবার জন্য যে পিতামাতার আগ্রহ দেখা যায়, স্বীকার কর্ত্তেই হবে যে, সেই পিতামাতা সত্যই সন্তানের কুশলপ্রার্থী। কিন্তু পুত্র-

কন্যাকে শুধু দীক্ষা নেওয়ালেই চল্‌বে না, এরা যাতে নিয়মিত সাধন-ভজনে নিষ্ঠাযুক্ত হ'য়ে চলে, তার জন্য হাতে ধ'রে তাদের টেনে টেনে নিতে হয়। আর সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য হচ্ছে, ছেলে-মেয়েদের চোখের সাম্‌নে নিয়মিত সাধনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরার জন্য নিজেরাও সত্য সত্য সাধন-ভজনে মন দেওয়া। পুত্রকন্যা ঈশ্বরানুরাগ-সম্পন্ন হোক্‌ শুধু এইটুকু আকাঙ্ক্ষা থাকুলেই যথেষ্ট হবে না, নিজেদেরও ঈশ্বরানুরাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রে দেখাতে হবে।

রুগ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম দীক্ষা

দীক্ষা ত' বাবা অনেক রকমে হ'তে পারে। তোমার স্ত্রী যখন রোগশয্যায় প'ড়ে বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকৃছে, আর আমি তোমার শ্বশুর-বাড়ীর গ্রামে ব'সে আমার এক সাময়িক আশ্রমের পুকুরের মাটী কাট্‌ছি, তখন কি কোনও অদৃশ্য শক্তি এসে দিনের পর দিন রাত্রের পর রাত্র রুগ্নার শিয়রে ব'সে অবিরাম অবিশ্রাম তাকে ইষ্টনামের মধুর ঝঙ্কার শুনিয়ে দীক্ষা দিয়ে আস্‌তে পারে না? আমি সেই দৃষ্টিতেই তোমার স্ত্রীকে দীক্ষিত ব'লে জ্ঞান ক'রে এসেছি এবং তাৎকালিক সুপ্ত স্মৃতিকে পুনর্জ্জাগরিত করার উদ্দেশ্যেই মাত্র আজ প্রকাশ্য ভাবে দীক্ষা দিলাম।

(৪ঠা পৌষ, ১৩৪৮)

স্বামীর অমতে দীক্ষা

হিরণ্যকশিপু চান নি যে কয়াধূ বা প্রহ্লাদ হরিনাম করুন, তবু তাঁরা স্বামীর বা পিতার নিষেধ মান্য করেন নি, নিজ নিজ পরম কর্ত্তব্যে প্রাণ-মন সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু তার কারণ এই যে, তাঁরা জেনেছিলেন যে, হিরণ্যকশিপুকে কখনো এপথে আনা যাবে না। কিন্তু এই যুগে হিরণ্যকশিপুর ঠিক অবিকল প্রতিরূপ পাওয়া অতি সুকঠিন ব্যাপার। চেষ্টা করলে এই যুগে সব পিতা সব স্বামীকেই একদা ভগবানের পথে টেনে আনা যায়। এই কারণে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে অথবা তার প্রসন্ন মনের পূর্ণ সম্মতি গ্রহণ ক'রে তবে স্ত্রীলোকদের দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য। নতুবা স্বামীর উৎপাতে সাধন-ভজনে নিত্যই নানা বিঘ্ন ঘটে। এই বিঘ্নের মূল উৎপাটনের উপায় হ'ল স্বামীকে নিয়ে এক সঙ্গে দীক্ষা নেওয়া, নতুবা তার পূর্ণ-সমর্থনের মধ্য দিয়ে দীক্ষিত হওয়া। সাধ্বী স্ত্রী ইচ্ছা করলে নিজের সেবাবুদ্ধি, দৃঢ়তা ও একাগ্রতা দিয়ে স্বামীকে সৎপথে গমনে বাধ্য কত্তে পারে। সুতরাং উতলা না হ'য়ে তার একাগ্র মনে কাল-প্রতীক্ষা করাই ভাল।

দীক্ষা ও অনন্ত-জীবন

হাঁ, দীক্ষায় অনন্ত-জীবন লাভ হয়, একথা সত্য, কিন্তু বাবা দীক্ষা নিয়ে সাধন কত্তে হবে।

(৫ই পৌষ, ১৩৪৮)

জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প

তোমার জীবনের উপরে শুধু একাকী তোমারই দাবী নয়, এ দাবী নিখিল জগতের। পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি, জগৎ সকলে তোমার জীবনের কাছ থেকে সেবা চায়, শান্তি চায়, সৌন্দর্য্য চায়, তৃপ্তি চায়, সুখ চায়, সমৃদ্ধি চায়। তোমার একক শান্তি, একক তৃপ্তি, একক সুখ, একক সমৃদ্ধিই তোমার লক্ষ্য হবে না, সমগ্র জগতের প্রত্যেকটী জীবকে, প্রত্যেকটী অণুপরমাণুকে তোমার ত্যাগে, তোমার তপস্যায়, তোমার সাধনায়, তোমার আত্মোপলব্ধিতে লাভবন্ত কর্ত্তে হবে। মনে রাখবে, এই চিন্তাটীই তোমার দীক্ষালাভের ভূমিকা। এই তত্ত্বটীই তোমার জীবন-ব্যাপী সাধনার পরি-প্রেক্ষিকা। নিজেকে, নিজের জীবনকে, নিজের সত্তাকে এই আলোকে দর্শন কর, নিজেকে জগন্মঙ্গল-সাধনার সঙ্কল্পে পূর্ণ কর, পরিপুষ্ট কর। তবে তোমার অখণ্ড-মন্ত্র-সাধন সত্য হবে, সার্থক হবে, ষোলকলায় পূর্ণ হবে। (৬ই পৌষ, ১৩৪৮)

শিষ্যের মধ্যে গুরু-শক্তির স্থিতি ও প্রকাশ

শিষ্য করার মানে হচ্ছে, শিষ্যের ভিতরে গুরু-কর্ত্তৃক অতি সূক্ষ্ম ভাবে নিজেকে স্থাপন করা। সত্যিকারের গুরু এই কার্য্যটী করেন। এমন ভাবে করেন যে, কেউ তা টের পায় না। কিন্তু সত্য সত্যই করেন। আমার শিষ্যদের মধ্যেও কি আমি এই ভাবে অবস্থান করি? নিশ্চয় করি।

আমি কি তাদের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ কর্ব্ব ? হাঁ, কর্ব্ব। অবশ্য, যদি শিষ্য হয় দ্বিধাহীন আত্মসমর্পণকারী নির্ব্বিচার সেবক, অদোষদর্শী প্রেমিক। (৮ই পৌষ, ১৩৪৮)

দীক্ষা ও ব্রাহ্মণ্য

দীক্ষা তোমাদের ব্রাহ্মণ্য দিয়েছে। ভুলে যাও, কে বৈশ্য ছিলে, কে শূদ্র ছিলে। আজ তোমরা ব্রাহ্মণ। কিন্তু নিরন্তর সাধনার দ্বারা এই ব্রাহ্মণ্যকে চিরস্থায়ী রাখ্‌বার দিকে তোমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। সাধনে যেন আলস্য না আসে, অবহেলা না আসে। নিয়ত তদ্ভাবভাবিত সদ্‌-ব্যক্তিদের সঙ্গ ক'রে সাধনের রুচি অটুট অব্যাহত রাখ্‌বে।

নামে-মাত্র দীক্ষা নিও না

বাছারা, শুধু নামে-মাত্রই একটা দীক্ষা নিলে চল্‌বে না। মনে রাখ্‌তে হবে যে, সর্ব্বপ্রযত্নে সাধন করাও চাই। যে দীক্ষা আজ ভগবৎ-কৃপায় পেলে, প্রাণ গেলেও তার সাধন পরিত্যাগ কর্ব্বে না, এই জিদ্‌ থাকা চাই। তবেই দীক্ষা নেওয়া সার্থক হবে।

সুন্দর হও

মহামন্ত্র জগতের সকল বস্তুকে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করে। তোমরা যে আজ মহামন্ত্র পেয়েছ। তোমরাও তোমাদের অজানাতেই আগের চেয়ে শতগুণে সুন্দর হয়েছ। যোগীর

চক্ষু তোমাদের দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারবে যে, তোমাদের কাণে অখণ্ডনাম প্রবেশ করেছে। মহামন্ত্রের অপর নাম 'সুন্দর'। এ নামটী তার কেন হ'ল জান? অপরকে সে সুন্দর করে। যে তার সাধন করে, চোখে, মুখে, দেহে, মনে, চলায়, বলায় তার অপার সৌন্দর্য্য, অপার সুষমা, অপার লাবণ্য উপ্‌চে পড়ে। পরমসুন্দর নাম পেয়েছ, এই নামের সেবা ক'রে সবাই তোমরা অপরূপ সুন্দর হও।

বিরোধ ভুলিয়া যাও

সর্ব্বজাতি, সর্ব্ববর্ণ, নিজ নিজ বিরোধ-বিদ্বেষ ভুলে যাও। সবাই নিজদিগকে একই পরম-পিতার সন্তান ব'লে জানো। বিরোধ-বিদ্বেষ অজ্ঞানতার ফল। জ্ঞানস্বরূপ ভগবানকে আপন জেনে সকল অজ্ঞানতা দূর কর। ভগবানকে ভালবাসার ভিতর দিয়ে তোমাদের সকল অন্ধতা, সকল মূর্খতা, সকল সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হোক। সমস্বরে এই ঘোষণা-বাণী উচ্চারণের সামর্থ্য অর্জ্জন কর যে, জগতে সবাই এক। (১২ই পৌষ, ১৩৪৮)

ধর্ম্ম-সঙ্ঘ ও গুরুদ্রোহ

সব সময়ে লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে যে, তোমাদের কোনও সম্মেলন যেন কখনো গুরুদ্রোহের সমর্থন না করে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি আমার শিষ্যদের এত অধিক নিরঙ্কুশতা দিয়েছি যে, পৃথিবীর গুরুমাত্রেই তাতে আশ্চর্য্যান্বিত হবেন। কিন্তু

যেখানে সঙ্ঘ নিয়ে কথা, সেখানে গুরুনিষ্ঠাই হবে সঙ্ঘের প্রাণ, ব্যক্তিগত মতামতের প্রাধান্য সঙ্ঘের প্রাণ হবে না। গুরুতে ঐকান্তিক আনুগত্য ব্যতীত কখনো সঙ্ঘ গ'ড়ে ওঠে না, গ'ড়ে ওঠে বিতর্ক-সভা, গ'ড়ে ওঠে ধ্বংসবাদীর আড্ডা, গ'ড়ে ওঠে উচ্ছৃঙ্খলতার কোলাহল। সঙ্ঘের প্রাণ অনুবর্ত্তিতা। আমার সন্তানেরা যখন আমারই সম্পর্কের দোহাই দিয়ে মিলিত হবে, তখন তারা প্রাণান্তেও আমার প্রতি দ্রোহ কত্তে অধিকারী নয়, যদি সত্যই তারা সঙ্ঘ গড়্‌তে চায়।

(১৪ই পৌষ, ১৩৪৮)

পতিতোদ্ধারকং মন্ত্র

মহামন্ত্রকে জান্‌বে পতিতোদ্ধারক, কলুষনাশক, জন্মমৃত্যু-জরাদুঃখবিনাশক। অন্তরের সমস্ত গ্লানি আজ ঝেড়ে মুছে ফেলে দাও। জীবনের নূতন যাত্রা-পথে আজ চল শঙ্কাহীন নির্ভয় প্রাণ নিয়ে। অতীতের সহস্র আবর্জ্জনাকে জীবনের প্রান্ত থেকে সরিয়ে রেখে নূতন জীবনের নবামৃত আস্বাদনের জন্য পাগল হ'য়ে ছোট। বারংবার বল,—হে পরমপবিত্র নাম, তুমি পতিতোদ্ধারকারী, আমার কোন ভয় নেই, ভাবনা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, দ্বিধা নেই, তোমাতে আশ্রয় নিয়ে আমার উদ্ধার সম্পর্কে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়েছি।

(১৫ই পৌষ, ১৩৪৮)

দীক্ষার পরে সাধনা প্রয়োজন

দীক্ষা নিয়েই মনে ক'রো না, কাজ হ'য়ে গেল। এর পরে সাধন করা চাই। নামকে-ওয়াস্তে সাধন নয়,—একাগ্র, উদগ্র, একনিষ্ঠ ভাবে সাধন কত্তে হবে। টিকিট কিন্‌লেই কেউ বৃন্দাবন যেতে পারে না, গাড়ীতে চেপে বসা চাই, ভীড়ের ঠেলা সহ্য ক'রেও গাড়ীর আসনটী আঁকড়ে ধরা চাই,— ধাক্কা-ধাক্কির ঠেলায় ছিট্‌কে গাড়ীর বাইরে প'ড়ে গেলে চল্‌বে না। চতুর্দ্দিকের বিশৃঙ্খল চীৎকারে গ্রাহ্য মাত্র না ক'রে নিজের জায়গায় জোর ক'রে লেগে থাকা চাই।

প্রেমই স্বরূপ

তোমরা কেউ জানো না যে, তোমাদের এক একজনের প্রাণের অন্তস্তলে কত অপরিমেয় প্রেম সঞ্চিত হ'য়ে লুকিয়ে আছে। তোমরা কল্পনাও কত্তে পার না যে, প্রেমের অতুলনীয় গুপ্তধনে তোমরা এক একজনে কত বড় ধনী। নামের সেবা ক'রে ক'রে অন্তরের আবরণকে উন্মোচিত কর, নিজের মূর্ত্তি নিজের চোখে একবার ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখ। অবাক্ হ'য়ে যাবে! দেখ্‌বে, প্রেমই তোমার স্বভাব, প্রেমই তোমার স্বরূপ, প্রেমই তোমার উৎপত্তি, প্রেমই তোমর বিলয়, প্রেমই তোমার নিঃশ্বাস-বায়ু, প্রেমই তোমার হৃৎস্পন্দন, প্রেম ছাড়া তোমার অস্তিত্বই অসম্ভব।

দীক্ষার মানে

তোমার সেই অপার্থিব দৈব স্বরূপকে চিনে নেবার জন্যই আজ তুমি দীক্ষা পেয়েছ। দীক্ষা শুধু কাণে কাণে একটী মন্ত্র শুনে নেওয়াই নয়, দীক্ষার মানে আত্মস্বরূপ চেনার পথে প্রথম পাদচারণা করা। এই যে সাধন সুরু হ'ল, শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত পুর্ণ আস্থার সহিত, পুর্ণ বিশ্বস্ততার সহিত এই সাধন ক'রে যাবে। আজ তারই সঙ্কল্প কর।

(১৬ই পৌষ, ১৩৪৮)

জগৎ-কল্যাণের সাধন

তোমাদের সাধন জগৎ-কল্যাণের সাধন। তোমাদের নিজেদের তপস্যার ভিতর দিয়ে জগতের অমোঘ মঙ্গল হবে। সবাই পবিত্র হ'য়ে জগৎকে পবিত্র কর, সবল হ'য়ে জগৎকে সবল কর।

ধর্ম্মসঙ্ঘ ও গুরুনিষ্ঠা

সঙ্ঘই যদি বাবা গড়তে চাও, তবে তার মুল হবে, ঐকান্তিকী গুরুগতপ্রাণতা। কোনও অবস্থাতেই যাদের গুরুনিষ্ঠা টলে না, তারাই সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে পারে। এই একটী মাত্র কেন্দ্র আছে, যেই কেন্দ্রের সঙ্গে তুমি যতক্ষণ প্রাণপণ যত্নে লগ্ন থাকবে, ততক্ষণ তোমার দ্বারা সঙ্ঘের সংহতি কোনও প্রকারেই বিনষ্ট হ'তে পারে না। কিন্তু গুরু-নিষ্ঠা যাই টল্‌ল, হাজার কেন কৃতিত্ব-সম্পন্ন তুমি হও না, তুমি যদি সঙ্ঘ গড়তে চাও,

তবু দেখ্‌বে, জিনিষটা আর গ'ড়ে উঠে না, পদ্মানদীর তীরবর্ত্তী ভূমির মত একটু একটু ক'রে কেবলই ভাঙ্গে। দেখ্‌বে তখন তোমার আদর্শবাদের দোহাই কোনও সদাত্ম ব্যক্তিকে তোমার সমীপস্থ করে না, বরং সন্দিগ্ধ করে। সুতরাং ধর্ম্ম-সঙ্ঘই যদি গড়্‌তে হয়, গোড়ায় নিষ্ঠা চাই। তোমাদের নিয়ে ধর্ম্মসঙ্ঘ গড়ার কল্পনা আমি কখনো করিনি। দলবদ্ধ ব্যক্তিদের গুরু হ'য়ে থাকব, এ কথা স্বপ্নেও আমি কখনো ভাবিনি! তাই, ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক শিষ্যকে চূড়ান্ত ভাবে ব্যক্তিগত স্বাধিকার প্রয়োগের প্রেরণা চিরকাল দিয়েছি। কিন্তু সঙ্ঘই যদি গ'ড়ে উঠে, তবে গুরুনিষ্ঠা ছাড়া তা' হবে না।

(১৬ই পৌষ, ১৩৪৮)

দীক্ষিত ও অদীক্ষিতের পার্থক্য

অন্তরকে করবে সরল, অকপট, ভাণবর্জ্জিত। কখনো এইরূপ অভিমান রাখ্‌বে না যে, তুমি দীক্ষিত হ'য়েছ ব'লে অদীক্ষিতের চেয়ে উৎকৃষ্ট। কিন্তু দীক্ষিত ব'লে নিজেকে ভাগ্যবান্ অবশ্যই মনে করবে। মনে মনে জানবে, অনন্ত সম্পদরাশির প্রবেশ-দুয়ারে তুমি এসে দাঁড়িয়েছ, গুরুদত্ত মহামন্ত্রের সাধন কত্তে কত্তে যদি এগিয়ে যাও, সব সম্পদ তোমার হবে। অদীক্ষিতের সঙ্গে তোমার প্রধান পার্থক্য এইখানে।

(১৭শে পৌষ, ১৩৪৮)

দীক্ষা কেন সৌভাগ্য-সূচক

তোমরা যারা দীক্ষা পেয়েছ, তারা ভাগ্যবান্। কেননা, এতদিন পথ-নির্দ্দেশহীন লক্ষ্যহীন পথিকের মত তালে বেতালে এদিক থেকে সেদিকে আর সেদিক থেকে এদিকে ঘু'রে বেড়াচ্ছিলে। কিন্তু আজ যখন পথ পেয়েছ, তখন লক্ষ্যহীনতার দুর্ভাগ্য তোমাদের পরিত্যাগ কর্‌ল।

দলবর্দ্ধনের কৃত্রিম চেষ্টা অনাবশ্যক

নিজেরা দীক্ষা পাওয়ার পরে তোমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য হবে, দীক্ষানুযায়ী সাধন করা, দলে দলে লোককে ডেকে এনে গুরু-ভ্রাতা বা গুরুভগ্নীতে পরিণত করা নয়। তোমাদের দল আপনি বাড়্‌বে, এজন্য কোনও ক্যানভাসিংএর প্রয়োজন হবে না। দিকে দিকে লক্ষ লক্ষ নরনারীর প্রাণে অখণ্ড-সাধন গ্রহণ করার জন্য তীব্র ব্যাকুলতার সৃষ্টি হবে, তার জন্য তোমাদের বা আমার কোনও প্রচার-কার্য্যের আদৌ আবশ্যকতা নেই। এস নিজেরা নিজ নিজ ইষ্টনামে একান্তভাবে আত্ম-সমর্পণ করি। আমাদের আত্মসমর্পণের পূর্ণতাই পরিপূর্ণ জগৎকে আমাদের দিকে টেনে আনবে। ভগবদিচ্ছায় আমি কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী নই। অফুরন্ত বহিঃকর্ম্মের মধ্য দিয়ে আমার জীবন-যাপন, আমার তপঃসাধন! তাই আধ্যাত্মিকতাবাদী সজ্জনেরা অনেকে আমাকে বুঝ্‌তেই পারেন না। অন্যে ত'

দূরের কথা, আমার কয়জন সঙ্গীই আমাকে বুঝ্‌তে পেরেছে? কিন্তু একথা জেনো, অখণ্ড-মন্ত্রের প্রতি আমার যে কুণ্ঠাহীন আনুগত্য, তাই আমার নিকটে নিখিল জগৎকে টেনে আন্‌বে। অন্য কোনও কৌশলের প্রয়োজন হবে না!

(২৩শে পৌষ, ১৩৪৮)

নামের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখ

মঙ্গলময় নামের অনির্ব্বাণ প্রদীপ সকল সময় ভ্রূমধ্যে প্রজ্জ্বলিত রাখ্‌বে। একটী নিমেষের জন্যও নামের প্রদীপকে নিভে যেতে দেবে না। জগতের যত সংশয়, যত সন্দেহ সব এই নামের পবিত্র জ্যোতিতে ছিন্ন হ'য়ে যাবে। জীবনের এমন কোনও রহস্য নেই, নামের তীরবৎ তীক্ষ্ণ জ্যোতি যাকে ভেদ না কত্তে পারে। নামে লগ্ন হ'য়ে থাক, সকল অজ্ঞান তোমার দূর হবে, নিয়ত ব্রাহ্মী প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে নিত্যসত্যময় অক্ষয় শান্তিতে তুমি বিরাজমান হবে।

আমি কিন্তু আসিব

আজ থেকে নাম-সাধনের ব্রত নিলে. তাতে কিন্তু দিনে রাত্রে আমি চার চার বার তোমাদের কাছে ছুটে আস্‌ব, প্রাণভরা এই ব্যাকুল কামনা নিয়ে যে, তোমরা ঠিক্‌ ঠিক্‌ তোমাদের নাম-সাধনার যজ্ঞবেদীতে বিনম্র হ'য়ে বসেছ। তোমরা যদি সেই সময়ে আমাকে মধুময় অখণ্ডনাম প্রেমভরে

শুনাও, হৃদয় আমার স্নেহে প্রেমে পুলকে স্নিগ্ধ হ'য়ে যাবে। আর তোমরা যদি স্বেচ্ছায় গৃহীত এই পবিত্র ব্রতে নিষ্ঠাযুক্ত না থাক, তবে মৌন মূক, বেদনাহত হ'য়ে তোমাদের গৃহের ছনছা-তলে কাল-প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকব। ভুলে যেও না বাছারা, আমি কিন্তু আসব।

(৩রা মাঘ, ১৩৪৮)

অখণ্ড-দীক্ষা ও জগন্মঙ্গল

অখণ্ড-নামকে জগন্মঙ্গল আদর্শের সঙ্গে একেবারে অভিন্ন ব'লে গণনা কর্ব্বে। জান্‌বে, এই নামে যখন দীক্ষা পেয়েছ, তখন জগতের মঙ্গল সাধনই তোমার জীবনের চরম কর্ত্তব্য। জীবনে যে যেই জীবিকাই ধর, জগতের মঙ্গল হবে তোমার প্রধান লক্ষ্য। এক মাত্র নিজেকে নিয়ে ভেব না। তোমার নাম-সাধনের সাথে সাথে সাধনে অপটু আরও লক্ষ লক্ষ জীবের আধ্যাত্মিক কুশল যে তোমারই সাধনের ফলে হচ্ছে, এই কথাটী স্মরণ রেখো। জগৎ যদি তোমাকে অস্বীকার করে, তবু তুমি জগৎকে কখনো অস্বীকার ক'রো না।

যে যেখানে যে মন্ত্র নিয়েছ, সে মন্ত্র নিয়ে আমৃত্যু নিষ্ঠায় লেগে থেকে একবার দেখ, সত্যই সাধনে কোনো আনন্দ আছে কিনা। বারংবার মন্ত্র বদল ক'রে বৃথা শ্রান্ত হ'য়ে লাভ কি ?

(৩রা মাঘ, ১৩৪৮)

আমার সন্তান আমার কাছেই আসিবে

আমারই জন্য যে ব্যাকুল, সে হাজার বছর আমারই জন্য নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করবে। কে কোথায় নিজ শিষ্যসংখ্যাবর্দ্ধনের জন্য আয়োজন কচ্ছেন দেখে, তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লে ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, হাজার টানাহেঁছড়ার মাঝেও আমার সন্তান আমার কাছেই আসবে। (১৭ই মাঘ, ১৩৪৮)

দীক্ষায় তাড়াহুড়া

দীক্ষার ব্যাপারে তাড়াহুড়া ভাল নয়। যার প্রাণ দীক্ষার জন্য কেঁদেছে, সে প্রতীক্ষা কর এবং নিজ ব্যাকুলতা ভগবানকে জানাও। তার ফলে অপ্রত্যাশিত ভাবে সত্যপথ তোমার লাভ হ'য়ে যাবে। (৫ই ফাল্গুন, ১৩৪৮)

অগ্রসর হও

এতকাল জীবন ছিল আশ্রয়হীন, অবলম্বনহীন, উদ্দেশ্যহীন। আজ জীবনে পরম শরণকে লাভ কর্লে। আজ আশ্রয় পেলে, অবলম্বন পেলে। জীবনের প্রকৃত পথ আজ বেছে নিলে, জীবনের সত্য উদ্দেশ্যকে আজ জান্‌লে। এখন চাই একাগ্র, উদগ্র, নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনা। এখন আর জীবনকে হেলায় খেলায় কাটিয়ে দেবার মত তুচ্ছ জিনিষ ব'লে জ্ঞান ক'রো না। পথ যে পায়নি, সে গালে হাত দিয়ে ব'সে থাকুক। কিন্তু পথ যে

পেয়েছে, তার আর অধিকার নাই একটা দিনও ব'সে থাকার, তাকে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ কেবল এগিয়েই যেতে হবে।

(১২ই ফাল্গুন, ১৩৪৮)

দীক্ষান্তর গ্রহণ

প্রশ্ন :—কোনও মহাপুরুষের উপদেশ শুনিয়া যদি আমার মনে হইতে থাকে যে, আমার গুরুদেব অপেক্ষা ইনি অনেক উচ্চস্তরের মহাপুরুষ এবং ইঁহার উপদেশে সারও অধিক রহিয়াছে। এই অবস্থায় আমার দীক্ষাদাতা গুরুর পথ পরিহার করিয়া আমি পুনরায় এই নবাগত মহাপুরুষের নিকটে দীক্ষা লইতে পারি কিনা ?

উত্তর :—তুমি একস্থানে দীক্ষা লইলে এবং তাহা ছাড়িয়া দিলে, পুনরায় অন্যত্র দীক্ষা লইলে, ইত্যাদি ঘটনার উপরে তোমার জীবনের উন্নতি নির্ভর করে না। তোমার জীবনের উন্নতি নির্ভরশীল হইবে তোমার সাধন-পরায়ণতার উপরে। দীক্ষা যাঁহার কাছ হইতেই লইয়া থাক, তোমার সাধন তোমাকে অকপটে অনলস ভাবে করিয়া যাইতে হইবে, ইহারই উপরে নির্ভর করে তোমার সাধনের সিদ্ধি। এক মানুষ হইতে অন্য মানুষ শ্রেষ্ঠ হন, তাই বলিয়া সাধ্বী পত্নী তাহার স্বামীকে পরিত্যাগ করেন না। দীক্ষাকে তোমার কাণে মন্ত্র দেওয়া বলিয়া মনে করিতেছ, কিন্তু দীক্ষা যে এক প্রকারের বিবাহ। দীক্ষাদাতা তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়া দীক্ষিতকে আপন করিয়া

লন। ইষ্টবীজ তাহার দাতার সহিত তাহার গ্রহীতার আত্মার সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দেয়। পতিব্রতা সতী নারী তাই যেমন করিয়া তাহার পতির সহিত বিবাহ দ্বারা পাতান সম্পর্কটাকে জন্মে জন্মে অচ্ছেদ্য মনে করেন, প্রকৃত শিষ্যও গুরুর সহিত দীক্ষাদ্বারা পাতান সম্পর্ককে তেমন জন্মে জন্মে অচ্ছেদ্য মনে করেন। শিষ্যের এই যে আনুগত্য, তাহার সুযোগ নিয়া অনেক অনাচারী গুরুরা অনেক অন্যায় কাজের অনুষ্ঠান করিয়াছেন বলিয়া এই ভাবটার মধ্যে আজ মালিন্য আসিয়া গিয়াছে। কিন্তু শিষ্যের এই জাতীয় আনুগত্য সাধন-নিষ্ঠা ও বল বাড়ায়। তাই প্রকৃত সাধকদের মধ্যে এখনও গুরুর প্রতি এই মনোভঙ্গী নাশ পায় নাই। তাই, একবার দীক্ষা নিয়া আবার দীক্ষা-পরিবর্ত্তন জনসমাজে প্রশংসিত নহে। সত্য সত্য সাধন যে করিবে, তাহার কাজ করা উচিত কেবল সাধনের দিকে আগাইয়া যাওয়ার জন্যই। ইহার জন্য গুরুপরিবর্ত্তন যাহার দরকার, সে করুক; যাহার প্রয়োজন নয়, সে স্থির হইয়া থাকুক। তবে কেহ ভাল করিয়া ভাষণ দিতে পারেন, কাহারও চেহারাখানা সুন্দর, কেহ জনসমাজে প্রভাবশালী, কাহারও দৈবশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, কাহারও হাতে আটটা হীরার আংটি, কেহ বহু গ্রন্থের রচয়িতা, কাহারও আশ্রমে হাজার সাধু থাকেন, কাহারও বা তিন লাখ শিষ্য, কাহারও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে পাঁচ লাখ টাকা আছে,—এই সকল বিবেচনা দ্বারা

পরিচালিত হইয়া কখনো কাহারো পূর্ব্বদীক্ষায় অনাদর করিয়া অন্যত্র নূতন দীক্ষা নেওয়া উচিত নহে।

(১৫ই ফাল্গুন, ১৩৪৮)

শিষ্যের ইষ্ট-নিষ্ঠা এবং গুরুর ঈর্ষ্যা

প্রশ্ন:—কোনও মহাপুরুষ নিজ শিষ্যদিগকে বারংবার উপদেশ দেন যে, দেখিও, সাবধান, অন্য মতের কোনও মহাপুরুষের বচনে ভুলিয়া গিয়া তাঁহার কাছে নূতন করিয়া মন্ত্র লইয়া বসিও না। সোণার মত চকচকে রং দেখিলেই ভাবিয়া বসিও না যে, ইহা সত্যই সোণা। অনেক সময়ে গিল্‌টি-করা মাল সোণার নামে বাজারে চলিয়া যায়।—এই সকল উপদেশ সম্পর্কে আপনার কি মত?

উত্তর:—নিজ শিষ্যের নিষ্ঠা-হানি নিবারণ করিবার জন্য গুরুদেবের পক্ষে সতর্ক দৃষ্টি থাকা ভাল। ইহাতে নিন্দা করিবার কিছু আমি পাইলাম না। জগতের অধিকাংশ শিষ্যই হুজুগে চলে এবং আজ এক গুরু, কাল এক গুরু করিয়া করিয়া কেবল গুরু চাখিয়া চাখিয়া জীবন পাত করিয়া দেয়। এই বিপদ হইতে শিষ্যকে বাঁচাইবার জন্য শিষ্যকে সাবধান-বাণী শোনান গুরুর পক্ষে অন্যায়ও নহে, অস্বাভাবিকও নহে। যেই যাহাকে গ্রহণ করুক, যাচাই বাছাই করিয়া করুক, ইহা ত' অতি সঙ্গত উপদেশ। সাধনে নিষ্ঠার নাশ না হইলে সাধারণ গুরুর শিষ্যও অসাধারণ হইতে পারেন। সাধনে নিষ্ঠার নাশ

হইলে অসাধারণ গুরুর শিষ্যও সাধারণ লোকদের চাইতে নিম্ন-স্তরে পড়িয়া থাকিতে পারেন। এই জন্য সাধনে শিষ্যের নিষ্ঠা-বর্দ্ধনের জন্য গুরুদেব অবশ্যই যে-কোনও উপদেশ শিষ্যকে দিতে পারেন। তবে এই বিষয়ে আমার রীতি আলাদা। আমি যাহাকে শিষ্য করিয়াছি, তাহার যদি সৌভাগ্য হয়, আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোকের পাদস্পর্শের, তাহা হইলে আমি তাহাকে বরং বলি যে, আমাকে একটুকুরা ছেঁড়া নেকড়ার ন্যায় এখনি পরিবর্জন করিয়া চলিয়া যাও। নিজের পরম লাভ, চরম উন্নতি নিয়া যেখানে কথা, সেখানে আমার প্রতি মমতা রাখিতে আমি তাদের নিষেধ করিয়া থাকি। তাহার সাধনে উন্নতিই ত' আমার কাম্য,—আমার শিষ্যদের মধ্যে কত জন কমিয়া গেল, ইহার প্রতি আমার দৃষ্টি নাই। জগতের মধ্যে আমার যদি একজনও শিষ্য না থাকেন, আর আমি যদি একাই নিজের শিষ্যত্ব করিয়া বেড়াই, তাহা হইলেও আমার কোন আফশোষ নাই, অবশ্য যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইয়া আমার এককালের শিষ্যনামধারিগণ নিজ নিজ নব-গৃহীত সাধন-পথে অবিচলিত বিক্রমে চলিয়া পরম লাভকে করায়ত্ত করিবার জন্য জীবন-পণ করেন। তাঁহাদের প্রকৃত উন্নতিই আমার কাম্য, আমার শিষ্যত্বের জোয়ালে তাঁহাদের ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিলাম না বলিয়া অক্ষমতার ক্ষোভ বা ঈর্ষ্যার বেদনা আমার অন্তরে নাই। এই জন্যই আমি আমার শিষ্যগণকে কোনও

মহাপুরুষকে সম্বর্ধনা করিতে দেখিলে আনন্দিত হই, শঙ্কায় কুণ্ঠায় দুর্ব্বলতায় মরমে মরিয়া যাইতে আরম্ভ করি না। তোমার প্রশ্নের উপলক্ষিত মহাপুরুষকে আমি চিনিয়াছি, কিন্তু তাঁহার প্রতি আমার অনাবিল প্রেম ছাড়া আর কিছুই নাই। অন্যের অধিকৃত দুর্গে আসিয়া হানা দেওয়া আমার স্বভাব নহে। কারণ, আমি যেই স্থানে নরহিত করিতে হয়ত পারিতাম না বা সময়, সুযোগ ও অবসরের অভাবে যেখানে নরহিত করি নাই, সেখানে অন্য এক জন সেই কাজটী করিয়া রাখিয়াছেন ভাবিয়া আমি বরং এই সকল মহাপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হই। অন্যান্য মহাপুরুষগণের দ্বারা জীবহিতকামনায় লোককে সাধন-দীক্ষা দানের সংবাদ শুনিলে আমি আনন্দে গদ্‌গদ হই এজন্য যে, আর একজন লোক বা আর এক দল লোক ভগবানকে ডাকিবার ব্রত লইলেন। যিনি যেই নামেই ডাকুন, আমারই প্রাণপ্রিয়তমকে ডাকিতেছেন। তাই তাহাতেই আমার লাভ। সমগ্র জগৎকে আমি অধিকার করিব, ইহা আমার লক্ষ্য নহে। কিন্তু সমগ্র জগৎ ভগবানের অধিকারে আসুক, ইহাই আমার লক্ষ্য। একজন সেনাপতি যদি সকল দেশ ভগবানের অধিকারে না আনিতে পারেন, তবে দশ জন সেনাপতি সে কাজে লাগুন। যে দিক দিয়াই বা যেই অস্ত্র দিয়াই ভগবানের অধিকারের প্রসার হউক, আমারই ত' প্রেমের ঠাকুরের তাহাতে অধিকার-বিস্তার হইল! আমার আফশোষ

করিবার পথটা কোথায় খোলা রহিল ? যেখানে আমার আনন্দ করিবার অবসর, সেখানে আমি ঈর্ষ্যার মত কলঙ্কিনীর সহিত প্রেম করি না।

পূর্ব্বদীক্ষিতকে কোন্ অবস্থায় দীক্ষা দেওয়া চলে?

প্রশ্ন :—একজন ভিন্ন মতে সাধন নিয়াছে, সেই মতানুযায়ী সাধনও দীর্ঘকাল করিয়াছে, কিন্তু মনে শান্তি পাইতেছে না। সে যদি আপনার আশ্রয় চাহে, আপনার শরণাগত হয়, তাহা হইলে তাহাকে আপনি সাধন-দীক্ষা প্রদান করিবেন কি ?

উত্তর :—তাহাকে আমি প্রথমেই বলিব যে, যে সাধন সে আগে করিয়া আসিয়াছে, হয়ত তাহার সহিত কামনা-বাসনার ছিল সংশ্রব। এটা চাই, ওটা চাই, এটা দাও, ওটা দাও, এই জাতীয় সকাম ভাব মনে রাখিয়াই হয়ত সে এত কাল সাধন করিয়াছে। তাহারই জন্য সাধনলতিকায় প্রেমের পারিজাত প্রস্ফুটিত হয় নাই। সে আগে সকল কামনা-বাসনা পরিহার করিয়া তাহার আগের সাধনাই মনঃপ্রাণ দিয়া আবার করিয়া দেখুক। ইহার ফলে হয়ত তাহার আর আমার কাছে আসিবার প্রয়োজন হইবে না। ইহার পরে আমি তাহাকে বলিব, তাহার গুরুদেবের নিকটে যাইয়া অকপটে সে তাহার সকল অবস্থার বর্ণনা করুক এবং তিনি সাধনে রুচি-বর্ধনের জন্য, সাধনপথে দ্রুত গমনশীলতার সৌকর্য্যার্থে কোনও সহজ সরল সদুপায়

বাতলাইয়া দিতে পারেন কিনা, তাহা সে দেখুক। হয়ত ইহার ফলে তাহার পক্ষে আর আমার নিকটে আসিবার প্রয়োজন নাও হইতে পারে। ইহার পরে আমি তাহাকে বলিব,— আমার শরণাগত হইতে চাহিতেছ, কিন্তু আমাকে পরীক্ষা করিয়া ত' দেখ নাই যে, আমার যোগ্যতাই কি বা আমার সাধনসিদ্ধিই বা কি, আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়া তুমি নিজেকেও নিজে পরীক্ষা করিয়া লও যে, তোমারই বা আমার দেওয়া সাধন লইয়া চলিবার জন্য সত্য সত্য আগ্রহ ও যোগ্যতা কতখানি হইয়াছে। এক বৎসর আমাকে তুলা-ধুনা করিয়া বিচার কর, একটা বৎসর ধরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখ, তাহার পরে সাধন নিতে হয়, বেশ নিশ্চিন্ত নির্দ্বিধ মনে আসিও, আমি তখন তোমাকে উপেক্ষা করিব না। কিন্তু ইহার আগে তোমাকে লইয়া কিছু করিতে গেলে আমি বুদ্ধিভেদ-জননের অপরাধ করিব। গুরু কেবল একজন অটোক্রাট স্বেচ্ছাচারী সম্রাট্ নহেন, তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ আচারবান্ অভ্যাসবান্ সৈনিকও বটেন। অপরের বুদ্ধি-ভেদ করিয়া তিনি কেন শাস্ত্রীয় শিষ্টাচারকে লঙ্ঘন করিবেন ?

শিষ্য-সংগ্রহের চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন

প্রশ্ন :—আমি আপনার গুণে মুগ্ধ। কিন্তু আমার পক্ষে আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ নানা কারণে সম্ভব নহে। কিছু দূরবর্ত্তী কোনও কোনও গ্রামে আপনার শিষ্য থাকিলেও সম্ভবতঃ এখানে

একজনও নাই। আমি যদি আপনার দুই চারি জন শিষ্য সংগ্রহ করিবার জন্য এখানে আমার সাত্ত্বিক সামর্থ্যকে প্রয়োগ করি, তাহা হইলে তাহাতে আপনার আপত্তি আছে কি?

উত্তর:—নিশ্চয়ই আছে। শিষ্য দিয়া আমার কোন্ প্রয়োজন? লোকেরা দলে দলে শিষ্য হইতে আসে, তাহাদের বুঝাইয়া সুজাইয়া ঠেকাইতে পারি না, তাই বাধ্য হইয়া দীক্ষা দেই। অবশ্য, দীক্ষা দিয়া একটা আত্মপ্রসাদ এই লাভ করি যে, ইহারা যদি সত্যই দীক্ষানুযায়ী সাধন-ভজন করে, তাহা হইলে ইহাদের মনের পাপ-তাপ-অশান্তি দূর হইবে, জগতের দুঃখ দূর হইবে। আমি ব্যক্তির মুক্তির ধর্ম্মকে যজন করি না। সমগ্র বিশ্বের মুক্তি আমার লক্ষ্য। শিষ্যগণকে আমি সেই লক্ষ্যই দেখাইয়া দেই। তাহাদের ব্যক্তিগত সাধনার সঙ্গে তাহারা নিখিল বিশ্বের জন্য সাধনা করিতেছে, এই কথাটী তাহাদের বুঝাইয়া দেই। যাহা করিলে এই কথাটী তাহাদের কোনও প্রকারেই একটী দিনও ভুল হইতে না পারে, তাহার অনুযায়ী সাধন তাহাদের দেই। সুতরাং ইহার মধ্যে আমার আত্মতৃপ্তি রহিয়াছে। কিন্তু ইহাদের সংখ্যার হউক বর্দ্ধন, ইহা আমি চেষ্টা করি না। দীক্ষা-দান-কালে আমি ইহাদের এই কথাটী বলিতে প্রায় ভুলি না যে, ইহাদের প্রয়োজন হইতেছে একাগ্র মনে সাধনে বলসঞ্চয়, দল বাড়াইবার বুদ্ধিতে যেন ইহারা কোনও কাজ না করে। ইহাদের বলিয়া দেই, অন্যত্র

কেহ অন্য পথে দীক্ষা লইলে মনে করিবে তোমারই একজন গুরু-ভাই বাড়িল, শত্রু বাড়ে নাই। সুতরাং তোমাকে এখানে আমার শিষ্য-সংগ্রহ করিবার জন্য কোনও পরিশ্রম করিতে হইবে না।

(১৫ই ফাল্গুন, ১৩৪৮)

পাপীর দীক্ষা

আত্ম-সংশোধনের শক্তি পাবে ব'লেই ত' দীক্ষা দেওয়া। পাপীকে আমি উপেক্ষা করি কি ক'রে? দীক্ষার শক্তিতে লম্পট লাম্পট্য ছাড়ে, পানাসক্ত মদ্যপান ত্যাগ করে, চির-নিন্দুক পরনিন্দা পরিহার করে। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। পাপীকে আমি ঘৃণা করব না।

(১৭ই ফাল্গুন, ১৩৪৮)

——

গুরু দ্বিতীয়াংশ সমাপ্ত

অখণ্ড অমৃতময় নামে করি' দেহক্ষয়,
জীবন সার্থক হবে, মরণেও বিশ্বজয়।
মৃত্যু নাই, ধ্বংস নাই, দুঃখ নাই তার তরে,
অবিরাম অনুক্ষণ নামের যে সেবা করে।

—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ—
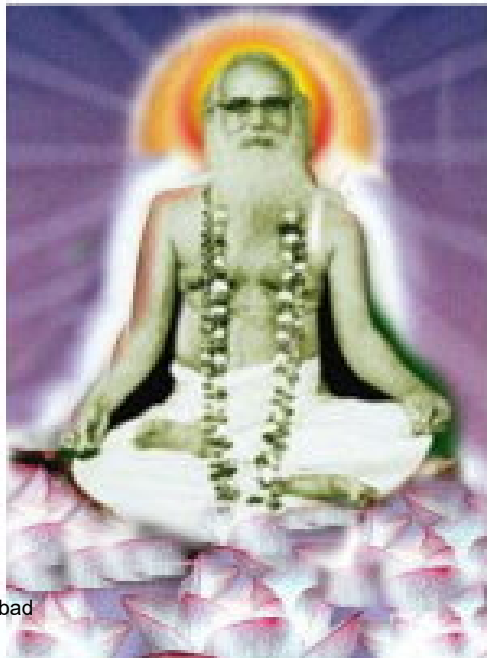
গুরু

শেষাংশ

গুরু, গুরুবাদ, ও দীক্ষা
সম্পর্কিত উক্তি-সমূহের
সংগ্রহ

No matter where I am
or what I am doing,
when you come to mind
a smiles comes to my face.
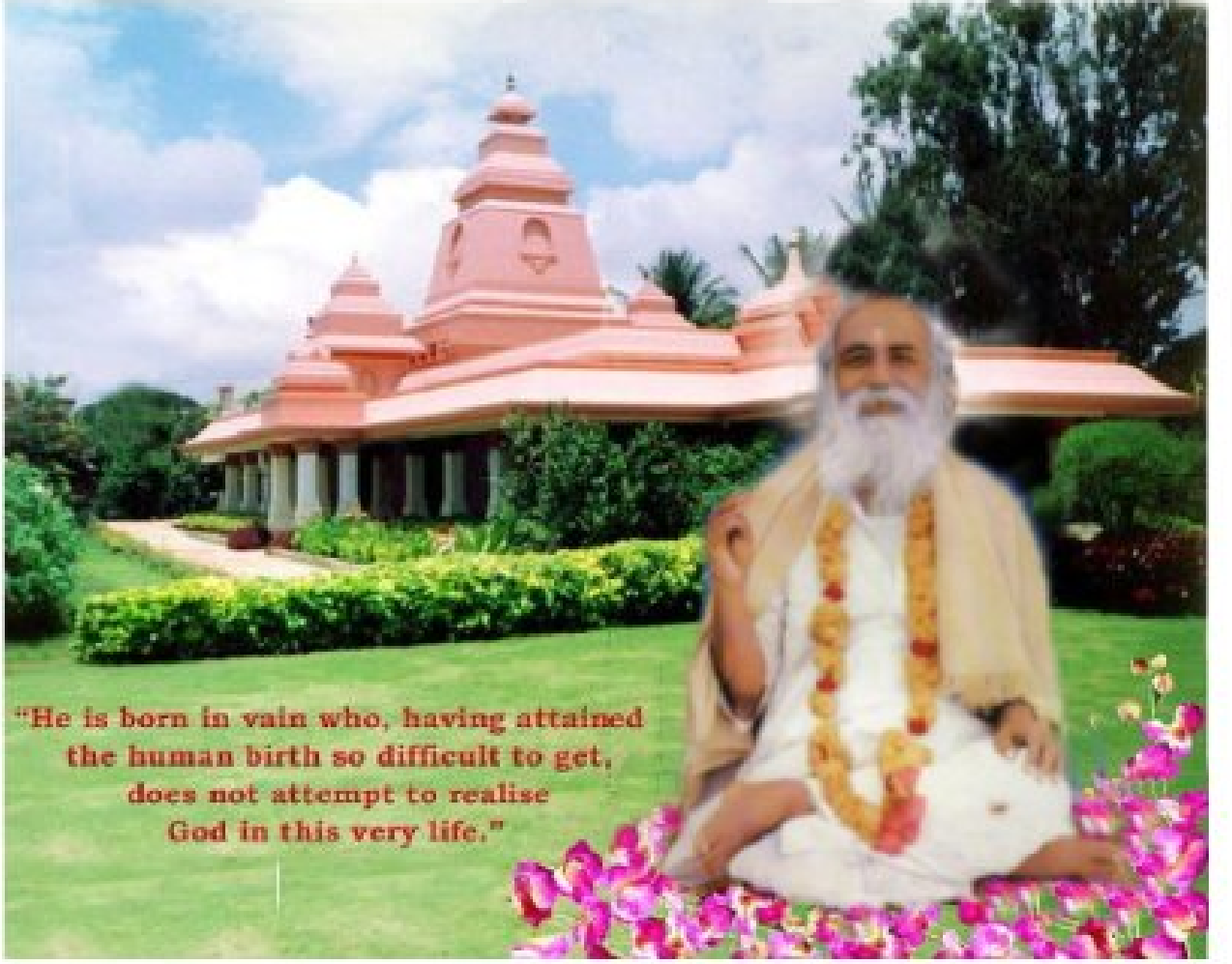
একনিষ্ঠাই সাফল্যের প্রাণ।

– শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

(১)

একটা প্রশ্ন তোমাকে খুবই রূঢ় ভাবে আঘাত করিবে যে, অন্যান্য গুরুদেবদের শিষ্যরা নিজ নিজ গুরুদেবের প্রতি অসাধারণ ভক্তিমান্, তাঁহাদের আদেশ-পালনে যত্নবান্, তাঁহাদের প্রতিটি কার্য্যে কুণ্ঠাহীন, দ্বিধাহীন, দ্ব্যর্থতাহীন ভাবে সহায়ক, আর আমার শিষ্যগণের মধ্যে ইহার অন্যথা কেন দেখা যাইতেছে। তাহার জবাবটা তোমরা জান। আমাকে বিচার করিবার অধিকার আমি আমার শিষ্যদের দিয়াছি, পৃথিবীর অন্য কোনও গুরু তাহা দেন নাই। কিন্তু আমাকে বিচারের অধিকার দিয়াছি বলিয়াই যে ইহাই শিষ্যদের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে, এমন ত' হইতে পারে না! ইহারা ইহা বোঝে নাই। স্বাধীনতা যে দায়িত্বের সহিত অঙ্গাঙ্গী, ইহা ইহারা বোঝে নাই। আমি স্বাধীনতা দিয়া ইহাদিগকে যে দায়িত্বের বন্ধনে বাঁধিয়াছি, ইহা বুঝিবার মত বোধশক্তি ইহাদের নাই। এই জন্যই বড় বড় কথার ফুলঝুরি যাহাদের মুখ হইতে নিয়ত ঝরিতেছে, তাহারা কিন্তু সংঘের কর্ত্তব্যে সর্ব্বদাই শূন্য। ইহাদের বুদ্ধি আছে, বিবেচনা নাই, জ্ঞান আছে, কর্ম্ম নাই, স্বাধীনতা আছে, দায়িত্ব নাই, ক্ষমতা আছে, তাহার প্রয়োগ নাই, সম্মানাভিলাষ আছে, সম্মান পাইবার যোগ্যতা নাই। আমি স্বাধীনতা দিতে গিয়াই ইহাদের এই সকল সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছি।

আমার প্রদত্ত স্বাধীনতা শিবকে বানরে পরিণত করিয়াছে, আমিও সেই বানর-কুলের সহস্র উৎপাতকে বরণ করিয়া লইয়া পথ চলিতে বাধ্য হইতেছি। যতবার গাছ পুঁতিতেছি, আমার রোপা গাছ আমার পুত্র-কন্যারাই ততবার টানিয়া টানিয়া তুলিয়া ফেলিতেছে। তবু বিরক্ত হইতেছি না এই কথা ভাবিয়া যে, আমি একটা নূতন পরীক্ষা করিয়াই দেখি না! আর আমি পুঁতিতেছি কল্পতরু। এই তরু ভূতল হইতে তুলিয়া ফেলিলেও জলে, আকাশে বাড়িবার ক্ষমতা রাখে। আমার তরু প্রেমের তরু, যে তরু নিজের ছায়ায় কোটি বিশ্বের তাপিত প্রাণকে শীতল করিতে পারে। আমার বীজ প্রেমের বীজ, যেই বীজের মধ্যে সকল বীজ আছে লুক্কায়িত, যে বীজ সকল বীজকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে। আমার সত্য সার্ব্বজনিক সার্ব্ব-ভৌমিক সত্য, যাহার সহিত জগতের কোনও সত্যের বিরোধ নাই। তাই আমি শিষ্যদের দ্রোহে বা বিভিন্ন সংঘের ধীমান্ অধিনায়কদের জ্ঞানগর্ভ বিদ্বেষ-ভাষণে, বজ্রগর্ভ হিংসার বোমায় বিন্দুমাত্র ভয় করি না। (৫ই চৈত্র, ১৩৬৪)

(২)

দীক্ষা তোমাদের পক্ষে প্রাংশুলভ্য ছিল। দুশ্চর তপস্যা তোমরা দীক্ষা পাইবার জন্যই করিয়াছ।

দীক্ষা পাইবার পরেই ত' তোমাদের আসল তপস্যার শুরু হইল। মন হইতে সকল দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দিয়া প্রতিজনে

সাধনে মনোনিবেশ কর। হাতের কাজ না ছাড়িয়াও যে ভগবৎ-সাধন করা যায়, সেই কৌশলই ত' আমি তোমাদের শিখাইয়া দিয়াছি। (১৫ই চৈত্র, ১৩৬৪)

(৩)

তুমি ভগবানের নামে দীক্ষা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছ। এদেশে দীক্ষা একটা বদ্ধমূল সংস্কার এবং দীক্ষা না নিলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না বলিয়া জনসাধারণের একটা প্রবল বিশ্বাস আছে। এই দুই কারণ যদি তোমাকে দীক্ষার দিকে ঠেলিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে দীক্ষা নিতে আরও কিছুকাল দেরী কর। প্রতীক্ষা দ্বারা নিজের মনকে পাকা-পোক্ত করিয়া লও। সম্ভব হইলে গুরু-পরীক্ষা করিয়াও ভবিষ্যতের বৃথা সন্দেহের ঝুঁকিগুলি কমাইয়া লও। প্রাণ যখন দীক্ষার জন্য ব্যাকুল হইবে, তাহার আগে শুধু ঝোঁকের বশে দীক্ষা নেওয়া কাহারও উচিত নহে। হুজুগে দীক্ষা নিয়া কদাচিৎ কেহ কেহ যে বিশেষ লাভবান্ হন নাই, তাহা নহে পরন্তু এই সব ব্যতিক্রম-স্থলীয় দৃষ্টান্তের জোরে হুজুগকে সমর্থন করা সঙ্গত নহে।

তুমি যদি সঙ্কল্প করিয়া থাক যে, ঈশ্বর-সাধনে ফাঁকি দিবে না, গুরুদত্ত সাধন অবিচল বিক্রমে আমৃত্যু করিয়াই যাইবে, তাহা হইলে তুমি প্রায় নির্ব্বিচারে নিজের অভিলষিত বা মনঃপূত যে-কোনও মহাজনের আশ্রয় নিতে পার। অমুকের পথ উৎকৃষ্ট বা তমুকের পথ নিকৃষ্ট, এই সব বিচারের মধ্যে

প্রবেশ করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। সকল পথেই ভগবানকে পাওয়া যায়। জগতের সকল মতাবলম্বীরাই ভগবানের পরম করুণার অধিকারী হইবেন। প্রাণ ভরিয়া ভগবানকে ডাকিতে কসুর না থাকিলে সকল মতের মতীরাই তাঁহাকে পাইবেন। তবে দীক্ষা নিবার আগে তোমার বিচার প্রয়োজন শুধু এইটুকুর যে, কোনও নির্দ্দিষ্ট একটা দলে ভিড়িবার ফলে ধর্ম্মের নামে কোনও অধর্ম্ম, অনাচার, অসহিষ্ণুতা অনুদারতা, পাপ, দুর্নীতি বা ব্যভিচার ত' তোমার জীবনে আসিবে না? অনেক সদ্ধর্ম্মাবলম্বীসম্প্রদায়েরও দীক্ষা নিবার পরে দেখা যায়, মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম না বাড়িয়া ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা বাড়িয়া যায়। দীক্ষা নিয়া এমন সকল সম্প্রদায়ের কবলে পড়া লাভজনক নহে।

আমার এখানে দীক্ষা নিবার জন্য আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ দিতে পারিতেছি না। তুমি খোলা মনে পৃথিবীটা ভ্রমণ করিয়া দেখ। সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা ও প্রেমের দৃষ্টিতে নানা স্থানের লোকপাবন পুরুষদের চরণ-প্রান্তে তাকাও। সস্নেহ ও সপ্রেম-অন্তরে তাঁহাদের প্রচারক ও শিষ্যদের আবরণ ও আচরণগুলি লক্ষ্য কর। আগে দেখ, জগতের কোনও মত, কোনও পথ, কোনও সংশ্রব তোমার প্রাণের পিপাসা মিটায় কিনা। যদি মিটায় বলিয়া অনুভব কর, তবে নিঃসঙ্কোচে সেখানে দীক্ষিত হইয়া যাও এবং পিছন ফিরিয়া তাকাইবার

অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া কেবল সাধন-পথে চলিতেই থাক। যখন দেখিবে, পৃথিবীর কোনও সম্প্রদায়ে তোমার স্থান হইল না, তখন আমার প্রতি তোমার প্রাণের দীর্ঘপোষিত প্রেমকে স্মরণ করিয়া আমার কাছে আসিতে পার। তখন আমি তোমাকে মন্ত্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

(২৩শে চৈত্র, ১৩৬৪)

(৪)

ওঙ্কার-মন্ত্রে যখন দীক্ষা পাইয়াছ, তখন কালী, দুর্গা, শিব, গণেশ প্রভৃতির ধ্যান করিবার আবশ্যকতা কি? তুমি ওঙ্কারই ধ্যান করিবে। কালী, দুর্গা, শিব, গণেশকে ধ্যান করিলে না বলিয়া তাঁহারা তোমার উপর চটিয়া যাইবেন, ইহা ভাবিতে যাওয়া মূর্খতা মাত্র, কারণ ক্রোধ, আক্রোশ, প্রতিহিংসা দেবতার স্বভাব নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ত' তোমাদিগকে এইভাবে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইয়াছে যে, অমুকের পূজা না করিলে মহামারী হইবে, তমুকের পূজা না করিলে নির্ধনতা আসিবে—ইত্যাদি। ভয়ের দ্বারা আতুর করিয়া নানা সময়ে নানা দেবতার পূজা প্রচলনের চেষ্টা হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও পূজা প্রেমের আকর্ষণে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু সব পূজাই যখন এক পরমেশ্বরের, তখন ধ্যান করিতে বসিয়া পাঁচ রকমের ধ্যান জমাইতে গিয়া সাধিয়া সংশয়ের হট্টগোলে পড়িবে কেন? দেবতাদিগকে যদি ঈশ্বরের বিভূতি বলিয়া মান,

তাহা হইলে একথা ভাবিতে কষ্ট কেন হইবে যে, তাঁহারা সকলেই ওঙ্কারের মধ্যে আছেন ? দেবতাদিগকে যদি স্মরণাতীত কালের মহাপুরুষ বলিয়া মান, যাঁহারা ঈশ্বর-সাধন করিতে করিতে লোকের কাছে ঈশ্বরের সম্মান পাইয়াছেন, তাহা হইলে একথা ভাবিতেই বা কষ্ট হইবে কেন যে, তাঁহারাও ওঙ্কার-মন্ত্রে ঈশ্বরকে ডাকিয়াছেন ? স্বপ্নে একদিন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়াছিলে, তাহাতে ইহাই মাত্র প্রমাণ হয় যে, যেই পরিবেশের মধ্যে আবাল্য পরিপালিত হইয়া আসিয়াছ, সেই পরিবেশের ধার্ম্মিক প্রভাবটুকু তোমার উপরে আজও রহিয়াছে। স্বপ্নে তোমরা কতজন আমার মূর্ত্তিও ত' দেখিয়া থাক,—এমন কি যাহারা আমার নিকটে দীক্ষিত নহ বা আমাকে জীবনে দেখ নাই—এমন শত শত ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখিয়াছ। ইহা দ্বারা মাত্র এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে, আমার সহিত তোমাদের একটা আপনত্বের সম্বন্ধ আছে। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, কালী, দুর্গা, কেহই তোমাদের পর নহেন,—স্বপ্নাদি দর্শনের প্রতিফলিত সিদ্ধান্ত মাত্র এইটুকু। দীক্ষা পাইয়াছ ওঙ্কার-মন্ত্রের – ধ্যানও কর ওঙ্কারেরই। ওঙ্কারের ভিতর কখনও কৃষ্ণ ফুটিয়া উঠিতে পারেন, কখনও বা ফুটিয়া উঠিবেন কালী। কখনও যে আমার মত সামান্য মানুষই ফুটিয়া উঠিবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে ? কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য হইবে এই যে, ওঙ্কারই তোমার প্রামাণ্য বেদ। অপরাপর পরিদৃষ্ট রূপ কখনও তাহার টীকা,

কখনও তাহার টিপ্পনি। তোমার ক্যানাডিয়ান বা আমেরিকান গুরুভ্রাতারা ওঙ্কার জপিতে জপিতে কখনও কখনও খৃষ্টকেও দেখিতে পান। খৃষ্ট এবং কৃষ্ণ যে এক, বুদ্ধ এবং গৌরাঙ্গ যে এক, শিব এবং বিষ্ণু যে এক, এই প্রতীতি একমাত্র ওঙ্কার-সাধনার মধ্য দিয়াই সহজসাধ্য। ক্লীং মন্ত্র জপ করিতে করিতে কৃষ্ণ আর খৃষ্টকে এক বলিয়া এখনও বোধ হয় কেহ উপলব্ধি করেন নাই। ওঙ্কার-মন্ত্র সেই উপলব্ধিকে সহজায়ত্ত করিয়াছে। বিশ্বের সকল বিভেদ যেই একটি মহামন্ত্রের মধ্যে সমন্বিত, সামঞ্জস্যীকৃত ও স্বীকৃত হইয়া সকল বিভেদ-বিচ্ছেদের মূল উৎপাটন করিয়াছে, সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পর সেই মন্ত্র-রাজের ধ্যানই ত' তোমার পক্ষে প্রশস্ত। (২৫ চৈত্র, ১৩৬৪)

(৫)

শিষ্যের মনে যদি গভীর ভক্তি থাকে, তাহা হইলে গুরু-দর্শনের দ্বারাও সে অশেষ অকল্যাণ হইতে উদ্ধার পায়,—এই যে একটা কথা গুরুদেবদের মুখে অনেক সময়ে শুনা যায়, এই কথাটা গুরুদেবেরা সকল সময়েই যে নিজেদের পসার বাড়াইবার জন্য বলিয়া থাকেন, তাহা নহে। এই কথার মধ্যে একটা সুগভীর সত্যও রহিয়াছে। আমি ত' বাবা, গণতন্ত্রের যুগের গুরু, যেই যুগে গুরু নিজেকে শিষ্যের সহিত সর্ব্ববিষয়ে সমান ভাবিয়া চলিবেন। কিন্তু তথাপি আমি ইহা অন্তরে সুস্পষ্ট অনুভব করি যে, গুরুতে শিষ্যের অনুরাগ যখন অকপট,

ঐকান্তিক ও সুদৃঢ়, তখন একমাত্র গুরুদর্শনের দ্বারা শিষ্য প্রভূত কল্যাণ লাভ করিতে পারে। প্রচলিত গুরুবাদের সহিত নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত সৈনিকরূপে আমি এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি যে, শিষ্য যেখানে একান্ত অনুরাগী এবং গুরু যেখানে নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ, সেখানে গুরু-শিষ্য পরস্পর পরস্পরকে দর্শন করিয়া সর্ব্বতোভাবে লাভবান হন। গুরুদর্শনে যেমন শিষ্যের লাভ, শিষ্যদর্শনেও গুরুর তেমন-লাভ।

আমি ত' তোমাদের প্রতিজনকে আমার ধ্যানের দেবতা, ভজনের বিগ্রহ বা আরাধ্যের প্রতিচিত্র-রূপে হৃদয়ে স্থান দিয়া রাখিয়াছি। লৌকিক প্রয়োজনে তোমাদের অসংখ্য জনের ভক্তিপ্রণাম গ্রহণ করতঃ নিয়ত আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিতে নিরত থাকিয়াও তোমাদের প্রতি প্রত্যেকটী ব্যবহারের মধ্য দিয়া আমি তোমাদের পূজা করিতেছি। ভাগ্যবান্ কেহ কেহ আমার সেই পূজাভাবকে উপলব্ধি করিয়া উহার সহায়তাতে আত্মোন্নতির শীর্ষস্থানে উঠিবার চেষ্টাও করিতেছে। অপরেরা লোকদৃষ্টিতে আমার ও নিজেদের বিচার করিয়া করিয়া প্রকাশ্যে কেবল নিজেদের চতুষ্পার্শ্বস্থ দুই চারি গণ্ডা তদ্রূপ অনুজনেরই করতালি সংগ্রহ করিতেছে, যাহারা পরোক্ষে নিজ নিজ প্রশংসা-গুঞ্জন প্রত্যাহার করিয়া লইয়া বিপরীত আচরণে প্রমত্ত হইতেছে। লৌকিক বিচারে অলৌকিকের আস্বাদন কি করিয়া হইবে? আমার দৃষ্টিতে গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ সর্ব্বপ্রকার লৌকিকতার ঊর্দ্ধে।

তোমরা যদি সাধন কর, তাহা হইলেই এই তত্ত্ব বুঝিবে। তাই, আমি এই তত্ত্ব নিয়া কখনও কোনও উপদেশ দেই নাই। সাধন কর বাবা, সাধন কর। (২৬শে চৈত্র, ১৩৬৪)

(৬)

গুরু বড় গুরু বস্তু। ভক্তি ও প্রেম দিয়া তাঁহার বাক্য ধরিলে প্রতিটি বাক্য মন্ত্রের মত হইয়া যায়। ক্ষুদ্র একটী বীজ-মন্ত্র যেমন সাধন করিতে করিতে নিজের ব্যাপক, বিপুল, সুবিস্তার অর্থ ক্রমশঃ প্রকট করিতে থাকে, গুরুবাক্য ভক্তিমান্ শিষ্যের কাছে তদ্রূপ। "যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ",—কথাটা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। ভাবের শুদ্ধি থাকিলে প্রাপ্তির দিক দিয়া কমতি হইবার কোনও কারণ নাই। (২৮ চৈত্র, ১৩৬৪)

(৭)

চমৎকার কথা লিখিয়াছ। মহাপুরুষটী যাকে তাকে দীক্ষা দেন না। তবে কি লোক বাছিয়া দীক্ষা দেন? কেমন লোককে দেন? গরীবকে? মূর্খকে? নীচ, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্যকে? তাই যদি দেন, তবে ত' তিনি আমার মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ, দিন-রজনী পুজা পাইবার যোগ্য সোণার মানুষ। নাকি, ধনীকেই দেন, বিদ্বান্‌কেই দেন, সমাজে প্রতিষ্ঠাবান্ সম্মানী দামী ব্যক্তিদেরই দেন? কিন্তু এসব মুল্যবান্ মনুষ্যদের সাথে ডোম, মুচি, মেথর এক পংক্তিতে বসিয়া দীক্ষা নিতে পারে কি? এই অভাগারা ত' বঞ্চিত হয় না? অথবা এইসব মুল্যহীন মনুষ্য-

গুলির প্রতি কৃপা হইলেও মূল্যবান্ সম্মানী মানুষদের কাছ হইতে দূরে নিয়া তাহাদের দীক্ষা দেওয়া হয়? গুরুদেবের উৎসবে একদল অভ্যাগতকে ঘরে বসাইয়া মালপোয়া পরিবেশন করিয়া আর একদলকে বাহিরের উঠানে বসাইয়া খিচুরী বিতরণের মত দীক্ষাকালেও কি দীক্ষার্থীর জাতি-বিচার, ধন-বিচার, প্রতিষ্ঠা-বিচার করা হয়? তোমার পত্র হইতে তাহার হদিস মিলিল না মা।

কেহ দীক্ষা নিয়াছে শুনিলেই আমি ভারী খুশী হইয়া যাই। দীক্ষা কার কাছ হইতে নিল, তাহা ভাবিবার আমার অবসর হয় না। তার আগেই আনন্দে প্রাণ নাচিয়া ওঠে। আহ্লাদ করিতে থাকি, একজন ভগবানের পথে পা বাড়াইল, একজন জীবনের অতীত গ্রন্থি ছিন্ন করিবার ব্রত লইল, আমার প্রাণ-প্রিয়তমের দিকে একজন ধাবিত হইল। শত শত লোক দীক্ষা নিতেছে শুনিলে আমি আরও খুশী, আরও অধিক আমার আনন্দ। যার কাছে ইচ্ছা নেউক, কিন্তু দীক্ষা ত' নিয়াছে, ভগবানকে ইহজীবনেই দর্শন করিবার সঙ্কল্পই ত' গ্রহণ করিয়াছে! এ লাভ যে আমাদের সকলের।

লোকগুরুগণের প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধনে তোমরা ক্লিষ্ট হইও না, আনন্দ করিও। পৃথিবীর প্রত্যেকটী ধর্ম্মসঙ্ঘের শ্রীবৃদ্ধিতে তোমরা আনন্দিত হইও। এমন ক্ষীণমনাঃ হীনবুদ্ধি তোমরা হইও না যে, তোমাদের মতে দীক্ষিতদের সংখ্যা না বাড়িয়া

অন্যদের মতে কেন বাড়িতেছে। দীক্ষাদানকালে আমি তোমাদের প্রতিজনকে বলিয়া দিয়াছি,—সমদীক্ষিতের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য কো[illegible] চেষ্টা তোমরা করিও না, কারণ তোমাদের যাহারা অ[illegible]রা আপনা আপনিই তোমাদের সমীপস্থ হই[illegible]। বলিয়াছি,—তোমরা নিজেরা সাধন করিয়া বলীয়া[illegible] বলই তোমাদের প্রয়োজন, দল নহে। যাহারা গুরুম[illegible]হইতে এমন উপদেশ পায়, যাহারা গুরুর জীবনের আচরণে এই জিনিষই দেখিতে পায় প্রতিফলিত, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষের গোষ্ঠীপুষ্টিতে অন্তরে আপত্তি অনুভব করিবে কেন? তোমরা এই সকল সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে নিজেদের স্থাপন কর। আমি বিশ্বের সকলের সহিত তোমাদের মিলাইতে চাহিতেছি। বিশ্বের একজনকেও তোমাদের পর ভাবিলে চলিবে না। অন্যত্র দীক্ষা নিয়াছে বলিয়াই যদি কেহ তোমাদের পর হইয়া থাকে, তবে জানিতে হইবে, আমার নিকটে দীক্ষালাভ তোমাদের সত্য সত্য হয় নাই। সকলের প্রতি ঈর্ষ্যাহীন প্রেমভাব পোষণ করিয়া তোমরা নিজ নিজ দীক্ষার সম্মান রক্ষা কর। (১২ই বৈশাখ, ১৩৬৫)

(৮)

কোন এক মঠের ধর্ম্মাচার্য্য মহোদয় তোমাদের অঞ্চলে আসিবেন বলিয়া তোমরা কেহ কেহ যেন ভয়ার্ত্ত হইয়াই আমাকে ডাকিয়াছিলে। আমি তোমাদের ভয়ের প্রকৃত কারণ

অনুধাবন করিতে পারিলাম না। কোন মঠ বা আশ্রম হইতে কোনও সাধু-মহাত্মা আসিলে নিশ্চয়ই তিনি জনসাধারণকে ঈশ্বরনিষ্ঠ করিবার জন্য চেষ্টা পাইবেন। ইহাতে আমাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি কি আছে? সকলের কথা ত' সকলে শুনে না। যে সকল লোক আমাদের কথা শুনিত না, তাহারা হয়ত এই ধর্ম্মাচার্য্যের কথায় পথে আসিবে। ইহা আমাদের সর্ব্বজনীন লাভ। লাভের ব্যাপারকে ক্ষতির কারণ বলিয়া কল্পনা তোমরা কেন করিতেছ?

এমন কতকগুলি লোকও আছে, যাহাদের নিকটে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মাচার্য্যেরা গিয়া উপস্থিত হইলেও, একবার তাহারা ঈশ্বরের নাম লইবে না। এস না, আমরা বরং সেই লোকগুলির ভিতরে কাজ করিবার চেষ্টা দেখি। সুন্দর, সমতল, নদীমাতৃক, শস্যদ স্থানগুলিতে সকলেই লাঙ্গল চালাইয়া দিয়াছেন। যেখানে পলে পলে লাঙ্গল ভাঙ্গে, মিনিটে মিনিটে কোদালে গাইতে পাথর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে, চল না, আমরা সেখানকার পাথর কাঁকর ভাঙ্গিতে সচেষ্ট হই। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাচার্য্যদিগকে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিবার কি প্রয়োজন আছে?

আমার দুইজন শিষ্য হয়ত তোবা তোবা করিয়া মহামন্ত্র ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া আধ্যাত্মিক পিপাসার পরিতৃপ্তি চাহিয়াছে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে তাহাতেই বা তোমাদের বুদ্ধি-বিভ্রমের প্রয়োজন কি? যে যেখানে নিষ্ঠাপূর্ব্বক সাধন করিতে পারিবে,

তাহার সেখানেই আশ্রয় নেওয়া উচিত। ইহাদিগকে দলত্যাগী বলিয়া গালি না দিয়া বরং পরমেশ্বরের নিকট ইহাদের জন্য আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা কর। ইহাদের সুখ হউক, ইহাদের শান্তি হউক। সব সংঘেই এরূপ দু-পাঁচ-দশ জন দলত্যাগী থাকে। তাহাদের প্রতি বিরোধ-ভাব পোষণ করিবার মধ্যে কোনও সার্থকতা নাই।

সকল ধর্ম্মাচার্য্যদেরই নিজ নিজ ব্যক্তিগত কতকগুলি খোশ-খেয়াল থাকে। কেহ ব্রাহ্মণ ছাড়া দীক্ষা দিবেন না। কেহ ধনী শিষ্য পাইলেই খুশী হইবেন। কেহ কেহ বাছিয়া বুছিয়া আয়কর-অফিসারদের দীক্ষা দিবেন। কেননা, ইহাতে সমস্ত ব্যবসায়িমণ্ডলী এক দাওয়াইতে বশ হইয়া যাইবে। কেহ কেহ দীক্ষিতব্যকে এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইবেন যে, আমৃত্যু প্রত্যহ গুরুদেবের জন্য অর্থ-সঞ্চয় করিতে হইবে। এইরূপ কতরকমের খোশ-খেয়ালী কত ধর্ম্মাচার্য্যেরা আছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু তোমাদের ত' সেই সকল বালাই কিছুই নাই। গরীব হইলেও তোমাদের এখানে দীক্ষা পাইতে কোনও বাধা নাই, নীচ জাতি হইলেও কোনও আপত্তি নাই, বড় বড় সরকারী চাকুরি-নকুরি না করিলেও দীক্ষাকালে সে সমাদরণীয়, গুরুদেবকে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক বা বার্ষিক রজত-কাঞ্চন দক্ষিণা দানের কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। এই একটা জরুরী জায়গায় যখন প্রায় সকলের সঙ্গে তোমাদের

এক বিরাট, পার্থক্য রহিয়াছে, তখন তোমরা কোনও ধর্ম্মসংঘকেই তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিয়া পরিক্লিষ্ট হইতে পার না। তবে একটি জায়গাতে তোমাদের অবশ্যই উদ্বিগ্ন হইবার সঙ্গত যুক্তি আছে। তাহা হইতেছে তোমাদের নিজেদের নিষ্ঠা এবং অনিষ্ঠা।

পৃথিবীর সকল ধর্ম্মাচার্য্যদের সম্পর্কে আমাদের মন উন্মুক্ত। প্রত্যেককে আমরা সম্মান করিব, প্রত্যেকের ধর্ম্মোপদেশ আমরা শ্রদ্ধা সহকারে শুনিব, প্রত্যেকের শিষ্যদিগকে আমরা ভ্রাতা বলিয়া গণ্য করিব। কেবল সাধনার বেলা আমরা অব্যভিচারী থাকিব। (১৪ই বৈশাখ, ১৩৬৫)

(৯)

তোমার ভ্রাতা শ্রী— এক পত্রে জানাইয়াছে যে, সেখানে এগার শত নরনারী দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত। এইরূপ ব্যাপক দীক্ষা আজকাল আমাদের কোথাও কোথাও হইতেছে, এই কারণে তাহার প্রদত্ত সংবাদ ভিত্তিহীন বা অলীক বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। কিন্তু আমার মনে যে প্রশ্নটী জাগিয়াছে, তাহা এই যে, এতগুলি লোক মন্ত্রদীক্ষা লইয়া তোমাদের সমগোত্রীয় হইলেই কি তোমরা ভগবান্ হইয়া যাইবে? দীক্ষা হইল, সাধন করিল না,—তাহারা কি সমাজের শক্তি? দীক্ষার মানে হইতেছে, উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন-যাপনের পবিত্র সঙ্কল্প-গ্রহণ এবং সেই সঙ্কল্পানুযায়ী চলিবার জন্য কঠোর প্রতিজ্ঞায়

আরূঢ় হওয়া। সঙ্কল্প করিব কিন্তু কাজ করিব না, প্রতিজ্ঞা করিব কিন্তু পালন করিব না,—ইহা কিরূপ ব্রত।

এই স্থানে দীক্ষা কথাটাকে তোমাদের ভাল করিয়া বুঝিয়া নিতে হইবে। বর্ত্তমান বিচার-বিতর্ক-প্রধান যুক্তির যুগে গুরু-দেবগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত দীক্ষা শিষ্যদলকে ক্রীতদাসরূপে তালিকা-ভুক্ত করার সামিল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। শিষ্যদলের শ্রমার্জ্জিত বিত্ত বিনা শ্রমে অপহরণ করিবার জন্য গুরুদেবগণ দীক্ষারূপ একটা কৌশল অবলম্বন করিয়া সহজ-বিশ্বাস-প্রবণ ও দুর্ব্বল-হৃদয় ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মের নামে ঈশ্বরের দোহাই দিয়া প্রতারণা করিয়া আসিতেছেন বলিয়া শতকরা পঞ্চাশ জন লোক আজ অভিযোগ করিতেছে। যুক্তিবাদীদের এই অভিযোগ অনেক স্থলে যে সত্য, তাহাও না মানিয়া পারা যায় না। গুরু-দেবগণ বা তাঁহাদের দালালেরা বাছিয়া বাছিয়া ধনী, মানী ও বড়লোকদের দীক্ষিত করিবার জন্য যেমন নিদারুণ পরিশ্রম করিয়া থাকেন, তাহা হইতে যুক্তিবাদীদের অভিযোগ অনেকটা সমর্থিত হইয়া যায়। এমন এক যুগে তোমরা যদি তোমাদের গুরুভ্রাতা সংগ্রহের চেষ্টাকে প্রাধান্য দিতে যাও, তাহা হইলে তোমরাও যে বহু সরল ও সততা-পরায়ণ যুক্তিবাদীর সমালোচনার বিষয় হইবে, ইহা নিশ্চিত। এই কারণেই তোমাদের মুখে যখন উল্লাস-ধ্বনি শুনি যে, অমুক স্থানে একদিনে তোমাদের এত শত গুরুভাই হইল, তখন

ভাবিতে ইচ্ছা করে যে, দীক্ষা কথার মানে তোমরা ঠিক-মত বুঝিয়াছ ত' ?

তোমাদের দীক্ষা ভগবানের কোনও নামকে নির্দ্দিষ্ট কোনও প্রণালীর মধ্য দিয়া সাধন করিবার সঙ্কল্পটুকু গ্রহণই মাত্র নহে, তোমাদের সমস্ত সাধনা যে জগন্মঙ্গলেরই জন্য, এই সঙ্কল্পকেও গ্রহণ করা। তোমাদের দেহ, মন, প্রাণ, আত্মাকে জগন্মঙ্গলের জন্য প্রস্তুত করিবার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টাকে নিয়ত অন্তরে জাগরিত করিয়া রাখিবার নিরলস উদ্যমের প্রতিজ্ঞা-গ্রহণ হইতেছে তোমাদের দীক্ষা। দেশ-প্রচলিত সকল রকমের দীক্ষা হইতে তোমাদের দীক্ষার লক্ষ্য ও প্রণালীর মধ্যে এই একটী বিরাট বিশিষ্টতা রহিয়াছে। তোমাদের দীক্ষা কেবল মন্ত্রদানই নহে, কেবল মন্ত্রগ্রহণই নহে। তোমাদের দীক্ষা জগৎ-কল্যাণের উদগ্র, একাগ্র, একান্ত ব্রতগ্রহণ।

এই কারণেই দীক্ষা-গ্রহণের আগে তোমার ভাবী গুরু-ভ্রাতাদের প্রয়োজন হইতেছে দীক্ষার জন্য উপযুক্তভাবে প্রস্তুত হওয়া। যে গুরু শিষ্যদের নিকটে গুরুপ্রণামী দাবী করিলেন না, যে গুরু শিষ্যদের নিকট হইতে বার্ষিক প্রার্থনা করিলেন না, যে গুরু শিষ্যদের ডাকিয়া বলিলেন না, "তোমাদের নিজের উদরে অন্নগ্রাস দিবার আগে আমার উদরের অন্নগ্রাস আলাদা করিয়া রাখ," যে গুরু সমগ্র জীবন কঠোর কৃচ্ছ সহিয়া কোদাল-গাইতি হাতে কঙ্করময় কঠোর প্রস্তরাকীর্ণ মৃত্তিকা

কেবল কাটিয়াই যাইতেছেন, তোমাদিগকে ভগবানের নামে দীক্ষিত করিবার মধ্যে তাঁহার প্রয়োজন-বোধটা কোথায়, তাহা তোমরা ভাবিয়া দেখ।

তোমরা দীক্ষা নিবে আর তারপরেও প্রতিজনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের দাস রহিয়া যাইবে, এমন হইলে দীক্ষা নিষ্প্রয়োজন। তোমরা নিজেদেরই কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি চাহিবে আর ভুবন ভরিয়া শূদ্র আর অপাংক্তেয়েরা অবজ্ঞার দুঃখপূর্ণ জীবন যাপন করিবে, এমন হইলে দীক্ষা লক্ষ্যহীন। তোমরা একটা সাম্প্রদায়িক গণ্ডী রচনা করিয়া একটা বিপুল দল সৃষ্টি করিবে আর নব নব কর্ম্মৈষণা নিয়া অন্য সঙ্ঘগুলি জনকল্যাণে অগ্রসর হইলে ঈর্ষ্যা, পরশ্রীকাতরতা, দুঃখ ও যন্ত্রণা অনুভব করিবে, সকল সম্প্রদায়কে নিজের এবং নিজেকে সকল সম্প্রদায়ের বলিয়া ভাবিতে পারিবে না, এমন হইলে দীক্ষা অপ্রাসঙ্গিক। (২৬শে বৈশাখ, ১৩৬৫)

(১০)

তোমাদের ওখানে বহু দীক্ষার্থী প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, একথাও আমি শুনিয়াছি। যাঁহারা আমার আপন জন, তাঁহারা আমার জন্য অনন্তকাল প্রতীক্ষা করিবেন, ইহা ধ্রুব। সুতরাং আমার এই পীড়িত শরীরে এখনই ছুটিয়া যাইবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। দীক্ষা নেওয়া ভাল কথা কিন্তু এই কার্য্যটায় তাড়াহুড়া এবং হুজুগ যত বর্জ্জন করা যায়, ততই ভাল। যে আসে তাহাকেই দীক্ষা দেই, বিচার করি না,

ইহা আমার উদারতাও হইতে পারে, দুর্ব্বলতাও হইতে পারে। কিন্তু দলে দলে লোকেরা আমার নিকটেই দীক্ষাপ্রার্থী হউক, এই লোভ আমার নাই। লোকহিতকামনায় আরও গুরুদেব যাঁহারা অনুগত ব্যক্তিদের দীক্ষা দিতেছেন, তাঁহাদের কাছেই যাউক না ইহারা। দীক্ষা যেখানেই নিক, সাধন করাটাই ত' বড় কথা। সাধন করিলে আপনি সাম্প্রদায়িক হীনতা কমিয়া যায় এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ে নিজ ইষ্টের মহিমা উপলব্ধিতে আসে। যাহারই যে শিষ্য হউক, কেবল শিষ্য হইলেই হইল না, সাধকও হওয়া চাহি। অমুকের শিষ্য, এই পরিচয়টী অপেক্ষা ভগবানের নামের সাধক, এই পরিচয়টী অনেক বড়, অনেক মহান্। তোমাদের ওখানে বহু দীক্ষার্থী ব্যাকুল প্রতীক্ষায় দিন গুণিতেছেন, ইহা কোনও মন্দ কথা নহে। কিন্তু দুই দিন পরে যাঁহারা দীক্ষা নিয়া আমার শিষ্য হইবেন বলিয়া অভিলাষ করিতেছেন, তাঁহারা শিষ্য হইবার আগে আমার চিন্তাপ্রণালী ও জীবনাদর্শের সঙ্গে একটু আধটু পরিচয় স্থাপনের জন্য চেষ্টিত হইতেছেন কি? তোমরাও কি তাঁহাদের নিকটে আমার শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলি পরিবেশন করিয়া যাইবার কোনও ধারাবাহিক চেষ্টা করিতেছ? আমার শিষ্য হইবার পরে নিজ ঠাকুরঘরে হাজার খানিক দেবতার মূর্ত্তি সাজাইয়া একটী যাদুঘর সৃষ্টি করিলে কেহ কি তাঁহাকে আমার শিষ্য বলিয়া মানিবে? আমি ত' একের পূজারী। (২৮শে বৈশাখ, ১৩৬৫)

(১১)

তৃপ্তির সহিত দেখিয়া মুগ্ধ হই যে, তুমি সকল গুরুর মধ্যে একই পরম গুরুর প্রকাশ দর্শন করিয়া ভিন্নতর স্থানে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও আমার নিকটে আসিয়াছ সাধন-সম্পর্কিত নিগম-নিগূঢ় নির্দ্দেশনা পাইতে। তোমার উদারতাকে প্রশংসা করি, তোমার প্রাণের আগ্রহকে অভিনন্দন দেই।

তোমার প্রয়োজনীয় উপদেশগুলি তোমাকে দিতে আমি কুণ্ঠিত হইব না। কিন্তু মা, আমি যেই উপদেশই দেই, তাহাই তুমি তোমার গুরুদেবের দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া নিও। সকল আচার্য্যদের প্রতি গুরুবুদ্ধি রাখিলেও স্বকীয় সাধনের প্রতি অপরিসীম নিষ্ঠাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য চরম অনুমোদনের স্থান একটী মাত্রই রাখিতে হয়। পত্নী যেমন স্বামীকে না জানাইয়া কোনও ব্যক্তির উপহার গ্রহণ করিতে পারে না, আর স্বামীর অনুমোদন হইলে নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তির প্রদত্ত উপহারও সাদরে স্বীকার করিয়া নিতে পারে, দীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে নিজ দীক্ষাদাতা গুরু ব্যতীত অন্য আচার্য্যদের নিকট হইতে উপদেশ নিয়া তাহা নিজ গুরুর নিকট হইতে অনুমোদন করাইয়া নিতে হয়। ইহাতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়-বিরহিত হইয়া সাধন চলিতে থাকে।

সদ্‌গুরুদীক্ষিতের পক্ষে অন্যান্য আচার্য্যদের সঙ্গ করা মাত্র এই বুদ্ধিতেই উচিত যে, সকল গুরুই এক গুরুর প্রকাশ। কিন্তু

নিজের লব্ধ সাধন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন সাধারণ অবস্থায় কখনো সঙ্গত নহে। সাধন-প্রণালীর মধ্যে পরিবর্ত্তন করিবার রুচি একবার আসিলে আর সেই রুচি একবার প্রশ্রয় পাইলে আস্তে আস্তে নিজ পথ হইতে স্খলিত হইয়া সাধক কোন্ দিক্ দিয়া যে কোন্ দিকে চলিয়া যায়, তাহা কল্পনা করা কঠিন। সাধন-ভজনে একনিষ্ঠারই মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, দার্শনিক চিন্তার ন্যায় ইহা ক্রমবিস্তারশীল নহে। সাধন-ভজন করিতে করিতে বিভিন্ন উপলব্ধির মধ্য দিয়া সাধকের এক প্রকারের দার্শনিক মতবাদ আপনা আপনি সৃষ্ট, পুষ্ট, ও বিস্তারিত হইতে থাকে, ইহা সত্য কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সাধকের পরিপূর্ণ নিষ্ঠা তাহার সাধন-কর্ম্মেই লাগিয়া থাকে। দার্শনিক চিন্তাশীল ব্যক্তি যুক্তি ও উপলব্ধির অগ্রগতির পথে আগাইতে আগাইতে কখনও কখনও এমন দুরধিগম্য স্থানে গিয়াও পৌছে, যেই স্থান হইতে তাহার পুরাতন স্থিতিস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য। তাই, দার্শনিক চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে যে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় ক্ষতি নাই, সাধন-ভজন-পরায়ণ ব্যক্তির জন্য তাহা বিহিত হয় নাই। একনিষ্ঠা সাধকের পক্ষে একান্ত ভাবেই অপরিহার্য্য।

উত্তরদেশীয় আচার্য্যের নিকট হইতে সাধন-ভজনের একটুকু প্রকরণ গ্রহণ করিয়া, দক্ষিণদেশীয় আচার্য্যের কাছ হইতে আর একটুকু নিলাম, তারপর সাধন-রীতিটুকুকে বেশ একটু ব্যাপক মূর্ত্তিতে পাইবার জন্য পশ্চিমদেশীয় আচার্য্যের কতক প্রকরণ

ইহার সঙ্গে যুক্ত করিলাম এবং পরিশেষে পূর্ব্বদেশীয় আচার্য্যের বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়া লইয়া নিজ সাধন-ভজনের রীতিতে একটী বিশ্বজনীন সংস্করণ প্রদান করিলাম,—ইহা উদার চিন্তার দিক হইতে খুব একটা মনোরম বস্তু হইতে পারে কিন্তু সাধন-সাফল্যের দিক হইতে অতীব মারাত্মক বিপদ। কোনও সাধকেরই এমন বিপদে সাধিয়া মাথা পাতা উচিত নহে।

তোমার যখন বায়ুরোগ আছে এবং ভ্রূমধ্যে গুরুমূর্ত্তি ধ্যান করিতে মস্তিষ্কের উদ্বেগ বর্দ্ধিত হয়, তখন যোগশাস্ত্রসম্মত এই সিদ্ধান্তই তোমার গ্রহণ করা উচিত যে, যেই হৃদয়ে নিয়ত তোমার সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি কখনো মন্দ, কখনো তীব্র ভাবে জাগিতেছে, সেই হৃদয়েই সর্ব্বদা শ্রীগুরু-ধ্যান করিবে। যাহাদের নিদ্রাল্পতাহেতু রাত্রের সাধন দুর্ব্বল এবং প্রাতঃকালীন মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্ত, তাহাদের পক্ষে যোগ-শাস্ত্রসম্মত বিধান এই যে, শয়নকালে নাভিমূলে শ্রীগুরু ধ্যান জমাইবে। অনেকের এমনও হয় যে, কামেন্দ্রিয়ের নানা চাঞ্চল্যহেতু কিছুতেই সাধনে মন বসাইতে পারে না, যতবার মনকে ভ্রূমধ্যে, হৃৎপদ্মে বা নাভিমূলে বসাইতে চাহে, ততবারই মন নানা অবান্তর যৌন বিষয় চিন্তা করিয়া করিয়া কেবল অধোগামীই হইতেছে। এমতাবস্থায় গুহ্যমূল, উপস্থমূল ও নাভিমূল এই তিনটী ধ্যানক্ষেত্র ব্যাপিয়া ব্রহ্মাণ্ডপতি শ্রীগুরুর ধ্যান যোগিগণের উপলব্ধি-সম্মত ব্যবস্থা।

আমি সাধকগণের ব্যবহার-সিদ্ধ উপদেশ দিলাম। তোমার শ্রীগুরুদেবের অনুমোদন পাইবার পরে আমার এই উপদেশ যতটুকু প্রয়োজন পালন করিও।

আমার দীক্ষিত সন্তানেরা কেহ কেহ মাঝে মাঝে তোমার গৃহে যায় এবং তোমাকে ও অন্যান্যকে আমার উপদেশ-বাণী শ্রবণ করায় শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। তাহারা যদি আমার বাণীতে মধুর আস্বাদ পাইয়া থাকে, তাহা হইলে সকলকে ইহা সদ্বুদ্ধি নিয়া শ্রবণ করান তাহাদের পক্ষে খুবই সঙ্গত কার্য্য হইতেছে। কিন্তু তোমরা যাহারা আমার নিকটে দীক্ষিত নহ এবং তোমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে যাহারা আমার নিকটে কখনও দীক্ষা নিবেন না, সকলেই নিজ নিজ বর্ত্তমান ও ভাবী দীক্ষা-গুরুদের মূল নির্দ্দেশের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া নিয়া আমার কথা যতটুকু নিতে পার, নিবে। সমগ্র জগতের কল্যাণের দিকে তাকাইয়াই আমি জীবনের প্রতি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ-পরিত্যাগ করিতেছি, আমার সকল বাণী বিশ্ববাসীর দিকে তাকাইয়া। কিন্তু সকলেই একমাত্র আমারই অনুবর্ত্তী হউক, এই কামনা আমার নাই। যাঁহার অনুবর্ত্তী হইলে যাহার প্রকৃষ্টতম কল্যাণ, সে যেন তাঁহারই অনুবর্ত্তী হয়। জগতের সকলের অনুবর্ত্তীদের জন্যই আমার বাণী, কেবল আমার অনুবর্ত্তীদের জন্য নহে। আমার যতটুকু কথা নিজ নিজ গুরুর নির্দ্দেশের সহিত অবিরোধী ভাবে গ্রহণ করিতে পারিবে, মাত্র ততটুকুই নিও। (৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫)

(১২)

তুমি আমাকে গুরুরূপে পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছ, আমিও আমার এই বিকলাঙ্গী কন্যাকে শিষ্যারূপে পাইয়া কেবল গৌরবই বোধ করিতেছি। বলবান্, রূপবান্, জ্ঞানবান্, বিদ্বান্, অর্থবান্, প্রভাববান্ সকল মানুষ অন্যত্র গুরু খুঁজিয়া লউক, আমি ত' দুর্ব্বল, কুরূপ, অজ্ঞান, মূর্খ, দরিদ্র ও অবজ্ঞাতদেরই চাহি। যাহারা অপর কোনও আচার্য্যের নিকটে লাভের সামগ্রী নহে বরং ঘাড়ের বোঝা এবং জীবন্ত আপদ, আমি ত' তাহাদেরই দিকে আমার লুব্ধ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছি। তোমরা যাহারা নিজেদের ভিতরের ব্রহ্মকে জান নাই বলিয়া নিয়ত কুণ্ঠায় কাটাইতেছ কাল, তাহাদেরই ত' আমি মুক্তির পথ দেখাইতে চাহি। জ্ঞানী, বিদ্বান্, সম্পত্তিশালী, রূপৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ভাগ্যবানদের আমি বিদ্বেষও করি না, ঈর্ষাও করি না কিন্তু যাহারা এই সকল লোভনীয় সম্পদ হইতে বঞ্চিত, তাহাদের পূজার জন্যই ত' আমি যুগযুগান্তর ধরিয়া করযুগে পুষ্পাঞ্জলি লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি। গুরু হইয়া আমি যদি তোমাদের ধ্যানের দেবতা হইয়া থাকি, তাহা হইলে জানিও, শিষ্য হইবার অনেক আগ হইতেই তোমরা আমার ধ্যানের দেবতা হইয়া রহিয়াছ।

মনীষীরা নানাভাবে জনসেবার পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। কেহ অন্নদান করিয়া, কেহ বস্ত্রদান করিয়া, কেহ শিক্ষাদান করিয়া, কেহ চিকিৎসা-বিদ্যার সাহায্যে জন-সেবা করিয়াছেন।

কেহ করিয়াছেন আবার অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিয়া। যাহাকে সেবা দেওয়া হইয়াছে, কোনও কোনও ধীমান্ প্রেমিক তাহাকে নর-নারায়ণ আখ্যা দিয়াছেন এবং বিপন্ন, নিরন্ন আর্ত্তের মধ্যে পরমোপাস্য পরব্রহ্মকে দেখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সকলের সকল সেবা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়াছি, বিভিন্ন প্রকারের সেবক-দলকে মনে মনে প্রণতি জানাইয়াছি। কিন্তু দীক্ষা দিয়াও যে নরনারায়ণের সেবা করা যায়, তাহা জানিতামও না, মানিতামও না।

একদা জীবন-নাট্যে এক অপূর্ব্ব দৃশ্যান্তর ঘটিতে সুরু করিল। আজ যে অবস্থায় রহিয়াছি, কালই দেহমন সেই অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। গহন বন, পার্ব্বত্য উপত্যকা, নীরব পল্লী, দুস্তর সাগরতীর পরপর দৃশ্যসজ্জায় ঝলমল করিয়া উঠিতে লাগিল। কত নরনারী আর বালক-বৃদ্ধ, কত কপটী আর সত্যসন্ধ, কত মহাসতী আর গণিকা, কত দস্যু-লম্পট আর দাতাকর্ণেরা রঙ্গমঞ্চে ভিড় করিতে লাগিল। সময়োচিত অভিনয় করিতে গিয়া হঠাৎ আবিষ্কার হইয়া গেল যে, দীক্ষা-মন্ত্রে গণিকার পাতিত্য নাশ করা যায়, মাতালের মাতলামী ছাড়ানো যায়, চোর-দস্যুকে সাধু করা যায়, পরস্বাপহারীকে দাতা বানানো যায়, চিরকালের মিথ্যাবাদীকে সত্যশীল করা যায়, দুর্ব্বলে বলাধান সুসম্ভব, নিরাশকে হতাশার পঙ্ক হইতে টানিয়া তোলা সু-সহজ। বিদ্যুতের বেগে একটার

পর একটা করিয়া অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া যাইতে লাগিল। আমাকে বিশ্বাস করিতে হইল, রাজনৈতিক বিপ্লব এক একটা দেশের যে পরিমাণ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সমর্থ, এক একটা দীক্ষামন্ত্রের ক্ষমতা তাহা অপেক্ষা অল্প নহে।

সেই অবধি সেবাবুদ্ধিতেই লোককে দীক্ষা দিয়া আসিতেছি। গোষ্ঠী-পুষ্টি নয়, দল-বাড়ানো নয়, অর্থসঞ্চয় নয়, একমাত্র দীক্ষা-প্রার্থীর নিঃশ্রেয়স কল্যাণের জন্যই এই দীক্ষা। আমার ধ্যানের ধনদিগকেই দিয়াছি দীক্ষা, এই জন্যই জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত ও ধনীদের প্রতি নয়নের ক্ষীণতম দৃষ্টিটুকুও পড়ে নাই। সেই জন্য দীক্ষাকালে তোমাদের প্রতিজনকে সুস্পষ্ট রূপে বলিয়া দিতে আমার কখনও ভুল হয় না যে, নিজেদের দলবৃদ্ধির চেষ্টা কেহ করিও না, প্রত্যেকে সাধন করিয়া বলীয়ান্ হও। তোমরা, সমাজের অবহেলিত অবজ্ঞাতের দল, দীক্ষা পাইবার কয় যুগ আগ হইতেই আমার ধ্যানের দেবতা হইয়া রহিয়াছ বলিয়াই আমি স্বেচ্ছায় সমাগত তোমাদের দীক্ষা দিবার কালে সেই আধ্যাত্মিক হর্ষই আস্বাদন করিয়াছি, যাহার মধ্যে ইষ্টদর্শনের আমেজ আছে, যাহার মধ্যে নাই এক কণা পার্থিব স্বার্থের প্রলুব্ধতা।

(৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫)

(১৩)

দীক্ষাদানের দিনই হয়ত তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, যখন যে সংশয় মনে জাগিবে, তাহাকে অন্তরে পোষণ করিয়া করিয়া

ঘুণের মত হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করিতে দিও না। একখানা কার্ডে সকল সংশয় লিপিবদ্ধ করিয়া ডাকে দিবে। আমাকে লিখিত ভাবে তাহার জবাব দিতে হইবে না। পত্র ডাকে দিবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার অন্তরাত্মারূপী গুরু আপনা আপনি সব প্রশ্নের উত্তর দিয়া, সব সমস্যার মীমাংসা সুরু করিবেন। দুই দশ-বিশটার প্রমাণও হাতে হাতে পাইয়াছ।

গুরু তোমার অন্তরে বাস করেন। তোমাদের একাগ্রতা সাধনের সহায়তার্থ আমি স্বীকার করিতেছি যে, তোমার সেই গুরু আর আমি এক ও অভিন্ন। বাহিরে গুরুকে যাহা দেখিতে পাও, গুরুদেব মাত্র ততটুকুই নহেন। তিনি তোমাতেও বিস্তারিত, তোমাতেও অবস্থিত। তিনি তোমাতে ঘুমাইয়া রহিয়াছেন বলিয়া তুমি শিষ্য নাম ধারণ করিয়াছ, আমাতে জাগ্রত হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া আমি গুরু নাম পাইয়াছি। তুমি ও আমি স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন। তোমাতে আমাতে প্রেম করার প্রকৃত মানে হইতেছে নিজেকে নিজে সর্ব্বশক্তি দিয়া সর্ব্ব-মনঃ-প্রাণ দিয়া ভালবাসা। তোমাতে আমাতে প্রেম জমানই হইতেছে আমাদের প্রকৃত গুরু-শিষ্য-সংলাপ। তুমি আমার জন্য, আমি তোমার জন্য, তুমি ছাড়া আমি নাই, আমি ছাড়া তুমি নাই, তুমি আর আমি মিলিয়া কোটি ব্রহ্মাণ্ডেরও অধিক বিস্তারিত সর্ব্বতত্ত্ব সর্ব্বসত্য এক অভেদ-সত্তায় পরিণত। ইহাই তোমার আর আমার সম্বন্ধ।

শুধু মুখের কথায় এই সত্যের উপলব্ধি জন্মে না। উপলব্ধির জন্য সাধন করিতে হয়। তোমরা সর্ব্বপ্রযত্নে লাগিয়া যাও। সাধন করিয়া সত্য জান, সাধন করিয়া সত্যে প্রতিষ্ঠিত হও।

(১৪)

বিচিত্র সংবাদ সব দিয়াছ। কোথাও সাধু-সজ্জনদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেই যদি তাঁহারা জোর করিয়া সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের দীক্ষা দিয়া দেন, তবে ত' বলিতেই হইবে যে, ইহা মহতের মধুর লীলা! যাঁহারা এমন করেন, তেমন সাধুদের দর্শন-সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিলে ক্ষতি কি? দীক্ষা জীবনের একটা অঘটন-ঘটনা। ইহাকে কোনও প্রকারেই লঘু হইতে দেওয়া উচিত নহে।

কেহ জোর করিয়া দীক্ষা দিলেই তোমরা নিতে বাধ্য হইবে কেন? জোর করিয়া দীক্ষা দেওয়া অনেক স্থলে নারীর উপরে বলাৎকারের ন্যায় অপরাধ। দীক্ষা যাঁহাদের ব্যবসায়, দীক্ষা-দানের মধ্য দিয়া যাঁহারা পার্থিব কোনও স্বার্থ আদায়ের ফন্দী রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে যেন-তেন প্রকারেণ দীক্ষাদান অন্যায় কার্য্য না হইতে পারে, কিন্তু দীক্ষাপ্রার্থীরা কেন ইহাকে বৈধ কার্য্য বলিয়া অবনত মস্তকে মানিয়া লইবে? মানুষ যদি অন্যায়কে মানিয়া লয়, অন্যায়কারীরা কেন দুঃসাহসী হইবে না?

দীক্ষা জীবনের এক সুমহান্ সংস্কার। দীক্ষা পাওয়া জীবনের একটা অতি প্রধান ঘটনা। নারীর জীবনে বিবাহকে

যেমন গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে, মানুষ মাত্রের জীবনে দীক্ষা প্রায় তদ্রূপ। দীক্ষা জীবাত্মায় পরমাত্মায় উদ্বাহ। বিবাহ-ব্যাপারে যেমন সংশয়-বর্জ্জিত হইয়া অগ্রসর হওয়া উচিত, দীক্ষার ব্যাপারেও তাহাই। যে-কেহ জোর করিয়া কাণ টানিয়া ফেঁাস করিয়া একটা মন্ত্র ঢুকাইয়া দিলেই তাহা দীক্ষা হইল বলিয়া মনে করা একটা চরম বোকামি। কেহ একটা মন্ত্র লিখিয়া বা শুনাইয়া দিলেই যদি দীক্ষা হইল, তাহা হইলে আকাশে উড্ডয়মান বিহঙ্গমের নিষ্ঠীবন গায়ের উপরে পড়িলে তাহাকেই বা দীক্ষা বলা হইবে না কেন? যা' তা' ব্যাপারকে তোমরা দীক্ষা বলিয়া মান বলিয়াই না বলাৎকারে দীক্ষা-দান এত চালু হইয়াছে!

নোয়াখালী কৃষ্ণরামপুর আশ্রমে থাকিতে আমি গোস্বামী শ্রেণীর কতিপয় দীক্ষাদাতার কাহিনী শুনিয়াছি। কাহিনী কহিয়াছে তাহারা, যাহারা দীক্ষা নিতে গিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সরলা গ্রাম্য বিধবাকে কৃষ্ণপ্রেম শিখাইতে গিয়া মন্ত্রদান-কালে ইঁহারা ধর্ষণ করিয়াছেন। দীক্ষা কথাটার উপরে মানুষের এত বড় এক দৃঢ় মোহ ও অনুকুল সংস্কার রহিয়া গিয়াছে যে এই সকল বলাৎকৃতা রমণীদের মধ্যে অনেকেই ইহাকে দীক্ষা বলিয়া মানিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছে। দেশাচার ও লোকপ্রথা এমনই এক অদ্ভুত দুর্ব্বলতার জনক-জননী। ইহা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানকে তুড়িতে উড়াইয়া দেয়,

বিচার-বুদ্ধিকে স্তব্ধ করিয়া রাখে। কিন্তু গায়ের জোরে দেওয়া দীক্ষাও কি দীক্ষা বলিয়া মান্য পাইবে? কেন তোমরা সাধু নামধারী ব্যক্তিদের এই অন্যায় সহ্য করিবে?

শাস্ত্র বলিয়াছেন, এক বৎসর গুরু-পরীক্ষা কর, এক বৎসর শিষ্য-পরীক্ষা কর, তারপরে দীক্ষা নাও বা দাও। এই কথায় নিহিত কোনও গূঢ়ার্থ কি নাই? ইহা কেবলই একটা কথার কথা? কোনও বিশেষ তাৎপর্য্যের দিকে লক্ষ্য করিয়াই কি কথাটা উচ্চারিত হয় নাই?

জানিলে না, চিনিলে না, দীক্ষা নিয়া বসিলে। কয়েক মাস বা কয়েক বছর পরে গুরুর বিরুদ্ধে হাজার নালিশ সুরু করিলে। তোমার সাধন-ভজন অগ্রগতি পাইবে কি করিয়া? জানিয়া-শুনিয়া দীক্ষা নিলে ভবিষ্যতের অনেক জটিলতা দূর হইয়া যায়।

ঘরের মেয়েকে জোর করিয়া টানিয়া ভিন্ন দেশে নিয়া যাইতে পারিলেই যেমন তাহাকে বিবাহের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, পথের ছেলেকে জোর করিয়া ধরিয়া বসাইয়া কাণে মন্ত্র দিয়া দিলেই তাহাকে তেমন দীক্ষা বলিয়া মানা চলে না। তবু যদি তোমরা ইহাকেই দীক্ষা বলিয়া মান এবং এক দিকে বিবেক আর অন্যদিকে লোকপ্রথার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে না পারিয়া অন্তর্জ্বালায় জ্বলিয়া মর, তবে তাহার আবার কি প্রতিকার হইতে পারে?

দীক্ষা ব্যতীত যে ঈশ্বর-দর্শন হইতে পারে, এই সত্যের উপরে মানুষের শ্রদ্ধা আবশ্যক। তাহা আসিলে যেভাবে-সেভাবে জোর করিয়া কেহ দীক্ষা দিলে সেই দীক্ষাকে পরিহার করিবার সৎ-সাহস আসিবে। দীক্ষা ব্যতীতও যে ভগবদ্দর্শন সম্ভব, এই বিশ্বাস থাকিলে নিজের মনের মত গুরু পাইবার জন্য সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা সম্ভব হয়।

দীক্ষাদান করিয়া অনেক মহাপুরুষ জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কেহ কেহ কেবল জগতের কল্যাণের দিকে তাকাইয়াই নিজেদের কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের কণামাত্র সংশ্রব না রাখিয়া অগণিত নরনারীকে দীক্ষা দিয়াছেন। দীক্ষা-দানের দ্বারা এক রতি লোকমান, প্রভুত্ব, আর্থিক স্বচ্ছলতা বা অন্য কোনও স্বার্থলাভ হউক, এই কামনা জীবনে একটি দিনও করেন নাই, এমন গুরুও জগতে নিশ্চয়ই আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা জোর-জবরদস্তির পথে বা ছলনা-কপটতার দ্বারা কাহাকেও দীক্ষা দেন না। দীক্ষাপ্রার্থীর অন্তরের অকপট আগ্রহই এই সকল ক্ষেত্রে দীক্ষাদানেচ্ছার প্রকৃত নিয়ামক।

অনেক গুরুরা বিশ্বাস করেন যে, যাহারা কিছুতেই ভগবানের নাম লইবে না, তাহাদিগকে জোর করিয়াও যদি দীক্ষা দিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এক সময়ে না এক সময়ে লোকগুলি একটু-আধটু নামজপ করিবেই। এইরূপ ভাবনা দ্বারা পরিচালিত হইয়াও তাঁহারা কখনও কখনও কোনও

কোনও লোককে দীক্ষা দিয়া দেন যে, আজ অনিচ্ছার মধ্য দিয়াই নামের বীজ বপন করিলাম, কাল বিপদ-আপদের মুখে মনের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে হঠাৎ দুই চারিবার এই নাম করিতেই হইবে এবং এই ভাবে মাঝে-মাঝে নাম করিতে করিতে এক সময়ে ভগবন্নামের প্রতি অবহেলাপরায়ণ এই ব্যক্তি নামের ভক্ত হইয়া উঠিবে। এইরূপ বিচারের দ্বারাও কেহ কেহ পরিচালিত হইয়া থাকেন যে, জোর করিয়াই যদি দীক্ষা দিয়া যাই, তাহা হইলে শতকরা ত্রিশটী লোক চরিত্রের ঔদ্ধত্যবশতঃ প্রাপ্ত দীক্ষা ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু শতকরা ষাটসত্তরটী লোক ত' ঐ দীক্ষাকেই প্রকৃত দীক্ষা মনে করিয়া আটক হইয়া গেল ! তাহাদের মধ্যে অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ মোট শতকরা ত্রিশ জন লোকেও কি আমার পিছনে দাঁড়াইয়া আমার সঙ্ঘের জয়ধ্বনি করিবে না? কার্য্যকর হিসাবের দিক দিয়া এই সকল অঙ্ক নিতান্তই ভুল নহে। যাহা হউক, যে-কোনও প্রকারে যে-কেহ নিজ শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টিত রহিয়াছেন বলিয়া তোমাদের কিন্তু কোনও সঙ্ঘ বা সম্প্রদায়ের সম্পর্কে ঈর্ষ্যান্বিত হইলে চলিবে না। তোমাদের আমি সহস্রবার বলিয়াছি যে, এই সকল তরল উপায়ে তোমাদের সম-সাধকদের সংখ্যাবৃদ্ধি চলিবে না।

সমসাধকদের সংখ্যাবৃদ্ধি অনেক সময়ে অনেকের নিকটে অতিশয় কামনীয় ব্যাপার। নিজ পরিবেশ পরিবর্ত্তনের দ্বারা সাধনে রুচিবর্দ্ধন যখন লক্ষ্য, তখন এই কামনা মোটেই দুষ্য

নহে। পথ পায় না বলিয়া যাহারা চলিতে অক্ষম, অথচ পথ পাইলেই যাহারা ভগবানের দিকে উদ্দাম বেগে ছুটিয়া চলিবে বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে, তাহাদিগকে নিজ মতে নিজ পথে আনয়ন-চেষ্টা ততক্ষণ পর্য্যন্ত হিতকারক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই চেষ্টায় মিথ্যা, চাতুরী, ছলনা, প্রলোভন, অতিশয়োক্তি এবং স্বার্থলাভের অভিপ্রায় না মিশ্রিত হয়। তথাপি তোমরা তোমাদের সমসাধকদের সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টায় শক্তিক্ষয় করিতে যাইও না। সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে অকপটে তোমরা বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর প্রতি অন্তরের ভালবাসা ছড়াইতে থাক, সর্ব্বশক্তি লইয়া তোমরা জগদ্ধিতার্থে এবং আত্মকুশলের জন্য গুরুদত্ত সাধন একাগ্রচিত্তে করিয়া যাইতে থাক। সাধনের বলে, সর্ব্বজীবশুভেচ্ছার ফলে তোমাদের চোখে মুখে প্রেম ও জ্ঞান ফুটিয়া উঠুক, তোমাদের বক্ষে, বাহুতে ব্রহ্মবল জাগিয়া উঠুক। তখন মানুষ বিনা অনুরোধে বিনা প্ররোচনায় তোমাদের সমীপস্থ হইবে, আপন জন আপন জনকে চিনিয়া লইবে। চারিদিকে সম্প্রদায়ের সংখ্যাগত পরি-পুষ্টির জন্য যখন সম্ভ্রান্ত ও অসম্ভ্রান্ত সকল ধর্ম্মসঙ্ঘের মধ্যে কাড়াকাড়ি হুড়াহুড়ি চলিতেছে, তোমরা সেই সময়ে এই বিশ্বাসে অটল নির্ভর রাখিয়া তদ্গতচিত্তে শ্রীভগবানের একক ও সমবেত সাধন করিয়া যাইতে থাক যে, যাহারা তোমাদের আপন, তাহারা তোমাদের জন্য শতাব্দী ধরিয়া বসিয়া অপেক্ষা

করিবে। মন হইতে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দাও যে, বিভিন্ন ধর্ম্মসঙ্ঘগুলির দ্রুতগতি সংখ্যাপরিপুষ্টির ফলে তোমাদের কোনও ক্ষতি হইতে পারে। বিশ্বাসের বল তোমাদের বাড়ুক, আমাতে তোমরা নির্ভর কর আর নিষ্কাম চিত্তে সকল সৎকাজে যথাশক্তি সহায়তা দান কর। তোমরা গড়িতেছ এক অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়, জগতের কোনও সম্প্রদায়ই তোমাদের পর নহে। (৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫)

(১৫)

কেহ কেহ দেখিয়াছি, নিজে শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও শিষ্যদের জনে জনে পছন্দ মতন রামমন্ত্রে, কৃষ্ণমন্ত্রে, বিষ্ণুমন্ত্রে, নৃসিংহমন্ত্রে দীক্ষা দিতেছেন। কেহ কেহ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এবং মহাদেব যে বিষ্ণুর কিঙ্কর আর পার্ব্বতী যে বিষ্ণুর কিঙ্করী, ভাগবত-পাঠকালে এই ব্যাখ্যা শুনাইবার পরেও, শিষ্যের ফরমায়েস মতন তাহাদিগকে শিব-পার্ব্বতীর মন্ত্রেই দীক্ষা দিতেছেন। নিজে যে সাধন পাইয়াছেন, তাহা কতিপয় লোকের মধ্যেই দিয়াছেন এবং নিজে যে সাধন পান নাই বা করেন নাই তাহাই দেশ জুড়িয়া সকল লোককে বিলাইয়া বেড়াইতেছেন। অমুক মঠ বা তমুক মিশনের স্বামীজীরা আসিয়া শিষ্যদের না ভাগাইয়া নিয়া যাইতে পারে, তাহার জন্য একই বাড়ীতে ভিন্ন স্ত্রী-পুরুষকে তাহাদের রুচিমতন নানা মন্ত্র দিয়া ত্রাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ফলে দেখা যাইতেছে যে, একই গুরুর শিষ্য হইয়াও এই শত শত লোক কখনও একটা মঞ্চে আসিয়া একত্র হইতে পারিতেছে না। মহোৎসব দিয়া বা কীর্ত্তন করিয়া অনেকগুলি নানা ভাবের লোককে একত্র করিবার চেষ্টা আবহমান কাল হইতেই হইয়া আসিতেছে সত্য কিন্তু সকলে একত্র বসিয়া একই ভাবে নিজের পৌরোহিত্য নিজে করিয়া উপাসনা করিতে পারে, এমন কোনও সামান্য ধর্ম্ম ইহাদের মধ্যে নাই।

(২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫)

(১৬)

তোমার অতি তরুণ বয়সে একদা আমার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলে, আজ তার কথা পুরাপুরি তোমার স্মরণেও নাই। অথচ আমার প্রতি অন্তরের অনুরাগও কমে নাই, শ্রদ্ধাও না। এখন তুমি ভাবিতেছ যে, কেমন করিয়া নূতন করিয়া আবার দীক্ষাটী লওয়া যায় এবং নূতন করিয়া সাধন-জীবন শুরু করা যায়।

অতি তরুণ কৈশোরে দীক্ষা নিতে পারিয়াছিলে, ইহা তোমার মহৎ সৌভাগ্য। সাধন কিছু করিতে পারিয়া থাক আর না থাক তুমি যে মহামন্ত্রে দীক্ষিত, এই কথাটাই তোমাকে নিয়ত মনোবল যোগাইয়াছে। তবে একেবারেই সাধন না করার ফলে বা নিতান্তই অনেকদিন পরে পরে কিছু কিছু সাধন করাতে অনভ্যাসের দরুণ তোমার সংশয় আসিয়াছে যে, ইহাই আমার দেওয়া সাধন কিনা।

আমার মনে হয়, এইটুকুই তোমার সমস্যা।

ইহাই যদি হইয়া থাকে, তবে আমার কাছে আবার নূতন করিয়া দীক্ষা নেওয়ার তোমার কোনও আবশ্যকতাই নাই। কারণ, কে না জানে যে, আমি প্রণব-মন্ত্রেই দীক্ষা দিয়া থাকি এবং সাধন-কৌশল-রূপে শ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ করিতে উপদেশ দিয়া থাকি ? তুমিও সম্ভবতঃ এই উপদেশই পাইয়াছিলে। অনেক গুরুদেবেরা আছেন, যাঁহারা নিজেরা যেই নামের সাধন করেন, শিষ্যদের সকলকেই সেই নামই যে দিবেন, তাহা নহে। কেহ কেহ কোষ্ঠী-ঠিকুজি বিচার করিয়া যেই ব্যক্তির জন্য যেই বীজ-মন্ত্র আসে, তাহা দিয়া থাকেন। অবশ্য, এইভাবে মন্ত্রদান কতকটা লটারির টিকিট কেনার মতন। কাহার ভাগ্যে যে কি পুরস্কার আসিবে, কেহই জানে না। যাহার প্রতিবেশ-প্রভাব যেই সাধনের অনুকূল, এই লটারি-খেলায় তাহার ভাগ্যে তাহার বিপরীত নামে দীক্ষাও হইয়া গিয়া থাকে, যাহার দরুণ গরীব বেচারীরা অনেক কাঠখড় পুড়াইয়া শেষ জীবনে গিয়া নিজের অভিলষিত কোনও মহাপুরুষের কাছে মন্ত্র পালটাইয়া প্রাণের গতির সম্মান রক্ষা করে এবং এই ভাবে জীবনের অনেকটা সময় তাহাদের প্রায় বৃথা কাটিয়া যায়। অনেক গুরুদেবেরা আবার নিজ পুত্রদের দীক্ষা দেন নিজ পিতার নিকটে প্রাপ্ত মন্ত্রে কিন্তু শিষ্যদের দীক্ষা দেন অন্যান্য নানা-মন্ত্রে। ইহার জন্য স্মৃতি-শক্তিকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাদিগকে শিষ্যবংশের তালিকা রক্ষা

করিয়া কাহার গোষ্ঠীতে কাহাকে কি মন্ত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া রাখিতে হয়। কোনও গুরুদেবের হঠাৎ মৃত্যু হইয়া গেলে তাঁহার পুত্র যদি কোনও প্রকারে সেই মন্ত্রকুলজীর খাতাটা খুঁজিয়া না পান, তাহা হইলেই বিপদ বাঁধিয়া গেল।

কিন্তু এই সকল ভয় আমার ব্যাপারে নাই। আমি ওঙ্কার মন্ত্র শিখিয়াছিলাম স্বয়ং ভগবানের কাছ হইতে। নানা সময়ে নানা গুরু আমার জীবনে তাঁহাদের কল্যাণ-প্রভাব বিস্তার করিতে আসিয়াছেন কিন্তু কেহই আমাকে ওঙ্কার-মন্ত্র হইতে এক চুল বিচলিত করিতে পারেন নাই। কাহারও কাহারও সহিত চির-জীবনের মতন সম্পর্কচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে এই ওঙ্কার-মহামন্ত্রের ব্যাপার লইয়া। কাহাকেও কাহাকেও গুরু বলিয়া অর্চ্চনা করিয়াছি কেবল তিনি ওঙ্কার-মহামন্ত্রেরই সমর্থক বলিয়া বা নিজে ইহার সাধক বলিয়া। এই একটী ব্যাপারে আমি একেবারে আপোষহীন বিপ্লবী। ওঙ্কার-মন্ত্রে আমার নিজের অধিকার অর্জ্জনের জন্য আমি আধ্যাত্মিক জীবনে যাহা অবিরাম করিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহার নাম সংগ্রাম। আর এই ওঙ্কার-মন্ত্রে সর্ব্বসাধারণের পরিপূর্ণ অধিকার স্থাপনের জন্য যাহা করিয়া চলিয়াছি, তাহার নাম বিপ্লব। এই সংবাদ এমনই প্রসিদ্ধ যে, তুমি তোমার অতি কাঁচা বয়সে দীক্ষা নেওয়ার দরুণ যদি মন্ত্র ও সাধন ভুলিয়া থাক, তাহা হইলে আমার নিকটে পুনরায় আনুষ্ঠানিক ভাবে দীক্ষিত না হইয়াও যদি তুমি

প্রণব-মন্ত্রের সাধনা করিয়া যাইতে থাক, তাহা হইলে তাহাতেই তোমার দীক্ষা অটুট রহিল বলিয়া মনে করিও।

(২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫)

(১৭)

তোমাদের মণ্ডলীর ভিতরে প্রায় প্রতিটি সদস্যের নিজ নিজ সামূহিক কর্ত্তব্যের প্রতি যে এত উদাসীনতা, তাহার কয়েকটী কারণ রহিয়াছে।

প্রথম কারণ এই যে, দীক্ষিতেরা অনেকেই আসিয়াছিল হুজুগে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, দীক্ষা নিবার পরে গুরুর উপদেশ-মত যে চলিতে হইবে, নিজের মতলব মতন চলা যে সঙ্গত নহে, অন্তরে এই বিষয়ে কোনও সুনির্দ্দিষ্ট প্রত্যয় না জন্মিতেই ইহারা অধিকাংশে দীক্ষা নিয়াছিল।

তৃতীয় কারণ, দীক্ষা যে একটা নবজন্ম, দীক্ষালাভের পরে যাবতীয় প্রতিকূল পূর্ব্ব-সংস্কার সাধ্যমত বর্জ্জন করিয়া নিজের রুচি, প্রকৃতি ও আচরণকে দীক্ষালব্ধ সাধনের অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য যে চেষ্টা দরকার, এই বিষয়ে জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব।

চতুর্থ কারণ, দীক্ষা নিয়াই খুব একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছি, দীক্ষা নিবার পরে আর সাধনে মনোনিবেশ না করিলেই বা ক্ষতি কি, এই জাতীয় একটা বেপরোয়া মনোভাবের অস্তিত্ব।

পঞ্চম কারণ, আর আর যাহারা দীক্ষা নিয়াছে, তাহারা কেহ কেহ যে সাধন করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির দিকে সত্যই ধাবিত হইতেছে এবং তাহাদের সংসর্গ দ্বারা যে নিজেরও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কুশল হইতে পারে, এই সম্পর্কে অজ্ঞানতা ও আগ্রহের অভাব।

ষষ্ঠ কারণ, সমদীক্ষিতদের প্রতি আপন ভ্রাতা ও ভগিনীর ন্যায় প্রেমপূর্ণ অনুরাগের অভাব। (২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫)

(১৮)

এত হা-হুতাশ কেন করিতেছ? "গুরুদেব, পথ দেখাইয়া দাও, পথ দেখাইয়া দাও" বলিয়া কেবল অশ্রুপাত করিতেছ। কিন্তু গুরু যে দীক্ষাদান-কালেই তোমাকে পথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, সেই পথে কতটুকু চলিতেছ, তাহা ত' কিছু লিখ নাই। গুরুদেব পথ দেখাইয়া দিলেন, কিন্তু তুমি সেই পথে না চলিয়া কেবল হাহাকার করিয়া কাঁদিতে থাকিলে "হায় পথ" "কৈ পথ", তাহা হইলে আর কি লাভ হইবে? দীক্ষা নিয়াছ, এখন সাধন কর। সাধন করিতে করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া যাও। দীক্ষা নিয়া তারপরে সাধন না করা ত' একটা মূর্খতা। পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে থাকিলে ত' পথ ফুরাইবে না! পথ চলিতে হইবে। দীক্ষাগ্রহণকে একটা লোকাচার মাত্র মনে না করিয়া জীবন-পথের এক অনির্ব্বচনীয় গতিপরিবর্ত্তন বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। যে নামে দীক্ষা পাইয়াছ, সেই নাম যদি

অবিচল নিষ্ঠায় কেবল করিয়াই যাইতে থাক, তাহা হইলে অল্প দিন মধ্যেই টের পাইবে যে, দয়াল গুরু তোমাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া নিয়া যাইতেছেন। বসিয়া বসিয়া কেবল কাঁদিও না। এই কান্নার কোনও শুভফল নাই। নাম কর আর নামের সঙ্গে কাঁদ, পথ চল আর চলার সঙ্গে কাঁদ, অবিরাম ভগবানকে স্মরণ কর আর স্মরণের সঙ্গে কাঁদ। সেই কান্নার অনেক মূল্য, সেই কান্নার অনেক ফল। মনে রাখিও হিষ্টিরিয়ার ব্যারামে ভোগা আর ভক্তিলাভ করা, এক কথা নহে। হিষ্টিরিয়ার উচ্ছ্বাস দুর্ব্বলতার ফল, ভক্তির উচ্ছ্বাস বলবত্তার ফল। দুর্ব্বলের ভক্তি হয় না। দুর্ব্বলেরা ভয় আর হতাশাকে ভক্তি বলিয়া ভ্রম করে। এই জন্যই নিষ্ঠার বলে আগে শক্তি অর্জ্জন করিতে হয়। তবে ভক্তি আসে। গুরুদত্ত সাধনে নিষ্ঠা আন। অন্য শত মতের শত পথের কথা ভুলিয়া যাও। নিষ্ঠার বলে প্রকৃত ভক্তির অধিকারিণী হও। তখন দেখিবে, হা-হুতাশ থামিয়া যাইবে, বিমল প্রেমের আলোকে জীবন উদ্ভাসিত হইবে, প্রেমের সুধায় জীবনের পাত্র কানায় কানায় ভরিয়া উঠিবে।

আর একটা কথাও আসিয়া গেল। তুমি বোধহয় তোমার গুরুদেবের যে গুরু কে, তাহা জান না বলিয়া নিজেকে অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছ। গুরুদেবের গুরুর নাম তোমার জানিতেই হইবে, নতুবা জপের মালা আর ঘুরিতে চাহে না। কেহ আসিয়া তোমাকে বলিয়া দিল, গুরুদেবের গুরু অমুক

সাধক। তারপরে কি আবার প্রশ্ন হইবে না যে, তাঁহার গুরু কে? কেহ আসিয়া সেই নামটীও বলিল। আবার কি প্রশ্ন হইবে না, তাঁহার আবার গুরু কে? এই ভাবে গুরুর গুরু, তস্য গুরু, তস্যাপি গুরু করিয়া শেষ পর্য্যন্ত একেবারে আদি গুরুর হদিস্ কি করিয়া মিলিবে? রামের গুরু বশিষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার গুরু কে? কৃষ্ণের গুরু সন্দীপন মুনি, কিন্তু তাঁহার গুরু কে? বুদ্ধের গুরু আড়ারকালাম, তাঁহার গুরু কে? চৈতন্যের গুরু কেশব ভারতী, তাঁহার গুরু কে? অঙ্গদের গুরু নানক, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর গুরু ব্রহ্মানন্দ পরমহংস, লোকনাথের গুরু ভগবান গাঙ্গুলী কিন্তু তাঁহাদের গুরু কে? সেন্ট জনের গুরু যীশুখৃষ্ট, কিন্তু তাঁহার গুরু কে? আলি, আবুবকর, ওমরের গুরু মহম্মদ, কিন্তু তাঁহার গুরু কে? রামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরী, কিন্তু তাঁহার গুরু কে? ইঁহাদের মধ্যে আবার বুদ্ধ আড়ারকালামকে, চৈতন্য কেশব ভারতীকে বা রামকৃষ্ণ তোতাপুরীকে হুবহু অনুসরণও করেন নাই। এমতাবস্থায় গুরুর গুরুকে জানিয়া লাভ কি? না জানিলেই বা ক্ষতি কোথায়? তুমি নিজে সাধনের রাস্তা জান না, তাই সাধনের পথ জানিবার জন্য একজনকে গুরু করিয়াছ। পথ জানিয়াছ, এখন এক মনে পথই চল। ভিন্ন লোকেরা তোমাকে উত্যক্ত করে, এজন্য তোমার গুরুদত্ত পথ মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে না। সন্ন্যাসী গুরুদেব গুরুর পরিচয় দিতে হইলে গিরি, পুরী,

ভারতী, সরস্বতী ইত্যাদি উপাধিধারী একজন দশনামী সন্ন্যাসীর প্রতি সশ্রদ্ধ নয়ন নিক্ষেপ করিতে হয়। কিন্তু পরম্পরাক্রমে একেবারে শঙ্করাচার্য্যের পাদপদ্মে পৌঁছিবার পরেও প্রশ্ন থাকে, তাঁহার গুরু কে, তাঁরও আবার গুরু কে? গোবিন্দপাদাচার্য্য, গৌড়পাদাচার্য্য এবং পরিশেষে দত্তাত্রেয় হইয়া শেষ পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের আদি গুরু কে সাব্যস্ত হইবেন? কোনও কোনও সম্প্রদায় ত' শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মা বা বিষ্ণুকে আদি গুরু করিয়াছে কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণুর গুরু কে? কোনও কোনও সম্প্রদায় শিবকে আদি গুরু করিয়াছেন কিন্তু তাঁর গুরু কে? কে দেখিয়াছে তাঁহাকে, যিনি জগতের সকল আচার্য্যদেরও আগের আচার্য্য? আর সেই আদিম আচার্য্যেরই বা গুরু কে? এই প্রশ্নের মীমাংসা পাইবে তখন, যখন জানিবে, তুমি কে, আমি কে, পরমেশ্বর কে? তখন এই তিন মিলিত হইয়া সত্য শাশ্বত গুরুর পরমসুন্দর মূরতি ধারণ করিবে সুতরাং বৃথা প্রশ্নে কাল না কাটাইয়া প্রাণপণে সাধন কর।

(২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫)

(১৯)

তোমাদের গুরুভ্রাতাদের সংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহাকে আহ্লাদের বিষয় মনে না করিয়া দুশ্চিন্তার বিষয় বলিয়াও মনে করা চলিতে পারে। কেন এত লোক দীক্ষা নিতেছে? দীক্ষাগৃহে এই যে 'নিদারুণ ভিড়, তাহা কি কেবলই অভিনন্দনের যোগ্য ব্যাপার, না ইহা নিয়া উদ্বিগ্ন

হইবারও কারণ আছে? হাজার হাজার নরনারী তোমরা দীক্ষিত হইতেছ। কেন হইতেছ? হুজুগে পড়িয়া কি?

আমি কিন্তু ভাবিত হইয়াছি। আগ্রহ করিয়া আসিলে আমি সকলের প্রতিই উদার, ইহাই কিন্তু যথেষ্ট নহে। কিছু কিছু ছেলে মেয়েকে কখনও কখনও আমি দীক্ষাগৃহ হইতে এই বলিয়া বাহির করিয়া দিয়া থাকি যে, তাহাদের প্রতীক্ষা করিবার প্রয়োজন আছে, ইহাও যথেষ্ট নহে। যাহারা দীক্ষা নিয়া যাইতেছে, তাহারা ঘরে ফিরিয়া প্রত্যহ সাধন করিবে, সপ্তাহের সমবেত উপাসনাটীতে অবশ্যই ভক্তিভরে যোগ দিবে এবং সহযোগিতা করিবে, সকল সম্প্রদায়ের সাধকদের প্রতি অন্তরের প্রীতি রক্ষা করিয়া চলিবে আর নিজেদের মধ্যে কোনও ভেদ-বিসম্বাদ, দলাদলি করিয়া সামাজিক আবহাওয়া কলুষিত করিবে না, প্রত্যেকে নিজ নিজ অতীতের পাপাসক্তি ও কদভ্যাসসমূহ বর্জ্জন করিয়া চলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, সাধ্যমত অদোষদর্শী হইয়া এবং অমানীকে মান দান করিয়া নম্র, বিনীত, নিরহঙ্কার হইয়া চলিবে, ইহা নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করিব। ইহা না হইলে, লোকেরা দলে দলে দীক্ষা নিতেছে, শুধু ইহাই যথেষ্ট নহে।

আগেকার দিনে কুলগুরুরা দীক্ষা দিতেন। অনেক কুলগুরু এখন আর দীক্ষাদান তৃপ্তিপ্রদ জ্ঞান করেন না। অনেক কুলগুরু অন্য বৃত্তি গ্রহণ করিয়া দীক্ষাদান-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়াছেন। অনেক কুলগুরু শিষ্য-বংশের লোকদের শ্রদ্ধা উদ্রেকে অসমর্থ

হইয়াছেন। অথচ গুরুর আবশ্যকতা-বোধ লোকের কমে নাই। ইহার ফলে নূতন শ্রেণীর গুরুদেবদের আবির্ভাব হইয়াছে। কোথাও সত্য সত্য লোকপাবন-উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া গুরুদেবরা কাজ করিতেছেন। কোথাও বা ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতির ন্যায় গুরুদেবগিরি অত্যন্ত লাভপ্রদ ব্যবসায় রূপে পরিগৃহীত হইয়া সুশৃঙ্খল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের রীতি অনুযায়ী বিপুল বিস্তারের অভাবনীয় ব্যবস্থা-সমূহের অধীন হইয়াছে। নিজ নিজ অন্তরের উদ্দেশ্যানুযায়ী এই সকল গুরুদেবদের অন্তিম গতি হইবে। কিন্তু বেশী ভাবনার বিষয় দাঁড়াইয়াছে শিষ্যদের নিয়া। ইহারা দীক্ষা নিবে, সাধন করিবেন না। ইহারা দীক্ষালাভের আগেও নৈতিক জীবনে যাহা ছিল, দশ বৎসর পরেও ঠিক তাহাই থাকিয়া যাইবে, কোনও উন্নতি ইহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হইবে না। দীক্ষার আগেও যেমন ছল-চাতুরী, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা-প্রতারণা প্রভৃতি চলিত, দীক্ষার পরেও তাহাই চলিতে থাকিবে। ইহার পরে লোকের মনে কি এই প্রশ্ন স্বাভাবিক নহে যে, তবে এত লোকে দীক্ষা নিতেছে কেন? গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় প্রথার অনুসরণ করিলেই ত' জগতের কোনও লাভ হইবে না। দীক্ষার ফলে মানুষের অন্তরের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া সে উদার হইবে, তাহার দুর্ব্বলতা কমিয়া সে সবল হইবে, তাহার অন্ধ-কুসংস্কার বিদূরিত হইয়া সে চক্ষুষ্মান্ সদসদ্‌বিচারক্ষম বীর্য্যবান্ সমাজ-মঙ্গল-কর্ম্মী হইবে,

তাহার আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা বিনাশ পাইয়া তাহাকে আদর্শ জগন্মঙ্গলকারী করিবে,—ইহাই ত' প্রত্যাশিত। এই প্রত্যাশার যদি পূরণ না হইল, তাহা হইলে কেবল কি দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়িলেই উৎফুল্ল হইব ?

দীক্ষাদানকালে তোমাদের বারংবার বলিয়াছি,—তোমরা তোমাদের সমদীক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা করিও না ; নিজেরা সাধন করিয়া বলশালী হও, তাহার ফলে আপনিই লক্ষ লক্ষ কল্যাণকামী নরনারী দীক্ষালাভকে জীবনের পরম লাভ বলিয়া বিশ্বাস করিতে সমর্থ হইবে। দীক্ষা নিয়া একদল লোক মানুষের মত মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, এই দৃশ্য চোখের উপরে দেখিবার পরে আর ত' কেহ অন্ধ-বিশ্বাসের তাড়নায় আসিবে না। আসিবে জ্বলন্ত বিশ্বাস লইয়া। অন্ধ-বিশ্বাস হুজুগ সৃষ্টি করে। হুজুগ সঙ্কল্পের শক্তিকে অস্থায়ী করিয়া দেয়। দুর্ব্বল সঙ্কল্প লইয়া কাজে নামিলে কাজ অকালে পণ্ড হয়।

তোমরা কথাগুলি ভাবিয়া দেখিও। প্রেম সহকারে কথাগুলি বিবেচনা করিও। বিশাল এক সম্প্রদায়ের গুরু-রূপে প্রতিষ্ঠা পাইয়া আমার কি লাভ হইবে ? দলে দলে জনকল্যাণকামী চরিত্রবলসমৃদ্ধ কর্ম্মবীরের আবির্ভাবই আমার কাম্য। দীক্ষা তোমাদের সঙ্কল্পকে দৃঢ় করিবার জন্য দিয়াছি, আমার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নহে। তোমরা যদি নিজেদের মূল্য নিজেরা বাড়াইতে চেষ্টা না কর, তাহা হইলে কেবল দীক্ষা

দিয়া কে কবে জগতের কল্যাণ করিতে সমর্থ হইবে? প্রেম-সহকারে কথাগুলি ভাব। (৬ই আষাঢ়, ১৩৬৫)

(২০)

স্বামীর সহিত একই দিনে এক সঙ্গে দীক্ষা না নিলে সাধনায় কোনও সিদ্ধি অর্জ্জন সম্ভব নহে বলিয়া যে কথা শুনিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন! কারণ, অনেক সময় দীক্ষা-গ্রহণের অনেক পরে স্বামী বিবাহ করিয়া থাকেন। এই সকল স্থলে স্বামী-স্ত্রীর একত্র দীক্ষা কি করিয়া সম্ভব হইবে? স্বামী তাঁহার কৈশোরে দীক্ষা নিয়াছিলেন বলিয়া কি যৌবনে বা যৌবনান্তে বিবাহিত পত্নীর দীক্ষা মিথ্যা হইয়া যাইবে?

আসল কথা এই যে, যেখানে সম্ভব, স্বামী ও স্ত্রীর একত্র দীক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করাই ভাল। যেখানে স্বামী আগেই দীক্ষা নিয়াছেন, সেখানে স্ত্রী পরেই দীক্ষা নিবেন। যেখানে অদীক্ষিত স্বামীর পক্ষে দীক্ষা নিবার সুযোগের অভাব অথচ প্রকৃত গুরুর সন্ধান মিলিয়া গিয়াছে, সেখানে স্বামীর সানন্দ অনুমতি থাকিলে স্ত্রী তাঁহার আগেই দীক্ষা নিতে পারেন। যেখানে স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে মনোগত ধারণা ও আদর্শগত অনুধ্যানের পার্থক্য আকাশ-পাতাল, সেখানে স্বামীর অনুমতি সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত কাল প্রতীক্ষা করিয়াও অনুমতি না পাইলে, পত্নীরা নিজেদের ইচ্ছামত দীক্ষা নিতে পারেন। কিন্তু কোনও যুক্তিমান্ বিবেচক গুরুই এমন পত্নীকে এক

কথায় দীক্ষা দিতে সম্মত হইতে পারেন না। কেননা, স্বামীর অনুমতি নিয়া দীক্ষা নিলে স্ত্রীর পক্ষে সাংসারিক অশান্তি অনেক কমিয়া যায়।

আদর্শ ব্যবস্থাটী এই যে, স্বামী ও স্ত্রী সাধ্যপক্ষে একত্রই দীক্ষিত হইবে। একত্র দীক্ষিত হইবার ফলে স্বামি-পত্নীর মধ্যে অনুরাগের সাত্ত্বিকতা বৃদ্ধি পায় এবং উভয়ে গোড়া হইতেই একে অন্যকে সাধন-পথে নিরন্তর উৎসাহিত করিতে অধিকতর রুচিসম্পন্ন থাকে।

ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে যে, স্বামিপত্নীর একসঙ্গে দীক্ষা-গ্রহণকে অত. প্রশংসা কেন করা হইয়াছে। কিন্তু দীক্ষা নিবার পরে সাধনও করিতে হয়। তাহারই পক্ষে সিদ্ধি অর্জ্জন সম্ভব, যে সাধন করিবে একাগ্র হইয়া। স্বামী দীক্ষিত না হইলে স্ত্রীর নানা সাধন-বিঘ্ন উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু স্বামী দীক্ষিত না হইলেও যদি স্ত্রী দীক্ষিত হন এবং প্রাণপণেই সাধন করিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার সিদ্ধি-অর্জ্জনকে রুখিবে কে? (১৩ই আষাঢ়, ১৩৫৫)

(২১)

তোমরা যদি নিজ নিজ অঞ্চলের সকল স্থানের সকল ভ্রাতাদের সঙ্গে যাচিয়া সাধিয়া আলাপ-পরিচয় এবং যোগাযোগ নিয়তই রাখ, তাহা হইলে যে-কোনও সময়ে স্বল্পকালের খবর

পাইলেও নিজেরা মিলিত হইতে পার। মিলনের যে আনন্দ, তাহা যদি আস্বাদ করিতে চাহ, তাহা হইলে সদাসর্ব্বদা খোঁজ-খবর রাখিবার অভ্যাসটী বজায় রাখিতে হইবে।

অমুক গুরুভাই ধনী আর অমুক গুরুভাই দরিদ্র, এই সকল বিবেচনা করিয়া শ্রদ্ধা-প্রীতিতে কোন তারতম্য না করিয়া সকলের সহিত পরিচয় রক্ষা করিয়া যাওয়া উচিত। যাহারা বড় চাকুরী করে বলিয়া গর্ব্বিত, যাহারা ধনী কিম্বা বিদ্বান্ বলিয়া অপরের কাছ হইতে নিজেদের দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে ব্যস্ত, এমন গুরুভাইদিগকেও তোমরা তোমাদের সহিত অপরিচিত থাকিতে দিও না। প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণের মধ্য দিয়া পরিচয়টা রক্ষা করিয়াই যাইও। আজ তাহারা অন্ধতা বশতঃ তোমার মত গরীবের সহিত পরিচয় রাখিতে অনিচ্ছুক হইতে পারে, কিন্তু তোমার জীবনে যদি সাধন-ভজন চলিতে থাকে সুনিশ্চিত গতিতে, তাহা হইলে একদিন তোমার মত লোকের সঙ্গই তাহাদের পরম-লোভনীয় হইবে। ধন, পদমর্য্যাদা বা বিদ্যার গরব মানুষের চিরকাল থাকে না, থাকিতে পারে না। কেহ অবস্থার ফেরে পড়িয়া, কেহ বা জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে দর্প, দম্ভ, গর্ব্বের কবল হইতে রক্ষা পায়। মানুষ-হিসাবে তখন তাহারা হয় সত্য সত্য দামী, তাই তাহারা ধনি-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষকে দেয় সম্মান। তাই, আপাততঃ অসুবিধাজনক হইলেও, যাহাদের সহিত আধ্যাত্মিক আত্মীয়তায়

তুমি আত্মীয়, তাহাদের সহিত পরিচয় রক্ষার সকল সঙ্গত সুযোগ সর্ব্বদা সুযোগ্য ভাবে গ্রহণ করিবে।

কিন্তু একটী কথা মনে রাখিও যে, ইহাদের কাহারও কাছ হইতে তোমার নিজের কোনও পার্থিব স্বার্থের ক্ষীণতম প্রত্যাশাও রাখিও না। নিষ্কাম পরিচয় উভয়তঃই লাভজনক হইবে। স্বার্থসাধনের জন্য ইহাদের সহিত পরিচয় করিতে গেলে তুমি ইহাদের দৃষ্টিতে এত ছোট হইয়া যাইবে যে, তোমারও স্বার্থ সাধিত হইবে না, ইহাদেও কোনও মঙ্গল হইবে না।

আদালতে চাকুরী পাইবার প্রত্যাশায় জজ সাহেবের গুরুর নিকট দীক্ষা নেওয়া, বিনা ফিতে পরিজনবর্গের চিকিৎসা হইবে আশা করিয়া ডাক্তারের গুরুদেবের শিষ্য হওয়া, সিনেমা ও থিয়েটারের চান্স পাইবার আশায় ফিল্ম-ডিরেক্টারের গুরুদেবের নিকট মন্ত্র লওয়া প্রভৃতি অপকৌশল সেয়ানা লোকেরা ধরিয়া ফেলিয়াছে। এই সকল ব্যাপার নিয়া অনেক গল্প-গাছাও সর্ব্বদাই শোনা যায়। যাহার সহিত তোমার পরিচয় হইতে যাইতেছে গুরুভাই বলিয়া, তাহার সহিত কোনও স্বার্থের সংস্রব রাখা আদৌ সঙ্গত নহে। যে দেশে বা যে কালে গুরুদেবরাই শিষ্যদিগকে প্রতারিত করিয়া তাহাদের মনে দারুণ সংশয়, সন্দেহ ও অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে কুণ্ঠিত নহেন, সেই দেশে বা সেই কালে এক গুরুভাই অন্য গুরুভাইএর সহিত স্বার্থের প্রয়োজনে পরিচয় রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে তাহাই বা কেন

নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে না? গুরুভ্রাতাদের উৎপাতে অস্থির হইয়া অনেক গুরুগতপ্রাণ ব্যক্তিকেও দেখা গিয়াছে গুরুদেবের দ্বারা আয়োজিত উৎসবাদি বর্জ্জন করিয়া চলিতে। এই কথাগুলি তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত।

একজন গুরুভ্রাতা হয়ত কোনও উদ্বাস্তু-উপনিবেশের প্রধান পরিচালক। গুরুভ্রাতৃত্বের দাবীতে তাহার নিকটে কোনও অতিরিক্ত বা অন্যায় সুবিধা চাহিয়া বসিলে এমনও কি হইতে পারে না যে, তাহাতে তাহার অপক্ষপাত কর্ত্তব্যে ত্রুটি হইবে? এমতাবস্থায় তাহার নির্ম্মল যশে কলঙ্কপাত হইবার আয়োজন ভ্রাতা হইয়া তোমরা কেহ কেন করিবে? একজন গুরুভ্রাতা হয়ত মুনসেফ বা জজ। তাঁহারই এজলাসে যে মামলা ঝুলিতেছে, সেই মামলা সম্পর্কে গুরুভ্রাতার দাবীতে তাহার নিকট সুবিধা পাইবার জন্য তদ্বির করাও তদ্রূপ জানিও। একজন সাধারণ মানুষ অপর একজন মানুষের কাছে যে বিষয়ে যতটুকু সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাশা করিতে পারে, তুমি তোমার গুরুভ্রাতার নিকটে বৈষয়িক ব্যাপারে তাহার অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধার দাবী কখনও রাখিও না!

গুরুভাই একটা মহান্ পরিচয়। গুরুভাইকে দেখিলে গুরুভাই হইবে ঐশ্বরিক ভাবে অনুপ্রাণিত, এক গুরুভাই অপর গুরুভাইকে করিবে দিব্য প্রেরণায় সঞ্জীবিত, এক গুরুভাইয়ের চিন্তা, বাক্য, কর্ম্ম অপর গুরুভাইয়ের বর্দ্ধন করিয়া চলিবে

নিষ্কাম জীবহিতৈষণা আর অফুরন্ত সাধন-স্পৃহা, ইহাই গুরুভাইয়ের সহিত গুরুভাইয়ের আদান-প্রদানের শ্রেষ্ঠ অবস্থা। এই অবস্থাকে কোনও ক্ষুদ্র তুচ্ছ স্বার্থের খাতিরে নীচে টানিয়া আনা মূঢ়তা মাত্র।

গুরুকে দেখিলে শিষ্যের মনে যেমন ভগবৎ-সাধনের দিব্যানন্দ স্ফূর্ত্ত হইয়া ওঠা উচিত, গুরুর মানস-পুত্রে গুরু সূক্ষ্ম ভাবে বিরাজিত বলিয়া গুরুভাইকে দেখিলেও গুরুভাইয়ের সেইরূপ হওয়া উচিত। আনন্দে গদ্‌গদ হইতে না পার, অন্ততঃ আনন্দের আবেশটুকু হওয়া উচিত। সম্বন্ধ তার প্রকৃত স্থানে পৌঁছিলে ইহাই স্বাভাবিক।

তোমা অপেক্ষা দুর্ব্বলতর গুরুভ্রাতাকে বল পরিবেশন করা, তোমা অপেক্ষা দরিদ্রতর গুরুভ্রাতাকে স্বাবলম্বী ও উপার্জ্জনক্ষম হইতে সাহায্য করা তোমার মত গরীবের পক্ষেও কল্যাণকর হইবে। বিপন্ন মানুষ মাত্রকেই সাহায্য করা তোমাদের কর্ত্তব্য। সেই বিপন্ন মানুষটী যদি আবার গুরুভ্রাতা বা ভগিনী হয়, তাহা হইলে এ কার্য্য তোমার পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায় এইজন্য যে, তোমার গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীদের মধ্য হইতে দারিদ্র্য-দোষ উৎখাত হইলে পরোক্ষভাবে তোমার আধ্যাত্মিক সাধনার আবহাওয়াও উন্নত হইবে। দরিদ্রের সমাজে পাপ বেশী, অপরাধ বেশী। ক্ষুধার তাড়নায় অনেক সৎলোকও অনিচ্ছায় অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। তাই সকল দরিদ্র ভ্রাতা-

ভগিনীদের অবস্থার উন্নতি সাধনে সহায়তা করিয়া তোমার ধর্ম্মসঙ্ঘকে নৈতিক দিক দিয়া সবল করা দরকার।

কোনও গুরুভ্রাতা বা গুরুভগিনীর নৈতিক অবনতি ঘটিলে তাহাকে জোর করিয়া পাপপঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিবার দায়িত্বও তোমাদের। গুরুভাই বা গুরুভগিনী বলিয়া আনন্দে ডগমগ হইয়া যাহার নিকটে গা-ঘেঁষিয়া বসিতেছ, তাহাকে প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন সর্ব্বপ্রকারের পাপ হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব তুমি কোনও প্রকারেই এড়াইতে পার না। নিজ সহোদর ভ্রাতার কলঙ্ককে যেমন করিয়া দূর করিতে হয়, তোমার গুরুভ্রাতার কলঙ্ককেও তেমন করিয়া দূর করিতে হইবে। সে যদি চোর-জুয়াচোর হয়, তোমাদিগকে চেষ্টা করিয়া তাহার স্বভাব বদলাইতে হইবে। সে যদি লম্পট বা দুশ্চরিত্র হয়, তোমাদিগকেই চেষ্টা করিয়া তাহার অন্যায় আসক্তি দূর করিয়া দিতে হইবে। হিতবুদ্ধি দিয়া দিয়া তাহার পাপক্ষয় করিতে হইবে। তাহার অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়া নহে, তাহাকে উত্তম আদর্শের প্রতি আগ্রহবান্ করিবার চেষ্টা করিয়া ইহা করিতে হইবে।

ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ইহা তোমার মানব-সমাজের প্রতি অতি স্বাভাবিক কর্ত্তব্য। সঙ্কীর্ণতর দৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহা তোমার সঙ্ঘের প্রতি এক আবশ্যিক কর্ত্তব্য। যে সঙ্ঘে দয়াল গুরুর অপার কৃপায়, চোর ডাকাত, লম্পট বা অসতীও

দীক্ষামূলে আশ্রয় পাইতে বঞ্চিত হয় না, সে সঙ্ঘে যদি ইহাদের চরিত্র-বিশোধনের সহায়তা করিবার জন্য চারিদিক হইতে চরিত্রবান্ সততাপরায়ণ ভ্রাতারা কর-প্রসারণ না করে, তবে আস্তে আস্তে এই ধর্ম্মসঙ্ঘ যে চোর-ডাকাত-অসতের সঙ্ঘেই পরিণত হইয়া যাইবে! ইহার যে আধ্যাত্মিক মর্য্যাদা কিছুই থাকিবে না! দয়াল গুরুরা চোরকে বা লম্পটকে ঘৃণা করেন না, ইহা তাঁহাদের মহত্ত্ব। কিন্তু চোর-ডাকাত যদি দীক্ষার পরেও চোর-ডাকাতই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ইহার চাইতে বড় বিপদ আর কি আছে? চোর, ডাকাত, মদ্যপ বা লম্পট বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিতে বলি না। প্রেমই করিতে হইবে। কিন্তু সেই প্রেম ইহাদের চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তনে যেন সমর্থ হয়। (১৫ই আষাঢ়, ১৩৬৫)

(২২)

চিরাচরিত প্রথানুযায়ী আজ তোমরা অপরাপর সকল হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী সাধক-সম্প্রদায়েরই ন্যায় হয়ত গুরু-পূর্ণিমা পালন করিতেছ। আমি এই বিষয়ে তোমাদিগকে কোনও সুনির্দ্দিষ্ট প্রবর্ত্তনা না দিলেও ইহা পছন্দই করি যে, যেই দিনে স্মরণাতীত-কাল হইতে সকল সাধকদলই নিজেদের গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া আধ্যাত্মিক উৎকর্ষমূলক উৎসবানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া আসিয়াছেন, সেই দিনটীতে তোমরা বিশ্বের সকল গুরুর সম্মানার্থ জগৎকল্যাণ সঙ্কল্পে নিশ্চয় সমবেত উপাসনা করিতেছ। আমি তোমাদের

গুরু, এই বলিয়া এই বিশেষ দিনটীতে আমি তোমাদের নিকট হইতে অন্য কোনও বিশেষ জিনিষ প্রার্থনা করি না। আমি তোমাদের নিকটে চাহি তোমাদের গাঢ়তর সাধনাভিনিবেশ, দৃঢ়তর সাধননিষ্ঠা। ইহার বলে তোমরা মহীয়ান্ হও এবং বিশ্বের সকল বৈষম্যের দুঃখ বিদূরিত কর। কেবল নিজের মোক্ষের জন্যই তোমরা শিষ্য হও নাই, তোমরা আমার কাছে আসিয়াছিলে বিশ্বের কুশলে আত্মসমর্পণ করিতে। কেবল একজনের ত্রাণকে লক্ষ্য করিয়াই তোমাদিগকে ব্রাহ্মণ্যের উচ্চতম অধিকার বিতরণ করি নাই, আমি চাহিয়াছিলাম তোমাদের এক এক জনের মধ্য দিয়া শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ অজ্ঞান মানবের ভ্রান্তিবিদূরণ, শ্রান্তিপ্রশমন, দুঃখ-বিমোচন।

অদ্য এই গুরুপূর্ণিমার দিন তোমাদের আমি প্রতিশ্রুতি-বাক্য দিতেছি যে, তোমাদের যে দীক্ষা আমি দিয়াছি, তাহার প্রকৃত অর্থ ই এই যে, অতগুলি সৈনিক আমি সৃষ্টি করিয়াছি, অতগুলি প্রচারক আমি তৈরী করিয়াছি, অতগুলি সাধকের আমি জন্ম দিয়াছি। তোমরা প্রত্যেকে সাধক হও, সাধনার বলে প্রচারকের পূর্ণ যোগ্যতা আহরণ কর। নির্ব্বিদ্বেষ মন লইয়া প্রচার-কার্য্য করিয়া যাও এবং যেখানেই যত বিরুদ্ধ অবস্থার সম্মুখীন হও না কেন, পলায়নপর না হইয়া, সৈনিকের ন্যায় সকল অস্ত্রাঘাত বক্ষে ধারণ করিতে করিতে অগ্রসর হও।

(১৬ আষাঢ়, ১৩৫৫)

(২৩)

যেখানেই যাও, তোমাদের নিজেদের মত-পথ প্রচারের জন্য কোনও স্থানেই প্রলোভন-প্রদর্শন, চালাকী বা উৎপীড়নের চেষ্টা করিবে না। সম্প্রতি কোনও কোনও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানকে উল্লিখিত কার্য্যগুলির প্রত্যেকটী অবলম্বন করিতে দেখা গিয়াছে। এক সময়ে এক শ্রেণীর অহিন্দু ধর্ম্মপ্রচারকেরা মেমের সহিত বিবাহ দিবার প্রলোভন দেখাইয়া হিন্দুসন্তানদিগকে নিজধর্ম্মাবলম্বী করিত। আর এক শ্রেণীর অহিন্দু ধর্ম্ম-প্রচারকেরা কুলকন্যা বা কুলবধূকে অপহরণ করিয়া ধর্ষণের দ্বারা তাহার মনোবল ভাঙ্গিয়া দিয়া স্বসমাজে পুনরায় স্থান পাইবার আশা নির্ম্মূল করিয়া দিবার পরে নিজধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া তাহাকে হাতে স্বর্গ পাওয়াইয়া দিত। এই জাতীয় ইতর-চেষ্টা হিন্দুনামধারী দীক্ষা-দাতাদের ভিতর এতকাল লক্ষ্য করা যায় নাই। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাইতেছে- যে, বয়স্থা কুমারী কন্যা কেন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট নির্দ্দিষ্ট এক মতে দীক্ষা গ্রহণ করিল না, তাহার জন্য তাহার কটিবস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহার নিতম্বে প্রজ্বলন্ত রক্তবর্ণ চিমটার আঘাত পর্য্যন্ত করা হইতেছে। ধর্ম্মের নাম করিয়া লোক-প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া যখন জনসমাজে সমর্থনকারীদের সংখ্যা অত্যধিক বাড়িয়া যায়, তখন এই সকল বেপরোয়া অন্যায় অনায়াসে চাপা পড়িয়া যায় এবং একটা অন্যায় সঙ্গে সঙ্গে শাসিত না হওয়ার দরুণ দশটা নূতন নূতন অন্যায় কেবল প্রশ্রয়

পাইতে থাকে। তখন হয়ত নরহত্যা ও নারীধর্ষণ এক এক বিচিত্র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা সমর্থিত হইতে থাকে। তোমাদের ধর্ম্মপ্রচার-প্রচেষ্টার মধ্যে পাপ, অসত্য ও অপরাধ যেন কোনও সময়েই বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় না পায়। বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে কয়েকটা বিপথগামী সমাজ নারী ও পুরুষকে নিয়া নিয়া জঘন্য যৌনাচার-সমূহের অনুশীলন একদা করিয়াছে। লিঙ্গপূজা এবং যোনিপূজা উপলক্ষ্য করিয়া তান্ত্রিক সমাজের কতকাংশেও অনেক প্রকার অসামাজিক ব্যবহার একদা সুপ্রচুর হইয়াছে। শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবেরা প্রথমোক্ত আচার-সমূহকে কদাচার ও শাস্ত্রাভিপ্রায়-বিরোধী বলিয়া প্রতিবাদও করিয়াছেন। দ্বিতীয়োক্ত আচার সমূহকে গার্হস্থ্যাবলম্বী তান্ত্রিক সাধকেরা কৃচ্ছ্র সাধন বলিয়া অপছন্দ করিলেও বা পঞ্চ-মকারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বিষয়টার পূতিগন্ধ দূর করিতে চাহিলেও একদল তান্ত্রিক যেই অকথনীয় উদ্দামতার অনুশীলন একদা করিয়াছিলেন এবং যাহার স্মৃতিকথা বিভিন্ন তান্ত্রিক রচনাবলীর মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন, একদল অষ্টসিদ্ধিকামী ও সকাম সাধক ব্যতীত অপরে তাহা অগর্হিত বলিয়া ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু তথাপি তাহাদের ভগ্নাবশেষ নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়া নানা সম্প্রদায়ে অতি গোপন ভাবে বাহুবিস্তার করিয়া চলিয়াছে। কিছুকাল পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ যোগসাধনা শিক্ষা-দানান্তে গুরুদেব-বিশেষের লোক-প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক অবস্থার খুব

ঊর্দ্ধগতি পাইবার পরে হয়ত কাম-কদাচারকে তিনি তিব্বতী যোগ বা কামরূপীয় সাধন নাম দিয়া শিষ্য-শিষ্যা-বিশেষের মধ্যে প্রচলন সুরু করিলেন। এইরূপ ব্যাপার লইয়া সম্প্রতি কিছু-কালের মধ্যে দেশের ধর্ম্মাধিকরণে বেশ কয়েকটা মামলা-মোকদ্দমাও হইয়া গিয়াছে। তোমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, তোমাদের সংঘটীর মধ্যে এমন জিনিষ যেন কোনও ছল-ছুতা আশ্রয় করিয়াই প্রবেশ করিতে না পারে, যাহার পরিণাম হইবে যৌন কদাচার ও অসামাজিক ইন্দ্রিয়-সেবাকে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়া সমাজে তুলিবার চেষ্টা। (১৫ই আষাঢ়, ১৩৬৫)

(২৪)

তোমরা যে দীক্ষা পাইয়াছ, তাহা জগন্মঙ্গলের দীক্ষা। কেবল একাকী একটি মাত্র আত্মার মুক্তির দীক্ষা ইহা নহে, প্রচলিত সর্ব্ববিধ দীক্ষা-পদ্ধতি হইতে তোমাদের দীক্ষা একেবারে স্বতন্ত্র।

এই স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে তোমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। উপাসনা-প্রণালীখানা বারংবার পড়। তাহা হইতে প্রকৃত তাৎপর্য্যটা বুঝিয়া লও। তোমরা শুধু হুজুগেই দীক্ষা নিয়াছ, ইহা আমি মনে করি না। জগতের মঙ্গল-প্রয়োজনে তোমরা আমার কাছে আসিয়াছ। সুতরাং দীক্ষিত হইবার পর অপরাপর সম-দীক্ষিতের কাছ হইতে তোমরা দূরে সরিয়া থাকিতে পার না। তাহাদিগের সহিত যোগাযোগ রক্ষা কর।

তাহাদিগকে লইয়া সমবেত উপাসনা কর। তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে সহায়তা কর। তাহাদের ভক্তি-প্রাণ চিত্ত ও সাধনানুরক্ত মন হইতে নিজেদের জন্য উৎসাহ সংগ্রহ কর। তাহাদিগকে স্বাবলম্বী শক্তিমান্ দীপ্ত-পৌরুষ-সম্পন্ন বীর্য্যবান্ পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সহায়তা কর।

ইহা তোমাদের ঋষি-ঋণ। কারণ, দীক্ষার বিনিময়ে আমি নিজের জন্য তোমাদের কাছে কিছুই চাহি নাই। কিন্তু তোমাদেরই সকলের নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য তোমাদের নিকটে ইহা চাহিয়াছি। ইহা গুরু-দক্ষিণারূপে তোমাদের অবশ্য-দেয়।

(১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৫)

(২৫)

সাধারণ অবস্থায় ছোট ছেলেমেয়েদের দীক্ষা দেওয়া উচিত নয়। কারণ, তাহারা দীক্ষার উদ্দেশ্য ও অর্থ বুঝিতে পারে না। কিন্তু যেখানে পারিবারিক পরিস্থিতি অনুকুল, যেখানে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বুঝাইয়া দিবার জন্য পিতা, মাতা বা ভ্রাতারা আছেন, সেখানে ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগকে দীক্ষা দেওয়া ভাল কথাই। বাল্যেই যাহার জীবনে সাধনা স্থরু হয়, সে পরম ভাগ্যবান্। আগেকার দিনে আট বৎসর বয়সেই ছেলেকে গুরুগৃহে পাঠান হইত। শুধু গরুর ঘাস কাটিবার জন্যই পাঠান হইত না, ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য পাঠান হইত।

গরুর ঘাস-কাটা, পশুচারণ আর ক্ষেতের আইল বাঁধা প্রভৃতি গৌণ কর্ত্তব্য মাত্র ছিল।

(১৯শে আষাঢ়, ১৩৬৫)

(২৬)

স্ত্রীকে দীক্ষা নিবার জন্য অত্যধিক পীড়াপীড়ি করিও না। কারণ সে ইতিমধ্যেই নিজস্ব কতকগুলি গোঁড়ামি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে জিদ্ ও গোঁড়ামি প্রবল, সেখানে জোর-জবরদস্তি করিয়া কাহাকেও দীক্ষিত করিলে দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধনে তাহার মন বসে না। প্রচণ্ড জেদ এবং নিদারুণ ঔদ্ধত্যকেও আমি দৃষ্টিমাত্রেই প্রশমিত করিতে পারি। কিন্তু দীক্ষার ব্যাপারে তাহা আমি করিব না। দীক্ষার্থিনী স্বেচ্ছায় দীক্ষা লইবে, সাগ্রহে, সানন্দে, সোল্লাসে এবং অফুরন্ত বিশ্বাস লইয়া প্রবেশ করিবে দীক্ষার গৃহে, ইহাই আদর্শ অবস্থা এবং ইহাই বাঞ্ছনীয়। তুমি তোমার অক্লান্ত প্রয়াসের দ্বারা তোমার সহধর্ম্মিণীর জ্ঞানবুদ্ধির পরিপ্রসারে চেষ্টিত হও। অবিরত তাহাকে পরিবেশন করিয়া যাও সচ্চিন্তা। ক্রমশঃ এই কাজ করিয়া যাইবার ফলে তাহার দীক্ষা নিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইবে। (২০শে আষাঢ়, ১৩৬৫)

(২৭)

কেহ কাহারও আগে জন্মগ্রহণ করিলে ভ্রাতা রূপে জ্যেষ্ঠত্বের দাবী করিয়া থাকে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ হইলেই শ্রেষ্ঠ হয়

না, এইরূপ একটা কথাও একেবারে অসত্য নহে। কেহ আগে দীক্ষা নিলে পরবর্ত্তী দীক্ষিতেরা তাহাকে অগ্রজের সম্মান দিয়া থাকে। এই সম্মান দানে অনুজেরই সম্মান বাড়ে, ইহা অগ্রজেরই কোনও যোগ্যতার পরিচায়ক নহে। আগে দীক্ষা নিয়াছ অথচ অন্যদের অপেক্ষা সাধনে তোমার রুচি বেশী নহে, অন্যদের চাইতে তুমি শীলে, সত্যে, অনুভবে শ্রেষ্ঠ নহ, তবু, তুমি দু'দশ বছর আগে দীক্ষা নিয়াছ বলিয়াই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিবে, ইহা সঙ্গত নহে। তোমার ভিতরে সদ্‌গুণ থাকিলে তোমার দীক্ষারূপ নবজন্মের তারিখ গ্রাহ্য না করিয়াই লোকে তোমাকে শ্রদ্ধা করিবে। এই কথাগুলি প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত। দীক্ষা সত্যই নবজন্ম। কিন্তু কাহার পক্ষে নবজন্ম? যে দীক্ষার পর হইতে পূর্ব্বাভ্যস্ত কদাচার পরিহার করিয়া জীবনকে সাধন-পথে চালাইবার জন্য একাগ্র চিত্তে শ্রম করিবে। লোক-দেখান একটা দীক্ষা নিয়া ফেলিলেই কাহারও নবজন্ম হইয়া যায় না। (১৮ই শ্রাবণ, ১৩৬৫)

(২৮)

তোমার পুত্র শ্রীমান্—তোমার পুত্রবধূসহ গত রবিবার দীক্ষা লইয়া গেল। এই মাত্র কিছুদিন হইল মাতৃশ্রাদ্ধ গিয়াছে, এক বৎসর ত' পার হয়ই নাই, গয়াতে পিণ্ড দেওয়াও হয় নাই, এই অবস্থায় তাহারা দীক্ষা নিতে পারে কিনা, তাহা তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। অবশ্য জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে

তাহারা দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। আমি তাহাদিগকে দীক্ষা দিয়া দিয়াছি। জীবনের পরম পাথেয় সংগ্রহে সমাজ-প্রচলিত পাঁচটা কাজের মত দীক্ষাতেও বাধা ও সংস্কারকে মানিবার প্রয়োজন কিছু নাই। আমার দীক্ষা পারমহংস্য ব্রাহ্মী দীক্ষা। ইহাতে মাতৃদশা বা পিতৃদশায় বাধা হয় না। জাতকাশৌচে বা মৃতাশৌচেও এই দীক্ষায় বাধা নাই। তবে জাতকাশৌচে প্রসূতির দীক্ষা হইতে পারে না। মৃতাশৌচে শ্রাদ্ধাধিকারীদের দীক্ষা শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন হইবার আগে হইতে পারে না। মাতৃবিয়োগে তোমার পুত্র এবং পুত্রবধূ উভয়েই শোকার্ত্ত। এই অবস্থাতে দীক্ষা পাইয়া তাহাদের মনের ভার অনেক লঘু হইল। দীক্ষার পরক্ষণে তাহাদের চেহারাতেই অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা গেল। দীক্ষা কেবলই একটা মন্ত্রদান বা মন্ত্রগ্রহণ নহে। ইহা নবজীবন-দান এবং নবজন্ম-লাভ। তোমার পুত্রের পক্ষে সেকথা সত্য হইয়াছে। আমি আশা করিতেছি যে, তাহার পরবর্ত্তী আচার-ব্যবহারে তুমি নিজেই তাহার প্রমাণ পাইবে।

(১২ই আশ্বিন, ১৩৬৫)

(২৯)

দীক্ষা নিবার পরে যখন তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যস্ত আট দশটি দেবতার স্তোত্র-পাঠে আপনি অরুচি আসিয়াছে, তখন সেইগুলি বর্জ্জন করিলে কোনও ক্ষতির কারণ নাই। দীক্ষা-

জীবনের একটা পরম সংস্কার। অন্য কথায় ইহাকে নবজন্ম বলিতে পার। দীক্ষা গ্রহণের পরে, পূর্ব্বে নিজের অভিরুচি অনুযায়ী যাহা যাহা করিয়াছ, তাহা পরিহার করিয়া দীক্ষা দ্বারা লব্ধ পথে সমস্ত মনঃপ্রাণ লইয়া চলা শুভপ্রদ। অবশ্য পূর্ব্বে যাহা যাহা করিয়াছ, তাহার শুভফল তোমার উপরে কিছু না কিছু পড়িতেছেই। সুতরাং তাহার ঋণ অস্বীকার করিতে পার না। কৈশোর-যৌবনে আর মাতৃস্তন্য চলে না। তখন তাহাকে নূতন খাদ্য গ্রহণ করিতে হয় এবং পরিণত বার্দ্ধক্যে মৃত্যুর দিনটী পর্য্যন্ত সেই নবগৃহীত খাদ্য-রীতিই চলিয়া থাকে। দীক্ষা নিবার পরেও ব্যাপারটা কতকটা তদ্রূপ। আগে যাহা যাহা করিয়াছ, তাহাকে মিথ্যা বলিয়া গালি দিবার বা অসম্পূর্ণ বলিয়া অশ্রদ্ধা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, তবে দীক্ষার পরে দীক্ষালব্ধ পথে পরিপূর্ণ একনিষ্ঠার প্রয়োজন আছে।

(১৬ই, আশ্বিন, ১৩৯৫)

(৩০)

তোমাদের ওখানেও যাট পঁয়ষট্টি জন নরনারী দীক্ষিত হইয়াছেন, ইহা এক হিসাবে আনন্দের বিষয় হইলেও ইহাতে উদ্বেগেরও কারণ রহিয়াছে। বালুরঘাটে দুই শতের উপরে নরনারী দীক্ষিত হইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আগরতলাতে এক দিনে চারি হাজার পঁচিশ জন দীক্ষা নিয়াছিলেন। এগুলি কেবলই সুখের সংবাদ নহে, দায়িত্বেরও সংবাদ। যাঁহারা

দীক্ষা নিলেন, তাঁহারা দীক্ষানুযায়ী সাধন করিবেন ত'। সাধন না করিলে দীক্ষাগ্রহণ একটা অতি হাস্যকর ব্যাপার। প্রতিটি নবদীক্ষিতকে এই কথাটি স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলিও না।

আর একটী কথা স্মরণ করাইয়া দিতেও ভুলিও না যে দলবৃদ্ধি যেন তোমাদের লক্ষ্য না হয়। বল বৃদ্ধি কর। সমদীক্ষিতের সংখ্যা না বাড়াইয়াও তোমরা তোমাদের সঙ্ঘের শক্তি কল্পনাতীত ভাবে বাড়াইতে পার। পৃথিবীর লোকগুলি যত পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মগুরুরই শাসনাধীনে থাকুক না কেন, এমন একটা স্থান আছে, যেখানে ইহারা প্রত্যেকে জগদ্গুরু পরমেশ্বরের অধীন। ঠিক সেই স্থানটীর মর্ম্মদেশে তোমরা তোমাদের সকল আবেগ, আবেদন ও আকর্ষণকে পরিচালিত কর। জগতে সহস্র সহস্র ধর্ম্মসম্প্রদায় থাকিলেও আমরা তাহাদের অন্তর্ভুক্ত প্রতিজনের আপনার আপন হইতে পারি। আমাদের মতে, পথে, সাধনে, আদর্শে, ধ্যানে, ধারণায়, অনুশীলনে ও প্রচারণায় কোথাও কাহারও সহিত সংঘর্ষ নাই। আমরা যেন আমাদের আদর্শ না ভুলি। এই বিষয়ে নবদীক্ষিত ও পূর্ব্বেকার অথণ্ড সকলকেই অবহিত করিয়া দিও। (১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫)

(৩১)

আমি কোনও মানুষ, দেবতা বা অবতারকে প্রচার করি নাই, করিয়াছি সর্ব্বমানব, সর্ব্বদেবতা, সর্ব্ব অবতার, সর্ব্ব সত্য, সর্ব্ব উপলব্ধি, সর্ব্ব দিব্যতার পরম আধার চরম সমন্বয় একান্ত

সামঞ্জস্য প্রণবকে। অসাম্প্রদায়িকতা প্রচার করিতেছি কহিয়া আমি অন্য অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ প্রচারও করি নাই, প্রশ্রয়ও দেই নাই। আমি জানি, তোমরাও জান, প্রণবমন্ত্রেই সর্ব্বমন্ত্রের স্থিতি, প্রণব হইতে সকল ধ্বনির সৃষ্টি, প্রণবই মূল ও সবকিছুর পরম আহরণকারী অক্ষয় অব্যয় সত্য। এই কারণে প্রণবের উপাসক সর্ব্ব ধর্ম্ম সম্পর্কে একেবারে বিদ্বেষ-বর্জ্জিত সহজ মানুষ। প্রণবকেও জোর করিয়া, ছল করিয়া, কৌশল ফাঁদিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, ভয় প্রদর্শন করিয়া, জোর খাটাইয়া, জবরদস্তি করিয়া জনগণের উপরে আমরা চাপাইতে চাহি নাই। জানিয়াছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত-সমূহের অনুবর্ত্তী খণ্ড দেবতার পূজার প্রতি কোটি কোটি মানুষের আজ আর আস্থা নাই, লক্ষ লক্ষ লোক সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান, সহস্র সহস্র নরনারী সেই সকল প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে অসঙ্গতি বা অবিশ্বাস্য যুক্তি দেখিতে পাইয়া জীবন-গতি-পথে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহারা কোনও খণ্ড দেবতার বা নূতন অবতারের পূজা করিতে প্রস্তুত নহে। ইহাদের আভ্যন্তর জীবনটাই হইতেছে আমার কর্ম্মস্থল। ইহাদের আমি আলম্বন দিতে গিয়া প্রণব-মন্ত্র দিয়া যাইতেছি। প্রচলিত কোনও ধর্ম্মসাধন-বিধির প্রতি ইহা দ্রোহ নহে, প্রচলিত ধর্ম্মাচার্য্যদের জনসেবার অপূরিত অংশে ইহা আমার অতীব স্বাভাবিক অনুপূরণ মাত্র। যেখানে কেহই কিছু দিতে পারিতেছিলেন না, আমি সেখানে

খণ্ড মন্ত্র না দিয়া অখণ্ড মন্ত্র দিয়াছি। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা দিনের পর দিন কেবল বাড়িতেছে বলিয়াই মনে করা বড় ভ্রম যে, আমরা অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বিষ্ট। নিজমত নিজপথ প্রচার করিবার আগ্রহ যাহাদের নাই, দলে দলে লোক যদি তাহাদের মত ও পথ গ্রহণ করিবার জন্য দীক্ষার গৃহে ভিড় করে, তবে তাহাকে ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ বলিয়া কেন বর্ণনা করিতে হইবে? আগরতলায় একদিন চারি হাজার পঁচিশ জন লোক প্রণবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়াছিল। কেন নিয়াছিল? দীক্ষা নিবার জন্য আমরা তাহাদিগকে ডাকিয়াছিলাম কি?

দীক্ষা ব্যতীতও অনেক নরনারী আমাদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা-বশতঃ গৃহে গৃহে প্রণব-বিগ্রহ স্থাপন করিয়া পূজা করিতেছেন। তোমার ছাত্রীরাও হয়ত সেইরূপভাবেই ভক্তি-মতী হইয়াছে। তাহাদের কাহাকেও কখনও বলিতে যাইও না যে, আমরা প্রণবের মাধ্যমে ঈশ্বরোপাসনা করি বলিয়াই তাহাদেরও তাহাই করিতে হইবে। আমরা অনুবর্ত্তী চাহি না। আমরা চাহি স্ববিবেকপ্রবুদ্ধ জাগ্রত আত্মার স্বাধীন আত্মানু-সন্ধান। জগতের প্রতি জনে নিজের মত, নিজের পথ, নিজের রুচি ও নিজের সাধনা দিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া লউক।

(১৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫)

(৩২)

আপনার একটী কথায় বড় শঙ্কিত হইলাম। আধুনিক

বাংলার চারি পাঁচ জন বড় বড় সাধক ধর্ম্মগুরুর নাম আপনি করিয়াছেন, যাঁহারা আপনার শহরটীতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশে আকৃষ্ট হইয়া শত শত লোক তাঁহাদের শিষ্যও হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এত বড় বড় মহাপুরুষের শিষ্য হইবার পরেও স্থানীয় জনসাধারণের মন হইতে পাপাসক্তি, আচরণ হইতে অন্যায় ও দুর্নীতি দূর হয় নাই। কালো বাজারের ব্যাপারী দীক্ষা নিবার পর হইতে অধিকতর নিশ্চিন্তে নিজের কাজ-কারবার চালাইয়া যাইতেছে। কদর্য্য বিষয়ে আসক্ত পুরুষ-নারীরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেপরোয়া হইয়া পাপচেষ্টা করিতেছে। এমন জায়গায় আমাকে করিতেছেন আহ্বান? হয়ত আমার ধর্ম্মোপদেশেও আকৃষ্ট হইয়া দুই চারিজন আমার শিষ্য হইবে এবং হয় স্থানমাহাত্ম্যে, নয় কালমাহাত্ম্যে আপনার কথিত মহাপুরুষদের শিষ্যদেরই ন্যায় পূর্ব্বে যেমন ছিল, পরেও তেমনই থাকিয়া যাইবে! ইহাতে ত' কোনও লাভ হইবে না। চোর চোরই রহিল, ডাকাত ডাকাতই রহিল, লম্পট লম্পটই রহিল, গণিকা গণিকাই রহিল, কেবল নামাবলী আর ফোঁটা-তিলকে একটু অঙ্গ-শোভার পরিবর্ত্তন হইল, এইটুকুতে তুষ্ট থাকা ত' সম্ভব নহে। (২৭শে পৌষ, ১৩৬৫)

(৩৩)

ওখানে দীক্ষাদান-কালে আমি অন্যান্য স্থানেরই ন্যায় হুজুগাকৃষ্ট-দিগকে বাদ দিয়া কাজ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু

তবু মনে হয়, কেহ কেহ দীক্ষা পাইবার যোগ্য হইবার আগেই দীক্ষার ঘরে ঢুকিয়াছে। এরূপ ভবিষ্যতে আর না হয়, তাহার জন্য তোমাদের সচেষ্ট থাকা দরকার। আগে আমি দীক্ষার ঘর হইতে কত লোককে বাহির করিয়া দিয়াছি কিন্তু এখন তাহা সকল সময়ে পারি না। কিন্তু অকারণে বা সাধারণ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ দীক্ষার ঘরে না প্রবেশ করে, ইহা তোমাদেরই দেখা উচিত। আমার নিকট হইতে দীক্ষা নিবার জন্য তোমরা একটী প্রাণীকেও প্রণোদনা দিও না। কিন্তু দীক্ষিত-অদীক্ষিত-নির্ব্বিশেষে সকলকে আমার মুদ্রিত বাণীসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত কর। জগতের সকলে কখনো একই গুরুর শিষ্য হইতে পারেন না। বিধাতৃ-বিহিত বৈচিত্র্যের ইহা নিয়ম নহে। বনে চন্দনই থাকিবে, শাল থাকিবে না, খদিরই থাকিবে, পলাশ থাকিবে না, গাম্ভারীই থাকিবে, ধুপবৃক্ষ থাকিবে না, ভূর্জ্জই থাকিবে অগুরু-তরু থাকিবে না, সুপারিই থাকিবে, নারিকেল থাকিবে না, এমন কখনও হইতে পারে না। সমসাময়িক অপরাপর আচার্য্যেরা নিজ নিজ মত প্রচারের দ্বারা শত শত লোককে নিজের সাধন-পথে দীক্ষিত করিবেন, এই কথা স্বীকার করিয়া নিয়াই তোমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। তোমরা স্বদলবৃদ্ধির জন্য উৎসাহী হইও না, উৎসাহী হও নিজেদের আদর্শ প্রচারের কাজে। আমার বণিত বাক্যে, রচিত উপদেশে, লিখিত নির্দ্দেশে এবং আচরিত কর্ম্মে তোমাদের আদর্শ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে,

তোমাদের জীবনের আচরণে তাহা হউক দৃষ্টান্তীকৃত। এই উভয়বিধ প্রকরণে তোমরা আদর্শের প্রচার কর।

আমার মতে এমন কোনও ব্যক্তিকে দীক্ষার গৃহে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত নহে, আগে হইতেই যে নিজ ভাবী গুরুদেবের মত, পথ, জীবনাদর্শ, জীবন-যাপন-প্রণালী, কর্ম্ম-জীবন ও অনুশীলন সম্পর্কে সব কিছু জ্ঞাতব্য জানিয়া না নিয়াছে। তোমরা সেই দিকে বাবা নজর দাও। পৃথিবী অমনই জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে নূতন নূতন বাঘ, ভালুক, গণ্ডারের আমদানী দ্বারা তোমাদের সঙ্ঘ শক্তিশালী হইবে না। (১৪ই মাঘ, ১৩৬৫)

(৩৪)

আমি আগামীবার তোমাদের ওখানে যখন যাইব, তখন যেন দীক্ষার গৃহে এমন একটী লোক ও না ঢোকে, যে আমাদের চিন্তা ও আদর্শের সহিত আগেই পরিচয়-স্থাপন করে নাই। এই বিষয়ে প্রত্যেককে সতর্ক হইতে আমি নির্দ্দেশ দিতেছি। এই নির্দ্দেশ যেন অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়।

(৩রা মাঘ, ১৩৬৬)

(৩৫)

আমাকে তোমরা যদি অবতার-পুরুষ বলিয়া প্রচার করিবার সুযোগ পাইতে, তোমাদের তেমন কার্য্যে আমি যদি আমার সম্মতির স্বাক্ষর প্রদান করিতাম, তাহা হইলে আমার আদর্শবাদ

বা জীবন-ব্রতের কোনও পরিচয় ইহাদের প্রয়োজন পড়িত না। অবতারকে পূজা করিয়াই ইহারা নিজেদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতে পারিত। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রায় সর্ব্বত্র ইহাই ঘটিতেছে। হয় অত্যুগ্র সাম্প্রদায়িকতা, নতুবা সংঘনেতাকে অবতার বলিয়া প্রচারের সর্ব্বতোমুখ চেষ্টাই সাধারণতঃ বিভিন্ন ধর্ম্মসঙ্ঘের বিরাট বিস্তৃতির সর্ব্বপ্রধান কারণ-স্বরূপ হইতেছে। এই দুইটীর একটীরও প্রশ্রয় আমার নিকটে পাও নাই।

(১৬ই ফাল্গুন, ১৩৬৬)

(৩৬)

তুমি দীক্ষা পাইয়াছিলে কত আগে। তোমার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী তখন আমাকে চোখেও দেখে নাই। কিন্তু দূর হইতে নাম শুনিয়াই সে আমার আদর্শের মূল সত্যকে জানিতে পারিয়াছিল। দাম্পত্য-সংযম পালনে সে তোমাকে যে-পরিমাণ সহায়তা দিয়াছিল, তাহা অনেক সুদীক্ষিতা মেয়েদের ক্ষেত্রেও বিরল। এই পুণ্যবতীর স্মৃতি আমার হৃদয়ে চিরকাল জাগরূক থাকিবে।

দীক্ষার পর হইতে তোমার সহধর্ম্মিণী তোমাকে প্রতি পদে যে সহায়তা দিয়াছে, তাহা তোমার অশেষ সৌভাগ্যের সূচক। তাহাকে পত্নীরূপে পাইয়া তুমি ধন্য হইয়াছ, তাহাকে কন্যারূপে পাইয়া আমিও নিজেকে ধন্য জ্ঞান করি। তাহাকে আমি মৃত বলিয়া বিবেচনা করি না। দেদীপ্যমান আদর্শরূপে সে অমর

হইয়া রহিয়াছে। মর্ত্ত্যে আমি অমরাবতী সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলাম, তোমার সাধ্বী পত্নী সেই অমরাবতীর একটী সম্মানিতা দেবতা। তাহার পুণ্য অক্ষয়। তুমি শোক সংবরণ কর। (১৩ই চৈত্র, ১৩৬৬)

(৩৭)

তোমাদের জন্ম জগতের কল্যাণের জন্য। তোমাদের দীক্ষা জগতের কল্যাণের জন্য। জগন্মঙ্গল-সাধনের মধ্য দিয়াই হইবে তোমাদের জীবনের অগ্রগতি। এই অতি সহজ সরল সত্যটীকে একটী নিমেষের জন্যও ভুলিও না। তোমরা ভুলিতে চাহিলেও আমি তোমাদিগকে ভুলিতে দিব না। আমি অক্ষয় অনন্ত হইয়া চিরকাল তোমাদের প্রাণে প্রাণে এই প্রেরণাই জাগাইব। কোনও প্রকারে আহার-নিদ্রা-অপত্যোৎপাদনের ভিতর দিয়া গলিয়া বাহির হইবার নাম জীবন নয়, নিজেকে প্রতিপদে আদর্শানুগ রাখিয়া সর্ব্বজীব-হিতার্থে তিলে তিলে উৎসর্গ করিতে থাকারই নাম জীবন। তোমরা জীবন্ত হও, ইহাই আমার আশীর্ব্বাদ। (২৬শে চৈত্র, ১৩৬৬)

(৩৮)

তোমরা প্রতিজনে সাধন-ভজন করিয়া জীবনের মূল্য বাড়াইয়া লও। যে সাধন করে না, সে কেবল দীক্ষা নিলেই শিষ্য হয় না। গুরু হওয়াও যেমন জীবনের একটা বিরাট অবস্থা, শিষ্য হওয়াও জীবনের একটা তেমন গৌরব।

শিষ্য হওয়ার অর্থ কি ইহাই নহে যে, তুমি একটী মহান্ আদর্শের অনুগত হইয়া চলিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলে? শিষ্য হইবার ইহাই কি অর্থ নহে যে, তুমি তোমার জীবনে সেই আদর্শকে রূপবন্ত করিবার জন্য প্রাণপাতের প্রতিজ্ঞা করিলে? গুরু হওয়া কি শুধু কাণে মন্ত্র ফোঁকা? শিষ্য হওয়ার মানে কি শুধু কাণে মন্ত্র শোনা? গুরুরও জীবনে কর্ত্তব্য আছে, শিষ্যেরও জীবনে কর্ত্তব্য আছে। কর্ত্তব্য করিব না, অথচ মস্ত বড় একটা নামের লেবেল ললাটে আঁটিয়া লোকের চক্ষে চমক লাগাইব,— ইহা অধর্ম্ম। (৩০শে চৈত্র, ১৩৬৬)

(৩৯)

তোমরা তোমাদের অখণ্ড-দীক্ষা গ্রহণের পুর্ব্বে নিজ নিজ পারিবারিক বা প্রাতিবেশিক সংস্কারবশতঃ যে দেবতার নিকটে যে-কোনও কারণে যে মানসিকই করিয়া থাক, দীক্ষা গ্রহণের পরে তাহা পরিশোধের শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক রীতি হইতেছে একমাত্র সমবেত উপাসনা। তোমরা সমবেত উপাসনার শক্তিতে বিশ্বাস কর। তোমরা দীক্ষাপ্রাপ্ত নামের প্রতি পরিপুর্ণরূপে আস্থাশীল হও। দীক্ষা একটা নবজন্ম,— ছেলেখেলা নহে। দীক্ষা একটা রূপান্তর, প্রথামাত্র নহে। দীক্ষা একটা জীবনাদর্শের অত্যদ্ভুত পথপরিবর্ত্তন,— লোকাচার মাত্র নহে। তোমরা তোমাদের দীক্ষার উপরে অধিকতর আস্থাশীল হও। পুত্রের যাবতীয় মানসিক একমাত্র সমবেত উপাসনা দ্বারাই শোধ কর,—ইহাতেই

তোমার নববিবাহিত পুত্র ও পুত্রবধূর তথা তোমাদের সমগ্র পরিবারের পরমকুশল হইবে। (১৭ই বৈশাখ, ১৩৬৭)

(৪০)

আমি গুরু হইয়াছি বলিয়া এমন কিছু হইয়া যাই নাই যে, তোমরা আমাকে ভয় করিবে। তোমাদের দোষ, ত্রুটি, দুর্ব্বলতা—সব কিছু আমি সহজ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। আমার নিকটে সর্ব্বদা নিঃসঙ্কোচ হইও।

(২২ বৈশাখ, ১৩৬৭)

(৪১)

আশ্রমকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিতে গুরু ভাই-বোন্‌দের কাহাকেও অনুরোধ করিও না। গুরুশিষ্যের মধ্যে টাকাকড়িটা একটা বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হইলে গুরুর গুরুত্ব কমিয়া যায়, শিষ্যের শিষ্যত্ব নাশ হয়। গুরু যদি মনে করেন, "শিষ্যের নিকটে আমার ন্যায্য দাবী রহিয়াছে, কেন তাহারা আমাকে অর্থ দিবে না", তাহা হইলে তিনি নীতিভ্রষ্ট একটী সংসারী বদ্ধ জীবে পরিণত হন। শিষ্য যদি মনে করে, "গুরুকে কত অর্থ দিব, দিতে দিতে ত' সারা হইয়া গেলাম, আগে জানিলে এমন লোককে গুরু করিতাম না, তার চেয়ে আমাদের পেলারাম গোঁসাই অনেক ভাল ছিলেন",—তাহা হইলে শিষ্য মানুষের পর্য্যায় হইতে নামিয়া একটি ছুঁচো ইন্দুরে পরিণত হইয়া গেল। তুমি তোমার গুরুভাই-বোনদের কাছে গুরু-

দেবের আশ্রমের জন্য টাকার তাগাদা নিয়া যাইও না বাবা। পৃথিবীর কোনও বড় কাজই কেবল টাকার জোরে হয় নাই, আরও একটী জিনিষের প্রয়োজন আছে। তাহার নাম প্রেম।

প্রতিটি ভাইবোনের কাছে যাও। জিজ্ঞাসা কর, হুজুগে দীক্ষা নিয়াছিল কিনা। জিজ্ঞাসা কর, প্রত্যহ নিয়ম-মত উপাসনায় বসিবার চেষ্টা করে কিনা। জিজ্ঞাসা কর, সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাতে যোগদান করে কিনা। জিজ্ঞাসা কর, কেবল ভোজন আর ইন্দ্রিয়-সেবা ব্যতীত অন্য কোনও মহত্তর ও বৃহত্তর উদ্দেশ্যে সমগ্র দিনে বা রাত্রে কোনও শ্রম করে কিনা। জিজ্ঞাসা কর, চারিদিকে যে কোটি কোটি দীনদরিদ্র অশেষ ক্লেশে দিন-যাপন করিতেছে, তাহাদের জন্য কেহ একবারও একটু চিন্তা করে কিনা। তোমার গুরুভাই ও গুরু-বোনদের চিত্তে তাহাদের জীবনের তথা জীবন-যাপন-প্রণালীর সার্থকতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগরিত কর। (২২শে বৈশাখ, ১৩৬৭)

(৪২)

গুরুভাই বলিয়া পরিচয় দিয়া একজন একজনের কারবারে ঢুকিল এবং পরে সমস্ত ব্যবসায়টীকে একেবারে মাটি করিয়া দিয়া ভাগ্যান্বেষণে অন্য দিকে ছুটিল,—ইহা সঙ্ঘের মহিমাবর্দ্ধক নহে। অভিভাবকহীন বিবাহ-পাগল গুরুভাইয়ের জন্য পাত্রী সংগ্রহ করিয়া দিবে বলিয়া নানা মধু-ভাষণে তাহার টাকার থলির ওজন কমাইল, পরে অসৌহৃদ্য হইল,—ইহা

সঙ্ঘের পক্ষে মঙ্গলকর নহে। গুরুভাই গুরুভাইএর জন্য ত্যাগই করিবে, একে অপরকে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা পাইবে না,—ইহাই আদর্শ সঙ্ঘ। তোমাদের সঙ্ঘে কোথাও কোথাও "গুরুভ্রাতা" পরিচয়টীকে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিবার জন্য ব্যবহার করা হইতেছে। ইহা সঙ্ঘের গুরুতর অস্বাস্থ্যের লক্ষণ। ইহা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। (১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭)

(৪৩)

গুরুভক্তির বলে তোমরা সমদর্শী হও। গুরুতে যার নিষ্ঠা, সে গুরুভাইমাত্রকেই প্রাণের অধিক জ্ঞান করে। সামাজিক উচ্চ-নীচ-বোধ তাহার মন হইতে দূর হইয়া যায়। সে আপনা আপনি সমদর্শী হয়। (১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭)

(৪৪)

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তোমার একপরিবারভুক্ত এবং আত্মীয়েরা মিলিয়া সাত আট জনে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলে। দীক্ষাদান-কালে নির্দ্দেশ দিয়াছিলাম, তোমাদিগকে জগৎকল্যাণে রত থাকিতে হইবে, কেবল জগৎ-কল্যাণের সঙ্কল্প করিলেই চলিবে না। মানুষ দীক্ষালাভকালের উপদেশ ভোলে না, আশা করি তোমরাও ভোল নাই। সেদিন দ্বিশতাধিক দীক্ষার্থীর ভিড়েও আমি একথা বলিতে ভুলি নাই যে, তোমাদের যেন গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীর সংখ্যাবর্দ্ধনের দিকে রুচি না যায়, প্রত্যেকের রুচি যেন যায় সাধন করিয়া অপার বলসঞ্চয় করিবার দিকে।

আর একটী কথা বলিতেও ভুলি নাই যে, তোমাদের জীবন জগৎকল্যাণের জন্য এবং নিজেদের সাংসারিক সহস্র দুর্য্যোগ ও ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝেও সর্ব্বদা লোককল্যাণ-প্রয়াসের সহিত নিজেদিগকে যুক্ত রাখিতে হইবে। আজ পুনরায় সেই কথাগুলি বলিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। তোমরা দ্রুত সঙ্ঘবদ্ধ হও এবং চারিদিকে আত্মশুদ্ধির আন্দোলনকে বিপুলভাবে প্রসারিত করিবার কাজে হাত দাও। (২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭)

(৪৫)

তোমাকে আবার নূতন একটা মন্ত্রে দীক্ষা দিবার সাধ যেই মহাপুরুষের রহিয়াছে, তাঁহাকে সাধু পুরুষ মনে না করিয়া সাধারণ লোক বলিয়া জ্ঞান করিও এবং সাধারণ ব্যক্তির কথা যেমন বিচার করিয়া গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে হয়, তেমন করিও। লাল কাপড় পরিলে বা জটা-জূট রাখিলে কিম্বা অনেক শিষ্যের গুরু হইলেই কেহ মহাপুরুষ হইয়া যায় না। মহাপুরুষেরা কেন ব্রতধারী অপর ব্যক্তিদের ভাব-ভঙ্গ করিবেন, ইহা আমি বুঝিতে অক্ষম। যে সকল লোক অদীক্ষিত রহিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা জগতে কোটি কোটি। তাঁহারা তাহাদের মধ্যে গিয়া কাজ করুন না কেন? পূর্ব্বদীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ সাধককে আবার একটী মন্ত্র দিয়া দ্বিধায় ফেলিবার কোন্ সার্থকতা বা তাৎপর্য্য আছে? ওঙ্কার-মন্ত্র পাইবার পরেও অন্য মন্ত্র পাইবার আবশ্যকতা আছে, একথা বলিবে ত' নিতান্ত অজ্ঞান ব্যক্তি। তুমি যে

তোমার নিষ্ঠা হারাও নাই এবং বাক্‌পটু পুরুষের বাগ্‌জালে হতবুদ্ধি হও নাই, ইহাতে তোমাকে প্রশংসা করিতে হয়। বহু ব্যক্তির শাস্ত্রজ্ঞান ও বাগ্মিতা মানুষের বুদ্ধিভেদজননে প্রযুক্ত হইতেছে, ইহা সত্যই পরিতাপের বিষয়।

(৪ঠা আষাঢ়, ১৩৬৭)

(৪৬)

হরি মানে সব কিছু যিনি নিজেতে আহরণ করিয়া একত্র করিয়াছেন। হরিওঁ মানে সর্ব্বসমন্বয়কারী পবিত্র প্রণব। ওঁ মানে হাঁ। সুতরাং "হরিওঁ" কথার আর এক মানে "ঈশ্বর আছেন।" ওঁশ্রীগুরু মানে ওঙ্কারই শ্রীগুরু, ওঙ্কারই জ্ঞান দান করেন, অজ্ঞান-তিমির নাশ করেন, অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান, ওঙ্কারে আর মঙ্গলময় গুরুতে পার্থক্য নাই।

হরিওঁ লিখি বলিয়াই আমি প্রচলিত অর্থে বৈষ্ণব নহি, ওঁশ্রীগুরু লিখি বলিয়াই আমি প্রচলিত অর্থে গুরুবাদী নহি।

হাঁ, এখন হইতে ভাবিতেছি প্রতি পত্রেই ওঁশ্রীগুরুই লিখিব।

(১০ আষাঢ়, ১৩৬৭)

(৪৭)

দীক্ষা যেদিন নিতে আসিয়াছিলে, সেদিন হয়ত ধারণাই করিতে পার নাই যে, কি বিরাট সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় ঘটিল তোমার জীবন-গগনে। সাধন কর বাবা, সাধন কর। সাধন করিয়া দীক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে সমর্থ হও। তোমরা

নিয়াছ জগন্মঙ্গলের দীক্ষা, তোমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে জগতের সকলকে উন্নততম চিন্তাগুলির সহিত সুপরিচিত করিয়া দেওয়া। জ্ঞানদানই শ্রেষ্ঠ দান। তোমরা এক এক জনে এমন এক একটা বিরাট জ্ঞানের আধার হও, যেখান হইতে দিক্-বিদিকে অবিরাম জ্ঞান পরিবেশিত হইবে।

(২৮শে আষাঢ়, ১৩৬৭)

(৪৮)

তরুণ বয়সে দীক্ষা নিয়াছ। দীক্ষা নিবার উপযুক্ত বয়সেই ইহা নিয়াছ। বিবাহ কর নাই, সংসারের দুশ্চিন্তার বোঝা এখনো ঘাড়ের উপরে পড়ে নাই, জীবনের স্বাধীনতা আংশিক হইলেও আস্বাদন করিতে পারিতেছ। এই সময়ে দীক্ষাগ্রহণ একটী বড় রকমের সৌভাগ্য। মনটীকে সহস্র দিক হইতে টানিয়া আনিয়া এখন নিয়ত ভগবানের মঙ্গলমধুময় নামে লগ্ন করিয়া রাখিবার দিকে যত্ন নাও। এই বয়সে অল্প চেষ্টায় সকল আধ্যাত্মিক কার্য্য সুসিদ্ধ হয়। কারণ এই বয়সে উদ্যম থাকে অপরাহত, মন থাকে সহজাত একাগ্রতায় সমৃদ্ধ এবং আলস্য হয় স্বভাববিরুদ্ধ। পাপ, দুর্ব্বলতা ও মিথ্যা হইতে দূরে থাকিবার প্রয়াস এই বয়সেই সহজে সার্থক। তুমি ব্রহ্মচর্য্যের উপরে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য দিও। মনে রাখিও যতটুকু ব্রহ্মচর্য্য, ততটুকু বল ; যতটুকু বল, ততটুকু সাহস ; যতটুকু সাহস, ততটুকু সফলতা ; যতটুকু সাফল্য, ততটুকু

অগ্রগতি। বিফলতাও অনেক সময়ে অগ্রগতির সহায়তা করিয়া থাকে কিন্তু সফলতা অর্জ্জনের জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগে সর্ব্বদা তৎপর থাকিবে। (২৯শে আষাঢ়, ১৩৬৭)

(৪৯)

দীক্ষা নিয়াছ সাধন করিবার জন্য, কুলপ্রথা রক্ষার জন্য নহে। এই কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখিও।

কেহ হুজুগে দীক্ষা নিতে আসিলে তোমরা তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইও। দীক্ষার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য অবধান ও অবধারণ করিবার পরে দীক্ষার্থীরা দীক্ষা নিবে, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

তোমাদের অঞ্চলে যে কয়জন নবদীক্ষিত আছে, তাহারা প্রত্যেকে আমার পত্রখানা পাঠ করিও। দীক্ষিতের আচরণের দ্বারা যে দীক্ষাদাতাকে বিচার করা হয়, সেই কথাটী তোমরা কেহ সহজে ভুলিয়া যাইও না। আরও ভুলিও না যে, একাগ্র চিত্তে এবং বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে সাধন করিলে দীক্ষাদাতার অপরিমেয় সাধন-শক্তি দীক্ষিতের ভিতর দিয়া প্রকটিত হইয়া ওঠে।

স্বামি-স্ত্রী একসঙ্গে দীক্ষা নিয়াছ। তোমাদের দিব্য জীবনের অগ্রগতি বা ক্রমবিকাশ একসঙ্গে হউক।

(২৯শে আষাঢ়, ১৩৬৭)

(৫০)

তোমার এক বয়োজ্যেষ্ঠ, কর্ম্মজ্যেষ্ঠ এবং সাধনজ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতার সম্পর্কে এক ভ্রান্ত অভিযোগ করিয়া আমাকে পত্র

দিয়াছিলে বলিয়া আমার মনে হয়। অবিলম্বে তাহার সহিত মৈত্রীস্থাপন কর, এবং তাহার সম্পর্কে আমাকে ভুল সংবাদ দিয়া থাকিলে তাহার নিকটে বিনা দ্বিধায় ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া মনের সকল অমিল দূর করিয়া দাও।

তোমার যে দুই গুরুভ্রাতা তোমার প্রতি রাগ করিয়াছে বলিয়া তুমি অনুমান করিতেছ, হয় ত' তাহাদের রাগের সঙ্গত কারণ আছে। যাহা করিলে তাহাদের রাগ পড়িয়া যায়, তাহা কর। অতীতে এই সঙ্ঘের জন্য তাহারা অল্পাধিক ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করিয়াছে। সেদিন তুমি আস নাই। তাহাদের ন্যায় ত্যাগ বা শ্রম তুমি বা তোমরা অন্য কেহ করও নাই। তাহারা তোমার সীনিয়ার। সীনিয়ারদের সম্মান নাশ করিয়া চলিবার যে সর্ব্বনাশা রীতি দেশে চল হইয়াছে, আমি তাহা বরদাস্ত করিতে রাজি নহি।

দীক্ষা এবং বক্তৃতা হইবে কি না, জানিতে চাহিয়াছ। যেখানেই যাই, কীর্ত্তন-উপাসনাটি থাকাই আমি পছন্দ করি। শরীর অসুস্থ না থাকিলে জন-সাধারণের আগ্রহ দেখিলে ভাষণেও আপত্তি নাই। কিন্তু দীক্ষাদানসম্পর্কে আমি উৎসাহ বোধ করি না। কতকগুলি লোককে আন্দাজে দীক্ষা দিলেই কি কোনও লাভ হয়? আর আগে যাহারা আমার চিন্তা ও আদর্শের সহিত পরিচিত হইবে না, তাহারা দীক্ষা নিতে আসিলে হুজুগ ছাড়া আর কি কারণে আসিবে বল। হুজুগে

দীক্ষা নেওয়া ও দেওয়া দুইটাই খারাপ। দীক্ষা নিবার পরে যাহাদের একনিষ্ঠা থাকিবে না, তাহাদিগকে দীক্ষার ঘরে ঢুকানো কি উচিত? নিষ্ঠাহীন চলচ্চিত্ত শিষ্যের দল বাড়াইতে আমি আগ্রহী নহি। (৩১ ভাদ্র, ১৩৬৭)

(৫১)

মন্ত্র দিলাম, শিষ্য করিলাম, জীবনের মতন তোমাদিগকে আমার দাসত্বের নিগড়ে বাঁধিলাম, বর্ষে বর্ষে তোমাদের কাছ হইতে টাকার থলি উপহার লইলাম, আর খুশী হইয়া তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ-পত্র পাঠাইলাম, তোমাদের সঙ্গে আমার এইটুকুই সম্পর্ক নহে। আমি কি তোমাদের কাছে কোনও আদর্শ ধরিতে পারিয়াছি? আমি কি সত্যই তোমাদের জীবন-যাপন-প্রণালীর মধ্যে কোনও নূতন প্রেরণা, নূতন উদ্দীপনা, নূতন মূল্যায়ন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছি? আমি কি তোমাদিগকে অচলায়তনের প্রস্তরপুঞ্জ ভাঙ্গিয়া কারাগারের বাহিরে উন্মুক্ত দিবালোকে সাহস-সহকারে আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য কোনও পাথেয় দিতে পারিয়াছি? তোমরা আগে যাহা ছিলে, তাহা হইতে তোমাদের কোনও নূতনতর পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তন সাধন করিতে কি আমি পারিয়াছি? তোমাদের আজ আমাকে কঠোর ভাবে বিচার করিয়া দেখা দরকার। আমি যদি তোমাদের দ্বারা পূর্ণ সুখী হইতে না পারিয়া থাকি, তবে তাহা কি একা তোমাদেরই দোষ? আমার কি তাহাতে কোনও

দোষ নাই ? আমি চাহি, আজ তোমরা আমাকে অতিশয় তীক্ষ্ণভাবে বিচার কর, আমাকে আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া, আমি খাঁটি সোণা কি না, তাহার একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হও। (১৫ আশ্বিন, ১৩৬৭)

(৫২)

দীক্ষিত হইয়াও অনেকে সাধন করিতেছে না। ইহা যে কত বড় মূর্খতা, আর কত বড় ক্ষতি, অবোধ বলিয়া ইহা ইহাদের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। সংপ্রেরণা দিয়া ইহাদের প্রতিজনকে সাধনে উন্মুখ কর। নিজে সাধন কর, তাহা হইলে সকলে তোমার ইচ্ছার দাম দিবে, কথার মূল্য স্বীকার করিবে।

(১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৮)

(৫৩)

তোমাদের দীক্ষাগ্রহণ একটা তুচ্ছ ঘটনা নহে। ইহা একটা জাতির ইতিহাস-রচনা। তোমরা গতানুগতিক পথ আশ্রয় কর নাই। নবজীবনের তোমরা বার্ত্তা আনিয়াছ। নবযুগের তোমরা সৃষ্টি করিবে। নিজেদিগকে ছোট করিয়া হেয় করিয়া দেখিও না। (১লা কার্ত্তিক, ১৩৬৮)

(৫৪)

তুমি তোমার সহধর্ম্মিণীকে দীক্ষিতা করিবার জন্য এতদিন ধরিয়া অনুনয়-বিনয় করিতেছ। কিন্তু আমি কর্ণপাত করিবার অবসর পাই নাই। এখন হয়ত তাহার দীক্ষার সময় কাছাইয়া

আসিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, আমার ভাব ও আদর্শের সহিত তাহার পরিচয়টী তুমি স্থাপন করিয়াছ কি? না কি কেবল হাতের জল শুদ্ধ করিবার জন্যই দীক্ষাকার্য্যটী সারিতে চাহ?

এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় প্রতিটি দীক্ষার্থীই মনে মনে বিরক্ত হয়। ভাবে, বাবার কাছে দীক্ষা নিতে আসিলাম, তিনি দীক্ষাটী দিয়া দিবেন, অতিরিক্ত কথার প্রয়োজন কি?

দীক্ষাদান যেখানে ব্যবসায়, দীক্ষাদানের উদ্দেশ্য যেখানে কেবল শিষ্য-সংগ্রহ, শিষ্য-সংগ্রহের অর্থ যেখানে অন্ধবৎ নীয়মান একদল বশংবদ ক্রীতদাসের সৃষ্টি, সেখানে এই প্রশ্নের কোনও ক্ষেত্র নাই। কিন্তু দীক্ষাদান যেখানে দীক্ষিতের প্রকৃত উদ্ধার, দেশের কল্যাণ, জাতির উন্নতি ও জগতের মঙ্গল, দীক্ষাদান যেখানে উন্নততর জীবনে আরোহণের সুনির্দ্দিষ্ট ও সুনির্ভর-যোগ্য সোপান, সেখানে এই প্রশ্নের যথেষ্ট অবসর আছে। তাই আমি এই প্রশ্ন করিতেছি।

জমি না চষিয়া বীজ বুনিলে কি গাছ হয়? বটের বীজে হয়। কিন্তু সকল অবস্থাতেই চষিয়া নিলে বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয়। যাহারা নামকে-ওয়াস্তে দীক্ষা নেয়, তাহাদের জমি চষিবার দায় নাই, অন্যের আছে।

দীক্ষা নিবার পরে জীবনকে আদর্শানুগ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এই জন্যই দীক্ষা নিবার আগে আদর্শের সহিত

অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপন করা আবশ্যক। কথাটাকে মূল্যহীন জ্ঞান করিও না।

আমি সুবৃহৎ এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, এই কথা দ্বারা আমার পরিচয় হউক, এই কামনা আমি করি না। আমার সংস্পর্শে আসিয়া অসংখ্য মানব-মানবী জীবনকে অবনত হইতে উন্নত, অনাদৃত হইতে সমাদৃত, ব্যর্থতার বেদনা হইতে সার্থকতার আনন্দে আরোপিত করিয়াছে, একথা সত্য হইয়া উঠিলে তাহাই আমার গৌরব। তোমরা শিষ্য হইতে চাহ, সাধক হইতে চাহ না, দল বাড়াইতে চাহ, বলের দিকে লক্ষ্য নাই, ইহা আমার নিকটে এক পরম অসহনীয় দুঃখ হইয়াই কি চিরকাল থাকিবে ?

আদর্শের আহ্বানে যাহারা দীক্ষা নেয়, আদর্শকে জানিয়া ও বুঝিয়া যাহারা শিষ্য হয়, জীবনে কখনো তাহাদের নিষ্ঠাচ্যুতি ঘটে না। তোমরা একথা কখনও ভুলিও না যে, বরং কখনও দীক্ষা নিবে না, বরং কাহারও শিষ্য হইবে না, তবু যেন নিষ্ঠাহীন সাধকের জীবন যাপন করিয়া ধর্ম্মের কেবল অভিনয় করিতে না হয়। সাধনেই বল বাড়ে, ভাণে নহে। সাধনেই প্রেম জন্মে, ভাণে নহে। সাধনেই ত্যাগের শক্তি আসে, ভাণে নহে। সাধনেই আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধা আসে, আত্মবল আর ব্রহ্মবল অভেদ অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয়, ভাণে নহে।

(১৩ কার্ত্তিক, ১৩৬৮)

(৫৫)

দীক্ষা নিয়াছ বলিয়াই তুমি শিষ্য হইয়াছ? না, তাহা হও নাই। যে উদ্দেশ্যে দীক্ষা নিয়াছ, যে উদ্দেশ্যে দীক্ষা দিয়াছি, তাহার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছ কি? তাহা করিলে তুমি শিষ্য, নতুবা "শিষ্য" কথাটা একটা অর্থহীন শব্দ মাত্র।

এদেশে লোকে গুরু করে নরপূজা করিবার জন্য, শিষ্য করে নিজে পূজিত হইবার জন্য। সেই প্রথার সহিত আমার কোনও সংস্পর্শ, সংশ্রব, সহানুভূতি বা সমর্থন নাই। তোমরা আমাকে গুরু করিয়াছ, আমাকে পূজা করার চাইতে মহত্তর কিছু করিবার জন্য, আমি তোমাদের শিষ্য করিয়াছি নিজে পূজিত হওয়ার চাইতেও বড় কিছু পাইবার আশায়। তোমরা আসল লক্ষ্য ভুলিয়া যাইও না। বহু শতাব্দী ধরিয়াই এ দেশে লক্ষ্য অপেক্ষা উপলক্ষ্য বড় হইয়া আসিতেছে। আমি সেই গতানুগতিকের অনুবর্ত্তনে উৎসাহীও নহি, ইচ্ছুকও নহি।

আরও ত' কত লোকপূজ্য গুরু তোমার দীক্ষাকালে জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের কাহারো কাহারো শিষ্যসংখ্যা আমার শিষ্যকুলের সংখ্যাপেক্ষা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ বেশী। তাঁহাদের অনেকের শিষ্যদের মধ্যে কত জজ, ব্যারিষ্টার, ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন, কত লক্ষপতি, ক্রোড়পতি রহিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ আমার অপেক্ষা হয়ত পঞ্চাশখানা বেশী

বই লিখিয়াছেন। তাঁহাদের কেহ কেহ এমন সব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, যেই সকল শাস্ত্রে আমি একটী বিস্ময়-বিমুগ্ধ দ্বারপাল মাত্র। তাঁহাদের যে-কাহারও নিকটে গিয়া তুমি দীক্ষা নিতে পারিতে। সেই সুযোগ তোমার ছিল। তোমার পিতৃদেব নিজে তাঁহাদের মধ্যে এক জনের দীক্ষাগৃহে তোমাকে জোর করিয়া ঢুকাইতে গিয়াছিলেন। তবু তুমি ছুটিয়া আসিয়াছিলে আমারই নিকট। কেহ সেদিন আমাকে চিনিত না, আমার কোনও স্থায়ী আশ্রম ছিল না, আমার ভাষণমঞ্চের বাগ্মিতার সেদিন প্রকাশ ঘটে নাই, একখানা ছিন্ন কম্বল আমার একমাত্র সম্পত্তি ছিল, একটী লোককে উপহার দিবার আমার সামর্থ্য ছিল না, তবু তুমি আমারই কাছে আসিয়াছিলে। এমন আরও সহস্র সহস্র আসিয়াছে এবং আসিবে। কিন্তু কি জন্য তোমাদের এই আসা, তাহা নিজেদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিও না।

তোমার ভিতরে ব্রহ্ম জাগুক, তবে ত' তোমাকে শিষ্য ভাবিয়া আমার গৌরব। তোমার জীবন জগতের কল্যাণে লাগুক, তবে ত' তোমার পিঠে লোকে আমার পাঞ্জা দেখিতে পাইবে! তোমার জীবনে শুচিতা, তোমার রুচিতে পবিত্রতা, তোমার কর্ম্মে প্রাণ, তোমার প্রাণে উদ্যম, উৎসাহ ও অপরাজেয় নিষ্ঠা জাগুক, তবে ত' তুমি আমার শিষ্য হইবে।

(১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬৮)

(৫৬)

যে শিষ্য হইবে, সে দীক্ষার পর হইতে আমৃত্যু নিষ্ঠায় তাঁহার প্রদর্শিত পন্থায় চলিবার জন্য মনে প্রাণে প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে কিনা, এই একটী প্রশ্নের সদুত্তরের উপরেই দীক্ষা-দাতার গুরু হইবার যোগ্যতা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে।

দলে দলে দীক্ষা নিতেছ, সাধন করিতেছ না, অথবা সাধনে একটু রুচি আসিবার পরেই সামান্য লোকপ্রিয়তা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে উপাসনার প্রণালী-মধ্যে নিজের মনগড়া নূতনত্ব সংযোজন করিয়া অপর সতীর্থদের মধ্যে সংশয়, সন্দেহ, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, তর্ক ও কলহ সৃষ্টি করিতেছ, সাধন-কর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে গুরুবাক্যানুসৃত না রাখিয়া তাহার মধ্যে নিজের ব্যক্তিগত রুচি, সংস্কার ও প্রবর্ত্তনকে সংযোজিত করিতেছ—এভাবে আমার কত শিষ্য যে নিজেদের শক্তির প্রকাশকে, বিভূতির বিস্তারকে, মিলন-রুচির বিকাশকে ব্যাহত করিতেছে, বলিবার নহে। এই কারণেই আমি শিষ্যসংখ্যাবর্দ্ধনকে আনন্দ সহকারে অভিনন্দন দিতে পারিতেছি না।

দীক্ষাগ্রহণ এক নূতন জন্মলাভ, এক নবজীবনের সঞ্জীবন। দীক্ষা এক অভূতপূর্ব্ব রূপান্তর। ইহা হুজুগে হয় না। ইহার জন্যও সুদীর্ঘকালব্যাপী সাধনা চাই। দীক্ষার পরেও যেমন সাধন করিতে হয়, দীক্ষা পাইবার পূর্ব্বেও তেমন। সেই সাধনা বড় কঠোর সাধনা। সহস্র প্রশ্নের আর সহস্র সমস্যার

মধ্য দিয়া সেই সাধনা করিয়া লও, তবে ত' বাবা দীক্ষা নিবে !

আমি তোমাদিগকে নিরুৎসাহ করিতে চাহি না। কিন্তু তোমাদের কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দেওয়াও আমার কর্ত্তব্য।

(২৬শে পৌষ, ১৩৬৮)

(৫৭)

তোমার পত্র পাইয়া হাসিলাম। জনৈক মহাপুরুষ নিজ অলৌকিক শক্তির প্রচার করিয়া কয়েকদিনে তোমাদের ওখানে দুই হাজার শিষ্য করিয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমি বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন হই নাই। আগরতলাতে আমি কি একমাত্র একদিনে চারি হাজার পঁচিশ জনকে দীক্ষা দেই নাই ? আমার রেকর্ড ইনি ব্রেক্ করিতে পারেন নাই। অথচ আমার কোনও অলৌকিক শক্তি নাই, আমার অলৌকিকতাকে প্রচার করিবার কোনও অধিকার তোমাদের দেই নাই। তবে কেন অত ঘাবড়াইয়া যাইতেছ ?

আমার শরীর মরিয়া যাইবার অনেক পরেও আমি বাঁচিয়া থাকিব। এ বাঁচা আদর্শের বাঁচা। আমার একটা আদর্শ আছে, যাহার সম্পর্কে আমারই রচিত ইংরাজি কবিতায় আমি একদা বলিয়াছি,—

Ages shall proclaim the name
For long and worthy years.

আদর্শবাদী কি কখনো শিষ্য-সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য ব্যাকুল হয় ? আমি হই না। তোমাদের সহরে একজন মহাপুরুষ আসিয়া মাত্র দুই হাজার লোককে কেন দীক্ষিত করিলেন, মোট জনসংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশ হাজারকেও কেন ভগবানের নামে দীক্ষিত করিয়া গেলেন না, আমার বরং ইহাই আফশোষ। আমার যাহারা শিষ্য হইবে তাহারা ত' আমার জন্য প্রয়োজন হইলে এক শতাব্দী কাল শবরীর প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে। আমার যাহারা আপন, তাহারা আমার বুকে আসিবে। হউক না তাহারা সংখ্যায় কম, তাহাতে ক্ষতিটা কোথায় ?

ভদ্রলোকের দীক্ষার রীতিটা তোমার পছন্দ হয় নাই। সকলের দীক্ষাদানের রীতিই কখনো এক হইতে পারে না। পরের ব্যাপার নিয়া মাথা ঘামাইও না! তুমি কাহাকেও দীক্ষা দিলে, ইহাই বড় কথা নহে। সাধন করিবে, এই সঙ্কল্প নিয়া কেহ দীক্ষা নিল, এইটাই বড় কথা। এই জন্যই আমি সর্ব্বদা বলিয়া থাকি যে, "শিষ্য চাহি না, সাধক চাহি।" আমার কাছে মন্ত্র নিয়া যে আমাকে মানে না, কিন্তু সত্য সত্য সাধন করে, তাহাকেও আমি যথার্থ ই প্রিয় মনে করি।

কোনও মহাপুরুষের আপাত-প্রতিষ্ঠা দেখিয়া চঞ্চল হইও না। সকল মহাপুরুষের ভিতর দিয়া আমিই কাজ করিয়া যাইতেছি।

শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে আমার এই কথা বিশ্বাস কর এবং সকলের সম্প্রদায়-বৃদ্ধিকেই তোমার নিজের বৃদ্ধি বলিয়া জ্ঞান কর। অখণ্ড বলিয়া যে পরিচয় দিবে, তাহার দৃষ্টিকোণ এইরূপ হওয়া প্রয়োজন।

সংঘ, সম্প্রদায়, মহাপুরুষ, শিষ্যদল ইহারা কেহই জগতে থাকিবে না,—থাকিবে অবিনশ্বর হইয়া আদর্শ। আমরা যতক্ষণ আদর্শে নিষ্ঠা লইয়া আছি, ততক্ষণ আমাদিগকে পরাজিত করিতে পারে কে? (১৩ই মাঘ, ১৩৬৮)

(৫৮)

তোমাদের ওখানে একটী দম্পতী অন্যত্র দীক্ষা নিয়া তোমাদের সাধন-গোষ্ঠী পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া তাহাদের উপরে বিরক্ত হইও না। আমি স্বাধীনতা-দাতা গুরু, কেহ স্বেচ্ছায় না আসিলে ডাকিয়া কাছে আনি না, কেহ অন্যত্র চলিয়া গেলে জোর করিয়া টানিয়া ধরিয়া রাখি না। এই বিষয়ে আমার এই নিঃস্পৃহতা আমার কতখানি বলের ফল, তাহা একদা তোমরা বুঝিবে। আমি দুর্ব্বল গুরু নহি।

দীক্ষার ঘরে কেহ ঢুকিতে চাহিলে তোমাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইল ভাবিয়া কখনো তোমরা উৎফুল্ল হইও না। দীক্ষাগৃহে প্রবেশাধিকার মাত্র তাহারই হওয়া উচিত, আমার চিন্তা ও সাধনার সহিত পূর্ব্বেই যে গভীর ভাবে পরিচয়-স্থাপন করিয়াছে। এই অতীব আবশ্যকীয় কাজটী না করিয়া যাহারা

দীক্ষা নেয়, তাহাদের কাহারো দেশে দেশে ঘুরিয়া গুরু চাখিবার ক্ষতিপ্রদ প্রবৃত্তি দেখা যায়। তাহাদের উপকারার্থেই তোমাদের এই বিষয়ে একটু কড়া হওয়া প্রয়োজন। দুনিয়ার সকল লোক আমার অনুবর্ত্তী হইল না বলিয়া আফশোষের কি কিছু আছে? (১৬ই ফাল্গুন, ১৩৬৮)

(৫৯)

আমার নিকটে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, পারসী, সকলেই সমান এবং ইহাদের যে যেখান হইতে যখন আর্ত্ত হইয়া আসে, আমি তাহাকে মহানামে নিঃসঙ্কোচে দীক্ষা দিয়া থাকি। আমার নিকট হইতে দীক্ষা নিয়া কেহই নিজ সমাজ হইতে চ্যুত হয় না। আমার অখণ্ডধর্ম্মে সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই যথাযোগ্য স্থান আছে। এমনকি আমার নিকটে দীক্ষিত না হইলেও অহিন্দু আমার নিকটে অনাদরণীয় নহে। তবে, প্রত্যেককে কতকগুলি সদাচার মানিতে হয়। আমি চাহি, হিন্দু খাঁটি হিন্দু হউক, মুসলমান খাঁটি মুসলমান হউক, খৃষ্টান খাঁটি খৃষ্টান হউক,—এক কথায় সকলেই প্রকৃত মানুষ হউক, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর হউক।

(১৬ই ফাল্গুন, ১৩৬৮)

(৬০)

প্রচলিত গুরুবাদ সম্পর্কে আমার অনুভূতি ও মতামত সুস্পষ্ট। তথাপি একথা আমি অনুভব করিয়া থাকি যে,

আমার দীক্ষিত শিষ্যগণের পক্ষে তাহাদের সান্নিধ্যে আমার নিত্য উপস্থিতি উপলব্ধি সুগভীর সাধনের উৎকর্ষ-বিধায়ক। আমি আমার শিষ্যকে আমাকে বর্জ্জনের অধিকারও দিয়াছি কিন্তু যেই ব্যক্তি সাধন করিবে আমার প্রণালী লইয়া, তাহার পক্ষে এই সাধনের অনুশীলনকালে আমার উপস্থিতি চিন্তা করা লাভ-জনক। আমি সেই গুরুদেব নহি, যিনি নিজের পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য শিষ্য করেন, যিনি নিজেকে পূজিত হইতে দেখিতে ভালবাসেন। তবু, আমার যাঁহারা দীক্ষিত, তাঁহারা সাধনের কোনও একটা ক্রমে একটীবারের জন্যই তাঁহাদের দুরন্ত শ্রমের বৈঠা ঠেলার কালে আমার উপস্থিতি উপলব্ধি করিয়া নবতর বললাভ করিবেন, ইহার প্রয়োজন আছে। যাহার প্রয়োজন নাই, যে প্রয়োজন নাই বলিয়া স্পষ্ট অনুভব করিয়াছে, সে ইহাও বর্জ্জন করুক। ক্ষতি কি? তুমি আমার স্মৃতিটি পর্য্যন্ত মন হইতে তুলিয়া নাও, সে স্বাধীনতা আমি তোমাকে দিয়াছি। অবতার বলিয়া যাঁহারা পূজিত হইতে চাহেন কিন্তু সাহস পান না বলিয়া মুখ ফুটিয়া কথাটা বলেন না, অবতার বলিয়া যাঁহারা পূজা চাহেন এবং তজ্জন্য যতপ্রকারের প্রচারশৈলীর সহায়তা নেওয়া সম্ভব, প্রাণপণে নিতেছেন, অবতার বলিয়া যাঁহারা পূজিত হইয়া গিয়াছেন এবং নিজেদের অবতারত্ব কোটিকল্পেও কেহ অস্বীকার করিতে না পারে, তার ব্যবস্থায় যত্নশীল, আমি তাঁহাদের থাকের নহি। তোমার, তোমার দেশবাসীর, এই যুগের বা পরবর্ত্তী

যুগের কোনও মানুষের পূজা আমার কাম্য নহে। এই কারণেই শিষ্যকে আমি দাসত্বের শৃঙ্খল পরাই নাই। এই জন্যই তাহার স্বাধীনতায় আমার আনন্দ। তাহার স্বাধীনতা তাহাকে যদি আমাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে প্রেরণা দেয়, তবে সরল ভাবে নিঃসঙ্কোচে সে তাহা করুক। ইহাতে বাধা কোথায় ? ইহাতে আমার আপত্তি থাকিবে কেন ?

আমার জীবনে অলৌকিকত্ব নাই, একথা বলিলে মিথ্যা বলিব। কিন্তু কাহার জীবনে অলৌকিকত্ব নাই ? মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনে ঘন্টায় ঘন্টায় অলৌকিক ঘটনা ঘটিত। তিনি প্রচার করিতে নিষেধ করিতেন। আমি এই বিষয়ে গোস্বামী মহাশয়ের অনুগামী। অলৌকিক ঘটনা প্রচারে কোনও লাভ নাই। বরং লৌকিক জীবনে কে কতটা অসাধারণ, তাহা দিয়াই তাহার মূল্য-নির্দ্ধারণ সঙ্গত। তবু যদি কোথাও আমার সম্পর্কে অলৌকিক কিছু জানিয়া থাক, তবে জানিও, আমার অলৌকিকত্ব-প্রচার তাহার উদ্দেশ্য নহে, অন্য কাহারও মহিমাকে প্রচার করাই তাহার উদ্দেশ্য। মূলে ভুল বুঝিয়া অকারণে মনে করিতেছ যে, অমুকে কেন আমার আশীর্ব্বাদে পরীক্ষায় পাশ করে না, তমুকে কেন আমার আশীর্ব্বাদে ভাল চাকুরী পায় না। আমার অন্তর্য্যামিত্ব অমুককে পরীক্ষায় পাশ করিয়া দেওয়ার জন্য আর তমুকের বিবাহের যোগ্য পাত্রী সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য ব্যয় করিতে হইবে, এই সকল ধারণাই বা

তোমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে আসে কি করিয়া, আমি বুঝিতে পারি না।

অন্তর্য্যামিত্বই বল আর অলৌকিক শক্তিই বল, কিছুই কিছু নহে, যদি প্রাণভরা না থাকে প্রেম। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীরা নিজ নিজ শক্তি কুকার্য্যে, হেয় কর্ম্মে, নীচ চেষ্টায় প্রয়োগ করিয়া বেড়াইতেছেন। অলৌকিকত্বই যদি দেবত্ব হইত, তবে তাঁহারা তাহা পারিতেন না। প্রেমই দেবত্ব। আমি সেই প্রেমেরই পিপাসু। আশ্রমে দেখা করিতে আসিলে আমি কাজের চাপে দুই ঘন্টা গল্প করিবার অবসর করিতে পারি না, ইহা হইতেই স্থির করিয়া নিও না যে, আমি প্রেমহীন। প্রেমকে যাচাই করার কষ্টিপাথর এক আলাদা বস্তু। সোণা গালাইবার যেই মৃৎপাত্রটিতে তীব্র অগ্নিতাপে আমার হৃৎপিণ্ড অবিরাম গলিতেছে আর টগ্‌বগ্‌ করিয়া আবর্ত্তিত হইতেছে, সেই মাটির খোরার জ্বলন্ত গর্ভে যখন আমার হৃদয়টীর ঠিক পাশে আনিয়া তোমার নিজের হৃদয়টীকে ফেলিতে পারিবে, সেই দিন বুঝিবে, এই হৃদয়ের প্রেমের উত্তাপ কত। তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, এই পৃথিবীর বা পরলোকের কোনও স্বার্থকে সিদ্ধ করিবার জন্য আমি নির্ব্বিচারে বিনা দ্বিধায় যাকে তাকে দীক্ষার ঘরে ঢুকিতে দিতেছি? আমার আততায়ীকেও আমি ক্ষমা করিয়া দীক্ষা দিয়াছি, এই কথা কি তোমরা জান? আমাকে বিষপ্রয়োগ যে করিয়াছে, তাহাকেও জানিয়া শুনিয়া

দীক্ষা দিয়াছি, এ খবর কি রাখ? স্বার্থের বাটখারা দিয়া আমার প্রেমকে ওজন করিতে চাহিলে ফের ভাঙ্গিবার জন্য অনেক রকমের অদ্ভুত মতবাদ ও যুক্তির আমদানী করিতে হয়। সুতরাং নিজের যুক্তিকেও বিচার করিয়া চলিও। তাহাতে লাভবান্ হইবে। (১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৯)

(৬১)

বেচারী ন—দীক্ষার জন্য আসিয়াছিল। একবার পাঁঠা-বলি হইয়া গিয়াছে, আবার খড়্গ ধরিতে ইচ্ছা হইল না। তবে, তীব্র আগ্রহ দেখিলে তাহার বাসনার অবশ্যই পূরণ করিব। পুনরায় আমার নিকট তাহাকে দীক্ষা নিবার জন্য অত্যাগ্রহী না করিয়া আমার সম্পূর্ণ আদর্শের সহিত তাহাকে পরিচিত হইবার জন্য প্রেরণা দিতে থাক। যেই গুরুর সে পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, তাঁহার সম্পর্কে বর্ত্তমানে সে যে ধারণা পোষণ করিতেছে, সেই ধারণাই তাহার থাকিয়া গেলে ঐ আশ্রম তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে। তবে, আমরা যেন তাহার এই পরিণতির কারণস্বরূপ না হই। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার নিকটে আসিয়া যাইবে; ইহা আমি নিশ্চিত জানি বলিয়াই ত' কাহারও শিষ্য-সংখ্যা-বর্দ্ধনে মোটেই ঈর্ষ্যান্বিত হই না, উদ্বিগ্ন হওয়া দূরের কথা। তোমরা মহাপুরুষ নামে পূজিত এই সকল ভদ্রলোকদের নিন্দায় যোগ দিও না। প্রেম আমাদের সাধনা। সকলের প্রতি যেন সর্ব্বাবস্থায় প্রেম রাখিতে পারি

অটুট, তাহাই হইবে আমাদের চেষ্টা। বিদ্বেষ নহে, প্রেমই আমাদের শ্রীবৃদ্ধির মূলমন্ত্র।

শুনিয়া অবাক হইলাম যে, ইনি নাকি শিষ্যদের দ্বারা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, ইনি আমার গুরুদেব। এইরূপ উপহাস্য উক্তিতে কর্ণপাত করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। কে কার গুরু, একথা কি বিজ্ঞাপনের জোরে প্রমাণিত হইবে? আমার গুরু বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের চেষ্টা ইহার আগে আরও কয়েক জনে করিয়াছেন। প্রতিবাদ করিয়া ইঁহাদের কৌলীণ্য বাড়াইব? মহাকাল জটার আঘাতে একে একে ইঁহাদের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। এই সকল তুচ্ছ ব্যাপারের দিকে তোমরা নজরই দিও না। তোমরা তোমাদের আদর্শকে ধরিয়া রাখ। সেই আদর্শ নরপূজা-প্রবর্ত্তনের আদর্শ নহে। সে আদর্শ প্রত্যেক মানুষের ভিতরে ব্রহ্মত্ব স্ফুরণের। আমরা একজনেও যেন সেই আদর্শ হইতে স্খলিত না হই। আমি যে আমার পূজা চাহি না, এই কথাটা বিশ্বাস করিও। আমি যাহার পূজা চাহি, তোমরাও তাঁহারই পূজক হও। তোমাদের এই মহাপূজার আয়োজনে আমি তোমাদের নিত্যসঙ্গী থাকিব। অন্যান্য গুরুদেবেরা নিজেদিগকে পূজার আসনে বসাইয়াছেন,—আমি অনন্ত কাল তোমাদের সমসাধক হইয়া থাকিব। কোনও অবতার বা সাক্ষাৎ ভগবানের চেয়ে আমি ছোট হইয়া যাইতেছি, মনে করিও না। অবতারবাদের সস্তা মাধুরীতে তোমরা মজিও

না। তোমরা প্রত্যেকেই যে ঈশ্বরের অবতার, এই বার্ত্তা শুনাইতেই আমি আসিয়াছি। আমি আসিয়াছি প্রাণভরা প্রেম লইয়া। এই জন্যই আমার লয় নাই, ক্ষয় নাই, পরাজয় নাই। (১৫ই আষাঢ়, ১৩৬৭)

(৬২)

আমার কাছেই তুমি দীক্ষা নিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলে কিন্তু কারণাধীনে অন্যত্র দীক্ষা নেওয়া হইয়া গেল। সেই দীক্ষায় তুমি মনোনিবেশ করিতে পারিতেছ না বলিয়া অন্তরের ক্লেশ প্রকাশ করিয়াছ। আমি বলি কি, তোমার দীক্ষাদাতা যাহাই হইয়া থাকুন, তাঁর দেওয়া নাম তুমি জপিয়া যাইতে থাক। পরে যাহা হয় হইবে। একজনের নিকটে দীক্ষা নিতে হইলে আগে তাঁহাকে চূড়ান্ত ভাবে জানিয়া নিতে হয়। তোমার আধ্যাত্মিক আপদুদ্ধারের জন্য আমাকেই যদি ক্ষেত্রে নামিতে হয়, তবে তার আগে তোমার কর্ত্তব্য আমাকে বার-বার শতবার যাচাই করিয়া নেওয়া। আমি অন্ধ গুরু হইতে চাহি না, অন্ধের গুরুও হইতে চাহি না। খোলা চখে দেখিয়া, সব জানিয়া-বুঝিয়া আমার শিষ্য হইবে। তবেই তোমার-আমার উভয়ের আশা-পূরণ হইবে। গুরু শিষ্য করিয়া, শিষ্যের ভিতরে প্রভূত উন্নতি দেখিবার আশা করেন। শিষ্য গুরু করিয়া, গুরু-প্রদর্শিত পথে নিজের পরম কল্যাণ প্রত্যাশা করেন। দুজনেরই আশা পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

তোমাদের অঞ্চলে যিনি নিজেকে আমার পর্য্যন্ত গুরুদেব বলিয়া প্রচার করাইয়া যাইতেছেন, তিনি তখন নিকটবর্ত্তী একটী স্কুলে চতুর্থ বা পঞ্চম মানের ছাত্র ছিলেন, তখন আমি রহিমপুরে পঁয়ত্রিশ হাজার নর-নারীকে লইয়া হরিনামের প্রেমানন্দে "ধরণী উত্তাল" করিতেছি। কিন্তু ছলনায় ভুলিয়া ইঁহারই নিকটে মন্ত্র লইয়াছ। বেশ করিয়াছ। ইনি নিজে ভাল বা মন্দ যাহাই হউন, ইঁহার দেওয়া মন্ত্র ত' ভগবানেরই নাম, যিনি নিত্য শাশ্বতরূপ ও অপাপবিদ্ধ। মানুষ সৎ বা অসৎ সবই হইতে পারে কিন্তু ভগবানের নাম কখনও অসৎ হয় না। নামকে সার জানিয়া তাহা জপিতে থাক। নামের গুণেই পরবর্ত্তী জীবন ধাপের পর ধাপ সুমঙ্গলময় হইয়া যাইবে।

এখানে আসিয়া আমার সঙ্গে বাস করিতে করিতে দেখিবে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার কোনও পার্থক্য নাই। প্রিয়জনের রসনা কখনও কখনও অলৌকিক ঘটনার বিলাপ এবং আমার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার প্রলাপ রটনা করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহার সহিত আমার সত্য মূর্ত্তি ও স্বরূপের কোনও সম্বন্ধই নাই। মানুষ আমাকে সাধারণ মানুষ জানিয়া সন্নিহিত হউক, ইহার অধিক কামনা আমার আর কিছুই নাই। আর, সকলের সঙ্গে সমান হইয়া মিশিবার যে আনন্দ, তাহাও আমার মতে তুলনাহীন। যাহারা গুরু খুঁজিতে আসিয়া মনের মতন একটী পূজার বিগ্রহই মাত্র খোঁজে, আমার কাছে আসিয়া তাহারা

ঠকিবে। দেখিবে, আমি এই পরিণত বয়সেও কোদাল দিয়া মাটি উল্‌টাই, কুড়াল দিয়া কাঠ ফাড়ি, গাইত দিয়া কাঁকর কাটি, শাবল আর ঘানা দিয়া পাথর ভাঙ্গি, লাঙ্গল দিয়া চাষ করি। যোগ-বিভূতির চর্চ্চায় খেয়াল না দিয়া আমি শূন্য মাঠে দুটা ফলের গাছ পুতিবার জন্য ছুটিয়া যাই সুদূর গ্রামে, শস্যের বীজ বিতরণের জন্য ঘুরিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে। আমার কারবার এই সংসারের সংসারী লোকদের সুখ-দুঃখ নিয়া। পেট ভরিয়া তাহারা আগে দুমুঠা খাইবে, আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া পত্নীর জন্য পরিধানের শাড়ী সংগ্রহ করিবে, তারপরে ভূমার দিকে ছুটিবে। পৃথিবীর মাটিকে একেবারেই যাহারা চিনিল না, অনন্ত নভো-মণ্ডলের মেঘপুঞ্জের অসীম উর্দ্ধে তাহারা লম্ফ দিবে কি করিয়া? মানুষ-রূপে জীবন-ধারণের যোগ্যতার উপরে দাঁড়াইবে মানবের উচ্চ আধ্যাত্মিকতার অভ্রভেদী বেদী—আমি ইহাই বুঝি।

কিন্তু ইহা ত' প্রচলিত মত-পথের অনুসরণ নহে। গোঁড়া ধার্ম্মিকেরা আমাকে এজন্য "অধার্ম্মিক", "শাস্ত্রদ্রোহী", "অশাস্ত্রীয় পন্থার প্রচারক" আদি অনেক সুললিত বিশেষণে বিভূষিত করিয়া থাকেন। এমন লোকের সঙ্গে থাকিয়া তোমার জীবনে লাভ উঠাইতে পারিবে, ইহা বিশ্বাস কর কি?

(১৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৯)

(৬৩)

যোগ্যতায় যাহারা উৎকৃষ্ট, কেবল তাহারাই আমার প্রিয়,

তাহা নহে। যোগ্যতায় যাহারা নিকৃষ্ট, তাহারাও আমার প্রিয়। আজ যাহারা নিকৃষ্ট, যত্ন এবং অনুশীলনের দ্বারা কাল তাহারা উৎকৃষ্ট হইবে। এই জন্যই ত' আমি দুনিয়ার যত অবজ্ঞাত শূদ্রকেও ব্রাহ্মণ্যের অধিকার বিতরণ করিয়া চলিয়াছি। আমার ন্যায় যাঁহারা দুঃসাহসী নহেন, তাঁহারাও নিকৃষ্টের উৎকৃষ্টতা-লাভ সঙ্গত এবং সম্ভব জ্ঞান করিয়া মুখে নিঃশব্দ থাকিলেও মনে মনে আমাকে সমর্থন করেন, সাবাস দেন। নিকৃষ্টেরা উৎকৃষ্ট হইবে, হইতে পারে, হওয়া উচিত। নিকৃষ্টেরা উৎকৃষ্ট হইবার চেষ্টা না করিলে তাহারা বৃথাই মনুষ্য-জন্ম পাইয়াছে, এই কথাটি সর্ব্বত্র তারস্বরে ঘোষিত হওয়া প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ আর অব্রাহ্মণের মধ্যে কলহ-সৃষ্টির জন্য নহে, প্রকৃত ব্রাহ্মণের মহিমাবর্দ্ধনের জন্যই আমার আকৈশোর অমানুষিক পরিশ্রম। আমার সন্তানেরা অধিকাংশই এই কথাটী বুঝিতে চাহে না বলিয়াই নামে-মাত্র একটী দীক্ষা নিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া যায়। কিন্তু তাহাদিগকে সাধন করিতে হইবে। দীক্ষা যে নবজন্ম, তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই কিন্তু দীক্ষা নিয়া তারপরে সাধন-ভজন না করিলে, সাধন-ভজনের দ্বারা দীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যকে সফলতার দিকে অগ্রসর করিয়া দিবার চেষ্টা না করিলে দীক্ষা সত্ত্বেও পাতিত্য ঘটে। তোমরা সকলকে সাবধান করিয়া দাও, কেহ যেন দীক্ষিত-পতিত না হয়।

(৯ই ভাদ্র, ১৩৬৯)

(৬৪)

গুরুবাক্যে যে কত শক্তি, তাহা কেবল বাক্যটী শ্রবণের ফলে বুঝা যায় না। বাক্যটীকে পালনও করিতে হয়। "অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গী লইয়া যত জনকে পারি সঙ্গী করিয়া ভক্তিভরে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা চালাইয়া যাইবই,—" এই সঙ্কল্প নিয়া যদি চারিদিকে দশ বিশ পঞ্চাশটা অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপিত হইয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে না দেখিতে ঐ অঞ্চলের মানসিক আবহাওয়ার অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। তখন বুঝিতে পারিবে, সমবেত উপাসনা কি আশ্চর্য্য বস্তু। তখন উপলব্ধিতে আসিবে, অখণ্ডমণ্ডলীর কত শক্তি। আদেশ-পালন কেহ করিবে না, কেবল বসিয়া বসিয়া কথা শুনিবে, তাহারা কি করিয়া গুরুবাক্যের শক্তি অনুভব করিবে?

(২২শে ভাদ্র, ১৩৬৯)

(৬৫)

যাহারা একই গুরুর নিকটে একই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য অতীব গভীর। কেহই যাহাতে পথভ্রষ্ট না হইতে পারে, প্রতি জনেই যাহাতে নিজ নিজ গুরুদত্ত সাধনে সর্ব্বশক্তি লইয়া লাগিয়া থাকে, একজনেও যেন সর্ব্বজীবের প্রতি নিজের কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হয়, তদ্বিষয়ে এক গুরুভাই অপর গুরুভাইয়ের, এক গুরুভগিনী অপর গুরুভগিনীর সদাসতর্ক প্রহরীর কাজ করিবে। পরস্পরের

কুশলের জন্য ইহা প্রয়োজন। আর, ইহাতে শৈথিল্য না থাকিলে তোমাদের আদর্শ ও অনুশীলন জগতে অপরাজেয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া থাকিবে।

মনে কখনও ভিন্ন সংঘ বা সম্প্রদায়ের প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ রাখিবে না, কিন্তু তাই বলিয়া নিজেদের মতপথ সম্পর্কে শ্রদ্ধাকেও কমিতে দিবে না। নিজের মতপথের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়াইতে গিয়া যদি ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি বিরোধ করিতে হয়, তবে এমন শ্রদ্ধা আত্মনাশকর। আবার অপরের মতপথের প্রতি সহিষ্ণু, সমদর্শী, উদার ভাব পোষণ করিতে গিয়া যদি নিজ মত-পথ সম্পর্কে শ্রদ্ধাচ্যুত হইতে হয়, তবে তাহাও সর্ব্বনাশকর। দুইটী বিপরীত অবস্থার মধ্যপথ ধরিয়া চলিবে। নিজের মতে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা কোনও অবস্থায়ই কমিতে দিবে না, অপরের মতের প্রতি বিদ্বেষ, বিরোধ, সংঘর্ষবুদ্ধি ও অনুদারতা অন্তরে প্রবেশ করিতে দিবে না। আমাদের আদর্শ সমন্বয়ের আদর্শ। অর্থাৎ সকল মতকে একটী পরম সত্যে বিধৃত জানিয়া সেই পরম সত্যের প্রতি আনুগত্যের আদর্শ, সেই পরম সত্যের সাধনায় জীবনোৎসর্গের আদর্শ, সেই পরম সত্যকে সর্ব্বজীবের করতলগত করাইবার প্রয়াসে বিশ্বদুঃখ বরণের আদর্শ। (২৩শে ভাদ্র, ১৩৬৯)

(৬৬)

আমার নিকটে দীক্ষা নিবার জন্য কদাচ কাহাকেও পরামর্শ

দিবে না। নিজের নিরপেক্ষ বিচারে যিনি আমার কাছ হইতে দীক্ষা নেওয়া আবশ্যক বলিয়া অনুভব করেন, তিনি নিজ অন্তরের প্রেরণায় আসুন। আমি ত' কাহাকেও উপেক্ষা করি না, কাহাকেও আমন্ত্রণও দেই না। আমার সাধন নিখিল ভুবনের প্রতিটি প্রাণীর কুশল লইয়া। সুতরাং আমার কাছে যিনি দীক্ষিত হইবেন, তাহাকে জগতের কল্যাণে লক্ষ্য দিতে হইবে। (১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৫৯)

(৬৭)

দীক্ষা দ্বারা নবজন্ম হয়। তোমাদের তাহা হইয়াছে। কিন্তু প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যপালনের দ্বারা সেই নবজন্মের অতুলন মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণও রাখিতে হয়। তোমাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ, ছোট-বড়, কুলীন-অকুলীন, আদরণীয়-অন্ত্যজ এই জাতীয় যে ব্যবহার-দ্বিধা লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ দুইটী। একটী হইতেছে এই যে, তথাকথিত উচ্চবংশীয় নারীপুরুষেরা চিরাচরিত সংস্কারের দাসত্ব বা আনুগত্য সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দ্বিতীয় কারণটা এই যে, নবদীক্ষিতেরা দীক্ষাপ্রাপ্তির পরবর্ত্তী মিনিট, ঘন্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস ও বৎসরগুলিকে নিজেদের অতীত শূদ্রত্বের অপপ্রভাব হইতে বাঁচাইয়া চলিবার জন্য সরল মনে, অকপটে, সর্ব্বান্তঃকরণে, সর্ব্বশক্তি দিয়া, সর্ব্বতোভাবে চেষ্টমান, যত্নশীল ও সাধন-পরায়ণ হইতেছে না। একটা জাতি বা দেশের সামগ্রিক উন্নতি কেবল

একটা দল লোকে কদাচ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। অপিচ কেবল একটা দল লোকের চেষ্টাতেও উন্নতি সম্ভব হয় না। * * * একজন নাভাগবশিষ্টের দুই পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, একজন বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, তাহাতে বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়দের সর্ব্বসাধারণের কি লাভ হইল? কিন্তু একজন শূদ্র বা বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়ের নন্দন স্বরূপানন্দ-সন্তান হইলে, সে নবদীক্ষিতের চতুর্দ্দিকের সকল আত্মীয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যগুণের প্লাবন বহিয়া যাওয়া চাই। স্বরূপানন্দ বিপ্লবী। তুমি বা তোমার ভাই একজন বা দুইজন শূদ্র আসিয়া ব্রাহ্মণ হইলে, ইহাতে স্বরূপানন্দের অভিলাষ-পূর্ত্তি হইবে না।

(১০ই বৈশাখ, ১৩৭১)

(৬৮)

বৈষ্ণব-গুরুরা শিষ্যকে দীক্ষা দিয়া প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এইরূপ ইঙ্গিত বা উপদেশ দিয়া থাকেন, যাহাতে নবদীক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন মতের ভিন্ন পথের লোকের সহিত ধর্ম্মীয় ব্যাপারে সংসর্গ না করে। এইরূপ ইঙ্গিত বা উপদেশ সকল সময়েই যে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ফল, তাহা মনে করিও না। কখনো কখনো শিষ্যকে নানা মতে নানা পথে আকৃষ্ট হইয়া নিজ পথ হইতে বিচলিত হইবার অপসম্ভাবনা হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য এই সকল উপদেশ দিতে হয়। বাহির হইতে যে উপদেশকে তুমি বা আমি নিতান্তই প্রকোষ্ঠবাদী সাম্প্রদায়িকের নীচতা

বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রলুব্ধ হই, ভিতর হইতে তাহাতে হয়ত শিষ্যের একনিষ্ঠতাকে সযত্নে রক্ষা করিবার ব্যাকুল আগ্রহ ও একান্ত প্রয়োজনীয়তাই ছিল। সবকিছুই বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা যায় না কিন্তু ভাসা-ভাসা দেখিয়াই বিজ্ঞের মতন নিন্দা করিতে বসা চটুলবুদ্ধি অগভীরদৃষ্টি খেলো স্বভাবের পরিচায়ক হয়। তাই, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সাধন-সম্পর্কিত ব্যাপারে কাহারও আপাতদৃশ্য সঙ্কীর্ণতা দেখিলে তদ্বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশে বিরত হন। (২৭শে আষাঢ়, ১৩৭১)

(৬৯)

দীক্ষা নিবার আগে দীক্ষাদাতাতে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও নির্ভর আসা প্রয়োজন। দীক্ষাগ্রহণকে জীবনের একটা অপরূপ পটপরিবর্ত্তন বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত। সদ্‌গুরুকে নিত্যসাথী নিত্যসঙ্গী নিত্যনিকট জানিবার ভিতরে অশেষ বলের উৎস লুকায়িত রহিয়াছে। না জানিয়া না বুঝিয়া কাহাকেও গুরু করা উচিত নহে। দীক্ষা নিবার পরে সাধনও করিতে হয়।

এখনই তুমি দীক্ষা নিবার জন্য ছুটিয়া আসিও না। আমার চিন্তাগুলির সহিত ভাল ভাবে আগে পরিচিত হও। দীক্ষা নিবার জন্য তোমার অন্তরে দেদীপ্যমান আগ্রহ জন্মিয়াছে কিনা, তাহা দেখ। দীক্ষা নিবার অনুকূলে তোমার বিবেক তোমাকে বারংবার নির্দ্দেশ প্রদান করিতেছে কি না, তাহার বিচার কর। গৃহীত দীক্ষার সহিত তোমার জীবন-যাপন-প্রণালীকে এবং

আধ্যাত্মিক সংস্কার-সমূহকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিবে কি না, বুঝিয়া দেখ। আমি একমাত্র ওঙ্কার-মন্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও মন্ত্রে দীক্ষা দেই না। আমি যে প্রণবেরই পূজারী, ইহা ভুবন-বিদিত। তোমার অন্তরের সংস্কার যদি অন্যরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার নিকটে আসিও না। নানা মন্ত্রে নানা জনকে দীক্ষা দিয়া দার্শনিক মতামতের জগা-খিচুড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্ম-জগতে আর একটী নূতন হট্টগোল আমি সৃষ্টি করিতে চাহি না।

প্রণবমন্ত্র স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রণবের আমি প্রচারকও নহি। "এস তোমরা প্রণব-মন্ত্রেই দীক্ষিত হও,"– এই আহ্বান আমার নহে। আমাকেই যাহারা গুরু বলিয়া ধরিবে, তাহাদের প্রণব-মন্ত্রই সাধিতে হইবে, কারণ, বহুবিধ মন্ত্র বহু লক্ষ বার জপ করিয়া করিয়া, প্রত্যেক মন্ত্র হইতে অদ্ভুত অদ্ভুত অনুভব লাভ করিয়া করিয়া, পরিণামে আমি এই পরম সত্যে উপনীত হইয়াছি যে, একমাত্র প্রণবের সাধনে সর্ব্বমন্ত্রের সাধনা করা হয়, প্রণব হইতেই সর্ব্বমন্ত্রের উৎপত্তি, প্রণবেই সকল মন্ত্রের মহা-মিলন বা মহা-সমাধি, প্রণবই সর্ব্বমন্ত্রের আদি, মধ্য ও অন্ত।

ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র জপ করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ মনোভঙ্গী আমি লাভ করিয়াছি কিন্তু প্রণবমন্ত্র পাইবার পরে দেখিয়াছি সকল সাম্প্রদায়িক ভঙ্গিমা একটী মহাভঙ্গিমার এক একটী খণ্ডিত রূপ মাত্র। এই জন্য প্রণব-

সাধনাই ভাবী কালের মহাসমন্বয়ের পথ-প্রবর্ত্তন বা রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়াছে।

আমার নিজের বিচার ও উপলব্ধি এই যে, প্রণবের মাধ্যমে সাধন-পরায়ণ ব্যক্তিদের সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে সাথে সাম্প্রদায়িক আক্রোশ এবং উন্মাদনা প্রশমনের পথে যাইবে।

তথাপি আমি ডাকিয়া কাহাকেও বলিতেছি না,—"এস আমার পথে।"

জগতে যত পথ আছে, তার মধ্যে যাহার যেইটী প্রিয়, সে সেইটী গ্রহণ করুক। তার পরেও যাহারা পথহীন পড়িয়া থাকিবে, সেই দুর্দ্ধর্ষ পুরুষ-নারীদের মধ্যে কয়েক লক্ষ বা কয়েক কোটিকে একদা আমি এক ঝাপটায় আমার বক্ষে তুলিয়া লইব।

আমি আমার শক্তি সম্পর্কে সচেতন, আমি আমার লক্ষ্য সম্পর্কে সতর্ক। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার বিমূঢ়তা আমাকে কদাপি স্পর্শ করিতে পারিবে না। (১লা শ্রাবণ, ১৩৭১)

(৭০)

তোমরা যাকে তাকে দীক্ষা নিবার জন্য পাঠাইও না। সত্য সত্য যাহার গুরুতে পূর্ণ বিশ্বাস আসিয়াছে, মাত্র তাহাকেই পাঠাইবে। অকর্ষিত ক্ষেত্রে বীজ বুনিলে, ব্রহ্মবীজ অবশ্য মিথ্যা যাইবে না কিন্তু নানা বিভ্রাট এবং বিপত্তির মধ্য দিয়া অত্যন্ত দেরীতে বীজে অঙ্কুরোদ্গম হইবে। দীক্ষার উদ্দেশ্য,

যাথার্থ্য, দীক্ষাদাতার জীবনাদর্শ ও দীক্ষার ভিত্তিভূত দার্শনিক তত্ত্বের সহিত যাহার পরিচয় হয় নাই, তাহাকে দীক্ষা দিবার পরে এসব কাজগুলি করিতে হয়। ইহা দীক্ষিতের পক্ষে ক্লেশদায়ক ও দীক্ষাদাতার পক্ষে মর্ম্মপীড়ক হইয়া থাকে।

দীক্ষা শুধু একটা সংস্কার মাত্রই নহে। ইহা জীবনের মহত্তম সংস্কার। বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতির অপেক্ষাও ইহার গুরুত্ব অধিক। একযুগে যখন উপনয়নটাই দীক্ষার সম্মান পাইত, তখন উপনয়নই জীবনের মহত্তম সংস্কার ছিল। 'ব্যাপ্‌টিজ্‌ম' বল, 'সোন্নত' বল বা 'কালেমা' উচ্চারণ বল, সবই এক প্রকারের দীক্ষা। কেবল হিন্দুদের মধ্যেই দীক্ষার প্রচলন আছে, তাহা নহে। প্রকারভেদে ধর্ম্মীয়-বোধসম্পন্ন সকল মানুষের ভিতরেই ইহা আছে। ইহার প্রয়োজন আছে বলিয়াই ইহা আছে, প্রয়োজন না থাকিলে ইহা মানব-মনে ঠাঁইই পাইত না। প্রয়োজনটা এতই গভীর যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহা মানুষকে সংসারের হাজার প্রলোভনীয় বিষয়ে অনায়াসে বিরক্ত করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু গুরুদেবদের হাতে পড়িয়া কাহারও খোশখেয়ালীর চাপে, কাহারও অর্থলোভের দাবে, কাহারও ইন্দ্রিয়পরিতর্পণ-বুদ্ধির কুটচক্রে দীক্ষার দুরন্ত অপব্যবহার হইয়াছে। দীক্ষাকে নিজ নিজ প্রভুত্ব ও প্রতিষ্ঠা-বর্দ্ধনের উপায় রূপে বা অর্থার্জ্জনের কৌশলরূপে প্রয়োগ করিয়া অনেকে সাংসারিক দৃষ্টিতে সফলতা

অর্জ্জন করিয়াছেন কিন্তু ইহার ফলে তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও তপস্যা রসাতলে ডুবিয়াছে, আর দীক্ষা জিনিষটীর অমর্য্যাদা হইয়াছে। মানুষের দীক্ষার প্রয়োজন আছে, তাই তাহারা দীক্ষার জন্য ছুটিয়া যায়, কিন্তু হায়, কি দীক্ষা নিল, কোথায় দীক্ষা নিল, কার চরণে দাসখত লিখিয়া দিল, কিছুই আগে ভাবিয়া দেখে না। ইহারই জন্য কত দীক্ষিতের অগ্রগমন ব্যাহত হইয়া রহিয়াছে, কত দীক্ষিত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অসামাজিক কুক্রিয়া-সমূহের প্রশ্রয়দাতা ও সমর্থকে পরিণত হইয়া যাইতেছে।

তোমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার যে, আমি এক অভ্যুন্নত নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি করিতে আসিয়াছি, তাই একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমার ভাব, আমার আদর্শ, আমার চিন্তা, আমার জীবন-ধারা, আমার কর্ম্মনীতি ও আমার ধ্যানের ধরণী সম্পর্কে কোনও ধারণা যাহার নাই, সে যেন হট্ করিয়া দীক্ষার ঘরে না প্রবেশ করে।

যাহারা দীক্ষা নিয়াছে, তাহাদিগকে সাধন করিতে প্রবল উৎসাহ দিবে। যাহারা দীক্ষা নেয় নাই বা কদাচ কাহারো নিকটে নিবে না, তাহাদিগকেও নিজ নিজ মনোঽভিলাষানুযায়ী সাধন একনিষ্ঠ প্রযত্নে করিয়া যাইবার জন্য প্রেরণা দিবে। অসাধনে মানুষ বহির্ম্মুখ হইয়া যায়। বহির্ম্মুখ মানুষের জীবনে শান্তি দুরূহ ব্যাপার। (২১শে শ্রাবণ, ১৩৭১)

(৭১)

দীক্ষা লইয়া নবজন্ম পাইয়াছ। সাধন করিয়া এই নবজন্ম সফল কর। প্রাণভরা শ্রদ্ধা নিয়া যাহা গ্রহণ করিয়াছ, প্রাণভরা প্রেম নিয়া তাহার সেবা কর। নাম করিতে করিতে অন্তরে আনন্দ উপজাত হইবে। তোমার অন্তর আনন্দে ভরিয়া গেলে জগদ্‌বাসী প্রতি জনে তাহার অংশভাক্ হইয়া কৃতকৃতার্থ হইবে।

নাম করিতে করিতে নামে প্রেম আসে। নাম যদি শূন্য বস্তু হইত, তাহা হইলে, ইহা হইত না। নাম প্রেমের খনি। এই জন্যই নাম করিতে করিতে প্রেম আসে। প্রেম তোমাদের আসুক, দেহমনঃপ্রাণ পরিপ্লাবিত করুক, তোমাদের প্রেম সমগ্র বিশ্বকে আবরিয়া ধরুক। এই আশীর্ব্বাদ করি।

গুরুভাই গুরুভগিনী প্রভৃতি কাহাকেও নামহীন, প্রেমহীন, সাধন-ভজনহীন, কর্ত্তব্যে উদাসীন থাকিতে দিও না। সকলে মিলিয়া সাধন কর, সকলের জন্য সাধন কর, একের সাধনায় সহস্র জনের অন্তরের শূন্যতা দূর কর।

(৭ই কার্ত্তিক, ১৩৭১)

(৭২)

আমাকে বর্জ্জন করিবার পূর্ণ অধিকার ত' তোমাদের প্রত্যেককে দিয়া রাখিয়াছি। সম্ভবতঃ তোমাদের সেই অধিকার-প্রাপ্তির বর্ষকাল আজ পঞ্চাশ পার হইয়া যাইতেছে। তোমাদের সেই অধিকার আমি প্রত্যাহৃত করি নাই। যে ইচ্ছা, আমাকে

ছাড়িয়া চলিয়া যাও। কিন্তু আমার অনুবর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিয়া তোমরা লোকের কাছে সস্তা বাহবা পাইবার জন্য যাহা আমার নির্দ্দেশ নহে, তাহাকেই আমার পন্থা বলিয়া চালাইয়া দিবে, আমার বিশুদ্ধ ধর্ম্মমতকে বিকৃত করিয়া প্রসারিত করিবে, ইহা ত' হইতে পারে না। খৃষ্টধর্ম্ম যখন রোম হইতে কনষ্ট্যান্টিনোপলে আসিল, তখন তাহা পূর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মমত-সমূহের সহিত একটা আপোষ-রক্ষা করিয়া বসিল। ইহার ফলে খৃষ্টানের সংখ্যা বাড়িল কিন্তু খৃষ্টিয়-ধর্ম্মাচার্য্যেরা বলিতেছেন যে, ইহা দ্বারা ধর্ম্মের আদিম শুচিতার রূপান্তর হইয়াছে।

কোনও কোনও ধর্ম্মমতাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্ম্মমতের প্রতি এত নিষ্ঠাবান্ যে, তাঁহারা অন্য মতকে অন্য পথকে সহ্য করিতে পারেন নাই। অকাতরে তাঁহারা অন্য ধর্ম্মকে নির্ম্মূল করিয়াছেন। আমি তোমাদিগকে কদাচ তাহা করিতে বলি নাই। "জগতের সকল সম্প্রদায় আমার" কথাটার মানে এই হইতেছে যে, জগতে যেখানে যিনি যেই ধর্ম্মমত অনুসরণ করিয়া ঈশ্বর-সাধন করিতেছেন, আমি নিজেকে তাঁহার সহিত অভিন্ন অনুভব করিয়া তাঁহার ধর্ম্মানুশীলণ-কালে তাঁহার সহিত রহিয়াছি। "আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের" কথাটার মানে এই যে, যে সম্প্রদায়ের যে সাধক যখনি আমার সন্নিহিত হইতেছেন, আমি তাঁহার মত-পথের অবিরোধী ভাবে তাঁহার ঈশ্বর-প্রেম বর্দ্ধনের কাজে নিয়ত যত্নবান্ রহিয়াছি। জগতের সকল সম্প্রদায় আমার বলিয়া আমি

প্রতিটী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের দিন কাহারও অনুকরণে নষ্টা চন্দ্রার নারিকেল চুরি করিব, কালী-পূজার পাঁঠা বলি দিব, চড়ক পূজায় বর্শি পিঠে বিঁধাইব, অমাবস্যার গভীর নিশীথে পঞ্চমকার-সাধন করিব, ঈদের দিনে গো-কোরবাণী করিব, অথবা বিশেষ এক পুণ্যদিনে পাত্রমধ্যস্থ মদ্যপানে পবিত্রাত্মার পবিত্র শোণিতের সম্মান করিব, ইহা কদাচ হইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে অসাম্প্রদায়িক হওয়া আর লোকের কাছে অসাম্প্রদায়িক খ্যাতি লাভ করা সকল সময়ে এক কথা নহে। (৬ই পৌষ, ১৩৭১)

(৭৩)

গয়া এক বিখ্যাত তীর্থস্থান। ধর্ম্মের স্থান। এ জন্যই এখানে আবার অধর্ম্মও দারুণ। আসিয়াই এক বিকট ব্যাপারের বিবরণ শুনিলাম। কে নাকি এক সদ্‌ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ঘৃতের নিরামিষ আহারের হোটেল বহু বর্ষ হয় খুলিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার হোটেলের এক প্রকোষ্ঠে দুইটী কূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা অসংখ্য পচাগলা এবং দুই একটী তাজা মৃতদেহে বোঝাই। উপরে স্ক্রু'র প্যাঁচে বসান দিব্য শিবমূর্ত্তি। টাকাওয়ালা খরিদ্দার আসিলে এই হোটেল হইতে আর কদাচ গৃহে ফিরিয়া যায় নাই. শিবঠাকুরের পায়ের তলায় খণ্ডিত বিখণ্ডিত অবস্থায় পূর্ব্বগামী মৃতদের দেহালিঙ্গন করিয়াছে।

কেমন, চমৎকার কাহিনী নয়? কাশীতেও এরূপ আছে। এখনো সেখানে এমন কূয়া আছে, যেখানে কাঁটা ফেলিলে মানুষের অস্থিকঙ্কাল উপরে উঠিয়া আসিবে।

ধর্ম্মস্থানে এমন সংকার্য্য হইবে, তবে না এগুলি তীর্থ-সমূহের রাজা বলিয়া পূজা পাইবে!

গুরুদেবের সম্পর্কেও তাহাই। অদ্য এখনি দীক্ষার ঘরে প্রবেশ করিব। শুনিলাম, একজন মহিলা তাঁহার গুরুদেবের আচার-ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধ চিরতরে তুলিয়া দিতে চান। আমি বলিয়াছি,—হাঁ, কদাচারী গুরুকে নিমেষে ত্যাগ করা যায়। কোনো ভয় নাই, আমি ইহাকে আশ্রয় দিব।

আমি আশ্রয় দিব কি আমার নিজের কোনও শক্তিতে? যাঁর শক্তিতে আমি গুরু, একমাত্র তাঁরই শক্তিতে। এজন্যই দুরাচারী গুরুদেবেরা আমাকে ভয় পাইয়া থাকেন। এই জন্যই আমাকে বারংবার বিষপ্রয়োগে হত্যারও ষড়যন্ত্র তাঁহারা করিয়াছেন। ঈশ্বর রক্ষা-কর্ত্তা, তিনি রাখিলে কে মারিবে?

কদাচার, অনাচার, অপচার, ব্যভিচার, সমাজের কল্যাণ-বোধের বিরোধী, নারীর সতীত্ব-বোধের অপলাপকারক সকল মত ও পথ এই দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হউক। প্রত্যেকটী মানুষের মনে নীতি-বোধ আমাদের জাগাইতে হইবে। গুরু ভগবান্, অতএব তিনি দেহকে ভোগ করিলে সতীর সতীত্ব যায়

না, এই জাতীয় মিথ্যা ধারণাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। গুরু যদি ভগবান্ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ভগবান্-রূপে পূজিত হইবার যোগ্য সদ্গুণাবলি তাঁহার মধ্যে থাকা চাই। যিনি কামকাঞ্চনে আসক্ত হইবেন, যিনি নিজের স্বার্থ-সাধনের জন্য অপরের অনিষ্ট করিতে লজ্জাবোধ করিবেন না, যিনি নিজের মান-সম্মান বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজন হইলে নরহত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, কিসের তিনি ভগবান্? ভগবানের প্রাপ্য পূজা কেন তিনি সুকৌশলে অপহরণ করিবেন? তাঁহাকে তাঁহার অভ্যুন্নত গুরুর আসন হইতে কাণে ধরিয়া নামাইয়া না আনিতে পার, বেশ, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের পথ নিজে দেখ। ইহাতে পাপ নাই।

(২৪শে মাঘ, ১৩৭১)

(৭৪)

দীক্ষা পাইয়াও যাহারা সাধনে মন দেয় না, তাহারা বড়ই হতভাগ্য। স্বভাবতঃই দীক্ষাগ্রহণের পরে সাধনে প্রবল রুচি সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সময়ে যাহারা সাধনে লাগিয়া যায়, তাহারা স্বল্পকাল-মধ্যে একচোটে অনেকটা পথ আগাইয়া যায়। যাহারা দীক্ষা নেয় কিন্তু সাধন করে না, কেবল কথা কহিয়া সময় নষ্ট করে, লোক ভুল করিয়া তাহাদিগকে সাধক বলিয়া মনে করিলেও তাহারা কেবলই পিছে পড়িয়া থাকে। প্রতিযোগিতা করিয়া কথা না বলিয়া, প্রতিযোগিতা করিয়া তোমাদিগকে সাধন

করিতে হইবে। *** তোমাদের পথ বড়, তোমাদের মত বড়, এইরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া মানুষের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রবেশ করাইও না। নিজ নিজ সাধনে অপ্রমত্ত একাগ্রতায় লাগিয়া থাকিলেই তোমাদের মত ও পথের মহত্ত্ব প্রমাণিত হইবে।

দীক্ষা একটা নবজন্ম। যে নেয়, সেও ধন্য, যে দেয়, সেও ধন্য। কিন্তু দীক্ষা দেওয়াও কঠিন, নেওয়াও কঠিন। উভয়তঃ প্রয়োজন শুদ্ধ মনের, শুদ্ধ আগ্রহের, নিষ্কাম নিঃস্বার্থ চিত্তভাবের।

দীক্ষা দিবার পরে দীক্ষাদাতার কর্ত্তব্য দীক্ষিতকে বারংবার সাধন-কর্ম্মে উৎসাহিত করা, দীক্ষিতের প্রয়োজন অবিচল নিষ্ঠায় সাধনে লাগিয়া যাওয়া। সাধন করিয়াই সুখ। কেবল দীক্ষা নিয়া কি সেই সুখ আসে? তোমরা প্রতিজনে সাধনে একাগ্র হও।

দীক্ষা দ্বারা পথনির্দ্দেশ মিলিয়াছে। এখন অমিত বিক্রমে চলিতে হইবে, থামিয়া থাকিলে চলিবে না। যে পথ পাইয়াছ, স্নিগ্ধ অন্তরে তাহাতে আস্থা ন্যস্ত কর, দৃঢ় চিত্তে তাহাতে লাগিয়া থাক। সাধন করিয়া নামের অমৃতময় রস আস্বাদন করিয়া কৃতকৃতার্থ হও। *** লোককে আমার শিষ্য করিবার জন্য প্ররোচনা দিবে না। ক্যানভাস করিয়া গুরুভাই-বোনের সংখ্যাবৃদ্ধি করার কাজটী আমি দোষাবহ এবং লজ্জাজনক মনে করি। তোমরা প্রাণপণে সাধন করিয়া

নিজেদের অন্তরের ভাণ্ডার অমৃত-রসায়নে পূর্ণ কর। আপনিই নিখিল বিশ্ব আমার বুকে ছুটিয়া আসিবে।

(১০ই ফাল্গুন, ১৩৭১)

(৭৫)

আমি হিন্দুর ছেলে, মুসলমানের ছেলে, খৃষ্টানের ছেলে, বৌদ্ধের ছেলে এবং ইহুদীর ছেলেকে দীক্ষা দিয়াছি। দিয়াছি অখণ্ড-মতে। আমি লোক-প্রচলিত বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য আদি মতের অনুবর্ত্তী নহি, প্রচারকও নহি। আমি অখণ্ড-মতের প্রচারক।

প্রচারক কথাটীর মানে এক্ষেত্রে এই যে, আমি নিজ জীবনে অখণ্ড-মতের অনুশীলনকারী। আমার আচারে ও আচরণে অখণ্ড-মতের ছাড়া অন্য মতের প্রতিফলন নাই। সুদূর প্রতি-ফলন কিছু থাকিলেও তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে।

এই অর্থেই আমি অখণ্ড-মতের প্রচারক। নতুবা, আমি আমার সেই মতকে বাহিরের লোকের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কদাচ কোনও চেষ্টা জীবনে করি নাই। অখণ্ড-মতবাদের ব্যাখ্যা দিবার জন্য আজ পর্য্যন্ত আমি কোনও সভামঞ্চে ভাষণ দেই নাই। আমার নিজ আচরণের দিকেই আমার লক্ষ্য, বাহিরের প্রচারণার দিকে আমার লক্ষ্য নাই।

তথাপি যে আমার কোনও কোনও শিষ্য আমার উপদেশ-বাণী পাঠ করিয়া নানা স্থানের লোককে শুনায়, তাহার তাৎপর্য্য

এই যে, আমার সেই শিষ্যগণের নিজ মতের প্রতি ঐকান্তিকী নিষ্ঠা সংরক্ষণের জন্য চতুর্দ্দিকের বাতাবরণ অনুকূল করা আবশ্যক। বিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে নিজ নিষ্ঠা অনেক সময়ে দুর্ব্বলতার প্রবণতা পায়। আত্মরক্ষার জন্যই বাতাবরণ বিশুদ্ধ করা প্রয়োজন।

আমার শিষ্যরা যদি উদ্যম-সহকারে আমার মত প্রচার করিত, তাহা হইলে তাহাতে কোনও দোষ হইত না। এমন কি আমি নিজেও যদি নিজের মত প্রচার করিতাম, তাহাতেও দোষ হইত না। যীশু, শঙ্কর, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য আদি প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত প্রচার করিয়াছেন, ইহাতে দোষ হয় নাই। তথাপি আমি যে আমার নিজস্ব মতকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া প্রচার করি না, তাহার কারণ এই যে, অপরকে তার মতে পূর্ণ শ্রদ্ধা লইয়া চলিবার অধিকার দিতে আমি সম্মত। আমি যাহা প্রচার করি, তাহা সকলের পক্ষে গ্রহণীয় শুদ্ধ সংযত সত্যময় সরল পথ, নৈতিক শুদ্ধতার পথ, সচ্চরিত্রতার পথ। আমি যাহা প্রচার করি, তাহা ঈশ্বর-বিশ্বাসের পথ, ঈশ্বরকে ভালবাসিবার পথ। ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার ধারণার সহিত আমার ধারণার পার্থক্য থাকিতে পারে। সেই পার্থক্য বিদূরণের জন্য আমার কোনও মাথাব্যথা নাই। ঈশ্বর সম্পর্কে তোমার ধারণা যাহাই হউক, তুমি তাঁহাকে ভালবাসিলেই আমি খুশী। আমার ধারণার অনুযায়ী ধারণা তোমার নাই বলিয়া আমি

তোমার জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করিব না। এই জন্যই আমার পক্ষে অকাতরে বলা সম্ভব হইয়াছে,—"জগতের সকল সম্প্রদায় আমার, আমি জগতের সকল সম্প্রদায়ের।" অন্যের পক্ষে ইহা বলা সম্ভব হইত কি না ঈশ্বর জানেন। (১২ চৈত্র, ১৩৭১)

(৭৬)

দীক্ষা নেয় অথচ সাধন করে না, এমন হতভাগ্যেরা কৃপারই পাত্র। তোমরা তাহাদিগকে ঘৃণা করিও না। কেবল আমার শিষ্যেরাই এই দোষে দোষী, তাহা মনে করি না। অন্যান্য গুরু-দেবদের শিষ্যভাগ্যও হয়ত কতকটা এই রকম। তবে তারতম্য আছে। কেহ তর, কেহ তম। এই তারতম্যের একটী কারণ এই যে, প্রায় সকল গুরুরাই নিজ নিজ শিষ্যদিগকে গুরুকেই ভগবান্ জ্ঞানে ভজনা করিতে উপদেশ দেন। আমি দেই না। গুরুকে ভগবান্ বলিয়া ভাবিবার মধ্যে সাধন-পথিকের একটা মস্ত সুবিধা রহিয়াছে। তাহা এই যে, পার্থিব ভাবে গুরু-দেবের স্নেহকে বাক্য, ব্যবহার বা সুদৃষ্টির মধ্য দিয়া অনুভব করা সহজ বলিয়া তাঁর প্রতি একটা গভীর ভক্তি ও অনুরক্তি আপনা আপনি সৃষ্ট হইয়া যায়। এ যেন কর্কশ বন্ধুর পথে পীচ দিয়া রাস্তা মসৃণ করার মত একটা বিশেষ অনুকুলতা। পীচের রাস্তায় পথ চলিতে পদদ্বয়, সাইকেল বা মোটরে ঠোকর কম লাগে। খুব সম্ভবতঃ এই কারণেই গুরুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি আরোপ প্রচলিত হইয়াছিল। ইহা আমি গুরুদেবের চালাকি

বা শয়তানী বলিয়া জ্ঞান করি না। শিল্পের দ্রুত অগ্রগমনের সহায়তার জন্যই যেন সাইকেলের হুইলে মবিল ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মৌলিক সদুদ্দেশ্য রহে না। এই পাপেই গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি বর্ত্তমান যুগে অতি সঙ্গত ভাবেই নিন্দিত হইয়াছে। (১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২)

(৭৭)

যেখানে যে গুরুভাই বা গুরুবোন্ আছে, তোমরা তাহাদের সকলের মধ্যে সাধনের উদ্যম সৃষ্টি কর। সাধন করিলে, জীবন সত্যময়, শান্তিময় ও দীপ্তিময় হইয়া উঠিবে। বিশ্বের সকলকে আনিয়া ভগবৎ-প্রেমের স্নিগ্ধ বন্ধনে বাঁধিয়া লইবার ভিতরে যে কৃতিত্ব আছে, রাজ্যজয়ে বা দিগ্বিজয়ে তাহা নাই। নিখিল ভুবন্ জুড়িয়া তোমরা ভগবৎ-প্রেমের প্লাবন সৃষ্টি কর। মহোৎসাহ সহকারে তোমরা মানুষের অন্তরের সুপ্ত দেবত্বকে জাগাইবার কাজে লাগিয়া যাও। আমার প্রত্যেকটী সন্তানের অন্তরে এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন যে, সে মহাকার্য্য সাধনের জন্যই আসিয়াছে, হেলায় খেলায় জীবন বিতাইয়া দিবার জন্য নহে। তোমরা কদাচ আত্মবিশ্বাস হারাইও না।

(১৮ই মাঘ, ১৩৭২)

(৭৮)

ওঙ্কার মহামন্ত্র গুরুমুখে দীক্ষাসূত্রে পাইলে মানব ধন্যাতিধন্য হয়। তখন তাহার আর শত শত দেবদেবীর ভজনা প্রয়োজন হয় না। তোমরা যে এখনও এই বিষয়ে কোনও স্থিরমতে

আসিতে পারিতেছ না, তাহার কারণ তোমাদের নামে অরুচি। যে নাম পাইয়াছ, নিষ্ঠা সহকারে তাহা করিয়া যাও। করিতে করিতে দেখিবে যে, এই এক নামেরই মধ্যে সমগ্র বিশ্ব-জগৎ রহিয়াছে। সুতরাং একমাত্র এই নামের সেবা করিলেই বিশ্বের সকলের সেবা হয়। আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিলেই ত' হইবে না, তোমাদিগকে নামের সেবা করিতে হইবে। নাম করিতে করিতে অন্তরে প্রেম আসিবে। জ্ঞান যেমন প্রেম-রাজ্যের সিংহদ্বার, প্রেম তেমন জ্ঞানরাজ্যের সিংহাসন। অর্থাৎ প্রেম হইলেই জ্ঞান হয় এবং জ্ঞান হইতে প্রেম হয়! আদিতে অন্তে সর্ব্বত্রই প্রেম উন্নতমস্তকে বিরাজমান। প্রেম প্রগাঢ় হইলে বহুত্ববোধ থাকে না, সব কিছুরই একে পর্য্যবসান হয়। আমার শুধু জিজ্ঞাসা, কবে তোমরা প্রেমিক হইবে? অতএব আমার ইহাও জিজ্ঞাসা, কবে তোমরা নামে রুচিসম্পন্ন হইবে। বহুদেবতার সেবা করিয়া কেবল দল বাড়িয়াছে। কেবল ভেদ-বিচ্ছেদ শিখিয়াছ। সকলে একের পূজারী হও। সব দল মিলিয়া একদল হউক। সকলের বলের সকলে অংশী হউক। সকলের বল সকলের অভ্যুদয়ে লাগুক।

আমরা অপরের অবলম্বিত সাধনপথকে নিন্দা যেন না করি। কেন না, যে-কোন মন্ত্র লইয়াই কেহ সাধন করুক, মন্ত্রের সাধন করিতে করিতে তাহার পরম উপলব্ধি ওঙ্কারেই তাহাকে নিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবে। (১৪ই শ্রাবণ, ১৩৭৩)

(৭৯)

সে-ই প্রকৃত পুত্র, পিতার দায় নিজে সাধিয়া যে স্কন্ধে নেয়। জগতে এমন পিতা কে আছে, যে নিজ পুত্রের কাছে এই প্রত্যাশাটুকু করিবে না? যাহারা পুত্রকন্যার চরিত্র-ভাগ্যে নিতান্তই বিড়ম্বিত ও বঞ্চিত, মাত্র তাহারাই বলিবে, চাহি না পুত্রকন্যার সাহায্য, চাহি না তাহাদের সেবা।

গুরুশিষ্য সম্পর্কেও এই কথাই খাটে। গুরু হয় ত' প্রত্যাশা করিবেন না, কারণ, শিষ্যের উপরে নির্ভর অপেক্ষা তাঁহার ঈশ্বরে নির্ভর বেশী। শিষ্য হয় ত' গুরুর আদর্শকে প্রসারিত করিল না, বাহিরের লোক আসিয়া তাহা করিতে পারে। বান্দা যে গুরু-গোবিন্দ সিংহের সামরিক ও সাংগঠনিক আদর্শকে গোবিন্দ-শিষ্য-নামধারী অন্য যে-কোনও শিখের অপেক্ষা বেশী রূপায়ণ করিতে চেষ্টিত ও সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস-বেত্তারা স্বীকার করিয়া থাকেন। বান্দার অসামান্য কর্ম্মোদ্যমে যে শিখ-সাধারণ আসিয়া নিজ নিজ শক্তিকে সংযোজিত করেন নাই, তাহার প্রধান কারণই ত' এই যে, তিনি কতকগুলি বিষয়ে গুরুগোবিন্দ হইতে পৃথক্ ছিলেন। বান্দা যদি গুরুর পাঞ্জা পাইতেন, তাহা হইলে হয়ত শিখের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়-যোজনা হইতে পারিত। বান্দা বৈষ্ণবের ছেলে, বৈষ্ণব-সাধনে চরণশীল, বান্দাকে গুরুগোবিন্দ পাইলেন একান্তই ঈশ্বরাভিপ্রায়ে।

অনেক শিষ্যই গুরুদেবের মত, পথ ও আদর্শকে জগতে প্রচারিত, প্রসারিত ও উজ্জ্বলতর করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা শিষ্য নহেন, এমন ব্যক্তিরাও যে শিষ্যাধিক আনুগত্য নিয়া কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত আসে যে, বিশ্বমানবের প্রতি যাঁহার সম্প্রদায়বুদ্ধিহীন উদার প্রেম, তাঁহার ভাব ও বাণী জগৎকে উপহার দিবার জন্য প্রথাগত শিষ্যেরাই একমাত্র অবলম্বন নহে।

এইরূপ স্থলে শিষ্যকুলের মর্য্যাদা একটু কমিয়া গেল বলিয়া নিশ্চয়ই মনে হইবে। কিন্তু যাঁহারা জগদ্গুরু, তাঁহাদের শিষ্য ত' বর্ত্তমান ও অনাগত যুগ ধরিয়া সমগ্র জগদ্বাসীরাই হইবে। সুতরাং আলাদা করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট ঢংয়ের শিষ্য-কুলের প্রতি তাঁহার তাকাইবার প্রয়োজন কি?

আমি অধিকাংশ সময়ে চিন্তার এই অধিষ্ঠান-ভূমিতে বিচরণ করি। এই জন্যই আমি শিষ্যনামধারীদিগকে আমার কর্ম্ম ও প্রয়াসগুলিতে অকারণে জড়িত করিতে সাধারণতঃ আগ্রহী হই না। তবে প্রকৃত শিষ্য যাহারা, তাহারা নিজেদের ভক্তির মহিমায় আপনিই বুঝিয়া লইবে যে, কি কি তাহাদের অবশ্য-করণীয় এবং আশুকর্ত্তব্য। নিজের কর্ত্তব্য নিজে বুঝিতে পারা অবশ্য বুদ্ধি-নির্ভর ও জ্ঞান-সাপেক্ষ। তোমরা যদি সাধন কর, তবে ত' বুদ্ধি নির্ভুল পথে চলিবে, তবে ত' জ্ঞান পূর্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে। (১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৭৩)

(৮০)

গুরুদ্রোহীকে আপ্যায়ন করার প্রকৃত অর্থ গুরুদ্রোহকে প্রশ্রয় দেওয়া। এই কথা জলের মত শাদা। তোমরা যদি শক্তিশালী সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে চাও, তবে তাহার বনিয়াদ হইবে গুরুভক্তি। এ কথা প্রত্যেক ধর্ম্মসঙ্ঘ মানিয়া থাকেন। যেখানে সঙ্ঘের কোনও বালাই নাই, গুরুর সহিত শিষ্যের ব্যক্তিগত সম্পর্কটুকুই চূড়ান্ত, সেখানে কে গুরুদ্রোহী আর কে গুরুদেবের আদর্শের অনুগত, ইহা নিয়া দ্বন্দ্ব উঠিবার হেতু নাই। ব্যক্তিগত ভাবে কোনও শিষ্য গুরুদ্রোহী হইলে ক্ষমাশীল এবং ক্ষমতাবান্ গুরু সানন্দ অন্তরে শিষ্যের দ্রোহ ও রুদ্র তেজ সহিয়া নিবেন এবং নেন। কিন্তু যেখানে গুরুদ্রোহের অর্থ হইবে সঙ্ঘের একনিষ্ঠা, একলক্ষ্যতা, দৃঢ় সঙ্কল্প এবং আত্মোৎসর্গের কামনাকে শিথিল, দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য করা, সেখানে গুরুদ্রোহ সহনীয়ও নহে, ক্ষমার্হও নহে। সঙ্ঘ যেন একটা ছোটখাট রাষ্ট্র। ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তি অন্যায় করিলে মানুষ তাহা ক্ষমা করিতে পারেন এবং সাধ্যমত ক্ষমা করাই উচিত। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি কেহ দ্রোহ করিলে ব্যক্তির অধিকার নাই সেই অন্যায়ের ক্ষমা করিবার। রাষ্ট্র বহু ব্যক্তির সমষ্টি। সমষ্টির যে ক্ষতি করিতে চাহিবে, ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলেও সে ক্ষমা পায় না। অন্য ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের প্রতিনিধি স্বরূপে তাহাকে শাসন করে, দমন করে। গুরু যখন একক তোমার গুরু,

তখন তুমি দ্রোহ করিলে নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা করিবেন এবং ক্ষমা করিবার শক্তি না থাকিলে তিনি গুরুপদবাচ্যই নহেন। যিনি ক্ষমায় অক্ষম, তিনি নিতান্তই লঘু। যিনি লঘু, তিনি কদাচ গুরু হইবার যোগ্য নহেন। যিনি বহুজনের গুরু, তাঁহাকেও কোনও একটী শিষ্য না মানিলে গুরু তাহাতে রুষ্ট হইতে পারেন না। কিন্তু যেখানে গুরু নিজের নিজস্বতা বিসর্জ্জন দিয়া একটা আদর্শের চরণে নিজেকে বিকাইয়া দিয়াছেন এবং সেই আদর্শের মোহন বেণু-ধ্বনি অসংখ্য নরনারীকে অপরিচয়ের দূরান্ত অতিক্রম করাইয়া পরমাত্মীয়তায় দিগন্ত দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে, যেখানে ইহারা নানা দেশ, নানা সমাজ, নানা পরিবেশ হইতে ছুটিয়া আসিয়া অখণ্ড-মিলন-নিলয় রচনায় আত্মনিয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেখানে বিশ্বের সকল বংশীর ঐক্য-সঙ্গীতের মাঝখানে বেসুরা পেচক-চীৎকার কে সহ্য করিবে? গুরু ক্ষমাশীল, তিনি সবই সহ্য করিবেন কিন্তু সঙ্ঘ গতিশীল, সঙ্ঘ বর্দ্ধনশীল, সঙ্ঘ কর্ম্ম-পরায়ণ, রণপ্রবৃত্ত, নিয়ত-ক্রিয়ান্বিত। সে কেন তাহার গতি, তাহার বৃদ্ধি, ক্রিয়া-কর্ম্ম, সংগ্রাম ও দিগ্বিজয়ের পথে রথচক্রের বাধাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দিবে? দিলে, সে নিজের কর্ত্তব্যের প্রতি দ্রোহ করিবে, নিজের নিষ্ঠা হারাইবে। সঙ্ঘকে কেহ এমন ক্ষতির মুখে পড়িতে দিতে পারে না। তবে যাহারা হৃদয়ে পাষাণ এবং মৌখিক যুক্তিতে দার্শনিক, যাহারা অন্তর্দৃষ্টিতে ক্ষীণ এবং বাহ্য

উদারতার বাহবা-প্রয়াসী, তেমন লোকদের কথা স্বতন্ত্র। সর্ব্বত্রই এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়; যাহারা বাহ্যতঃ অন্তরঙ্গতা দেখাইয়া, অন্তরে অন্তরে তস্করের প্রবেশ-পথই নির্ম্মাণ করে। এই জাতীয় বিবরবাসী ছদ্মচারী কৌটিল্য-পন্থীদের কথা আলাদা। ইহারা সঙ্ঘের পায় না বিশ্বাস, সমাজের পায় না সম্ভ্রম, জীবনব্যাপী শ্রমে লাভ করে না কোনও প্রকারের কৌলীন্য। ইহারা জগতে কাহারও চোখেই আদর্শস্থানীয় নহে। (৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩)

(৮১)

দীক্ষাকালে কোনও কোনও শিষ্য সত্য সত্যই গুরুর সাধন-শক্তির পরিচয় পায়। কেহ কেহ কিছুই টের পায় না। যে পায়, সে ভাগ্যবান্। যে না পায়, সে দুর্ভাগা নহে। শুধু এই পার্থক্যের দ্বারা শিষ্যের উৎকৃষ্টত্ব বা নিকৃষ্টত্ব বুঝা যায় না। ঐকান্তিক আগ্রহ ও দ্বিধাহীন আনুগত্য নিয়া গুরুদত্ত সাধন যে করে, সে-ই প্রকৃত শিষ্য। সাধন করিতে করিতে লব্ধ পন্থার প্রতি গভীর নিষ্ঠা আসে। এই নিষ্ঠা আসিলেই গুরুর শক্তির শিষ্যের মধ্যে প্রকাশ। তখন শিষ্য অতি সহজে প্রকৃতি জয় করে। দীক্ষা গ্রহণকালেই গুরুর শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল, তবু শিষ্য সাধন করিল না; ইহা দুঃখকর। * * * অনেক মহাপুরুষেরা ইতরসুখাকৃষ্ট শিষ্যকে নিজেদের ঐশী শক্তির মহিমায় বিপথ হইতে টানিয়া আনিয়াছেন, ইহা সত্য। কিন্তু যে সকল স্থলে শিষ্যগণ নিজেদের পুরুষকারকে চূড়ান্ত ভাবে প্রয়োগ করিয়া নিষ্কৃতির পথ খুঁজিয়াছেন, সেই সকল স্থলে

তাঁহারা নিজ নিজ গুরুদেবকে শিষ্য-গৌরবে গৌরবান্বিত হইবার সৌভাগ্য দান করিয়াছেন। গুরু চিরকালই শিষ্যকে শক্তি দান করিবেন কিন্তু শিষ্যই বা কেন গুরুদেবকে গৌরব-দানে কৃপণ রহিবেন ?

শিষ্য যদৃচ্ছা পাপ করিয়া বেড়াইবে এবং গুরুদেব নিরন্তর তাহাকে নিজ তপঃপ্রতাপে কেবলই রক্ষা করিয়া যাইবেন, গুরুদেবের উপরে ইহা তোমার এক অতীব অন্যায় আবদার। দেশের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাযুক্ত অনেক ব্যক্তিরও দেখিয়াছি, তাঁহারা সুশাসনের প্রতিষ্ঠা চান, কুশাসনের অবসান চান, দ্রব্যমূল্যের হ্রাস চান, স্বল্পব্যয়ে পুত্র-কন্যার বিদ্যার্জ্জন চান, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ চান, দীর্ঘায়ুর আনুকুল্য চান কিন্তু তাহার জন্য নিজেরা গায়ে পায়ে বা হাতে কলমে কিছু করিতে চাহেন না। সকল সমস্যার সমাধান তাঁহারা চাহেন রাষ্ট্র-ক্ষমতাধিকারী রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছে অথবা সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে। নিজেরাই ভোট দিয়া যখন অতি সাধারণ লোকগুলিকে অসাধারণ করিয়া তুলিয়া তাঁহারা রাষ্ট্রকর্ণধার করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের নিকটে এই প্রত্যাশা কোনও অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার নহে। কিন্তু এই প্রত্যাশা শুধু তাঁহাদের নিকট করিলেই চলিবে না, যাঁহারা জনসাধারণের ভোট-নিয়োজিত দাস মাত্র ; এই প্রত্যাশা পূরণের জন্য নিজেদেরও অনেক কিছু করিতে হইবে। সাধু-সন্ন্যাসীদের নিকট হইতে এই সকল সমস্যার সমাধান চাহিতে যাওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিতান্ত অস্বাভাবিক। সাধু-সজ্জনেরা যোগবলে মানুষের সকল পার্থিব দুঃখ দূর করিয়া দিবেন, এই উদ্দেশ্যে আচার্য্যেরা যোগের বা ভক্তির বা তত্ত্ব-জ্ঞানের আবিষ্কার করেন নাই। (৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩)

সমাপ্ত

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক	বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

শেষাংশ

———